

(ঝরিয়া-বরাকর-মেদিনীপুর)

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো



প্রথম সংস্করণ : আষাঢ়, ১৩৫১

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট-শিল্পী—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৬, চালতাবাগান লেন
কলিকাতা-৬

আট টাকা

বাংলার সেই ধর্মনিষ্ঠ বিপ্লবীদের হাতে—

যাদের প্রতিচ্ছায়া মাস্টারমশাই, টুলু, চম্পা…

ব. ভ. ম.

কর্মচারী প্রভৃতির বাড়ি ও কোয়ার্টাস। এর পরেই বোধ হয় পনের-ষোল মাইলের পরিধি লইয়া রাণীগঞ্জ-বরাকর অঞ্চলের একটা বিরাট খনিচক্র—এখানে-ওখানে, কাছে দূরে, আরও দূরে অন্তর্বিক্ষুব্ধ ধরিত্রীর অভিশাপের মত ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠিয়া আকাশ মলিন করিয়া তুলিয়াছে। পায়ের নিকট হইতে দিক-চক্রবলয়িত সমস্ত দৃশ্যটা এক নজরে দেখা যায়; খুব দূরে বাঁ দিকে পঞ্চকোট পাহাড়ের নীল রেখা। মাস্টারমশাই একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া থাকেন। এক এক সময়ে বোধ হয় নিজে হইতেই কিছু বলিয়া উঠেন, তাহার উত্তরও নিজেই দেন কখনও কখনও।···অন্ধকার একটু জমিয়া উঠিলে আবার বাসায় ফিরিয়া যান।

স্কুলের দেওয়ালের পাশ দিয়া একটা রাস্তা উঠিয়া আসিয়া টিলার গা বাহিয়া আবার অন্যদিকে নামিয়া গেছে; লোক চলাচল খুব কম। একদিন টুলু সেই রাস্তায় আসিয়া মাস্টারমশাইয়ের সামনে দাঁড়াইয়া করজোড়ে নমস্কার করিল। অচেনা লোক, সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিতে বলিল—"ইয়ে—কদিন দূর থেকে দেখেছি—কেন ঠিক বলতে পারি না, কেমন একটা শ্রদ্ধা হয়, ইচ্ছে হয় আলাপ করি, তাই—"

মাস্টারমশাই কয়েক সেকেণ্ড স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর হাসিমুখে বলিলেন—"চাঁদা-টাঁদা আমার দ্বারা হবে না, এখনও গুছিয়ে বসতে পারি নি···"

টুলু একটু বিপর্যস্ত ভাবে বলিল—"আজ্ঞে, চাঁদা নয়।"

"ইন্‌সিওরেন্সের প্রিমিয়াম্‌ও আমি নিয়মিত ভাবে জুগিয়ে উঠতে পারিনি—কিংবা শেয়ারের কল্‌—অনেক গচ্ছা গেছে।"

"আজ্ঞে, এজেণ্ট নয় আমি।"

"তবে?"

"মানে কতবার মনে হয়েছে···মানে···"

টুলু ব্যাকুল ভাবে একবার সামনের দিকে চাহিল, একবার উপরের দিকে চাহিল, তাহার পর চুপ করিয়া গেল। মাস্টারমশাই হাসিয়াই বলিলেন—"বোস, অসুবিধা হবে মাটির উপর বসতে? ঘাস নেই তেমন।"

"আজ্ঞে ঘাস নেই তো কি হয়েছে? আপনি নিজে যখন ব'সে রয়েছেন…"

বলিয়া একেবারেই ঘাস নাই এমন একটা জায়গা দেখিয়া টুলু বসিয়া পড়িল। পাশেই একটা আধপোঁতা পাথরের চাঁই ছিল, তখনও বেশ তপ্ত, কিছু বলিলে বোধ হয় বিনয়ের আতিশয্যে সেইটার উপরই গিয়া বসিবে এই ভাবিয়া বসা সম্বন্ধে মাস্টারমশাই আর কিছু মন্তব্য করিলেন না। তবে হাসিটা মিলাইয়া যাইবার পূর্বে আবার একবার স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

আগন্তুকই আগমনের উদ্দেশ্যটা বলিবে এই আশায় মাস্টারমশাই একটু প্রতীক্ষা করিয়াই রহিলেন, শেষে স্তব্ধতাটা বেশ অস্বস্তিকর হইয়া উঠায় যেন একটা কথা পাড়িবার জন্য হাসিয়া বলিলেন—"কিছু মনে করলে না তো?… ও-রকম গৌরচন্দ্রিকা এর আগে অনেক ভুগিয়েছে। তাই…"

"না আপনি বলবেন তার জন্যে মনে করব কি?…তা ভিন্ন, ভোগায় বইকি ওরা—"

প্রশ্ন হইল—"এখানে কোথায় থাক তুমি? কর কি?"

টুলু বলিল—"এখানে থাকি না আমি, নতুন এসেছি। বাজারে কাকার একটা স্টেশনারি দোকান আছে—স্টেশনারি আর ড্রাগস্—সবচেয়ে বড় যেটা —ব্যানার্জি অ্যাণ্ড কোম্পানি, দেখে থাকবেন।"

"সেই দোকানে বসো?"

"আজ্ঞে না; ওসব দিকে টেস্ট্ নেই।"

"তবে? মাইন্-এ কাজ খুঁজছ?"

"আজ্ঞে না, ওসব কিছুই ভালো লাগে না।"

মাস্টারমশাই একটু মুখের দিকে চাহিলেন, প্রশ্ন করিলেন—"পড়েছ কত দূর?"

উত্তর পাইতে একটু বেশি বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া প্রশ্নটার আর পুনরুক্তি করিলেন না।

নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। কথাবার্তার মোড় ফেরায় টুলু যেন একটু খুশি হইল, বলিল—"আজ্ঞে, আমার নাম নিতাইপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের বাড়ি রাজসাহী, বাবা সেখানে ওকালতি করেন—বেশ বড় উকিলই একজন।

আমার কিন্তু আই-এ পাশ দেওয়ার পর আর পড়তে ভালো লাগল না—কি হবে প'ড়ে বলুন?—এই তো দেখছি। ইচ্ছে হয় কিছু কাজ করি, কিন্তু ঠিক মনের মতন কাজ পাচ্ছি না।"

প্রশ্ন হইল—"কি ধরনের কাজ চাও তুমি?"

টুলু একটু চুপ করিয়া ভাবিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল—"আপনি ভূমানন্দ মহারাজের নাম শুনেছেন বোধ হয়?"

"না। নামটা নতুন নতুন ঠেকছে; একটু বেশি অ্যাম্বিশাস্ও।"

টুলু আবেগের মাথায় মন্তব্যটা আর খেয়াল করিল না, বলিয়া চলিল—"সেই এক মহাপুরুষ দেখেছিলাম। রাজসাহী থেকে কয়েক মাইল দূরে পদ্মার ধারে আশ্রম করেছিলেন। ছ ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, তেজ যেন ফুটে বেরুচ্ছে। সমাধির মধ্যেই কথা কইতেন, একজন লিখে রাখত, তারপর সমাধি ভাঙলে সবাইকে বুঝিয়ে দিতেন…"

মাস্টারমশাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া শুনিয়া যাইতেছিলেন, শেষ হইলে ঠোঁটের কোণটা যে একটু কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল সেটাকে মিলাইয়া লইয়া প্রশ্ন করিলেন—"তুমি সেই আশ্রমভুক্ত হয়েছিলে বুঝি?"

"হব-হব মনে করছি—মানে হাঁটি-হাঁটি ক'রে একটু কৃপালাভ হয়েছে ব'লে মনে হচ্ছে, এমন সময়…" টুলু হঠাৎ চুপ করিয়া গেল। একটু অপেক্ষা করিয়া মাস্টারমশাই প্রশ্ন করিলেন—"চুপ করলে যে?"

কুণ্ঠাটাকে কাটাইয়া উঠিয়া টুলু বলিল—"অমনধারা লোক কখনও দাগী আসামী হতে পারে ব'লে আপনার বিশ্বাস হয়? ছ ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, আর তেমনি…"

মাস্টারমশাই আরও একটা হাসিকে অনেক কষ্টে মিলাইয়া লইয়া বলিলেন—"আমি সাত ফুট আড়াই ইঞ্চি পর্যন্ত দাগী আসামী দেখেছি। একদিন বুঝি হঠাৎ আর তাঁকে দেখা গেল না?"

একটু বেদনাতুর দৃষ্টিতে চাহিয়া টুলু বলিল—"আজ্ঞে ওঁরা এমনিই থাকতে চান না লোকালয়ে, তারপর এইসব লুকোচুরি—জানেনই তো পুলিসকে।…আমরা কয়েকজন শিষ্য মিলে আদর্শটা প্রচার করব ভেবেছিলাম—সেখানেও পুলিস…"

"আদর্শটা ছিল কি তাঁর ?"

টুলু একটু চিন্তা করিয়া বোধ হয় সেটা গুছাইয়া বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় দেখা গেল স্কুলের সেক্রেটারি গেট খুলিয়া স্কুলে প্রবেশ করিতেছেন। মাস্টারমশাই উঠিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, আর একদিন শোনা যাবে। হ্যাঁ, তোমার নামটা কি বললে ?"

টুলু বিনীত ভাবে মাথাটা একদিকে একটু ঝুঁকাইয়া বলিল—"আজ্ঞে, নিতাইপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। সবাই টুলু ব'লে ডাকে, আপনিও তাই ব'লেই ডাকবেন।"

দুইজনে কাঞ্চনতলা থেকে ধীরে ধীরে একসঙ্গে নামিলেন। ফটকের বাহির হইয়া টুলু গঞ্জের উল্টাদিকে মুখ ফিরাইল। মাস্টারমশাই একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"ওদিকে যে ?"

টুলু মুখটা নিচু করিয়া দাঁড়াইল। দ্বিতীয় বার প্রশ্নে একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলিল—"বালিয়াড়িতে একজন নাকি সিদ্ধপুরুষ এসেছেন স্যার..."

মাস্টারমশাই এবার বিস্ময়ে একেবারে সিধা হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"তাতে কি ? আর বালিয়াড়ি—সে তো প্রায় দু কোশ এখান থেকে—সন্ধ্যে হয়ে এলো, নির্জন পথ..."

টুলু মুখটা তুলিয়া লজ্জিতভাবে হাসিল। হাসিটা সলজ্জ হইলেও মাস্টার-মশাই লক্ষ্য করিলেন তাহাতে একটা অটল প্রতিজ্ঞা ওতঃপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। এই প্রথম বার চেষ্টা করিয়াও তিনি নিজের মুখের অত সহজ হাসিটা টানিয়া আনিতে পারিলেন না। টুলু ঢালু পথ দিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া চলিল, একবারও ফিরিয়া চাহিল না, যেন টের পাইয়াছে মাস্টারমশাই ঠিক সেই জায়গাটিতে দাঁড়াইয়া আছেন, ফিরিলেই আবার লজ্জায় পড়িতে হইবে।

নীচের বস্তি থেকে কি একটা কলরব উঠিল—ওঠে মাঝে মাঝে ও-রকম—হয়তো মাতলামি, হয়তো এ ওর ঘরে চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে, হয়তো চুরির চেয়েও বীভৎস কিছু।—মাস্টারমশাইয়ের দৃষ্টিটা ধীরে ধীরে বিরাট খনিচক্রের দিক্‌রেখার উপর দিয়া ঘুরিয়া আসিল—এই একটি মাত্র বস্তি নয় তো—এমন কত শত। ধরিত্রীর সমস্ত অঙ্গ বিষাক্ত ক্ষতে যেন ভরিয়া উঠিয়াছে।

তাহার পর টুলুর উপর নজরটা ফিরিয়া গেল—দৃঢ় পদক্ষেপে সাধুসঙ্গমে চলিয়াছে—দেশের একজন সক্ষম যুবা!

নেপথ্যে মাস্টারমশাই বড় একটা হাসেন না, কথাটাকে যেন চিবাইয়াই বাহির করিলেন—"ভক্তি! মানুষ না পাওয়া যায়, অমানুষের পায়েই লুটিয়ে পড়বে, ভক্তি ঢালা চাই-ই—হাজার হাজার বছর ধরে শুধু তো এই জমা করলে, রাখে কোথায়?—যতই অত্যাচার বেড়েছে ততই জমেছে যে ভক্তি—"

স্কুলের চাকরটা আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া বলিল—"সেক্রেটারি বাবু এলেন আজ্ঞে।"

কথাটা কানে গেল না; মাস্টারমশাই টুলুর দিকেই চাহিয়া বলিলেন—"আমার চাই; ওই তপস্যা, ওই দৃঢ় গতি আমি উল্টো দিকে ফেরাবই—"

চাকরটা আবার বলিল—"সেক্রেটারি বাবু এলেন আজ্ঞে।" ফিরিয়া চাহিয়াও কথাটা বুঝিতে মাস্টারমশায়ের একটু বিলম্ব হইল; চাকরটা আবার সেই চারিটা কথার পুনরুক্তি করিল। মাস্টারমশাই বলিলেন—"চেয়ার বের ক'রে দিয়েছিস?—চল্।"

কয়েক পা গিয়া আবার একটু বাধা পড়িল; টুলুর গলা—"স্যার, একটু দাঁড়ান।"

ফিরিয়া দেখেন হন-হন করিয়া উঠিয়া আসিতেছে। কাছে আসিতে আসিতে বলিল—"পায়ের ধুলো নেওয়া হয়নি, তাই⋯"

ঝুঁকিতে যাইবে, মাস্টারমশাই তাহার কাঁধ দুইটায় হাত দিয়া সোজাই দাঁড় করাইয়া রাখিলেন, মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—"এসে যেমন করেছিলে তেমনি সোজা হয়েই নমস্কার কর টুলু।⋯অন্তত একটা মাস দেখে নাও অত ভক্তির যোগ্য কি না এই নতুন লোকটি।⋯যাও এবার, নমস্কার।"

ওর অভিবাদনের আগেই প্রত্যাভিবাদন করিয়া আবার স্কুলের অভিমুখী হইলেন।

॥ দুই ॥

এর পর টুলুই মাস্টারমশায়ের সমস্ত মনটা অধিকার করিয়া রহিল—একেবারে নিদ্রা না হওয়া পর্যন্ত, বরং বেশ খানিকটা বাধাও দিল নিদ্রায়। ছেলেটি আসিয়াছে তাঁহার আকর্ষণে—তাহার মূলে নিশ্চয় তাঁহার ঐ কাঞ্চন-তলাটির মৌনবিলাস; আসিয়াই কিন্তু সেও মাস্টারমশাইকে আকৃষ্ট করিয়া লইল।

টুলু যে আই-এ পাস করিয়াছে বলিল সে নিশ্চয় অনেক পূর্বের কথা, এখন তাহার বয়স প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ বছর। বেশির ভাগ বাঙালী যুবকের মত স্বপ্নালু ও আদর্শবাদী। মনে হয় বাড়ীতে একটু আদর পাইয়া আসিয়াছে বেশি; এই আদর ও আদর্শের সমন্বয়ে তাহাকে বয়সের অনুপাতে অনেক বেশি ছেলেমানুষ দেখায়। এইখানে টুলু মায়া জন্মাইয়াছে একটা।...এদিকে টুলু একটা আশা লইয়া আসিয়াছে—ওকে কোন গুরুত্বপূর্ণ বাণী দিতে হইবে—নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক; কোন গভীর আধ্যাত্মিক রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া ধরিতে হইবে ওর চোখের সামনে; ওকে কোন আধ্যাত্মিক পথে পরিচালিত করিতে হইবে। ভূমানন্দ স্বামীর সম্বন্ধে বিদ্রূপে টুলু পীড়া অনুভব করিয়াছিল, সিদ্ধ-পুরুষের উল্লেখে হইয়াছিল লজ্জিত। তবুও এই সূক্ষ্মশক্তি-বিষয়ে মাস্টার-মশাইয়ের ঔদাসীন্য এতে টুলুকে বিচলিত করিতে পারে নাই। ও বরং এটাকে মহাপুরুষের লক্ষণ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছে,—ওঁরা তো এইভাবেই আত্মগোপন করেন, গা-ঝাড়া দেন।

এইখানে আকর্ষণের মধ্যে আছে আশঙ্কা—যদি উহাকে স্পষ্ট করিয়া বলা যায় অলৌকিক কোনকিছুর বিন্দুবিসর্গও ওর মধ্যে লুকানো নাই তো, টুলুর বিশ্বাস আরও পাকা হইয়া উঠিবে, এবং ও হয়তো তখন খোলাখুলিই তপস্যা আরম্ভ করিয়া দিবে। এরা আবার মহাত্মা বলিয়া চারিদিকে ঘোষিত করিয়া অনেক সময় অতিষ্ঠ করিয়াও তোলে! চিন্তার বিষয় বই কি!

এসব চিন্তার পাশেই সেই ছবিটি ফুটিয়া উঠে—অন্ধকার সম্মুখে রাখিয়া সুদূর নির্জন পথে দৃঢ় পদক্ষেপে টুলু সাধুসঙ্গমে চলিয়াছে।

আকর্ষণে-বিকর্ষণে টুলু মাস্টারমশাইয়ের একটা অশান্তি হইয়া উঠিল। কিন্তু সব-কিছুর মধ্যেই ঐ কথাটা ধরিয়া রহিলেন—টুলুকে চাই-ই।

ধর্মের বিলাস ঢের হইয়াছে, এখন ঐ প্রতিজ্ঞার দরকার অন্য দিকে। হাজার বৎসরের ধর্মাবেগকে কাজে ফিরাইতে হইবে।

কিন্তু এখন কথাটা কিভাবে পাড়িতে হইবে যাহাতে ওর "কৃপালাভ"-এর আশাটা একেবারে ধূলিসাৎ না হইয়া যায়, তাহা হইলে ভড়কাইয়া যাইবে। প্রথম নম্বর—ভাষাটা হওয়া চাই আধ্যাত্মিক-ঘেঁষা।

পরদিন টুলু আসিলে বলিলেন—"টুলু, মনের খুব গভীরে আমার এক এক সময় একটা ইয়ে হচ্ছে— এক ধরনের সঙ্কেত পাচ্ছিই, বলতে পার যে তুমি আধ্যাত্মিক কিছু একটা পাবার জন্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছ···"

ভাষাটিই নিজের কানেই বেশ চমৎকার লাগিল, "হাতড়ে বেড়াচ্ছ"টা আবার একেবারে আধুনিক।

টুলু উল্লসিত হইয়া উঠিল, হাত দুইটা কচলাইতে কচলাইতে বলিল—"আপনি যে সেটা একদিন-না-একদিম টের পাইবেনই স্যার, আমার একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। আপনি মুখে যাই বলুন, কিন্তু আমি তো অনেক জায়গায় ঘুরলাম, অনেক সাধুসঙ্গ করলাম···"

খুব সূক্ষ্ম একটা আধ্যাত্মিক হাসি ঠোঁটে অল্প একটু ফুটাইয়া মাস্টারমশাই বলিলেন—"কিন্তু একটা কথা টুলু—ছাদে উঠতে চাইছে একটা লোক, অর্থাৎ এমন জায়গায় পৌঁছতে চাইছে যেটা তার বাড়ির শেষ —এক হিসাবে তার ঐহিক যা কিছু তার পরিসমাপ্তি ; অতটা যদি না-ই স্বীকার কর—তার ঘরকন্না যেখানে গিয়ে মুক্ত আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে—যে-আকাশ অনন্তেরই একটা প্রতীক ; স্বীকার কর তো ?"

টুলু নড়িয়া চড়িয়া গুছাইয়া বসিল।

মাস্টারমশাই বলিলেন—"কিন্তু একটা কথার উত্তর দাও, সে এক লাফে যদি উঠবার চেষ্টা করে···"

টুলুর মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কথাটা কাড়িয়া লইয়া একটু ব্যঙ্গের হাসির সঙ্গেই বলিল—"তা হ'লে বুঝতে হবে স্যার, তার একেবারে আদি পুরুষের বুদ্ধি আবার মাথায় ঢুকে পড়েছে।"

ডারউইনের মতবাদ টুলু যে এমন চমৎকার রসিকতায় ফুটাইবে মাস্টারমশাই সেটা আশা করেন নাই, বেশ ভুলিয়াই হাসিয়া উঠিলেন। তারপর আবার গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"অস্বীকার করছ তো? তার মানে তাকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে। এখন সিঁড়ি জিনিসটাকে বোঝবার চেষ্টা কর—এ এমন একটা জিনিস যা আমরা পা দিয়ে মাড়াই অর্থাৎ যা নিম্নস্তরের অথচ যা মাড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের খানিকটা ক'রে তুলে দেয়।"

টুলু মুগ্ধ দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া রহিল; পাশে একটা ফুল ঝরিয়া পড়িতে অন্যমনস্ক ভাবে সেটা তুলিয়া লইয়া দুই হাতের মধ্যে করিয়া কতকটা ভাগবত শোনার মত লইয়া বসিল।

মাস্টারমশাই বলিলেন—"তা থেকে দাঁড়াচ্ছে কি? এই নয় কি যে আমরা কোন জিনিসকেই ছোট বলতে পারি না? শুধু তাই নয়—সঙ্গে সঙ্গে এও নয় কি যে কোন বড় কাজ করতে হ'লে, কোন বড় সাধনায় সিদ্ধি পেতে হ'লে আমাদের ছোট থেকেই আরম্ভ করতে হবে?"

তুলনার মধ্যে সাপ-ব্যাঙ যাই থাক্, ফল হইল। টুলু একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল, বলিল—"আগে এ-বি, তারপর তো বি-এ, এম-এ স্যার।"

মাস্টারমশাই বলিলেন—"আমি জানতাম তোমায় বোঝাতে বেগ পেতে হবে না আমার।···ঠিক এই জন্যে আমাদের দেশের মুনিঋষিরা আধ্যাত্মিক লাভের আগে রেখেছেন সেবা-ধর্ম, কেননা চিত্তশুদ্ধি করতে সেবা-ধর্মের মতন কিছুই নেই, আর চিত্তশুদ্ধি না হ'লে···"

টুলুর চোখের দীপ্তি হঠাৎ একটু নিষ্প্রভ হইয়া গেল যেন, বলিল—"কিন্তু গুরুদেব অর্থাৎ স্বামী ভূমানন্দ বলতেন, ওসব আজকালকার মিশন-সন্ন্যাসীদের হুজুগ, ও দিয়ে আত্মার কিছুই লাভ হয় না স্যার।"

মালাই-মালপোয় গড়া ছয় ফুট তিন ইঞ্চির লাস—সে সন্ন্যাসী আর অন্যবিধ কি বলিবে? মাস্টারমশাই সে কথা অবশ্য টুলুকে বলিলেন না এবং যদিও

একটু ধাক্কা খাইলেন, নিরুৎসাহ হইলেন না; কহিলেন—"তোমার গুরুদেব ঠিক বলেছেন টুলু—হয়তো তোমার একটু বোঝবার ভুল হয়েছে,—লোকে সেবার নেশাতেই প'ড়ে থেকে সব নষ্ট করে যে। কথা হচ্ছে—সিঁড়িটা যেমন উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য ছাদ, সেবাটা তেমনি সাধন মাত্র, উদ্দেশ্য আত্মিক উন্নতি। এখন তুমি যদি সিঁড়ি আঁকড়ে প'ড়ে থাক—পারবে কি উঠতে ছাদে?"

আবার চোখের দীপ্তিটা ফিরিয়া আসিল, বরং মনে হইল বেশ একটু বেশি করিয়াই, টুলু বলিল—"কি করতে আপনার আদেশ হয় বলুন?"

মাস্টারমশাই হঠাৎ মৌন হইয়া পড়িলেন। শুধু পাণ্ডুর মুখটা স্থানে স্থানে রক্তিম হইয়া উঠিল। নেপথ্যে কে যেন তাগাদা দিতেছে—সে তাহার নিজের ভাষায় কি বলিতে চায়; প্রবঞ্চনার ভাষা নয়—স্পষ্ট অনুভূতির সঙ্গে যে ভাষার নাড়ির যোগ। তবু সংযত ভাবেই আরম্ভ করিলেন—"যার সেবা করছ, তার অবস্থা যত হীন, সে যত দুঃস্থ, যত পতিত, সেবার স্কোপ্‌টা ততই বেশি, আর তাই থেকে চিত্তশুদ্ধির সুযোগটাও তত বেশি এটা নিশ্চয় স্বীকার করছ। তা হ'লে ঐ বস্তির দিকে চেয়ে দেখো—রোগ, দারিদ্র্য, দুর্নীতি—মানুষকে টেনে পশুর স্তরে নামিয়ে ফেলতে যা-কিছু দরকার সে-সবের এক জায়গায় অমন সমাবেশ আর দেখতে পাবে না টুলু। সর্বনাশের কথা এই যে ওরা যে কত নেমে গেছে, উঠতে পারলে মানুষ হিসাবে তাদের যে কত ওঠবার সম্ভাবনা ছিল—সেটা পর্যন্ত ওরা আর টের পায় না। আরও সর্বনাশের কথা ওরা সুখে আছে। হয়তো বলবে, সুখই যখন সবার চরম লক্ষ্য তখন কাজ কি ওদের অশান্তি বাড়িয়ে? কিন্তু কথা হচ্ছে, যে-অবস্থায় কুকুর ছাগল, এমন কি নর্দমার পোকা সুখে থাকে সে-অবস্থায় যদি মানুষও সুখে থাকে তো সে যে একটা মস্ত বড় অপচয় ভগবানের রাজ্যে টুলু, অতখানি মনুষ্যত্বই যে বিলীন হয়ে গেল সৃষ্টি থেকে। মানুষের দারিদ্র্য হবে ইচ্ছাকৃত ত্যাগ থেকে উৎপন্ন—সে দারিদ্র্য তপস্যা, সে মানুষের মতোই বিরাট। ঠিক এই এখন আমার চোখের সামনে সে-দারিদ্র্যের ছবি ভেসে উঠছে—স্মার্ত রঘুনন্দনের জীবনে—তেঁতুল-পাতার শাক আর অন্ন—প্রতি তেঁতুলপাতাটি তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্বের তেজ পূর্ণ ক'রে তুলেছে—রাজা দান দিতে চাইছে, এই অকিঞ্চন পৃথিবীতে তিনি নেবার যুগ্যি

কিছুই খুঁজে পেলেন না।···ওই দারিদ্র্যকে বুঝি ; তার মধ্যে হীনতা কিছু নেই, ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের আত্মারই একটি বিকাশ সে-দারিদ্র্য। কিন্তু চারিদিকের অর্থগত বিলাসের মধ্যে, চারিদিকের ভূরিভোজের ঢেঁকুরের মধ্যে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে ঐ যে তিলে তিলে মরা, তারপর এই তারতম্যের—অর্থাৎ এই অভাবের বোধটুকুও আস্তে আস্তে অসাড় হয়ে যাওয়া—একে একে যত রকম পাপ সবকে পাথেয় ক'রে নিয়ে—অমৃতের পুত্র ব'লে যাদের সম্বন্ধে বড়াই করি, তাদের এই নরকের দিকে তীর্থযাত্রা—এ দারিদ্র্য আমি বুঝি না টুলু। যদি কিছু করতে চাও তো এদের বাঁচাও, তার চেয়ে বড় কাজ কিছুই নেই। সত্যি কথা বলতে কি, তুমি হয়তো ভাবো বিকেলে এই নির্জন কাঞ্চনতলাটিতে ব'সে আমি আত্মার ক্ষমতা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করি কিংবা পরমেশ্বরের ধ্যান করি। জায়গাটি বড্ড মনোরম—একেবারে চরম সত্যেরই আরাধনা করবার মতন, হয়ও ইচ্ছা এক এক সময়, কিন্তু পারি না। বড্ড বাধা দেয় আমায় ঐ বস্তি, আর তারই অন্ন খেয়ে তারই দিকে উদ্ধত অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চাওয়া ঐ রঙ-করা বাড়িগুলো।···আমার উপায় নেই, কেন তা হয়তো একদিন তোমায় বলব ; এখন জেনে রাখ—পরের দাস, সময় অল্প, তার ওপর অন্নচিন্তা চমৎকারা। তুমি নেমে এস এইখানে, তোমার বয়স, আছে, উৎসাহ আছে, টাকা আছে, সবচেয়ে বড় কথা আছে অবসর, তুমি ”

হঠাৎ মনে পড়িল একটু ঝোঁকে পড়িয়া গেছেন, আবেগের মাথায় যা-কিছু বলিয়া গেলেন, সেগুলো টুলুকে না বিচলিত করিবারই কথা। ওর মাথা খাইয়াছে ধর্ম, ধর্মের বিকারই বলা সমীচীন, যাহাতে ছয় ফুট তিন ইঞ্চির একটা ভোগপুষ্ট দুর্বৃত্তকেও গুরু বলিয়া মানিয়া লইতে বাধে না।···চুপ করিয়া গেলেন।

টুলু মুখের উপর চোখ তুলিয়া শুনিতেছিল, চুপ করিতে দৃষ্টি নত করিল। মাস্টারমশাই চুপ করিয়াই রহিলেন ; যখন প্রকাশ হইয়া গেছে মনের আবেগটা, হাসির বা প্রবঞ্চনার ভাষা দিয়া আর ঢাকিবার চেষ্টা করিলেন না ; উত্তরটা কি হয় শুনিবার জন্য নীরবে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

একভাবেই থাকিয়া টুলু অনেকক্ষণ ভাবিল, তাহার পর মুখটা তুলিয়া প্রশ্ন করিল—"আপনার বিশ্বাস হয় আমার দ্বারা হবে?"

নরম ভাবালু দৃষ্টিতে কোথায় যেন একটু দীপ্তি আসিয়াছে। ঐ ধরনের ছেলেদের মধ্যে এটা অনেক বারই দেখিবার সুযোগ হইয়াছে—চেনা জিনিস, বড় একটা টেঁকে না; তবু নিরুৎসাহ করিলেন না মাস্টারমশাই, অর্থাৎ নিরুৎসাহ হইলেন না, বলিলেন—"একদিনেই তো কোন জিনিস হয় না টুলু।"

টুলু একটু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"কিন্তু এই পথে গেলে পাব তো সে জিনিস, স্যার, যা খুঁজছি ?"

মাস্টারমশাই বলিলেন—"পথটা তো আমার নয় টুলু, মুনিঋষিদের সৃষ্টি, আগেই তো বলেছি সে কথা তোমায়।"

টুলু আবার দৃষ্টি নত করিয়া একটু ভাবিল, তাহার পর বলিল—"তাই করব না হয়, চিত্তশুদ্ধি হয়ে যখন আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা বলছেন।"

সেই দীপ্তি এইটুকুতেই মলিন হইয়া আসিয়াছে,—মনের উপর সংশয়ের চাপটা আর সহ্য করিতে পারিতেছে না টুলু।

আজ এই পর্যন্তই রহিল; মাস্টারমশাই প্রসঙ্গান্তর আনিয়া ফেলিলেন, বলিলেন,—"হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম, তুমি যাঁর দর্শনে গিয়েছিলে কাল—কি হ'ল, এসেছেন ?"

"না বোধ হয় দেরি হবে স্যার, টপ ক'রে তো পাওয়া যায় না তাঁদের।"

মাস্টারমশাই বলিলেন—"ভালই হ'ল টুলু, তুমি বরং ততদিন খানিকটা এগিয়ে থাক—হুট ক'রে অত বড় একটা মহাপুরুষের সামনে যাওয়া···"

হাসিয়া বলিলেন—"মানে, হাইস্কুলের আগে তুমি আমার মাইনারের কোর্সটা শেষ ক'রে নাও।"

॥ তিন ॥

মানুষ যে-কাজটা করিতে চায় না, অথচ যেটা না করিয়া উপায় নাই, সব ছাড়িয়া আগে সেই কাজটা ধরে। আনন্দ আছে এমন কাজ মানুষ জিয়াইয়া রাখে, ধীরে-সুস্থে একটু একটু করিয়া স্বাদ লইয়া সম্পন্ন করে, যে-কাজে বিতৃষ্ণা বিরক্তি সেটা তাহার কাঁধের বোঝা, কোন রকমে তাড়াতাড়ি ঝাড়িয়া না ফেলা পর্যন্ত তাহার নিষ্কৃতি নাই।...বস্তির সেবায় টুলুর তাহাই হইল।

সেবাটা যে ঠিক কাহার হইবে, কি আকারের হইবে সে সম্বন্ধে মাস্টার-মশাইয়ের সঙ্গে একটা পরামর্শ করিবার ধৈর্য রহিল না টুলুর। সে যেন কোন রকমে তাঁহাকে একটা রিপোর্ট আনিয়া দিলে বাঁচে—এই আমি গিয়েছিলাম, এই আমার কাজ, এই আমি ফিরিয়াছি। কাজ শেষ করিবার তাড়াহুড়ার মধ্যে কাজটা যে কি সেটা ভাবিয়া দেখিবার ফুরসত হইল না।

বস্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণাও নাই। চিরকাল আশ্রম ঘাঁটিয়াই বেড়াইয়াছে,—নদীর তীর, কিংবা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, তাহার পর বৃক্ষলতাগুল্মের স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রম—ছাদই হোক, খড়ের চালই হোক, তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে কয়টি ঘর, গেরুয়ায় ছোবানো বস্ত্র-উত্তরীয়-পরা শান্তদৃষ্টি মৃদুহাস আশ্রম-বাসীর দল—বাড়ির বাহিরের জীবন সম্বন্ধে টুলুর এই ধারণা। এই নিশ্চিন্ত, সত্ত্বগুণাশ্রিত জীবনের সঙ্গে যাহা খাপ খায় না টুলু তাহা কখনও খোঁজে তো না-ই, বরং সব রকমে এড়াইয়াই আসিয়াছে। গঞ্জডিহি আসিয়াও সে আকৃষ্ট হইয়াছে এর বাহিরের সৌন্দর্যে, এর দূরের রূপে; কী যে এর বেদনা, কী যে গ্লানি, কাছে গিয়া দৃষ্টি নত করিয়া দেখিবার না হইয়াছে প্রবৃত্তি, না অবসর। পাকচক্রে এখন সেইটাই হইয়া পড়িয়াছে প্রয়োজন।

স্কুলের টিলা হইতে খানিকটা নামিয়া রাস্তাটা ভাগ হইয়া গেছে—একটা গেছে গঞ্জের দিকে সোজা, একটা একটু ডান দিক দিয়া ঘুরিয়া বস্তির দিকে।

এটা সরু একটা ফালি গোছের, বস্তির যে কয়টি ছেলে স্কুলে পড়িতে আসে তাহাদের পায়ে পায়ে গড়িয়া উঠিয়াছে। মাস্টারমশাইয়ের নিকট হইতে ফিরিয়া টুলু এই পথই ধরিল। রাত্রি হইয়াছে; দূরে নিচের দিকে বস্তিটা—স্পষ্ট দেখা যায় না, তবে একটা চাপা চঞ্চলতা অনুভব করা যায়, মৌমাছির চাকের মত। মাঝে মাঝে একটা শব্দ উচ্চকিত হইয়া উঠিতেছে। দূরত্বের জন্য আর চারিদিকের ধোঁয়ার জন্য আলোকবিন্দুগুলো অস্পষ্ট। অপরিচিত, রহস্যময়, কদর্য—তবু একটা আমোঘ আকর্ষণে টানিতেছে বস্তিটা। টুলু অগ্রসর হইতে লাগিল; ঢালু পাথুরে রাস্তার উপর এক একবার পা হড়কাইয়া যাইতেছে। যতই অগ্রসর হইতে লাগিল ততই একটা প্রশ্ন মনে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল—কি করিতে হইবে তাহাকে? বস্তি তো এই কাছে আসিয়া পড়িল, তাহার কাজ কি? আরও কাছে আসিয়া মনে হইল সময়টাও ঠিক বাছা হয় নাই; এ তো রীতিমত রাত্রি, একটা অজানা জায়গায় এ সময় সেবার কাজ কি করা যাইতে পারে?

তবুও আগাইয়া চলিল। কর্মক্ষেত্রটা যতই স্পষ্ট হইয়া আসে, ততই কর্মের একটা স্পষ্ট রূপ দেখিতে চায়।...এক সময় টুলুর হঠাৎ মনে পড়িল—কেন, মাতব্বর দেখিয়া ইহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করা যাক না—ইহারা কি চায়, কি ইহাদের অভাব-অভিযোগ! তাহা হইলেই তো কর্মপন্থা আপনি বাহির হইয়া আসে।...“অভাব-অভিযোগ!”—বাঃ, চমৎকার মনে পড়িয়া গেছে।... কথাটা টুলু মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখে; কৌতূহল না থাকায় নিতান্ত ঐহিক নিম্নস্তরের জিনিস মনে হওয়ায় এতদিন ও-লইয়া মাথা ঘামায় নাই; এখন কাজের সূচনা হিসাবে টুলু কথাটাকে ধরিয়া রহিল। গিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেই হইবে—“তোমাদের অভাব-অভিযোগটা কি বলো দিকিন।”

একটা অবলম্বন পাইয়া যেন কতকটা আশ্বস্ত হইল। এখন, একেবারে বস্তিতে না প্রবেশ করিয়া বাহিরেই যদি কাহারও দেখা পাওয়া যাইত তো বেশ হইত; মাতব্বরগোছের হইলে ভালোই, না হোক, মাতব্বরের নামধামটা দিতে পারে এমন কেহ।

তাহাও পাওয়া গেল।

রাস্তাটা বস্তিকে চক্রাকারে ঘিরিয়া, গঞ্জের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। মাঝা-

মাঝি ডান দিক থেকে একটা রাস্তা আসিয়া এই রাস্তাটার উপর দিয়া সোজা বস্তির দিকে চলিয়া গেছে। এটা খনি আর বস্তির দিকে চলিয়া গেছে। এটা খনি আর বস্তির যোজক। খনির দিক হইতে দুই জন লোক আসিতেছিল, আগাগোড়া এত কালো যে মনে হয় একটি অন্ধকার যেন ঘেঁষাঘেঁষি দুই জায়গায় জমাট হইয়া সচল হইয়া উঠিয়াছে। কাঁধের উপর এক একটা কি ফেলা, খুব সম্ভবত খনির কোন হাতিয়ার, এক জনের মুখে পুরাদমে টানা একটা বিড়ির মত কি দুই বার জ্বলিয়া উঠিয়া মুখের বিকৃতিটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল।...দেখিলে ভয় হয়, সেই সঙ্গে বেশ খানিকটা ঘৃণাও। তবুও একটা হাতে পাওয়া সুযোগ, টুলু দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

চৌমাথায় আসিয়া উহাদেরই একজন প্রশ্ন করিল—"তু কাকে চাস্?"

মনে হইল টুলুকে লইয়া উহাদের মধ্যেও এতক্ষণ কিছু আন্দাজের চেষ্টা চলিতেছিল। এই প্রশ্নের উপরই দ্বিতীয় ব্যক্তি দুই পাটি সাদা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল—" আমি জানচি রে তু কাকে চাস!"

সাদা সাদা চোখ দুইটা ঘুরাইয়া এমন ভাবে মাথাটা নাড়িতে লাগিল যেন মস্ত বড় একটা কৌতুক আছে সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে।

কেমন একটা অস্বস্তির মধ্যে টুলু বলিল—"এ বস্তির মাতব্বর কে?"

মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিয়া এবার দুইজনেই হাসিয়া উঠিল, দুইজনেই জড়াজড়ি করিয়া মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া বলিল—"জানচি রে জানচি, তু চরণদাসকে চাস্; বাবুটি আচিস তু বটে!"

একজন আলাদা করিয়া বলিল—"জোয়ানটি আচিস বটে!"

হাসিটা আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কথা আর বিকৃত হাসির ভঙ্গিতে গা-টা ঘিন্‌ঘিন করিতেছে,—ব্যাপারখানা কি?...টুলু কিন্তু রহস্য সমাধানের দিকে গেল না। একটা কথা ঠিক—চরণদাস একজন সর্দার-গোছের কেহ, নামটাও বাঙালী-বাঙালী; টুলু প্রশ্ন করিল—"চরণদাসের বাসাটা কোথায়?"

"ঐ হুথা, একাশি নম্বর ঘর। তু যাবি আমাদের সাথে?—আয়।"

হাসি তেমনি চলিতেছে, প্রতি কথাতেই। টুলু একবার সামনের বস্তিটার

পানে চাহিল। গা-টা ছমছম করিতেছে, একটু কি ভাবিয়া বলিল, "না, আজ রাত হয়ে গেছে; একাশি নম্বর বাসা তো? কাল আসব দিনের বেলা।"

"কাল আসবে! বাবুটি কাল আসবে! চল্ খবরটি দিই। বাংলায় এই পর্যন্ত বুঝা গেল, তাহার পর নিজেদের ভাষায় কি বলিতে বলিতে আরও উৎকট ভাবে হাসিতে হাসিতে লোক দুইটা বস্তির পানে চলিয়া গেল। টুলু স্তব্ধ ভাবে একটু দাঁড়াইয়া রহিল। কোন জিনিসই স্পষ্ট নয়—বস্তিও নয়, এদের কথাবার্তাও নয়, তবু সেই অস্পষ্টতার অন্তরালে যে-জগৎটার আভাস পাওয়া যায় সেটা টুলুর পক্ষে সম্পূর্ণ এক নূতন জগৎ। তাহার সামনে দাঁড়াইতে সাহস বা অভিরুচি হইতেছে না বলিয়াই এত কাছে আসিয়াও, এমন একটা সুযোগ পাইয়াও টুলু আপাতত এক দিন বিলম্ব করিল। বস্তিটা পরিক্রমা করিবার সময় অনেক বারই ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিল—এদিকটা পিছন দিক, আবর্জনার উপর অন্ধকারের চাপ, সামনের দিক হইতে একটানা কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে, এক জায়গায় যদি একটু নরম হইল তো আর এক জায়গায় দ্বিগুণ চতুর্গুণ জোর। কিসের ভারে টুলুর মনটা যেন নুইয়া পড়িতেছে, গতিটা হইয়া পড়িতেছে আরও শ্লথ। বাড়ি পৌঁছিতে রাত্রি হইয়া গেল; আহার করিল না, একটা ছুতা করিয়া শয্যা আশ্রয় করিল।

সমস্ত রাত নিদ্রাও হইল না, পাশেই কোন্ বাড়িতে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছে; নবজন্মের বেদনায় সে সমস্ত রাত আর্তনাদ করিয়া কাটাইল; টুলুও তাহার সঙ্গে জাগিয়া রহিল।

নিদ্রা নাই হোক, সকালে যখন উঠিল, মনটা অনেকটা দৃঢ় হইয়াছে। দিনের বেলা কেন সে চরণদাসের ওখানে যাইবে? যাইতে হয় তো রাত্রেই রহস্যটার সম্মুখীন হইতে হইবে। দেখার মধ্যে যদি খানিকটা বাকিই রহিয়া গেল তো সে দেখার সার্থকতা কি?···কাল ওদের ও-কথা বলা ভুল হইয়াছিল।

টুলু আর দিনের বেলা মাস্টারমশাইয়ের কাছে গেল না। কেন, তাহা নিজেই ঠিক বুঝিতে পারিল না, বুঝিবার বিশেষ চেষ্টাও করিল না; শুধু এইটুকু বুঝিতে পারিল যে এর আগে যাওয়ার চিন্তাতেই যে একটা আনন্দ পাওয়া যাইত সেটা নাই। অথচ শ্রদ্ধাও যে কিছু কমিয়াছে এমনও তো নয়।

বাসা থেকে বস্তিটা মাইলখানেকের কাছাকাছি। টুলু সন্ধ্যার একটু আগে বাহির হইল, যখন বস্তির সামনে পৌঁছিল হালকা একটু অন্ধকার নামিয়াছে।

লম্বা টানা খোলার চালের নিচে দুই সারি বাসা, দেওয়ালগুলো এবড়ো-খেবড়ো পাথর দিয়া তৈয়ারি। অনেক জায়গার চালের প্রান্তভাগের খোলা পড়িয়া গিয়া বাঁশ ও বাতা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক বাসার সামনে একটি ছোট্ট দাওয়া, তাহার এক কোণে একটি করিয়া উনুন; দাওয়ার পিছনেই পর পর দুইটি করিয়া ঘর, খুপরি বলিলেই ভাল হয়। বাসার লাইন দুইটা সমান্তরালে দাঁড়াইয়া আছে, মাঝখানে হাত-কুড়ি চওড়া একটা খালি জমি, ইট দিয়া বাঁধানো, দুই দিক হইতে ঢালু হইয়া আসিয়াছে, মাঝখানে একটা নর্দমা একেবারে এমুড়ো-ওমুড়ো চলিয়া গেছে। সমস্ত জায়গাটা ব্যাপিয়া একটা তুমুল অরাজকতা—উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ ছেলেমেয়েদের দল; ছাগল, কুকুর, হাঁস, মুরগী, তাহাদের ছানা, সব একসঙ্গে মিশিয়া গেছে। মেয়ে-পুরুষেরাও প্রায় সবাই জীর্ণবস্ত্রপরিহিত, তাহার উপর গায়ে-কাপড়ে কয়লার ছোপ। এ জিনিসটা কোথাও বাদ নাই, হাঁসটাকেও পর্যন্ত হাঁস বলিয়া চেনা যায় না।

বাসার সামনে এক-একটা করিয়া খাটুলি, তাহাদের দড়ি ঝুলিয়া প্রায় মাটি পর্যন্ত নামিয়া গেছে। একটাতে একটা কুলি ধনুকাকার হইয়া নির্জীবভাবে পড়িয়া আছে, একটাতে কয়েকজন ছেলেমেয়ে পড়িয়া হুটাপুটি করিতেছে, একটাতে একটা কচি শিশু শোয়ানো—পরিত্রাহি চিৎকার জুড়িয়া দিয়াছে। জানোয়ার, পাখী, মানুষ—ধাড়ি, কচি সবার কণ্ঠ হইতে একটা মিশ্র কলরব উঠিয়া বাতাসটাকে ভারাক্রান্ত করিয়া দিয়াছে। একটা জলের কল, কলসী, বালতি, ডেকচি, গামলা—আরও নানারকম পাত্রে বোঝাই; মেয়ে-পুরুষের ঝগড়া, ইতর গালাগালিতে কানপাতা যায় না। ওদিকেও গোটা তিনেক কল, এই রকম জটলা।

প্রতিপদেই নূতন অভিজ্ঞতা, টুলু তবুও অগ্রসর হইয়া চলিল, কেমন একটা জিদ ধরিয়া গেছে। শুধু শব্দ আর দৃশ্যই নয়, কতকগুলো দাওয়ায় রান্না আরম্ভ হইয়াছে, মাংস পোড়ার একটা উৎকট গন্ধ নর্দমার গন্ধের সঙ্গে মিশিয়া একেবারে নূতন ধরনের একটা তীব্র গন্ধ সৃষ্টি করিয়াছে। দুইটা বাসার মাঝের দেওয়ালের

গায়ে আলকাতরা দিয়া ইংরেজীতে বাসার নম্বর লেখা, সেইগুলো দেখিয়া দেখিয়া টুলু আগাইয়া চলিল। দুই-এক জন কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল। টুলু বলিল —"চরণদাসের বাসায় যাব।" দুই-এক জন দেখাইয়া দিল, দুই-এক জন অবহেলাভরে চুপ করিয়া রহিল, কেহ কেহ একটু বক্র হাসির সহিত মুখটা ঘুরাইয়া লইল ; যাহারা দেখাইয়া দিল তাহারাও একটু হাসিয়া মুখ ঘুরাইল।

একাশি নম্বর বাসাটা এ লাইনের একেবারে শেষ বাসা। এইখানে আসিয়া একেবারে চরণের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

বাসার নিচেই পাঁচ-ছয় জন লোক নেশা করিয়া জটলা করিতেছে। একজন মাঝবয়সী লোক, মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি, মাথায় বাবরি, একেবারে বেসামাল হইয়া নর্দমার ধারে পড়িয়া আছে। একজন বোধ হয় তাহাকে তুলিতে গিয়া তাহার পিঠে মাথা ঠেকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মাতাল আর পাগলের মত ছেলেমেয়েদের কৌতুক উদ্রেক করিতে আর কেহই পারে না। এদের ঘিরিয়া বেশ একটি দল জুটিয়াছে, নাচিয়া কুঁদিয়া, ছড়া আওড়াইয়া, নানারকম প্রশ্ন করিয়া ক্ষেপাইয়া তুলিতেছে ; তাড়া খাইয়া প্রবল উল্লাসে হাততালি দিতে দিতে ছড়াইয়া পড়িতেছে, আবার জড়ো হইতেছে। টুলু একটু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল ; বিষবায়ুর মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে তাহার মনটা নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল, এখানে আসিয়া যেন একেবারেই অসাড় হইয়া গেল। তাহার চব্বিশ বৎসরের জীবনে এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয় নাই, এর কাছাকাছিও কিছু নয়, খানিকটা তাহার বাক্‌স্ফূর্তিও হইল না। তাহার পর একটু সম্বিৎ হইলে বাসাটার পানে ঘুরিয়া চরণদাসকে ডাকিতে যাইবে, মনে হইল কে যেন তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। তাহার শরীরের ঊর্ধ্বভাগটা ঘরের অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেছে, নিচের ময়লা কাপড়ের যতটুকু নজরে পড়িল তাহাতে মনে হইল স্ত্রীলোক। টুলু ডাকিল—"চরণদাস আছ ?" ঘর হইতে কোন উত্তর আসিল না, উত্তরটা আসিল পিছন থেকে। একজন নেশার গাঢ় স্বরে বলিল—"চরণদাস উখানে কুথায় ?"

টুলু ফিরিয়া দেখিল দলের মধ্যে একজন তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া রহিয়াছে। টুলু প্রশ্ন করিল—"কোথায় চরণদাস ?"

আরও যাহাদের একটু সাড় ছিল পিট-পিট করিয়া টুলুর পানে বোধহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। লোকটা কোন উত্তর না দিয়া টলিতে টলিতে উঠিয়া নর্দমার ধারে সেই প্রৌঢ়টার কাছে উপস্থিত হইল। যে লোকটা পিঠে মাথা ঠেকাইয়া বসিয়াছিল তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল—"তুলতে পারলিক্ নি বুড়োকে ?"

প্রৌঢ়ের পিঠেই গোটাদুই ঠেলা দিয়া বলিল—"অ্যাই, নতুন নিসপিকটার সায়েব ; উঠ্।"

কথাটায় দলের আর সবার মধ্যে একটু সাড় আসিল, যে যেমন ভাবে পারিল হাতটা কপালে ঠেকাইয়া অভিবাদন করিল। একজন উঠিয়া ছেলেমেয়েগুলাকে পর্যন্ত তাড়া করিয়া জায়গাটা পরিষ্কার করিল। তাহার পর চোখে-মুখে মাতালের গাম্ভীর্য ফুটাইয়া সকলে চরণদাসকে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। টুলুর যে-মনটা অসাড় হইয়া গিয়াছিল তাহাতেই যেন একটা নেশার অদ্ভুত চৈতন্য জাগিয়া উঠিতেছে।

অনেক ঠেলাঠেলির পর চরণদাসের একটু হুঁশ হইল, বাঁ হাতে ভর দিয়া, সামান্য একটু সোজা হইয়া বসিয়া ব্যাপারটা বুঝিবার চেষ্টা করিল। হাতটা কিন্তু পাতা ছিল নর্দমাটার একেবারে ধারে, হঠাৎ পিছলাইয়া গিয়া চরণদাস এবার নর্দমার মধ্যেই হুমড়ি খাইয়া পড়িল।

মাথায় কোথাও চোট লাগিয়া থাকিবে, এবার আগের চেয়ে অল্প ডাকেই চৈতন্য হইল—যদিও অতি সামান্যই। সেটাও বিকৃত হইয়াই দেখা দিল ; মাতালের অনিশ্চিত মনে সম্ভ্রমের বদলে আসিয়া পড়িল ক্রোধ ; পা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িবার চেষ্টা করিয়া উগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল—"নেকালো ! নিসপিকটারি চরণদাসের কাছে !—নিসপিকটারী—নিসপিক···"

এইবার টলিয়া বেশ ভাল করিয়াই নর্দমায় গড়াইয়া পড়িল।

এ সময় আরও একটা ব্যাপার হইল, বস্তির ঘরে ঘরে একযোগে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিয়া উঠিল। এও এক অদ্ভুত পরিহাস, জাতিসংঘের আদেশ পালন—শ্রমিকদের আলো চাই একেবারে সেরা। তা নহিলে নরক গুলজার হয় কিসে ? —সেই গুলজার নরকের গায়ে, তাহাদের সঙ্গেই মানাইয়া, আরও একটি দৃশ্য,

যাহা টুলু কোন জন্মেই কল্পনায় আনিতে পারিত না। একাশি নম্বর বাসায় ঘরের ভিতরে চৌকাঠ ধরিয়া একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে, বেশ পরিপাটি করিয়া একখানি পরিষ্কার শাড়ি পরা, সযত্নে পরিষ্কার করা মুখে বিদ্যুতের আলো গিয়া পড়িয়াছে। টুলুর দৃষ্টি পড়িতে চৌকাঠ ডিঙাইয়া দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল, একটু হাসিয়া বলিল—"এখন বাবার নাকি সাড় থাকে? কারই বা আছে? আপনাকে তো নোতুন ইনস্‌পিকটার-ই করে দিলে।"

শেষে হাসিল একটু তরল শব্দ তুলিয়াই।

॥ চার ॥

বস্তির এ দিকটাও খোলা, একটা পায়ে-হাঁটা রাস্তা সামনের দিকে চলিয়া গেছে; টুলু আর বস্তির মধ্যে না গিয়া এই দিক দিয়া বাহির হইয়া আসিল, তাহার পর হনহন করিয়া অনেকটা দূরে চলিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, ছোটে নাই তবু হাঁপাইতেছে; গঞ্জডিহির এটা এদিককার শেষ প্রান্ত, একেবারে ফাঁকা সবচেয়ে নিচুও; এখান থেকে সমস্ত জায়গাটা এক নজরে দেখা যায়—একেবারে দূরে ঐ কর্তাদের, কর্মচারীদের বাড়ি—কোঠা, অনেকগুলো দোতলা, আলোয় ঝলমল করিতেছে—নামও পড়িয়াছে কর্তাপাড়া। তাহার নিচে খানিকটা আসিয়া বাজার; একেবারে এদিকে, বাঁ দিকে গঞ্জডিহির সবচেয়ে উঁচু জায়গায় ঐ স্কুলটা, তাহার পরেই মাস্টারমশাইয়ের বাসা, অন্ধকারে লিপ্ত এ কাঞ্চনগাছটা দেখা যাইতেছে। টুলুর মনে অদ্ভুত একটা আনন্দের জোয়ার ঠেলিয়া উঠিতেছে, সেটা যে শুধু ঐ নরককুণ্ড হইতে বাহির হইয়া আসিবার জন্যই তাহা নয়, তাহার মধ্যে আরও একটা বৃহত্তর মুক্তির উল্লাস রহিয়াছে। বস্তি যে কী নরক মাস্টারমশাই সেটা নিশ্চয় সম্পূর্ণ জানেন না; এবার টুলুর এ দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি।

নিচের এই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ আর উপরের অসীম আকাশের সঙ্গে সুর মিলাইয়া টুলু অনেকক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, যেন নিজের জগতে ফিরিয়া আসিয়াছে।...তবু সদ্য অভিজ্ঞতার কথাটা আগাগোড়া আর একবার মনে পড়িয়া

গেল,—সব শেষে সেই মেয়েটি। টুলু বেশ বুঝিতে পারিল, ও-ই তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গিয়াছিল, তাহার পর যথাসাধ্য বেশভূষা করিয়া বাহির হইয়া আসিল। কাল থেকে আজ পর্যন্ত চরণদাসের বাড়ি খোঁজ লইয়া যত বিদ্রূপ, বক্রহাসি, বাঁকা চাহনি এতক্ষণে সমস্তরই অর্থ বুঝা গেল। সমস্ত শরীরটা বারবার শিরশির করিয়া উঠিতে লাগিল। তবু সব ছাপাইয়া একটা আনন্দ, একটা বোঝাপড়া হইয়া গেছে, আর কী? টুলু বেশ ভাল করিয়া সমস্ত জায়গাটার একটা আন্দাজ করিয়া লইয়া স্কুলের দিকে পা বাড়াইল। রাস্তা নাই এখান থেকে, তবে সোজাসুজি গেলে একটা-না-একটা পাওয়া যাইবে নিশ্চয়।

স্কুলের দিকটায় বিদ্যুতের আলো নাই, উঁচু-নিচু ভাঙিয়া যখন পৌছিল তখন বেশ অন্ধকার হইয়া গেছে। মাস্টারমশাই কি এতক্ষণ কাঞ্চনতলায় থাকিবেন? …টিপিটার দিকে যাওয়ার আগে টুলু বাসার সামনে দাঁড়াইয়াই হাঁক দিল—"স্যার, বাসাতেই আছেন?"

"কে? দাঁড়াও আসি।"

খড়ম পরিয়া আসিতেছেন, আসিতে আসিতেই প্রশ্ন করিলেন—"টুলু নাকি?"

দুয়ার খুলিয়া বলিলেন—"তাই তো দেখছি। অনেকক্ষণ কাঞ্চনতলায় অপেক্ষা ক'রে ভাবলাম—যাঃ দিলাম বুঝি ভড়কে টুলুকে; মনটা এত খারাপ হয়ে গেছল।"

উঠানের ওদিকে রান্নাঘর, উনানে আগুন জ্বলিতেছে, উপরে কি একটা চড়ানো।

টুলু অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল,—"রাঁধছিলেন স্যার? আপনি রান্না করছিলেন?"

"মনটা খারাপ হয়েছিল বটে টুলু, তা ব'লে কি এত খারাপ হয়েছিল যে রান্না-খাওয়া ছেড়ে দোব?"

বেশ জোরেই হাসিয়া উঠিলেন মাস্টারমশাই।

টুলু একটু অপ্রতিভভাবে বলিল—"না, বলছিলাম নিজের হাতেই রাঁধেন আপনি?"

মাস্টারমশাই আবার হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"এবার তুমি সত্যি হাসালে টুলু—তোমায় আমি পরের সেবা করবার উপদেশ দিচ্ছি, আর এদিকে আমার নিজের হাতই আমার নিজের পেটের সেবা করবে না ?"

দুয়ারটা একটু ঠেলিয়া ধরিয়া বলিলেন—"ভেতরে এস ; কি খবর ? এত দেরি হ'ল যে ?"

দুয়ারটা বন্ধ করিয়া পাশের ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন—"বরং অন্যভাবেই জিগ্যেস করি,—এতটা দেরি হয়ে গেল, তবুও এলে যে ?··· এস বারান্দার ঐখানটায় বসি, তুমি ঘর থেকে ঐ চেয়ারটা বের ক'রে নিয়ে এস ; না, কাঞ্চনতলাতেই যাবে ?"

টুলু একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিল—"রান্না চড়ানো রয়েছে স্যার, আপনি ভুলে যাচ্ছেন সেটা।"

মাস্টারমশাই আবার হাসিয়া উঠিলেন—"তুমি এলে, আর রান্না ভোলবার মতনও আনন্দটুকু হবে না আমার টুলু ?"

টুলু আরও লজ্জিতভাবে হাসিয়া বলিল—"আমার এত সৌভাগ্য স্যার ?"

"যার আনন্দ,—সৌভাগ্য তো তারই টুলু। বেশ এইখানেই বসা যাক।··· দাঁড়াও বরং, ভাতের হাঁড়িতে দুটো আলু ফেলে দিয়ে আসি। তুমি যাওয়ার পর আমার আনন্দ থাকবে না, তার ওপর যদি আবার আলুভাতেটুকুও না থাকে···"

হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে পা তুলিয়া গুছাইয়া বসিলেন, প্রশ্ন করিলেন—"তারপর কি খবর বল ?"

টুলু বলিল—"হ'ল না স্যার।"

চেষ্টা সত্ত্বেও বিফলতার উল্লাসটা চোখে-মুখে ঠেলিয়া আসিয়াছে।

মাস্টারমশাই মুহূর্ত কয়েক বিস্মিতভাবে মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি হ'ল না টুলু ?"

টুলু একটু ভূমিকার সহিতই আরম্ভ করিল এবং তাহার আন্তরিকতা যে কত বেশি সেটা বুঝাইবার জন্য ভূমিকায় প্রচুর কল্পনার সাহায্য লইল—কৃপালাভ করিতে হইলে মন যোগাইয়া চলিতে হইবে তো আবার। বলিল—"যখন থেকে

আপনার কাছে জানতে পারলাম যে সেবা-ব্রতই সব চেয়ে বড় ব্রত, সেবাই আত্মশুদ্ধির একমাত্র উপায়, তখন থেকে কাজে নেমে পড়বার জন্যে মনটা বড়ই অস্থির হয়ে রইল স্যার। এখান থেকে ফিরতি সোজাই বস্তিতে নেমে গেলাম, ভাবলাম শুভস্য শীঘ্রম্, তা হ'লে আর দেরি করা কেন? ওদের অভাব-অভিযোগটা কি জানবার জন্যে খোঁজ নিয়ে বুঝলাম, ওদের সর্দার হচ্ছে চরণদাস। চরণদাসের সঙ্গে কিন্তু দেখা হ'ল না কাল। মনটা যে কি খারাপ হয়ে রইল সমস্ত রাত! কাজটা আরম্ভ না ক'রে আপনার কাছে মুখ দেখাতেও পারছি না এদিকে···"

মাস্টারমশাই স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া শুনিতেছিলেন, প্রশ্ন করিলেন—"কিন্তু কি আরম্ভ করতে টুলু?—তোমায় কোন রকম একটা ধারণা দিয়েছিলাম ব'লে তো মনে পড়ছে না।"

টুলু মাস্টারমশাইয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে বেশ একটু থতমত খাইয়া গেল, তাহার পর বলিল—"সেইটেই ঠিক করবার জন্যে আবার আজ সন্ধ্যের সময় চরণদাসের বাসায় গিয়েছিলাম—একাশি নম্বরের বাসা—সেইখান থেকে সোজা

প্রমাণ হিসাবে বাসার নম্বরটা পর্যন্ত বলিয়া দিয়া টুলু চুপ করিয়া মাস্টার-মশাইয়ের মুখের পানে একটু চাহিয়া রহিল, কোন পরিবর্তন লক্ষ্য না করিয়া বলিল—"জিগ্যেস করতে গিয়েছিলাম—তাদের অভাব-অভিযোগটা কি—মানে, অভাব-অভিযোগগুলো না জানতে পারলে তো আর···"

"কমিশন বসানো চলবে না!"

মাস্টারমশাই কথাটা বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতেই আবার বলিলেন—"তোমার কথাগুলো রাতারাতি আমাদের বিলিতি কর্তাদের মতন কি ক'রে হয়ে উঠল ভেবে সারা হচ্ছি টুলু—অভাব-অভিযোগ, তারপর কমিশন, তারপর রিপোর্ট, তারপর অর্থাভাব সবশেষে সেই ফক্কিকার—আবার যথাপূর্বং তথা পরম্—দেড়শো বছরের এই ইতিহাস। অভাব-অভিযোগের কথা জিগ্যেস করতে গিয়েছিলে—সমুদ্রকে যদি জিগ্যেস করা হয়, কোন্‌খানটা তার নোনা তো কি তার উত্তর হবে টুলু?"

এক একটা হাসি একেবারে অন্তস্থলে গিয়া হানা দেয়; টুলু বেশ একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল, শেষের কথাটায় মুখ তুলিয়া চাহিল। ভূমিকা করিতে যাওয়াটাই ভুল হইয়াছে মাস্টারমশাইয়ের কাছে, তাহার আসল বক্তব্যটায় আসিয়া পড়ায় যেন বাঁচিল, একবার আরম্ভ করিয়া মাঝপথে কোথাও আর থামিলও না; বলিল—"সেই কথাই বলছিলাম স্যার, কত যে দুঃখ ওদের, কত রকম গ্লানিতে ভরা যে ওদের জীবন তার আর হিসেব হয় না। চালে খড় নেই, কোমরে কাপড় নেই বললেই চলে। অন্নের বদলে যা খেতে হয় তাতে অন্ন-প্রাশনের ভাত উঠে আসে; নেশাভাঙ তো ছেলেমেয়েদের মধ্যে পর্যন্ত গিয়ে ঢুকেছে; দুখানা টানা চালার খুপরির মধ্যে এমন জাত নেই যা পাওয়া যায় না। ভাষা বোঝা না গেলেও ওদের কথার মাত্রাই যে কুৎসিত গালাগাল তাতে আর সন্দেহ থাকে না। বস্তিতে ঢুকেই আর এক পা এগুতে প্রবৃত্তি হয় না স্যার, তবু আমি মনের সমস্ত জোর দিয়ে এগিয়ে চলেছি—এই পথেই যখন কর্তব্য তখন চোখ-কান বুজে এগিয়ে যেতেই হবে—দু-পা এগুতেই আরও কদর্য একটা কিছু যেন পথ আগলে দাঁড়ায়—ছেলেমেয়েরা খেলা করছে, কি মেয়ে-পুরুষে কলতলায় জল নিতে এসেছে—একই রকম ব্যাপার—যেমন কুৎসিত তেমনি নোংরা, তেমনি মুখের ভাষা—নরক যেন পাতাল ঠেলে উঠেছে। গ্রামের মধ্যেও মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখছি, কিন্তু এরা যেন মানুষের স্তর থেকেই নেমে গেছে। যাক্, তবুও এগিয়েই চললাম আমি—আপনি বলেছেন অবস্থা যতই হীন সেবার স্কোপটা ততই বেশি—সেই নরককুণ্ড ঠেলে কোন রকমে চরণদাসের বাসার সামনে এসে পড়লাম; একটা দস্তুরমত অভিযান, কোথা থেকে যে মনের জোর পেলাম নিজেই বুঝতে পারি না। সেখানে এসে দেখি একেবারে চরম, কোনও উপায় নেই, একেবারে শিবের অসাধ্য রোগ।

"চরণদাস নেশায় চুর হয়ে বস্তির নর্দমার কাছে পড়ে রয়েছে। সঙ্গে আরও পাঁচ-ছ জন, সবার অবস্থাই প্রায় ঐ রকম, তবে চরণদাস একেবারেই বেহুঁশ। আমি অমন দৃশ্য কখনও দেখিনি স্যার, না দেখলে কল্পনার মধ্যেও আনতে পারতাম না যে, মানুষ নিজেকে একেবারে অমন ক'রে ভুলতে পারে। অসহ্য হয়ে উঠেছিল, তবু রইলাম একটু দাঁড়িয়ে, যখন এসেছি শেষ দেখেই যাই।

ওরা আমায় নতুন ইন্‌সপেক্টার বাবু ব'লে ঠাউরেছে, যাদের একটু হুঁশ ছিল তারা বোধ হয় ভয় পেয়ে চরণদাসকে তোলবার চেষ্টা করলে। একবার উঠতে গিয়ে চরণদাস নর্দমার মধ্যে গুঁজড়ে পড়ল, তারপর দ্বিতীয় বার চেষ্টা ক'রে সোজা হয়ে ব'সে কটমটিয়ে আমার পানে চেয়ে রইল—চুলে নর্দমার পাঁক লেগে জট পাকিয়ে গেছে, জামাতে কাপড়ে নর্দমার পাঁক, তার ওপর আপাদমস্তক কয়লার কালিতে ঢাকা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ, আর মুখের হাড়গুলো এতখানি ক'রে বেরুনো; সে কী চোখ!—নেশায় টকটকে লাল, এতখানি গর্তের মধ্যে দুটো আগুনের ভাঁটার মতন জ্বলছে, নেশার জন্যেই স্থির নয়, এক একবার নরম হয়ে একবার দ্বিগুণ চতুর্গুণ জ্ব'লে উঠছে। ইন্‌সপেক্টার এসেছে শুনে আমার দিকে একটু চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে লাগল, তারপর হঠাৎ তেড়ে-ফুড়ে চিৎকার ক'রে উঠল—'নেকালো! নিসপিক্টারি চরণদাসের কাছে!'···সে রকম অদ্ভুত বিকৃত গলার আওয়াজ আমি কখনও শুনিনি স্যর—গলাটা যেন ওর চৌচির হয়ে ফেটে গেছে। তারপরই নিজেকে আর সামলাতে না পেরে একেবারে তালগোল পাকিয়ে আবার নর্দমার মধ্যে প'ড়ে গেল। আমি জ্যান্ত নরক দেখে এই ফিরছি স্যার।"

টুলু একটু থামিল। মুখটা কুঞ্চিত হয়ে গেছে, বলায় গ্লানিতেই তাহার সমস্ত শরীরটা যেন ক্লেদাক্ত। মাস্টারমশাই কি বলিতে যাইতেছিলেন, টুলু আবার স্মৃতির আলোড়নে যেন নূতন করিয়া শিহরিয়া উঠিল, বলিল,—"হ্যাঁ, এইখানেই শেষ নয়, এর চেয়েও একটা কুৎসিত ব্যাপার স্যার, কিন্তু সে আপনার সামনে আমি মুখ দিয়ে বের করতে পারছি না···"

মাস্টারমশাই এক দৃষ্টে টুলুর পানে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখের রেখায় কি যেন একটা পাঠোদ্ধার করিতেছেন। একটু পরে প্রশ্ন করিলেন···"চরণদাসের মেয়ে চম্পা?"

এবার টুলুর চাহিয়া থাকিবার পালা, তাহার দৃষ্টিতে বিস্ময়ের যেন অন্ত নাই। প্রশ্ন করিল—"আপনি জানেন?"

"বস্তির সবচেয়ে বড় ট্রাজেডির কথা জানব না?"

"এর পরে আমার কি করতে বলেন তা হ'লে?"

"আগে যা বলেছিলাম তাই—অর্থাৎ সেবা করতে।"

টুলু একটা মস্ত বড় ধাক্কা খাইল। সে নিজের মুক্তি সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া আসিয়াছিল, এত ব্যাপারের পরও যে আবার তর্ক করার দরকার হইবে এটা ভাবিতেই পারে নাই। একটু স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া বলিল—"কিন্তু সেবা নেবে কে বলুন? চরণদাস—ওদের সর্দার—যার ভরসায় আমার যাওয়া তার নিজের অবস্থাই তো আপনাকে বললাম।"

মাস্টারমশাই হাসিলেন, বলিলেন—"তুমি কী সেবা করতে গিয়েছিলে টুলু? কথাটা এই জন্যে জিগ্যেস করছি—তুমি যে সব সহাচর্য খুঁজে বেড়িয়েছ এপর্যন্ত, তার অনেক ক্ষেত্রে সেবা কথাটার মানে হচ্ছে পা টেপা আর গাঁজা সেজে দেওয়া। আমায় শপথ করিয়ে নাও, এ ধরনের কোনটাতে চরণদাস তোমায় অমন ক'রে চোখ রাঙিয়ে উঠত না।...দাঁড়াও আসছি, ভাতের হাঁড়ি বড়বড়ানি লাগিয়াছে।"

ফিরিয়া আসিয়া টুলুর চেয়ারের পাশে দাঁড়াইলেন, তাহার কাঁধে নরম হাতের স্পর্শ দিয়া বলিলেন—"কথাগুলো আমার একটু কড়া হয়ে পড়ল, না? কিছু মনে ক'রো না ব'লে সান্ত্বনা দোব না টুলু। তোমার যতদূর যা মনে করবার কর, তারপরও যদি মাস্টারমশাইকে অন্তরের সঙ্গে নিতে পার, সেই নেওয়া আসল নেওয়া।...এইবার কাজের কথায় আসা যাক্—তুমি কাল থেকে প্রাণপণে চেষ্টা করছ যাতে বস্তির কাজে তোমায় নামতে না হয়।...কথাটা বড় আশ্চর্য বোধ হচ্ছে, না? কাল থেকে তুমি এ হাঙ্গামা কোন রকমে চুকিয়ে আমার কাছে একটা জবাবদিহি তোয়ের করবার জন্যে এত ব্যস্ত আছ যে মনের প্রবঞ্চনাটা ধরবার অবসর পাওনি। লুকোচুরিতে মনের মতন অত বড় খেলোয়াড় আর নেই টুলু; আজ হাঙ্গাম চুকেছে, বাড়ি গিয়ে স্থির হয়ে নিরপেক্ষ-ভাবে ভেবে দেখো, দেখবে আমি মিথ্যে বলছি না। কাজ কি ভাবে করতে হবে সে সম্বন্ধে আমিই তোমায় রাস্তা বাৎলে দিতাম, আর সেটা নিশ্চয় চরণদাসের বাসার রাস্তা হ'ত না। তবুও অভিজ্ঞতা একটা যখন হ'লই, সেটাকে জীবন থেকে বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী আমি নই। চরণদাস বস্তি-জীবনের একটা টাইপ তো বটে। তুমি ওকে কি রকম দেখবে আশা করেছিলে?"

"অন্তত এত খারাপ দেখব এ ধারণা ছিল না ; মানুষের বাইরে গিয়ে পড়েছে। সমস্ত বস্তিটাই তাই মনে হ'ল। সেবা মানুষের করতে পারা যায়, কিন্তু…"

মাস্টারমশাই মৃদু হাসিয়া টুলুর কাঁধে একটা হালকা চাপ দিয়া তাহার উচ্ছ্বাসটা বন্ধ করিলেন, বলিলেন—"চরণদাস ঠিক এই রকমই হবে, এক চুল এদিক-ওদিক হওয়া সম্ভব নয় ; বস্তির আর সবাইয়ের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। তুমি তাড়াতাড়ি সেবায় নামতে গিয়ে পরিণামটা দেখে শিউরে উঠেছে, তার কারণটা দেখ নি ব'লেই। ওদের যা জীবন, যে অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে, যে ভীষণ অবিচার-অত্যাচারের মধ্যে অমানুষিক ওদের খাটুনি, তাতে নেশা না করলে ওরা এক দিনও বাঁচবে না।…তুমি বাঁচা আর নেশা-না-করার মধ্যে কোনটাকে বড় বল টুলু ?"

"নেশা - না - করা স্যার, এতে আর মতামত কি থাকতে পারে ?"

"আমি কিন্তু বলি বেঁচে থাকা।"

"ঐ রকম নেশাখোর হয়ে বেঁচে থাকার দরকার কি স্যার ?"

"দরকার এই যে বেঁচে থাকলে এক সময় ভাল ক'রে বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা রয়েছে, সৃষ্টি-পরিকল্পনায় সে সম্ভাবনা যে একটা বিরাট জিনিস। ম'রে গেলে যে সবই গেল শেষ হয়ে।…যাক্, এ কথাটা একটু অবান্তর এসে পড়ল। আমাদের কথা হচ্ছিল চরণদাস তার অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি। তা যদি হয় তো দোষটা তো ওর নয়। আর এটা যদি স্বীকার কর তো সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো কি উচিত মনে কর না ?"

"অবস্থা জিনিসটা তো অ্যাবসট্রাক্ট কিছু নয় স্যার, তার পরিবর্তন ঘটানো মানে তো ঐ ধরনের মানুষের মধ্যে গিয়ে কাজ করা।"

"আজ সেটা কদর্য ব'লে মনে হচ্ছে, একটু অভ্যেস হয়ে গেলে ততটা নাও হতে পারে।"

"মন যদি অভ্যেসের জন্যেই কোন সময় এমন কদর্যতাকে গায়ে না মাখে তো সেটা মনের অবনতি নয় কি স্যার ?"

"কথাটা তোমার একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না টুলু। কিন্তু কাউকে তোলবার জন্যে যদি একটু ঝুঁকতে হয় তো উচিত নয় কি ঝোঁকা ?…কিন্তু তর্ক

এখন থাক্। যদি চরণদাসকেই এখানকার বস্তি-জীবনের উদাহরণ ব'লে ধ'রে নেওয়া হয় তো যে-কোন মহাপুরুষই এই অবস্থার মধ্যে পড়লে চরণদাস হ'তে যেতে বাধ্য কিনা সেটা একবার খতিয়ে নিলে হয় না?…আজ রাত হয়ে গেছে তুমি…”

মাস্টারমশাই মনে মনে একটু হিসাব করিয়া লইয়া বলিলেন—“পরশু রবিবার আছে, তুমি বেলা তিনটের সময় একবার এসো আমার কাছে।”

॥ পাঁচ ॥

দিন সাতেক টুলুর আর একেবারে দেখা নাই। মাস্টারমশাই কাঞ্চন-তলাটিতে আসিয়া নিয়মিত ভাবে বসেন। এক এক দিন নিজের সঙ্গে নিজের আলাপ বড় বেশি জমিয়া উঠে। একটা শিকার হাতের মধ্যে আসিয়া আবার ছাড়িয়া গেলে হিংস্র জন্তুর যেমন অবস্থা হইয়া উঠে, মাস্টারমশাইয়ের অবস্থাও হইয়া পড়ে অনেকটা সেই রকম। চাপা আক্রোশে গর্জাইতে থাকেন—ও ভেবেছে আমার কাছ থেকে ওর নিষ্কৃতি আছে—পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে—ওর ধর্ম ওকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে!—ধর্ম…সে এবার স'রে দাঁড়াক আসর ছেড়ে মুখোশ ফেলে দিয়ে, নইলে এই টুলুকেই মাঝে রেখে আমাদের বোঝাপোড়া আরম্ভ হবে, আর এটাও ঠিক যে সে বোঝাপড়ায় আমি হারব না।…এক এক সময় একেবারেই নিশ্চুপ হইয়া বসিয়া থাকেন সামনে যে-কোন একটা জায়গায় দৃষ্টি ফেলিয়া, কিন্তু যেন সমস্ত দৃশ্যপটটাকে চোখের মধ্যে ভরিয়া লইয়া; একটি স্নিগ্ধমমতায় চোখ দুইটি নরম হইতে হইতে সিক্ত পর্যন্ত হইয়া উঠে, মাস্টারমশাই যেন সবার কান্না নিজের বুকে জমা করিয়া লইয়াছেন। এ ভাবটা কিন্তু স্থায়ী হয় না; আবার আসে জ্বালা, আবার টুলু, আবার তাঁহার ধর্মের সঙ্গে বোঝাপড়া করার প্রতিজ্ঞা।

অন্ধকার হইয়া গেলেও উঠেন না। স্কুলের বুড়া চাকর বনমালীকে ডাকিয়া বলিয়া দেন তাহার হাঁড়িতেই চালটা ছাড়িয়া দিতে। তাহার পর সে রান্নার পাট সারিয়া উপস্থিত হইলে তাহার সঙ্গে বস্তির গল্প হয়। লোকটা চরণদাসের

বাবা; আগে কি রকম ছিল বলা যায় না, তবে এখন যেন একটু মাথা খারাপ হইয়া গেছে। নিজে হইতে কথা কয় কম, তবে দম দিয়া যাইতে পারিলে নিঃসাড়ে বকবক করিয়া বকিয়া যাইতে পারে—ঠিক একটা গ্রামোফোনের মতই—স্মৃতির রেকর্ড একখানি করিয়া তুলিয়া দিলেই হইল, বনমালী আওড়াইয়া যাইবে; চম্পার কথাও বলে—যেন তাহার নাতনি নয়, যেন কোন সম্পর্কই নাই তাহার সঙ্গে।

চরণদাসের আগে বনমালীই ছিল একাশি নম্বর বাসায়, কাঞ্চ ছাড়িয়া ছেলের সঙ্গেও অনেক দিন ছিল; বস্তি-জীবনের একটি বিশ্বকোষ।

মাস্টারমশাইয়ের একটা বিশেষত্ব—টিলা ছাড়িয়া কখনও নিচে নামেন না। নিম্নতম সীমা স্কুল, ঊর্ধ্বতম সীমা কাঞ্চনতলা, এর মধ্যে তাঁহার দিনরাত। এবারে কিন্তু সাত দিনের দিন নামিলেন। ঐ শিকারের উদাহরণই দিতে হয়—সে যখন এ তল্লাট ছাড়িয়াছে তখন নিজের ঘাঁটিটুকু আগলাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না তো।

সন্ধ্যা একটু গাঢ় হইলে মাস্টারমশাই নামিলেন। বাজারে ব্যানার্জি এ্যাণ্ড কোম্পানীর ঔষধ-বিভাগ স্টেশনারি-বিভাগ লইয়া বেশ বড় দোকান। টুলু নাই। মাস্টারমশাই অবশ্য রাস্তা হইতেই প্রচ্ছন্ন ভাবে দেখিলেন, কেন না টুলু আবার দেখিয়া ফেলে এটা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। টুলু থাকিলে তিনি আশেপাশে অপেক্ষা করিতেন, তাহার পর বাহির হইলে ধরিতেন—এই ছিল শিকারের প্ল্যান। দোকানে না পাইয়া একটু ইতস্তত করিয়া বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করিলেন, কর্তাপাড়ার এক প্রান্তে টুলুর কাকার বাড়ি। ঐ প্রচ্ছন্ন ভাবেই সন্ধান লওয়া; টের পাওয়া গেল সেখানেও টুলু নাই। আক্রোশে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী—অর্থাৎ টুলুর ধর্মের সঙ্গে বাগযুদ্ধ করিতে করিতে মাস্টারমশাই টিলার দিকে ফিরিলেন। সে-ই জিতিয়াছে, তবে এটা যেন সে অবধারিত সত্য জানে, তাহার জয়, তাহার এ উল্লাস ক্ষণিক।

টিলার নিচেটিতে আসিয়াছেন, দেখেন তাঁহার বাসা হইতে একটি ছায়ামূর্তি বাহির হইয়া নামিয়া আসিতেছে, পরক্ষণেই বুঝিতে পারিলেন—টুলু। একটু কাছাকাছি হইতে বলিলেন—"তুমি এখানে?—এদিকে তোমার জন্যে আমি

সারা গঞ্জডিহি এক ক'রে বেড়াচ্ছি। একেবারে হপ্তাকে হপ্তা দেখা নেই যে?"

টুলু মুহূর্ত মাত্র ইতস্তত করিয়া, মাস্টারমশাই নিবারণ করিবার আগেই ঝুঁকিয়া তাঁহার পদ স্পর্শ করিয়া হাতটা মাথায় ঠেকাইল, বলিল—"এবার আর মানা মানলাম না স্যার, বড় একটা শুভ খবর নিয়ে এসেছি।"

অন্ধকার হইলেও বুঝা যায় তাহার মুখটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, গলার স্বরও একটু আবেগকম্পিত।

প্রশ্ন করিলেন—"খবরটা কি টুলু?"

একটু হাসিয়া বলিলেন—"শুভ বলছ অথচ ফল—অবাধ্যতা!"

"আমার খোঁজার পালা শেষ হয়েছে স্যার, এতদিনে আমি যা খুঁজছিলাম তা পেয়েছি। আমি বিদায় নিতেও এসেছিলাম, কেন না আমার আর এখানে থাকা একেবারে অনিশ্চিত; তা ভিন্ন বড় ইচ্ছে ছিল আপনিও যদি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন..."

দারুণ নিরাশায় অন্ধকারের মধ্যে মাস্টারমশাইয়ের চোখ দুইটা একবার জ্বলিয়া উঠিল, প্রশ্ন করিলেন—"দেখা! দেখা কার সঙ্গে টলু—কোন্..."

আর একটা উগ্রতর কি মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছিল, নিজেকে সংবৃত করিয়া লইলেন, এবং টুলু অন্ধকারে ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্বেই মুখটা একটু ফিরাইয়া লইয়া চোখের দৃষ্টিটা শান্ত করিয়া লইলেন, বলিলেন—"ভেতরে চল টুলু; বড্ড ঘুরিয়েছ, ভাল খবর একটু ভাল ভাবে নেওয়ার মতন অবস্থাটা ক'রে নিই।"

বনমালীকে ডাক দিলেন, বাহির হইলে বলিলেন—"চাল ডাল বের ক'রে নিয়ে আসবি চল, তোর হাঁড়িতেই ফুটিয়ে দিস।"

টুলু বিস্মিত ভাবে মুখের পানে চাহিল; মাস্টারমশাই প্রশ্ন করিলেন—"কি?"

"কিছু না তো।" তাহার পর যেন অনুচিত জানিয়াও প্রশ্নটা কোনমতে চাপিতে পারিল না, এইভাবে বলিল—"মানে, ওর রান্না খাবেন আপনি?"—নাসিকাটা একটু কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।

মাস্টারমশাই হাসিলেন, বলিলেন—"নিজের হাতে রাঁধব তাতে আপত্তি—তা হ'লে ?"

টুলুও লজ্জিত ভাবে হাসিল, বলিল—"না স্যার, সে কথা বলছিলাম না। আর সত্যিই তো আপনাদের মতন যাঁরা উঁচুতে উঠে গেছেন, তাঁরাও যদি এটুকু জাত-পাঁতের সংস্কারমুক্ত না হতে পারেন তো—"

দুইজনে আসিয়া বারান্দায় চেয়ার লইয়া বসিলেন। টুলুকেই আরম্ভ করিবার একটু সময় দিয়া মাস্টারমশাই বলিলেন—"তারপর ? তোমার কথার ধাঁচে মনে হচ্ছে এবার তুমি সত্যিই একজন বড় মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছ। সমস্ত হপ্তাটা তাঁর কাছেই ছিলে নাকি ?"

"হাঁ, তিনি কুল্টে পরশু এসেছেন।"

"এখানে ?"

এসব জায়গায় তো তাঁদের পায়ের ধুলো পড়বার নয় স্যার—দেখতেই পাচ্ছেন তো জায়গার শ্রী। তিনি এসেছেন বালিয়াড়িতে।"

"সিদ্ধবাবা তা হ'লে ?"

টুলুর মুখটা সার্থকতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, বলিল—"আজ্ঞে হ্যা ; পরশু এসেছেন। এই পাঁচ-ছয় দিন নাগাড়ে ঘুরেছি স্যার। প্রথমটা শুনলাম, বরাকরে আবির্ভাব হয়েছেন, নদীর ধারে আস্তানা গেড়েছেন। ছুটলাম সেখানে ; গিয়ে শুনলাম, ঘণ্টা-কয়েকের দেরি হয়ে গেছে, এক মারোয়াড়ী শিষ্যের ওখানে উঠেছিলেন, কিছুক্ষণ আগেই মুলুটিতে এক শিষ্যকে কৃপা করতে গেছেন। ছোট, সেখানে ;—সে আবার বিটকেল জায়গা, পথের ঠিক সন্ধান না পাওয়ায় একটু ঘুরপাকের মধ্যে প'ড়ে যেতে হ'ল। পৌছে জানতে পারলাম, একটা দিন ছিলেন, সেখান থেকে এসেছেন পিরুলিতে, বাবার এক জমিদার-শিষ্যের ওখানে,—তারই মোটর গিয়ে নিয়ে এসেছে। পিরুলি এসে শুনলাম, তিনি সেইদিনই বালিয়াড়িতে চ'লে এসেছেন, গঞ্জডিহির সাহাদের বাগান-বাড়িতে। পিরুলি থেকে বালিয়াড়ি ঝাড়া সতের মাইল। একটা মোটর সার্ভিস ছিল, তাও সাত দিন থেকে তেলের অভাবে বন্ধ। যা পরিশ্রমটা হ'ল স্যার, কিছুদিন মনে থাকবে।"

মাস্টারমশাই যেন দম বন্ধ করিয়া শুনিতেছিলেন, প্রশ্ন করিলেন—"হাঁটলে সতের মাইল ?—ঐ ঘোরাঘুরির পর !"

তৃপ্ত হাসিতে টুলুর মুখটা একটু এলাইয়া পড়িল, বলিল—"একটু না ঘুরিয়ে তো ওঁরা দেখা দেবার পাত্র নন্ স্যার—খানিকটা পাপক্ষয় হওয়া চাই তো ?"

মাস্টারমশাই মুখটা ফিরাইয়া লইলেন, বেদনায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, নিরুপায়ভাবে একটা বিরাট অপচয় দেখিলে যেমন হয়। উস্ করিয়া চাপা একটা শব্দও বাহির হইয়া পড়িল মুখ দিয়া। টুলু প্রশ্ন করিল—"কি হ'ল স্যার ?"

"কিছু না, মাঝে মাঝে একটা বেদনা ওঠে না ! তক্ষুনি ভ্যানিশ ক'রে যায়।"

হাসিয়া বলিলেন—"তোমার কত পাপ ছিল টুলু ? যে রকম ঘুরতে হয়েছে এই পাথুরে জায়গায় তাতে তো পাপ-পুণ্যি সুদ্ধ সমস্ত দেহটাই ক্ষয় হয়ে যাওয়ার কথা।...বেশ, তারপর—কি রকম দেখলে ?"

"ও রকম দেখিনি স্যার, অপূর্ব—একেবারে অপূর্ব !...আপনার তন্ত্রশাস্ত্রে বিশ্বাস আছে ?"

"অবিশ্বাসের কথা কখনও শুনেছ ?"

"সিদ্ধবাবা তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ, বেশির ভাগ সময়ই সমাধিতে থাকেন, আমার বরাত জোর, পরশু এসে সহজ অবস্থাতেই পেলাম। সব শুনে একটু মুচকে হাসলেন, বললেন—'তোর তপস্যা আছে' পরশু বিকেলে আসিস।'...আজ গিয়েছিলাম, বিকেলের একটু আগেই। নির্বিকল্প সমাধি-রূপ কথাতেই শুনেছিলাম, আজ প্রত্যক্ষ করলাম ! কোথায় আছেন, কি হচ্ছে চারিদিকে, কিছুমাত্র জ্ঞান নেই। নদীর ধারে চমৎকার বাড়ি সাহাদের, দোতলাতেই থাকেন বাবা। নিচে কি করতে নেমেছিলেন, বারান্দার পাশে যেখানে ছাদের নলটা নর্দমার উপর নেমে এসেছে সেইখানে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। আমি যখন পৌঁছিলাম, দুজন শিষ্য ঘিরে ব'সে আছে কখন সমাধি ভাঙবে সেই প্রতীক্ষায়—বিরক্ত করবার হুকুম নেই কিনা। সে রকম নোংরা নালা না হোক, তবু তো অত বড় বাড়িটার নানা জায়গায় জলনিকাশের পথ, খানিকটা নোংরা আছেই—তা ভ্রুক্ষেপ মাত্র নেই,—দেওয়ালে ঠেস দিয়ে, নালার ওপর দিয়ে পা দুটো বাড়িয়ে ব'সে আছেন, রক্তবস্ত্রপরা, পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষের মালায়

সমস্ত বুকটা ভ'রে আছে। কাপড়ের খানিকটা নর্দমার মধ্যে লুটিয়ে পড়েছে —ভ্রূক্ষেপ নেই, খানিকক্ষণ পরে হেলে নিজেও গড়িয়ে পড়লেন—একেবারে নির্বিকার—তিনি যে কে আর রয়েছেন যে কোথায়, একেবারে চৈতন্য নেই। ব'সে আছি তো ব'সেই আছি। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে চোখ খুললেন—কি অপূর্ব মূর্তি! দীর্ঘ জটা, এই বিশাল শরীর, রক্তচেলির মধ্য দিয়ে জ্যোতি যেন ফুটে বেরুচ্ছে, মুখখানা রাঙা টক্‌টকে, তার ওপর কারণ-বারিতে গোলাপী দুটি চোখ। আকর্ণ-বিস্তৃত কথাটা বইয়েই পড়েছিলাম, আজ চাক্ষুষ করলাম, যেন করুণায় ঢুলঢুল করছে। আর কি যে তাঁর চাউনি!—অপার্থিব কথাটাও কানেই শোনা ছিল, সে চাউনিও যেন এ পৃথিবীর নয়, চোখ ফিরিয়ে নেয় কার সাধ্যি! আমার দিকে চেয়ে থেকে অনেকক্ষণ দেখলেন, তারপর একবার হঠাৎ ব'লে উঠলেন—"বেরিয়ে যা এখান থেকে।—নেকালো!"···শিষ্যেরা আগেই আমায় সাবধান ক'রে দিয়েছিল—দাবড়ানি, ধমকানিতে ঘাবড়ালে চলবে না, ওঁর ঐ রীত, ঐ পরীক্ষা—আমি হাত জোড় ক'রে প্রণামীর টাকা কয়টি সামনে রেখে বসলাম—"

মাস্টারমশাই টুলুর কাঁধে হাতটা চাপিয়ে বলিলেন—"আর পারছি না টুলু, থামো এবার।"

দুই জনে উঠানের দিকে মুখ করিয়া পাশাপাশি বসিয়া ছিলেন। আলোটা ঘরের মধ্যে, বিলম্বিত জ্যোৎস্নার একটা ক্ষীণ আভা বারান্দার এক পাশ দিয়া মাস্টারমশাইয়ের মুখের একদিকে আসিয়া পড়িয়াছিল, কথাটা বলিবার জন্য ফিরিতে ছায়ায়-আলোয় সেই আভা মুখের সামনেটা স্পষ্ট করিয়া দিল। মাস্টার-মশাইয়ের মুখটা শীর্ণ, রেখাবহুল, কিন্তু বরাবরই তাহার উপর একটি প্রসন্নতার আচ্ছাদন দেখিয়া আসিয়াছে, এমন বিকৃত কখনও দেখে নাই টুলু, শঙ্কিত ভাবে প্রশ্ন করিল—"বেদনাটা বাড়ল নাকি স্যার?"

সঙ্গে সঙ্গে কি করিয়া বুঝিতে পারিল, এটা কোন দৈহিক বেদনার অভিব্যক্তি নয়; একটু চিন্তিত ভাবে মুখের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল—"আপনি তন্ত্রশাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না স্যার?—সিদ্ধবাবা আবার শুনেছি এদিকে পরম বৈষ্ণবও।"

মাস্টারমশাই বলিলেন—"বিশ্বাসের কথা নয়, প্রয়োজনের কথা টুলু। হাজার বছর ধ'রে তো নর্দমায় মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছি, আরও দরকার আছে ?"

একটু বিরতি দিয়া বলিলেন—"কেন এই ভাবে প'ড়ে থাকা, সেটা ভেবে দেখবার কি এখনও সময় হয়নি টুলু ? ধর্মের মর্যাদা দিতে থাকবে ?"

॥ ছয় ॥

টুলু নিরতিশয় বিস্ময়ে মাস্টারমশাইয়ের মুখের পানে একটু চাহিয়া রহিল, তাহার পর শুধু বলিল—"ব্যাভিচার !"

এর আগে ধর্ম লইয়া, অন্তত তাহার ধর্ম-বিশ্বাস লইয়া এক-আধবার বিদ্রূপ করিয়াছেন—তাও মনে হইয়াছে লঘু ভাবে কখন কখন কথা কওয়া স্বভাব বলিয়াই—একেবারে সোজাসুজি যে এতবড় আঘাতটা দিবেন, টুলু নিজের মনকে যেন বিশ্বাস করাইতে পারিতেছে না। একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"আপনি কোন্‌টাকে ব্যাভিচার বলেন স্যার, তান্ত্রিক সিস্টেম্‌টাকেই, না, সিদ্ধবাবার এই যে সমাধিপ্রাপ্তি, এই যে শুচি-অশুচি সম্বন্ধে নির্বিকার ভাব, এই যে সব-কিছুর মধ্যেই তাঁর তেজের বিকাশ—"

কণ্ঠে শুধু ক্ষোভই নয়, খানিকটা আবেগও আসিয়া পড়িয়াছে, বোধ হয়, ক্ষুণ্ণভাবও—সামান্য হইলেও একটু বিদ্রোহ। মাস্টারমশাই বলিলেন—"তন্ত্র সিস্টেম্‌টা সম্বন্ধে আমি কিছু বলবার অধিকারী নই টুলু। আমার জীবনে আমি ধর্মচর্চা করবার অবসর পাই নি, অন্তত এই সিস্‌টেম-গত ধর্ম, যাকে ক্রীড (cre.d) বলে, যা এক মানুষ থেকে অন্য মানুষকে আলাদা ক'রে রাখে। তাই আমি ধর্ম সম্বন্ধে নীরব থাকাই পছন্দ করি। তবে এ প্রশ্নটা তো মনে উদয় হতে বাধ্য যে, এই প্রায় হাজার বছরের মধ্যে যে সব সাম্প্রদায়িক ধর্মের উৎপত্তি—বোধ হয় মাত্র একটির কথা বাদ দিলে—তারা আমাদের দিয়েছে কি ? আমাদের যা সবচেয়ে বড় সর্বনাশ পরাধীনতা, তা থেকে উদ্ধার করতে পেরেছে ? যা হারিয়ে, আমাদের ঘর বাঁচিয়ে, এমন কি যে ধর্মকে সবচেয়ে বড় ব'লে মেনে নিয়েছি, তাকে পর্যন্ত বাঁচিয়ে আমরা মানুষের মর্যাদায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে

পারি নি! বরঞ্চ দিন দিনই নতুন নতুন ক্রীড়ের নব নব মোহে আমরা জীবন সম্বন্ধে উত্তরোত্তর উদাসীন হয়ে গেছি,—সে জীবন এত বড় একটা বাস্তব, যার মধ্যে এত বড় সম্ভাবনা রয়েছে, তাকে ঠেলে রেখে—"

"কিন্তু আমরা কি মিছিমিছিই ঠেলে রেখেছি? এই বৈরাগ্যের মধ্যে দিয়ে আমরা কি একটা বড় আনন্দ অর্জন করছি না স্যার?"

আশ্রমের বাঁধা বুলি! মাস্টারমশাই প্রশ্ন করিলেন—"কোথায়?"

"এর পরের জন্মে—পরলোকে—যেখানে আনন্দ আরও সত্য।"

মাস্টারমশাই একটু চুপ করিলেন। তাঁহার মুখে আবার একটু হাসি ফুটিল, ব্যঙ্গের হাসি, বলিলেন—"করছিই যে, এমন বলতে পারি না, তবে করলেও সে আনন্দ আমাদের সামনে থেকে উবে যাবে টুলু—আমাদের মনের গঠনই এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আমরা যেটা হাতের কাছে পাচ্ছি সেটা ছেড়ে ক্রমাগতই একটা আরও বড়র জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি। অনেক তপস্যায় স্বর্গ পেলে আমরা সেটাকেও পায়ে ঠেলে আরও একটা বড় স্বর্গের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠব। আমরা অর্জনই ক'রে যাব, পাওয়া—ভোগ করা এ চিরবৈরাগীদের ভাগ্যে কখনই জুটবে না। যাক, তোমার প্রশ্নের ওপর একটু অবান্তর কথা এসে পড়ল। আমি যা বলছিলাম—নতুন নতুন ক্রীড়ের মোহে, এত বড় সম্ভাবনার যে জীবন, সেটা সম্বন্ধে আমরা একেবারেই উদাসীন হয়ে গেছি। আমাদেরই সমাজ-শরীরের অংশ ভেঙে আলাদা হয়ে গেছে, নির্বিকারভাবে চেয়ে দেখেছি। বড় বড় যাঁরা ধর্ম-প্রবর্তক তাঁদের অশ্রদ্ধা করি আমার এমন ধৃষ্টতা নেই, তবে একটা কথা ঠিক যে, হয় তাঁরা তাঁদের বাণীকে একেবারে যুগোপযোগী ক'রে দিতে পারেন নি, নয়তো লোকে নিতে পারে নি; হয়তো দুটোই একসঙ্গে সত্য। চৈতন্যের ধর্মই দেখো না—অন্তত আচণ্ডাল সবাইকে কোল দিতে বলেছিলেন তো? ও-যুগে যা সবচেয়ে অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার—মুসলমানকে পর্যন্ত তিনি নিজের ধর্মে গ্রহণও করেছিলেন। লোকে পারলে রাখতে? সেই জাত-পাঁত সবই র'য়ে গেল—বাড়তির মধ্যে এল অভিসারের জয়জয়কার আর পুরুষদের কণ্ঠে মেয়েদের বিরহের নাকি কান্না। একে পুরুষ দেশে ছিলই কম—"

টুলু বাধা দিল, বলিল—"স্যার—"

মাস্টারমশাইয়ের কথাগুলো ক্রমশই দ্রুত হইয়া উঠিতেছিল, যা সাধারণত হয় না; চুপ করিয়া একটু অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন। একটু পরে প্রশ্ন করিলেন—"কিছু বলবে?"

মাত্র বাধা দিবারই উদ্দেশ্য ছিল টুলুর, তবু প্রশ্ন করিল—"কিন্তু এতে চৈতন্য আর কি করতে পারতেন?" আপনি 'হয়তো দুটোই একসঙ্গে সত্য' বললেন, তাই জিজ্ঞেস করছি।

"এত বড় মুক্তির মন্ত্র যে দিলেন, তার সঙ্গে শৌর্যের মন্ত্র দেওয়া উচিত ছিল, কেননা শৌর্যই মুক্তিকে রক্ষা করতে পারে। যে সাহস, মনের যে বলিষ্ঠতা পেলে সমাজের এই জাত-পাঁতের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলা যেত, সেই সাহস আরও এগিয়ে আরও বড় জিনিস এনে দিতে পারত আমাদের—আরও বড় মুক্তি। এও হতে পারে, উনি ভেবেছিলেন—এই মুক্তি থেকেই ওই সাহস জন্মাবে; কিন্তু মাটির দোষই হোক বা যে জন্যই হোক, তা জন্মাল না।"

দুইজনেই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। বেশ খানিকক্ষণ পরে মাস্টারমশাই বলিলেন—"কিন্তু আমি আগেই বলেছি, আমি অনধিকারী টুলু, ধর্ম নিয়ে নাড়াচাড়া করবার অবসর আমি পাইনি জীবনে। শুনেছি সব ধর্মের সামনেটা তার খোলস মাত্র, ভেতরে অতি সূক্ষ্ম জিনিস আছে। আমার মোট বক্তব্য, তা মেনে নিলেও এ যেন গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া হচ্ছে।—ধর ওই বস্তিটা—তুমিই বললে, ওরা মানুষের স্তর থেকে নেমে গেছে। আমি বলি, আগে ওদের মানুষের স্তরে তুলে নিয়ে আসতে হবে—শুধু পেটের অন্ন, পরনের কাপড় আর মানুষের সাধারণ নীতিবোধ দিয়ে, তারপর ওদের ধর্ম দেওয়া আর সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা বলা—যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততক্ষণ এই ধরনের ধর্ম আমার একটা অমার্জনীয় বিলাস ব'লেই মনে হয় টুলু। ইতিহাসের গোড়ায় দেখতে পাই যতদিন নাকি আর্যদের অতিমাত্রায় যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে থাকতে হ'ত ততদিন যুদ্ধটাই ছিল সমাজ-জীবনের বড় কথা, যুদ্ধ তখন সবার সাধারণ ব্রত ছিল। যুদ্ধকাণ্ড শেষ ক'রে যখন সমাজ গোছাবার অবসর হ'ল তখন তাঁরা ধর্মকে শ্রেষ্ঠ জায়গা দিয়ে, যারা তাতে ব্রতী—অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের সুদ্ধ সমাজের শীর্ষে তুলে

রাখলেন। আমাদের এখন চারিদিকে যুদ্ধের অবস্থা চলছে টুলু, এমন অবস্থা যে রক্ষাও করতে পারছি না ধর্মকে, এখন—"

টুলু বলিল—"কিন্তু জীবন থেকে ধর্মকেই যদি বাদ দিলাম, ঈশ্বরকেই যদি—"

মাস্টারমশাই টুলুর পিঠে হাত দিলেন, বলিলেন—"ঈশ্বর আর ধর্মেতে এক জায়গায় বিস্তর তফাত আছে টুলু—যেখানে তফাত আমি সেইখানটার কথাই বলছিলাম বিশেষ ক'রে।"

কথাটা টুলুর মনে থিতাইয়া বসিবার জন্যই মাস্টারমশাই একটু বেশি সময় লইলেন এবার। এতবড় একটা বিরুদ্ধোক্তিতেও টুলু যখন কোন প্রশ্ন করিল না, মাস্টারমশাই নিজেই আবার আরম্ভ করিলেন—"তুমি আমায় জিজ্ঞেস করলে আমি তন্ত্রকে ধর্মের ব্যাভিচার বললাম, কি তোমার সিদ্ধবাবার মতন তান্ত্রিককে—তাই থেকেই কথাগুলো এসে পড়ল। তোমার কথার আসল উত্তরটা আমার এখনও দেওয়া হয় নি। ব্যভিচার আমি বিশেষ ক'রে এদেরই কীর্তিকলাপকে বলেছি।"

'এদের' কথাটায় একটু বেশি ঝোঁক দিলেন মাস্টারমশাই। টুলু দৃষ্টি নত করিয়া শুনিতেছিল, বোধ হয় যে অবজ্ঞাটা প্রকাশ পাইল তাহার জন্যই একবার মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু মাস্টারমশাই লক্ষ্য করিলেন, একবার টুলু শিহরিয়া উঠিল না। বলিয়া চলিলেন—"এদের প্রতি আমার আক্রোশ আর ঘেন্নার অন্ত নেই টুলু; কিন্তু তা এই জন্যে নয় যে, এরা সোজা মদটাকে 'কারণ' ব'লে তাইতে ডুবে থাকে,—আমি তো বলি এদের যা জীবন তাতে এরা যত বেশি ডুবে থাকে, সংসারের ওপর এরা এদের কলুষ-দৃষ্টি যত কম দিতে পারে ততই ভাল। তারপর এরা যে অমুক অমুক লক্ষপতির গায়ে ব'সে জোঁকের মত রক্ত মোক্ষণ করছে, তাতেও আমার দুঃখ নেই; কেননা সে রক্ত যত কমে, সমাজের ততই কল্যাণ। আমার দুঃখ আর আক্রোশ এই জন্যে যে, তোমাদের মতন ভাবপ্রবণ যুবকদের চিন্তাশক্তিকে মোহগ্রস্ত ক'রে একেবারে অসাড় ক'রে দিয়ে এরা নিজের পসার জমিয়ে চলেছে। তোমার মত একটা বাঙালীর ছেলে দেখলে আমার লোভ হয় টুলু—তোমাকে যে সেদিন শক্ত পায়ে বালিয়াড়ির দিকে চ'লে যেতে দেখলাম, সে কথা আমি কখনও ভুলব না। যে সাধনা আলেয়ার পিছনে নষ্ট হ'চ্ছে,

আলোর পিছনে যদি তা লাগাতে পারা যেত! আমি সেদিন সমস্ত রাত্রি এই দুঃখই করেছি। আমি অনেক সাধনাই চোখের সামনে এই ভাবে অপব্যয় হতে দেখেছি, আর আপশোস আমার যাবার নয়। আমার আক্রোশ এদের প্রবঞ্চনার জন্যে; এরা ঐ আলেয়া—পচা বিলের বিষাক্ত গ্যাস, এরা আলোর মুখোশ প'রে এই মোহ ঘটাবে কেন?—এই নালিশ এদের বিরুদ্ধে। ছ'ফুট তিন ইঞ্চির রাঙা টক্‌টকে লাস নিয়ে—"

মাস্টারমশাই থামিয়া গেলেন, লক্ষ্য করিলেন, এবার এত বড় মোক্ষম আঘাতেও টুলু মুখ তুলিল না। কি একটু ভাবিলেন, তাহার পর বলিলেন—"কিন্তু তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে টুলু, একে রাত ক'রেই এসেছ; আর একদিন না হয়—"

টুলু মুখ তুলিয়া বলিল—"রাত একটু হোক গে না, কি আর হয়েছে।"

এই উত্তর প্রত্যাশা করিয়াই বলা কথাটা, সিদ্ধিকে সামনে যে প্রত্যক্ষ করিয়াই মাস্টারমশাইয়ের অন্তরটা নাচিয়া উঠিল, আবার আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন, টুলু হঠাৎ একটু বিদ্রোহী ভাবেই মাথা তুলিয়া প্রশ্ন করিল—"কিন্তু এঁরা প্রবঞ্চক, এঁরা যে আলেয়া, এটা শেষ পর্যন্ত না দেখে জানছি কি ক'রে স্যার? শেষ পর্যন্ত না দেখে, এঁদের ভাল ভাবে বোঝবার অভিজ্ঞতা অর্জন না ক'রে যদি একটা অভিমত খাড়া করি যে, এঁরা আমাদের বিচার-শক্তিকে মোহগ্রস্ত করেছেন, তবে আমাদের খুব গর্হিত একটা মিথ্যাচরণের ভাগী হবারই সম্ভাবনা নয় কি?"

এবার মাস্টারমশাইয়ের বিস্মিত হইবার পালা; যখন ভাবিলেন, কথাগুলো টুলুর মনে বসিয়াছে—বিজয় একেবারে মুঠার মধ্যে, তখন হঠাৎ টুলু যেন একেবারে ফণা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইল; তাঁহার মুখের সবচেয়ে রূঢ় কথাগুলি বেশ দুইটি দর্পিত প্রশ্নের মধ্যে সাজাইয়া ধরিয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাস্টারমশাইয়ের মুখে কিন্তু হাসি ফুটিল; যেন এও একটা সুলক্ষণ, চরম পরাজয় স্বীকারের পূর্বে এটা যেন হইবেই। ধীরে ধীরে বলিলেন—"টুলু, চরণদাস যা খেয়েছিল আর আজ তোমার সিদ্ধবাবা যা খেয়েছেন তার মধ্যে মূলগত কোন তফাৎ আছে—একটুও—একটুকুও?"

টুলু যেন একটা ঘা খাইয়া সিধা হইয়া বসিল, কয়েক সেকেণ্ড তাহার মুখে কোন কথাই সরিল না, তাহার পর বলিল—"ওঁর ওটা মদ নয় মন্ত্রপূত 'কারণ'।

মাস্টারমশাই বলিলেন—"মন্ত্রপূত 'কারণ' হ'লে তো উঁচুতেই তুলে নিয়ে যাবার কথা—দোতলা থেকে তেতলায়, নিচে নর্দমায় টেনে ফেলবে কেন ?"

ব্যঙ্গটার তীব্রতায় আর ভিতরে নূতন সন্দেহের অস্বস্তিতে টুলু যেন নিস্পন্দ হইয়া গেল। একটা উত্তর ভাবিয়া লইবার জন্যই স্থির দৃষ্টিতে মাস্টারমশায়ের মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, কয়েকবার মাথা নাড়িয়া এদিক ওদিক চাহিলও, তাহার পর আবার নিরুপায় ভাবেই দৃষ্টিটা আগের জায়গায় ফিরাইয়া আনিল। মাস্টারমশাই বলিলেন—"তুমি আবেগের মাথায় চরণদাস আর তোমার সিদ্ধবাবার সম্বন্ধে যে কথাগুলো বলেছ—মনে রেখো, দুজনের কথাই তুমি আবেগের মাথায়ই বলেছ—সেগুলো যদি আমি পাশাপাশি লিখে রাখতে পারতাম তো দেখতে, তার মধ্যে বিষয়ের দিক দিয়ে একটুও তফাত নেই। সেই নর্দমা, সেই পাঁকে ল্যাপটানো মাথার চুল, পরিধেয়, সেই তীব্র নেশায় অচেতন অবস্থা, সেই রক্ত চক্ষু,—একটুও কি তফাত আছে ? ভেবে দেখ, এমন কি চরণদাসও তোমায় যে 'নেকালো' ব'লে তেড়ে-ফু'ড়ে উঠল, তোমার সিদ্ধবাবাও ঠিক সেই 'নেকালো' ব'লেই তোমায় অভিনন্দিত করলেন। কিন্তু বিষয়ের দিক দিয়ে, ঘটনার দিক দিয়ে এক হ'লেও, ভাবের দিক দিয়ে, আর সেই জন্যেই ভাষার দিক দিয়ে, কত প্রভেদ হয়ে গেছে দেখো। তোমার বর্ণনাটা চরণদাসের বেলায় হ'ল—নেশায় বেহুঁশ ; সিদ্ধবাবার বেলায় হ'ল—সমাধি, অর্থাৎ যোগের চরম সিদ্ধি—সাযুজ্য। চরণদাসের চোখ হ'ল—নেশায় টকটকে লাল, গর্তের মধ্যে এক জোড়া ভাঁটার মত জ্বলছে ; সিদ্ধবাবার বেলায় হ'ল—আকর্ণবিস্তৃত চোখে করুণায় ঢলঢল দিব্য চাহনি। চরণদাসের বেলায় হ'ল—বিকৃত স্বরে তিরস্কার ; আবার ঠিক সেই তীরস্কারটাই তোমার সিদ্ধবাবার বেলায় হ'ল—পরীক্ষা, দয়ার রহস্য। বিচারশক্তি যদি পক্ষাঘাতগ্রস্ত নাই হয়ে থাকে তো এমন ওলট-পালট আর কি ক'রে হয় টুলু ? এ আলেয়ার সম্মোহন নয় তো কি ? প্রবঞ্চনা ভিন্ন একে কি বলব ?"

আর একটু চুপ করিলেন, তাহার পর বলিলেন—"এর চেয়ে চরণদাসের

ব্যাপারটা বেশ স্পষ্ট, তার ব্যবহারটাও সাধু, অর্থাৎ ইংরিজিতে যাকে বলা যায়—More honest ; তিরস্কারটা তিরস্কার ব'লেই নিয়ে তুমি তার পথ ছেড়ে দাঁড়াবে এই তার অভিপ্রেত ছিল, তাকে প্রণামী দিতে গেলেও সে নর্দমাতেই ফেলে দিত দেখতে। হয়তো বলবে, তোমার সিদ্ধবাবাই যে হাতে ক'রে নিয়েছিলেন—এ কথা তুমি আমায় কখন বললে ?···মেনে নিচ্ছি, নেন নি, না নেওয়াই সম্ভব ও-অবস্থায় ; কিন্তু যাতে নর্দমায় না পড়ে, আর 'নেকালো কথাটারও তুমি যাতে আসল অর্থ নিয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ না দাও তার জন্যে তিনি কাছে শিষ্যদের পাহারা বসিয়ে রেখেছিলেন।"

জলটা খুব তাড়াতাড়ি বহিয়া গেলে মাটিতে বসিতে পায় না ; মাস্টারমশাই আবার চুপ করিলেন। নির্জন জায়গাটার নিস্তব্ধতাটুকু একটু শব্দের বিরতিতে যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিল, শুধু খুব দূরে কয়েকটা সেকেণ্ডের জন্য একটা উৎকট শব্দে সেই স্তব্ধটা একটু ব্যাহত হইল ; বোধ হয় বস্তিরই কিছু ব্যাপার, টুলু একবার মুখটা ঘুরাইল সেদিকে ; আবার দৃষ্টি নত করিল। জ্যোৎস্না আরও স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে, টুলুর মুখের আলোছায়ার রেখাগুলো আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ; মাস্টারমশাই কয়েকবারই ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন—বাইরের আলোছায়ার সঙ্গে ভিতরেরও আলোছায়া, রেখায় রেখায় একটা অব্যক্ত বেদনা, সংসারের জ্বালা, অনুতাপ ; তাহার পাশে সংশয়মুক্তি, আশার আলোক। মাস্টারমশাই লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, এই আলোই ধীরে ধীরে যেন হইয়া উঠিতেছে জয়ী।···আরও ভাবুক ও, দরকার আরও চিন্তা।

এক সময় টুলু হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিল, একটু অপ্রতিভ ভাবে হাসিয়া বলিল —"আজ উঠি তা হ'লে স্যার, রাত হয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ, আমি যখন উঠতে বলেছিলাম তার চেয়ে মিনিট পাঁচেক তো বেড়েছেই রাতটা।"

কথাটা বলিয়া মাস্টারমশাই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন— "না, ওঠো, সত্যিই হয়েছে রাত।"

দুয়ার পর্যন্ত গিয়া প্রশ্ন করিলেন—"তোমায় একটু এগিয়ে দোব ?'

টুলু বলিল—"না স্যার, একলাই বেশ যাব।"

টুলু দূরে অদৃশ্যপ্রায় হইয়া গেলে ফিরিয়া আসিতে আসিতে বলিলেন—"ভালই, যতক্ষণ একলা ভাবতে পারে।"

নেপথ্যে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে আলোচনা চলিল। নিস্তব্ধতার গায়ে এবার মাত্র একজনের নিশ্বাসের শব্দ।

প্রায় আধঘণ্টাটাক পরে দরজায় করাঘাত পড়িল। বনমালী ভাত আনিবে, মাস্টারমশাই উঠিয়া দরজাটা খুলিয়া দেখেন, টুলু দাঁড়াইয়া। মুখে জ্যোৎস্নাটা পুরাপুরি আসিয়া পড়িয়াছে, কোনখানে এতটুকু ছায়া নাই আর তাহার উপর সেই নিঃসংশয়তার আলোক, তাহাতেও কোথাও যেন আর এতটুকু মলিনতা নাই।

মুখের হাসিটা সেই রকম অপ্রতিভভাবেই ফুটিল, টুলু বলিল—"ফিরেই এলাম স্যার, রাতটা বেশিই হয়েছে মনে হচ্ছে যেন, গেলাম না আর।"

মাস্টারমশাই ভিতরে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কিন্তু তোমার খাওয়া?"

দুয়ারটা এবার খোলাই ছিল, বনমালী আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়া বলিল—"ভাত আনলাম আজ্ঞে।"

টুলু ও মাস্টারমশাই একবার পরস্পরের মুখের পানে চাহিলেন, তাহার পর কি যেন আশা করিয়া মাস্টারমশাই আবার প্রশ্ন করিলেন—"কিন্তু তোমার খাওয়ার কি হবে টুলু?"

টুলু আবার অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া একবার মুখের পানে চাহিয়া লইয়া বলিল—"বনমালীই তার জবাব দিয়েছে স্যার; ওর খাটুনি একটু বাড়ল শুধু।"

চরণ স্পর্শ করিবার জন্য নত হইল। মাস্টারমশাই বললেন, "কিন্তু বনমালীর হাতের খাওয়া—মানে চরণদাসের হাতের খাওয়া, চম্পাও বাদ পড়ছে না টুলু।"

টুলু পদধূলি মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, সেই অপ্রতিভ হাসি, বলিল—"তা হোক, কাউকেই বাদ দেওয়া চলবে না স্যার।"

॥ সাত ॥

অনেক রাত পর্যন্ত অনেক কথা হইল। টুলু যখন শয্যাশ্রয় করিল, তখন রাত তিনটা।

মাস্টারমশাই জাগিয়া রহিলেন। স্কুল থেকে খান চারেক বেঞ্চি আনিয়া টুলুর খাট করা হইয়াছে, মাস্টারমশাইয়ের খুব সংক্ষিপ্ত বিছানার খানিকটা সেই খাটে গেল; তাহাতেই টুলু এত আপত্তি করিল যে, মশারির কথাটা মাস্টারমশাই একেবারে তুলিলেনই না। টুলু ঘুমাইয়া পড়িলে সেটা আস্তে আস্তে খাটাইয়া দিয়া খুব সন্তর্পণে তাহার বিছানার চারিদিকে গুঁজিয়া দিলেন। তাহার তৃপ্ত নিদ্রিত মুখের পানে মাতার মত অপরিসীম স্নেহের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বাহিরে আসিলেন। একবার ভাবিলেন কাঞ্চনতলাটিতে গিয়া বসেন—জায়গাটা দুঃখেও টানে, আনন্দেও টানে। কিন্তু টুলু হঠাৎ উঠিয়া পড়িতে পারে, তাহার কাছে থাকাই ভাল। উঠানের দুয়ার খুলিয়া মাস্টারমশাই রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন; ঘরটা পাশেই, টুলুর গাঢ় নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাইতেছে।

বাসার সামনেই রাস্তাটা লইয়া খানিকটা চৌরস জায়গা, মাস্টারমশাই সেইটুকুর উপর পায়চারি করিয়া সমস্ত রাত কাটাইয়া দিলেন। আকাশে পাণ্ডুর এককালি চাঁদ, নিচে সমস্ত খনিচক্র ব্যাপিয়া এখানে-ওখানে আগুনের হল্‌কা—কোথাও কাঁচা কয়লা পোড়াইতেছে, কোথাও চিমনিগুলাই হইয়া পড়িয়াছে আগুনের পিচকারি। সাহাদের তিন নম্বর খনিটা ধ্বসিয়া গিয়া এখনও জায়গায় জায়গায় জ্বলিতেছে—বড় বীভৎস দেখাইতেছে।

আজ নিজের সঙ্গে মাস্টারমশাইয়ের আলাপ-আলোচনা তর্ক-বচসার আর অন্ত নাই। পায়চারি করিতে করিতে প্রশ্নের বা উত্তরের গুরুত্বে এক-একবার থামিয়া যাইতেছেন, সেগুলো কখন-কখন মনে মনেই, কখন বা স্পষ্ট। একবার দাঁড়াইয়া পড়িয়া বাঁ হাতে ডান হাতের মুঠাটা চাপিয়া বলিলেন—"কিন্তু এত শীগগির ও আসবে না—কখনই না। এরা আসে না এত শীগগির এদের বিশ্বাস

বা অবিশ্বাস ছেড়ে।"···বারকয়েক চিন্তিতভাবে পায়চারি করিয়া এর উত্তরটাও পাওয়া গেল—"কিন্তু যত দেরি ক'রে আসবে, যত ভুগিয়ে আসবে, তত ভাল ক'রে আসবে; তার জন্যে থাকতে হবে ধৈর্য ধ'রে,—নরেন দত্তকে বিবেকানন্দে দাঁড় করাতে তো কম বেগটা পেতে হয় নি,—এদের ধাতই এই যে—"

বিরাট দৃশ্যপটের গায়ে সমস্ত রাত একটা স্বগতোক্তি-অভিনয় চলিল। এক সময় দৃশ্যপটটা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া গেল। পূবের দিকটা আলো হইয়া উঠিয়া পঞ্চকোট পাহাড়ের নীল রেখাটাকে প্রথমে জাগাইয়া দিল। খনিচক্রের অগ্নিস্তূপগুলো স্তিমিত হইয়া আসিল।···মাস্টারমশাইয়ের মুখে একটা প্রশান্ত দীপ্তি; রাত্রির গ্লানি শরীর মন হইতে ঝাড়িয়া সম্পূর্ণ অন্য একটা অভিনয়ের জন্য যেন প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় টুলু আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিয়া পাশে দাঁড়াইল, প্রশ্ন করিল—"সমস্ত রাত ঘুমোন নি স্যার?"

কখন যে ওর ঘুমের সেই গাঢ় নিশ্বাস বন্ধ হইয়া গেছে খেয়াল হয় নাই, মাস্টারমশাই বেশ একটু থতমত খাইয়া গেলেন, বলিলেন—"ঘুম—মানে—হ্যাঁ—তা, বড্ড গরম বোধ হচ্ছিল টুলু···"

অপরাধীর মত মুখের পানে চাহিয়া একটু অপ্রতিভ হাসি হাসিলেন। টুলু ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল—"আপনার মশারিখানিও আমার বিছানায় টাঙিয়ে দিয়েছিলেন দেখলাম···"

মাস্টারমশাই এবার ভালভাবেই হাসিয়া বাঁচিলেন, যেন বলিলেন—"এই দেখো!—ঘুম হচ্ছে না, তবুও আমার মশারি ব'লে আমি গায়ে জড়িয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম? অধিকার জ্ঞানের এ যে চূড়ান্ত হ'ল টুলু; ছোট ছেলেরাও এমন খুনসুটিপনা করে না বোধ হয়।"

তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিলেন—"তুমি বাড়ি যাও এবার, দিব্যি ঠাণ্ডা আছে। আর হ্যাঁ, আজ রোববার, তিনটের সময় তুমি একবার নিশ্চয় আসবে, সেবারকার মতন যেন স্কুল-পালানো ছেলে হয়ো না। উদ্দেশ্যটাও তোমায় ব'লে দিই এবার,—তুমি পরিণামটা দেখেছ, কারণ একবার দেখাতে চাই তোমায়, কারণের কতকটা। মানে, একবার খনি দেখতে যাব।"

তিনটার আগেই টুলু আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রায় পাঁচটার সময় মাস্টার-মশাই তাহাকে লইয়া সাহাদের এক নম্বর খনির মুখে উপস্থিত হইলেন; স্কুলের সেক্রেটারি ম্যানেজার, তাঁহার সম্মতি পূর্বাহ্ণেই লওয়া ছিল। দেখাইবার জন্য একজন যুবক ঠিক করা ছিল—খনির কোন অধস্তন কর্মচারী। মাস্টারমশাই ঈষৎ হাসির সহিত তাঁহার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিলেন, বলিলেন—"মানুষকে নামবার রাস্তা দেখিয়ে দিতে হয় না; তুমি যাও তোমার কাজে।"

দুই জনে গিয়া লিফ্‌টের খাঁচায় উঠিলেন। আরও দুইজন উঠিল—কুলি, তাহার পর খাঁচাটি পায়ের তলায় ধ্বসিয়া যাইতে লাগিল। একেবারে নূতন অভিজ্ঞতা, টুলু যেন দম বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কতকটা অভ্যাস হইলে প্রশ্ন করিল—"ছেলেটিকে সঙ্গে নিলেন না স্যার, আপনি নাবেন নাকি এর মধ্যে মাঝে মাঝে?"

মাস্টারমশাই বলিলেন—"হ্যাঁ, এক এক সময় ওপরের দিকে চেয়ে তোমাদের ভগবানকে বড় ডাকতে ইচ্ছে করে টুলু, তখন তাঁর নিচের রূপটাও এসে দেখি।"

হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু মুখটা সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হইয়া উঠিল। টুলু আর কোন প্রশ্ন করিল না, শুধু মাঝে আর একবার সেই কঠিন মুখের পানে চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া লইল।...খাঁচাটা, নামিয়া চলিয়াছে, প্রতি মুহূর্তেই মনে হইতেছে, এই বুঝি পা হইতে আলাদা হইয়া গেল। এ অবস্থার মধ্যেও বুকটা একবার ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল—জলের তোড়ের শব্দ, যেন একটা বান ডাকিয়াছে।... তখনই কিন্তু কারণটা বুঝিতে পারিল। একটু পরেই খাঁচাটা নিচের মেঝেয় আসিয়া ঠেকিল, চালক দরজা টানিয়া দিতে দুই জনে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

হাতকয়েক পরিধি লইয়া গোলমত এক ফাঁকা জায়গা। কালো এবড়ো-খেবড়ো দেয়াল, মাঝে কয়েকটা কালো থামের মত, একটা বিদ্যুতের বাল্‌ব থেকে আলো বাহির হইয়া এগুলোর গায়ে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। চোখ দুইটা একটু অভ্যস্ত হইতেই টুলু টের পাইল—সব পাথুরে কয়লা।...লিফ্‌টের রাস্তার গা বাহিয়া এবং অন্য চারিদিকেরও দেয়াল বাহিয়া ঝরঝর করিয়া জল নামিয়া নালা দিয়া একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে নামিয়া যাইতেছে। গুমটের সঙ্গে স্যাঁতসেঁতে

অদ্ভুত ধরনের এক গন্ধ, পৃথিবীর উপরে কোথাও এ গন্ধ নাই—টুলুর মনে হইল এ যেন টুঁটি-টেপা পাতালের কষ্টশ্বাস, সংক্রামকতায় যেন তাহারও দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। দৃষ্টি তুলিয়া দেখিল, মাথার কয়েক ফুট উপরেই অন্ধকার ছাত, কয়লার চাপ একটা যে-কোন মুহূর্তেই উপরের ভারে নামিয়া পড়িয়া এই অবকাশটুকু বন্ধ করিয়া দিতে পারে—নিঃশব্দ মৃত্যু—আর্তনাদের এতটুকুও শব্দ পৃথিবীর কাছে পৌঁছিবে না।

এই চত্বরের গায়ে গোটাচারেক গর্ত, প্রায় এই রকমই উঁচু—ঢালু হইয়া নামিয়া গেছে। সবগুলিতেই এক জোড়া করিয়া ছোট রেল পাতা, একটার মধ্যে হইতে জনতিনেক লোক একটা ট্রাক্ ঠেলিয়া তুলিল, কয়লায় বোঝাই, লিফ্‌টের কাছে দাঁড় করাইল। একটা ব্যাচ একটা ট্রাক্ খালাস করিয়া অন্য একটা গর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল—সতর্ক করিতে করিতে—যদি কেহ থাকে সেই পথে; তাহাদের কণ্ঠস্বর আস্তে আস্তে মিলাইয়া গেল।···চারিদিকেই লোক—পুরুষ, স্ত্রী, ছেলে, বুড়া—লিফ্‌ট বাহিয়া ওঠানামা করিতেছে, গর্ত-গুলার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, বাহির হইয়া আসিতেছে, সঙ্গে বেতের ঝুড়ি, গাঁইতা, শোভেল—বিটকেল চেহারা—শুধু চোখ দুইটি আর ওষ্ঠাধর ছাড়া অঙ্গে সর্বত্র কয়লার আধিপত্য। কেমন একটা ক্লান্ত, নিস্পৃহ ভাব সবার মুখে, মৃত্যুর সঙ্গে ঘর করিয়া অভ্যাসের একটা অবহেলা আছে—তবুও চোখে-মুখে একটা চাপা ভয়ের ছাপ। এ জিনিসটা টুলু সেদিনও বস্তিতে সবার মুখে লক্ষ্য করিয়াছিল—খনির কুলিকে যেন একটা আলাদা জাতই করিয়া রাখিয়াছে। অথচ এর মধ্যে হাসিও আছে, ঠাট্টাও আছে, সম্পূর্ণ এক অন্য জগতই।

মাস্টারমশাই বলিলেন—"এইটুকু হ'ল এখানকার গড়ের মাঠ, এইবার চলো একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকি।—দাঁড়াও, একটা লোক নিই, সব জায়গায় আবার আলো পাওয়া যায় না।"

একজন কেরানি-গোছের লোক একটা টেবিলের সামনে বসিয়া কি একটা হিসাব লিখিয়া যাইতেছিল, তাহাকে বলিতে সেফ্‌টি-ল্যাম্প-হাতে একটি বৃদ্ধ-গোছের কুলি সঙ্গে দিল। টুলু একটু অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিল—"সে ছোকরাকে সঙ্গে নিলেন না যে তা হ'লে?"

মাস্টারমশাই বলিলেন—"খনির গুনগান করতে তো আমরা নামি নি। এমন কিছু মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে আমার, যা এদের শ্রুতিমধুর নাও হতে পারে।"

এবড়ো-খেবড়ো ঢালু পথ দিয়া নামিয়া চলিলেন। মাথার উপর খিলানটা আরও নিচু, এক এক জায়গায় এত নিচু যে, একটু কুঁজা হইয়া না গেলে বিপদ আছে; লোকটা আগাইয়া যাইতেছিল, সাবধান করিয়া দিতে লাগিল। এক এক জায়গায় দুই ধারের দেওয়ালও আগাইয়া আসিয়া গলিটাকে আরও সঙ্কীর্ণ করিয়া দিয়াছে, মাঝখান দিয়া সেই রেলপথ, একদিকে খানিকটা খাঁজের মধ্য দিয়া জলের স্রোত নামিয়া যাইতেছে। এই রকম একটা দু'ধার-চাপা জায়গায় আসিতে হঠাৎ একটা গুম্ গুম্ শব্দ উঠিল, যেন রেল বাহিয়া আসিতেছে শব্দটা, সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্ট সতর্কবাণীর মত—মাটির অত নিচে শব্দেরও যেন জাত বদলাইয়া গেছে।

কুলিটা ঘুরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"ট্রাক নামছে গো বাবু।"

জায়গাটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হওয়ার জন্য নিজেও কি একটা জোরে বলিয়া চালকদের সাবধান করিয়া দিল। মাস্টারমশাই তাড়াতাড়ি টুলুকে লইয়া অপেক্ষাকৃত চওড়া জায়গায় গিয়া দাঁড়াইলেন; কয়েক সেকেণ্ড পরে খালি ট্রাকটা নামিয়া গেল। ঢালুর মুখে দুইজন লোক উল্টা দিকে ঝোঁক দিয়া তাহার গতিটা সংযত করিয়া চলিতেছে।

টুলু শুষ্ক মুখে মাস্টারমশাইয়ের দিকে চাহিল। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন —"অবশ্য পাশাপাশি দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালে বিপদ ছিল না, তবে একেবারেই কি নিরাপদ?"

টুলু প্রশ্ন করিল—"বাড়িয়ে দেয় না কেন ফাঁকটা এখানে?"

"খুব সম্ভবত জায়গাটায় শক্ত পাথরের চাঁই প'ড়ে গেছে।"

"কয়লার মধ্যে হঠাৎ শক্ত পাথরের চাঁই যে? আর, থাকেই যদি তো পথ করবার সময় কেটে ফেলে নি কেন? এ যে কুলিদের প্রাণ নিয়ে—"

মাস্টারমশাই ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন, হাসিয়া বলিলেন—"খনির মালিকদের জন্যেই বিশেষ ক'রে খনি নিজেকে তোয়ের করে নি, সুতরাং মাঝে মাঝে

এক-আধখানা শক্ত পাথর নিজের গায়ে ওভাবে বসিয়ে রেখবার তার অধিকার আছে; তার পর, খনির মালিকরাও বিশেষ ক'রে কুলিদের বাঁচাবার জন্যেই টাকা খরচ ক'রে মাটির ভেতর এই কাণ্ডটা করে নি, সুতরাং ওরকম এক-আধটা খুনে পাথর যদি ছেড়েই যায় তো তাদেরও অগ্রাহ্য করবার অধিকার আছে।"

সঙ্গী কুলিটা বলিল—"উটি পাষাণ পার্থোর আজ্ঞে, নড়েক নাই, ভাঙেক নাই।"

টুলু প্রশ্ন করিল,—"লোক মারা পড়ে না?"

"হুঁ, মরছেঁ, থেঁতো হইছেঁ,—মরছেঁ, থেঁতো হইছেঁ—মরছেঁ; মরবার কি বারোন আছেঁ গো?"

বেশ নিশ্চিন্ত আর নির্বিকার ভাবে মাথা দুলাইয়া কথাগুলা বলিতে বলিতে অগ্রসর হইল।

এই সুড়ঙ্গটার গা ভেদ করিয়া অন্য সব সুড়ঙ্গও মাঝে মাঝে ডাইনে বামে চলিয়া গেছে, কোনটা অনেক দূর—অন্তত অস্পষ্ট আলোয় তাই মনে হয়, কোন কোনটা কয়েক হাত মাত্র; খোঁড়া হইতেছে, দেয়ালের গায়ে গাঁইতার চোট পড়িয়া বড় বড় কয়লার চাপ খসিয়া পড়িতেছে। বেশির ভাগ মেয়ে-কুলিরাই বেতের ঝুড়িতে মাথায় করিয়া লইয়া গিয়া ট্রাকে বোঝাই করিতেছে।

একটি অল্পবয়সী স্ত্রীলোক ঝুড়িটা খালি করিয়া তাহাদেরই সামনে নিতান্ত ক্লান্ত ভাবে আসিয়া নূতন একটা সুড়ঙ্গের মুখে দেয়ালে ঠেস দিয়া এলাইয়া বসিল। গাল বসা, চোখ দুইটা কোটরের মধ্যে জলজল করিতেছে; ঘামে চুলগুলা পর্যন্ত ভেজা; মুখে ক্লান্তির সঙ্গে একটা অসহায় আতঙ্কের ছাপ। বক্ষ আর উদর ফুলিয়া এক হইয়া উঠিয়াছে, স্ত্রীলোকটি টানিয়া টানিয়া সমস্তটার উপর হাত বুলাইতে লাগিল, মুখটা মাঝে মাঝে যেন অসহ্য বেদনায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

একটু আগাইয়া গিয়াছিল,—টুলু ফিরিয়া আর একবার দেখিয়া লইয়া শঙ্কিত ভাবে বলিল—"পেটে সন্তান মেয়েটির স্যার! এদেরও খাটতে হয় নাকি?"

কয়েকজন স্ত্রীলোক মেয়েটিকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, প্রশ্নাদি করিতেছে। মাস্টারমশাই ঘুরিয়া বলিলেন—"তুমি অঙ্কে তো বড় কাঁচা ছেলে দেখছি টুলু—খালি পেটে, অর্থাৎ শুধু নিজের জন্যে যখন খাটতে হচ্ছে মেয়েদের, তখন সন্তান পেটে আরও বেশি খাটবার কথা নয় কি? দু-দুটো জীবনের দায়িত্ব তো তার ওপর?"

সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া খুব মৃদু একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত বহিতেছে, তবু যেন নিশ্বাসের হাওয়া পাইতেছে না টুলু। সেইরূপ শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়াই বলিল—"কিন্তু যেন শুনেছিলাম আইনে গর্ভবতী মেয়েদের খাটতে দেওয়া মানা—"

"কিন্তু দয়া ব'লেও তো একটা জিনিস আছে যা আইনের ওপর!"

"বুঝলাম না স্যার।"

"খনির মালিক বা ধরো ম্যানেজার—এরা মানুষই তো? দয়া-ধর্ম ব'লে একটা জিনিস থাকতে নেই এদের? এরা আইনকে লুকিয়ে দেয় খাটতে বেচারাদের; রোজগার চাই তো?"

মেয়েটিকে ঘিরিয়া আরও কয়েকজন স্ত্রীলোক জড়ো হইয়াছে, জনকতক দাঁড়াইয়া বলিয়া তাহাকে আর দেখা যাইতেছে না। মাস্টারমশাই সেই দিকে চাহিয়া একটু কি ভাবিলেন, তাহার পর আবার সামনের দিকে ঘুরিয়া পা বাড়াইয়া বলিলেন—"এস।"

টুলু যেন স্তম্ভিত হইয়া গেছে, না ঘুরিয়াই বলিল—"কিন্তু শুনেছিলাম যেন ব'সে খেতে দিতে হয় ক'টা মাস—"

মাস্টারমশাই আগাইয়া আসিয়া তাহার কাঁধে হাত দিলেন; হাসিয়া বলিলেন —"দু'রকম ভাবেই দয়া করতে হবে? তোমার আবদার কম নয় তো! চলো, খনিতে দেখবার জিনিসের এমন অভাব নেই যে, এক জায়গায় দাঁড়িয়েই দেখতে হবে, তা ভিন্ন কিছু মেয়েলি ব্যাপার হচ্ছে, ঠিক নয়ও দাঁড়ানো।"

দুইজনেই একসঙ্গে ঘুরিয়া পা বাড়াইলেন, কিন্তু টুলুকে আবার ঠিক তেমন ভাবেই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল; হাত-দশেক পরেই এ সুড়ঙ্গটা আড়াআড়ি অন্য একটার সঙ্গে মিশিয়াছে, সেই তেমাথার মাঝখানে দাঁড়াইয়া

। একা নয়, পাশেই হাফ-প্যাণ্ট আর নূতন স্টাইলের আধা-হাত-গেঞ্জি-পরা একটি যুবক, চম্পা বেশ দুলিয়া হাসিয়া তাহার সঙ্গে কি একটা প্রসঙ্গ চালাইয়া যাইতেছে।

মাস্টারমশাই আগাইয়া চলিয়াছেন, টুলু মুহূর্তখানেক থমকিয়া দাঁড়াইয়া আবার অগ্রসর হইল। চম্পার শাড়ি ময়লাই, তবে বেশ আস্ত আর সযত্নে পরা, একটা বেতের ঝুড়ি উপুড় করিয়া তাহার উপর ডান পাটা তুলিয়া দিয়াছে, এদিকে নজর পড়িতেই ঝুড়িটা তুলিয়া লইয়া পাশ কাটাইয়া উঠিয়া আসিল; মাস্টার-মশাইকে পিছনে ফেলিয়া টুলুর পাশাপাশি হইয়া একবার মুখ তুলিয়া চাহিল, বেশ একটু হাসি-হাসি ভাব; তাহার পর হনহন করিয়া উঠিয়া গেল।

নামিয়া আসিতে যুবকটি হাত তুলিয়া মাস্টারমশাইকে নমস্কার করিল, প্রশ্ন করিল—"মাইন্ দেখতে এসেছেন ?"

মাস্টারমশাই প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, এই ইনি নূতন লোক, শখ হয়েছে।"

যুবকটি হাসিয়া নমস্কার করিয়া সামনে আগাইয়া গেল, মাস্টারমশাই তাহার উল্টা দিকে অগ্রসর হইলেন, বলিলেন—"এটি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার।"

বিশেষ কিছু না মনে করিয়াই টুলু একবার ঘুরিয়া দেখিল, দেখে যুবকটিও ঘাড় ফিরাইয়া তাহার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে, চোখের দৃষ্টি প্রীতিপূর্ণ নয়।

॥ আট ॥

ঘুরিয়া ফিরিয়া আরও অনেকক্ষণ দেখিয়া বেড়াইল! মনটা ক্রমেই নিঝুম হইয়া পড়িতেছে, তবুও একটা উৎকট কৌতূহল। মনে করিতে গেলে যেন বিশ্বাস হয় না যে, পৃথিবীর আলো, বাতাস, গতি যেখানে একটা বিরাট চাপের নিচে এই রকম স্তম্ভিত, সেই জায়গাটাই আবার পৃথিবীতে আলো, বাতাস, গতি জোগাইবার ভার লইয়াছে।...আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘুরিয়া মাস্টারমশাই সঙ্গীকে প্রশ্ন করিলেন—"চরণদাস কোন্‌খানটায় কাজ করে জানিস ?"

বলিল—জানে। একটা দিকে লইয়া চলিল এবং অপর একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই হাওয়াটা থামিয়া গিয়া একটা বিশ্রী রকম গুমোট। কাজও হইতেছে না। একটু আগাইয়া গিয়া এর গা ফুঁড়িয়া আর একটা সুড়ঙ্গ। সঙ্গী তাহার সামনে আলোটা তুলিয়া ধরিল। মাস্টারমশাই প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, শঙ্কিতভাবেই বলিল—"পারবেক নি বাবু।"

না-পারিবারই কথা, একেবারে অসহ্য গুমোট, তবু মাস্টারমশাই ভিতরে পা বাড়াইয়া বলিলেন—"না, পারব; এস টুলু।"

টুলু দুই পা আগাইয়া বলিল—"স্যার, এ রকম কেন? এ যে···"

সত্যই, পৃথিবীর উপরের কোন উষ্ণতার সঙ্গেই এর মিল নাই, সেখানকার উষ্ণতা তীব্র হইলে দগ্ধ করে, এ যেন টুঁটি টিপিয়া মারিতেছে, এ যেন আগুনের প্রেতমূর্তি—স্বধর্মভ্রষ্ট। আর একটু আগাইয়া টুলু আর্তভাবে বলিয়া উঠিল—"মাস্টারমশাই!"

হাত দশ-বারো ভিতরের দিকে একটা লোক গাঁইতা চালাইতেছে, বন্ধ করিয়া ফিরিয়া চাহিল—ক্ষীণ বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল—শুধু শরীরে একটা বহিঃ-রেখা আর এক জোড়া জ্বলন্ত চোখ।

মাস্টারমশাইয়ের গলার স্বর বদলাইয়া গেছে—একটা অদ্ভুত জিদ, যেন আক্রোশই; বলিলেন—"বেরিয়ে এস।"

"বাঃ, দেখব না?"

"বেরিয়ে এস!—এস বেরিয়ে!"

নিছক প্রাণধর্মের তাগিদেই টুলু ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। মাথাটা ঝিমঝিম করিতেছে, শরীরটা কাঁপিতেছে, অবসন্ন ভাবে দেয়ালে কপালটা ঠেকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ফেলিল।

মাস্টারমশাইও আসিয়া পড়িয়াছেন, সঙ্গে চরণদাস। গাঁইতাটা রাখিয়া দিয়া টুলুকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—"উইখানে চলুন আজ্ঞে—বাতাঁসে।"

সেদিনকার সে চরণদাস নয়, তবু কথা কহিতে মুখ দিয়া ভক্ করিয়া সুরার গন্ধ বাহির হইয়া পড়িল, টুলু মুখটা ঘুরাইয়া লইল।

দুই জনকে আস্তে আস্তে বড় সুড়ঙ্গটায় লইয়া আসিল। ঠাণ্ডা, চালানি

বাতাস অল্প অল্প বহিতেছে, একটু বসিয়া থাকিয়াই টুলুর শরীরটা অনেকটা ধাতস্থ হইল ; বলিল—"একটু জল পাওয়া যাবে ?"

বৃদ্ধ হাসিয়া চরণদাসের পানে চাহিল, বলিল—"চরণদাসের ড্যারায় সাদা জল ?—বাবু কি কয় গো চরণ-ভাই !—আমি আনছি জল আজ্ঞে।"

চরণদাস কপালের ঘাম মুছিয়া বলিল—"কি করি বাবুমশাই ?—পেট বড় দুশমন, নইলে বোষ্টমের পুত হয়ে···যাই আজ্ঞে।"

যেন থাকিবার লজ্জা এড়াইবার জন্যই একবার ভীত দৃষ্টিতে সুড়ঙ্গটার পানে চাহিয়া একটা সেলাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

টুলু মাস্টারমশাইয়ের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"আপনি আরও ভেতরে গিয়েছিলেন ?"

মাস্টারমশাই একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন, বলিলেন—"তোমায় বড্ড অ্যাফেক্ট করেছিল, না ? আমারই ভুল হয়েছিল, অতটা আন্দাজ করতে পারি নি।"

একটু হাসিয়া বলিলেন—"আমার কথা আলাদা, আমি সিজন্‌ড (seasoned), আগুনে জলে আর কিছু করতে পারে না ; পেল্লাদের ছাপ মেরে দিয়েছে।"

টুলু আতঙ্কের দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"মনে করতেও আমার এখনও ভয় করছে স্যার। গরম এ রকম হয় !"

মাস্টারমশাই বলিলেন—"সুড়ঙ্গটা এফোঁড়-ওফোঁড় না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা আরও ভীষণ, ওপর থেকে পাম্প-করা হাওয়াটা খেলতে পাচ্ছে না কিনা। ওঠ, যাওয়া যাক।"

ঘটনাটুকুর স্মৃতিতে আচ্ছন্ন হইয়া টুলু মাথা নীচু করিয়া চলিয়াছে। এক সময় মুখ তুলিয়া আবার বলিল—"কী গরম স্যার ! শুধু সেই কথাই ভাবছি আমি ; আর দু'পা গেলেই আমার—"

মাস্টারমশাই বলিলেন—"আমি যে প্রশ্নটা তোমার কাছে আশা ক'রে নিয়ে গেছলাম, সেটা কিন্তু এখন পর্যন্ত পেলাম না টুলু।"

টুলু থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি প্রশ্ন স্যার ?"

"চরণদাস ঐ সুড়ঙ্গটার মধ্যে আরও প্রায় আট-দশ হাত ভেতরে কাজ করে, তাও অন্য কাজ নয়, গাঁইতা চালানো। ভেবেছিলাম—ওর কথাটাই আগে তুলবে তুমি।"

টুলু আরও বিহ্বলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। নিজের সদ্য অভিজ্ঞতার উপরে চরণদাসকে লইয়া এই ব্যাপারটা যেন জুড়িবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কোনমতেই মিলাইতে পারিতেছে না। একটা নিতান্ত অসম্ভব কাণ্ড, যা কখনই হইতে পারে না, অথচ চোখের সামনে হইয়া যাইতেছে। টুলু বলিল—"তাই তো, ভেবে দেখি নি তো! আরও আট-দশ হাত ভেতরে! হ্যাঁ, গাঁইতাই তো চালাচ্ছিল!"

মূঢ়ের মত মুখের পানে চাহিয়া রহিল—হিসাব ধরিতে পারিতেছে না।

মাস্টারমশাই বলিলেন—"এরই প্রতিক্রিয়া—সেই নর্দমার ধারে যা দৃশ্য দেখেছিলে। খুব অস্বাভাবিক ব'লে মনে হচ্ছে?"

টুলু কোন উত্তর দিলো না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিবার মত প্রশ্ন নয় বলিয়া মাস্টারমশাই সেটার পুনরুক্তিও করিলেন না।···চিন্তা করুক ও।

দুই জনে নিঃশব্দে চলিয়াছেন; সামনে বৃদ্ধ আলো লইয়া; বুড়া মানুষ বলিয়াই বোধ হয় বকা অভ্যাস, বিড়বিড় করিয়া নিজের ভাষাতেই কি মন্তব্য করিতেছে। তাহার পিছনে টুলু—মাথাটা গোঁজা, পিছনে মাস্টারমশাই—টুলুর পানেই চাহিয়া আছেন, যেন হিসাব রাখিয়া যাইতেছেন, তাহার মনের উপর কতটা চাপ দেওয়া যায়।

চড়াই বাহিয়া উঠিতেছেন। হঠাৎ গুমগুম করিয়া একটা শব্দ হইল, যেন শব্দটা পিষিয়া যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গেই একটা কাঁপুনি।

"ভূমিকম্প!"—বলিয়া উৎকট একটা চিৎকার করিয়া টুলু ঘুরিয়া দাঁড়াইল। মাস্টারমশাই সঙ্গে সঙ্গেই হাত তুলিয়া বলিলেন—"না, কিছু ভয় নেই।"

টুলু চকিতে কৃষ্ণ দৈত্যটার যতখানি পারিল যেন একবার শেষ দেখা দেখিয়া লইয়া সমস্ত শরীরটা কুঁচকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাস্টারমশাই উঠিয়া আসিয়া তাহার পিঠে হাত দিলেন, মুখে অল্প একটু আশ্বাসের হাসি।···কিছু হইল না, শুধু পাশের দেয়াল থেকে ঝুরঝুর করিয়া খানিকটা গুঁড়া কয়লা ঝরিয়া পড়িল।

সাহস কতকটা ফিরিয়া আসিয়াছে, টুলু প্রশ্ন করিল—"কি হ'ল এটা?"

"সম্ভবত ডিনামাইট করেছে কোনখানে।"

"এই খনিতে ?"

"খুব সম্ভব।"

টুলুর চোখে ভয়টা আবার ফুটিয়া উঠিল, মাস্টারমশাই বলিলেন—"কিংবা পাশের কোন খনিতেও হতে পারে, কিংবা—"

টুলু উৎসুক দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল। মাস্টারমশাই বলিলেন—"কিংবা তিন নম্বর খনিটায় যে আগুন লেগেছিল, বোধ হয় একটা বড় ধস্ নামল।"

মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন; হিসাব লওয়া চলিতেছে—কতটা বরদাস্ত করিতে পারে টুলুর আহত স্নায়ুমণ্ডলী।

টুলু বলিল—"এবার উঠবেন স্যার ?"

"হ্যাঁ, উঠছিই; অনেকক্ষণ হ'ল, না ?"

"ঘুরে ফিরে অন্য দিক দিয়ে উঠবেন, না ?"

উত্তরটা আপনিই পাওয়া গেল,—মোড় ঘুরিতে সামনেই সেই জায়গাটি যেখানে সেই আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোকটি বসিয়া পড়িয়াছিল। এবারে কিন্তু জায়গাটা ঘিরিয়া লোক আরও বেশি—মাঝখানটায় স্ত্রীলোক, বাইরে বাইরে কয়েকজন পুরুষ, বেশ একটু জটলা হইতেছে যেন। টুলু আর বৃদ্ধ সঙ্গীর পাশ কাটাইয়া মাস্টারমশাই হন্তদন্ত হইয়া সামনে আগাইয়া গেলেন, পাশের একটা লোককে উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"কি রে, ব্যাপার কি ?"

"খোঁকাটি হ'ল আজ্ঞে।"

"আর মা ?"

ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে গেলেন। খাকি হাফ-প্যাণ্ট-পরা একটি ছোকরা ডাক্তার একটি ব্যাগ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বোধ হয় ভদ্রলোক দেখিয়া বলিল—"ও আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।...Hell !"

বিশেষ কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া বলিল—"ম্যানেজারবাবুকে খবর দে, ছেলেটার কি ব্যবস্থা করবেন।"

আরও বার কয়েক—"Hell ! hell ! নরক !" বলিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে উঠিয়া গেল। বোধ হয় নূতন চাকরি লইয়া আসিয়াছে।

মাস্টারমশাই সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন, টুলুও আসিয়া পড়িল, প্রশ্ন করিল—"কি স্যার ?"

"সেই মেয়েটা প্রসব ক'রে মারা গেছে।"

তাহার পর নিজেই এক জনকে প্রশ্ন করিলেন—"ওর স্বামী ? তাকে খবর দেওয়া হয়েছে ?"

একটি প্রগল্‌ভা মাঝবয়সী সাঁওতালী স্ত্রীলোক কতকটা যেন রসিকতা করিয়াই বলিল—"কুথা তাকে খবর দেওয়া হবেক গো ?—উ তো হুথায়।"

ঊর্ধ্বে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। মাস্টারমশাই প্রশ্ন করিলেন—"ওপরে ?"

"হুঁ, খু-ব উপ্পোরে !"—রসিকতায় একটু হাসিয়াই উঠিল।

টের পাওয়া গেল, মেয়েটির স্বামী মাসছয়েক আগে একটা দুর্ঘটনায় মারা গেছে, খনির মধ্যেই। সংসারে উহার আর কেহই ছিল না।

স্ত্রীলোকটি পাশ ফিরিয়া পড়িয়া আছে। বস্ত্রে সদ্য মাতৃত্বের গ্লানি, সে সুদ্ধ গোছগাছ করিয়া তাহাকে আপাদ-মস্তক ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে, ঠিক যেন সংসারের যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া সে বিদায় লইল। পাশেই নগ্ন শিশুটি; মিনিট দুয়েক কান্নাটা বন্ধ ছিল, একটি বৃদ্ধগোছের স্ত্রীলোক মুখে আঙুল দিয়া মুখটা পরিষ্কার করিয়া দিতে আবার হাত-পা ছুঁড়িয়া বেশ সুস্থ কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। হৃষ্টপুষ্ট, ফুটফুটে রঙ, মাথায় এক মাথা কুচকুচে চুল; বিদ্যুতের আলোয় এই সুকৃষ্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে যেন ঝলমল করিতেছে; ও-ই আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ওরই পাশে যে অত বড় ট্র্যাজেডি, সেদিকে যেন কাহারও খেয়াল নাই।...যাহা অস্বাভাবিক তাহাই মনোযোগ আকর্ষণ করে। স্বামী নাই, সুতরাং পূর্ণ গর্ভ লইয়া খনিতে কাজ করে, সুতরাং মরিবেই—এ তো নিতান্ত স্বাভাবিক কথা, এর মধ্যে আর আলোচনার কি আছে ? বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি গিন্নিত্বের ঢঙে বলিল—"আরে, চুপ কর ছাওয়াল, বাপ খেলে, মা খেলে, আবার !"

কোলে লইয়া বারদুয়েক লুফিয়া চারিদিকে চাহিয়া বলিল—"কে দুধ দিব্বি গো ? কার মায়ে দুধ আছে গো ?—গেলে দে বটে, মৌয়ে মিশায়েঁ দিতে হবেক না ছাওয়ালকে ?"

শিশু কোলে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া ছিল, সব মেয়েরা তাহার পানে চাহিতে

সে বোধ হয় লজ্জার জন্যই ভিড়ের মধ্যে পিছাইয়া গেল, অস্পষ্ট ভাবে বলিল—"ই—গো! আপ্‌ন ছাওয়ালই পায় না!—"

দুধ কিন্তু জোগাড় হইল। "দুধ—সরো, দুধ—সরো" বলিতে বলিতে একটি মেয়ে পিছন হইতে পুরুষ আর স্ত্রীলোকদের ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে বাটিতে করিয়া খানিকটা মধু-মেশানো দুধ আর একটা ন্যাকড়ার পলতে আনিয়া একেবারে সামনে দাঁড়াইল। উপস্থিতবুদ্ধি এবং তৎপরতার জন্যই তাহার একটু খাতির হইয়া পড়িল, সবাই জায়গা ছাড়িয়া দিল। মেয়েটি কোন দিকে খেয়াল না করিয়া সামনে বসিয়া পড়িল, এবং বৃদ্ধের নিকট হইতে শিশুকে লইয়া তাহার মুখে দুধ-ভিজানো পলিতাটা সাঁদ করাইয়া দিল। টুলু স্থির বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে লাগিল—চম্পা।

মৃত্যু ছাড়িয়া জীবনের কথাই চলিল।

মাস্টারমশাই বলিলেন—"ছেলেটিকে তোরা কেউ নে, মানুষ করতে হবে তো? যা হবার তা তো হয়ে গেল।"

মেয়েদের মধ্যে সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল; কোন উত্তর দিল না। মাস্টারমশাই পুরুষদের দিকে ফিরিয়া বলিল—"কি হে, একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো?"

"চম্পা লিবে, কোল আলো করা খোঁকা বটেক!"

মেয়েদের মধ্যে একজন একটু ঠাট্টার সুরে কথাটা বলিয়া, হাসিয়া মুখটা নিজের ঘাড়ে গুঁজিয়া লইল। বেশ একটু হাসি-টিপ্পনী চলিল, চম্পার মুখটা রাঙা হইয়া উঠিল। ছেলেটিকে বৃদ্ধার কোলে তুলিয়া দিতে দিতে বলিল—"চম্পা!—ইস্—মাইরি নাকি গো!"

মাস্টারমশাই একবার সবার পানে চাহিয়া লইয়া বলিলেন—"তা হ'লে—কেউ গেল খবর দিতে ম্যানেজারবাবুকে? মেয়েটিকে সৎকারেরও তো ব্যবস্থা করতে হবে?"

পাশের একটি লোক বলিল—"গেঁইছে।"

পিছন হইতে এক জন বলিল—"তাঁকে পাবে কুথা? তিনি বর্ধমান গেঁইছেন। আসিস্টেণ্ট বাবুকে খুঁজতে পাঠাইঁছি।"

কিছু করিবার নাই দেখিয়া সবাই নিস্পন্দ হইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে টুলু মাস্টারমশাইয়ের পানে একটু কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া নিচু গলাতেই বলিল—"স্যার, এরা কিন্তু ছেলেটাকে নষ্ট ক'রে ফেলবে, ম্যানেজার যদি জোর ক'রে একটা ব্যবস্থা করেও, তার চেয়ে আমরা যদি—"

মাস্টারমশাই ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"কিন্তু আমরা যে ওদের চেয়ে আগে নষ্ট ক'রে ফেলব টুলু—নির্জ্জলা পুরুষের বাড়ি—"

"না, সে কথা বলছি না, ধরুন, এদের কাউকে যদি কিছু টাকা দেওয়া যায়? ছেলেটি আমারই···মানে···মানে···"

"অর্থাৎ তুমিই নিলে, এই তো?"

টুলু আরও লজ্জিতভাবে বলিল—"চমৎকার ছেলেটি স্যার, শেষে নর্দমায় গড়াবে তো?"

মাস্টারমশাই ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া মুহূর্তখানেক কি ভাবিলেন, তাহার পর মেয়েদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এই বাবু ছেলেটিকে নিলে; কিন্তু দুধ না-ছাড়া পর্যন্ত সে তো রাখতে পারবে না। তদ্দিন তোরা কেউ মানুষ ক'রে দে, বাবু টাকা দেবে।"

টুলু পকেট থেকে একটি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া মাস্টারমশাইয়ের হাতে দিল। মাস্টারমশাই সেটা তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন—"আপাতত এই পাঁচ টাকা, বাবুর হাতে এখন আর নেই—"

পুরুষদের মধ্যে চাপা প্রশংসার একটা গুঞ্জন উঠিল, মেয়েরা কিন্তু একেবারেই চুপ করিয়া গেল। বেশ বুঝা গেল, তাহাদের সবারই মর্যাদা সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, অর্থের বদলে মাতৃত্বকে পণ্য করিতে বাধিতেছে; যাহার হয়তো লোভ আছে সেও এ-আসরে সেটাকে প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইল। একজন বর্ষীয়সী সবার মুখপাত্র হইয়া যেন একটু শ্লেষস্তরে বলিল—"ট্যাকাই চাইছে নাকি গো?"

মাস্টারমশাই বলিলেন—"তা না, একটা খরচ আছে তো? ছেলে যখন ইনি নিলেন, তখন অপরে সে খরচটা বয় কেন? এই আর কি! আর যার কচি ছেলে আছে সেই ভার নেবে তো? নিজে একটু খাওয়া-

দাওয়া না করলে ছুটো ছেলেকে যোগান দিতে পারবে কেন—কি বলগো তোমরা ?”

পুরুষদের সালিশ মানিলেন, তাহারা সাগ্রহে অনুমোদন করিল।

ছেলে-কোলে সেই স্ত্রীলোকটি সঙ্কুচিতভাবে ভিড়ের মধ্যে পিছাইয়া যাইতেছিল, সকলে তাহাকেই বলিল, এবং রাজিও করাইল শেষ পর্যন্ত। মাস্টারমশাই তাহাকে মিষ্ট কথা বলিয়া টাকাটা লওয়াইলেন। এ পর্বটা শেষ হইল।

মাস্টারমশাই হাসিয়া টুলুর পানে চাহিলেন, শুধু হাসিই নয়, আরও অপূর্ব কি আছে দৃষ্টিতে। টুলু অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া নিজের দৃষ্টি নত করিল। মাস্টারমশাই বলিলেন—“বেশ হ'ল টুলু, একটি নতুন জন্মের সঙ্গে তোমার বস্তির সেবা আরম্ভ হ'ল।···আর জন্মটিও অদ্ভুত, পুরোনোকে যেন একেবারে মুছে দিয়ে জন্মাল।”

টুলুর চোখ ছুইটি ছলছল করিয়া উঠিয়াছে,—নিশ্চয় মনের পূর্ণতার জন্যই, কিন্তু লজ্জা ঢাকিবার নিমিত্তই সামনের এই অবলম্বনটুকু ধরিল, বলিল—“কিন্তু এ কী মুছে-ফেলা মাস্টারমশাই ?”

মাস্টারমশাই স্নেহভরে টুলুর কাঁধে হাত দিলেন, বলিলেন—“না, ভুল বুঝো না টুলু,—ও যে বাপ-মাকে হারিয়ে জন্মাল—সে ট্রাজেডিটা কি অস্বীকার করা যায় ?···আমি ঘটনাটা প্রতীক হিসেবে গ্রহণ ক'রে বলছি। আর তাও বলি, তাঁরা ছুজন তো সেইখানেই গেছেন যেখান থেকে সন্তানের ওপর তাঁদের আশীর্বাদটা আরও ফলবতী হতে পারে।”

টুলু বেশ বিস্মিত হইয়া মাস্টারমশাইয়ের মুখের পানে চাহিল, তিনি যেন ছুতা করিয়াই, সেটা ওদিকে ফিরাইয়া লইয়া উপস্থিত সবাইকে বলিলেন—“তা হ'লে এই ব্যবস্থাই রইল। তোমরা পাঁচ জন ভালমানুষ রয়েছ স্ত্রী-পুরুষে, ম্যানেজারবাবু এলে ব'লো—আমরা এই ব্যবস্থা করেছি। আমিও ব'লে দোব। এইবার মেয়েটির সৎকার—”

সবাই যেন একটা থমথমে ভাব হইতে জাগিয়া উঠিল ; কয়েকজন একসঙ্গে বলিল—“কিন্তু পুলিস না এলে উঠবেক না বাবু।”

"বেশ, তা হ'লে আমরা এখন যাই, চল টুলু।"

দুই পা গিয়াই মাস্টারমশাই আবার ফিরিলেন, বলিলেন—"এস টুলু, আর একটা কাজ সেরে যাই ওর মায়ের সামনেই।"

কাছে আসিয়া সবার পানে একবার চাহিয়া লইয়া বলিলেন—"কয়লার খনিতে হীরে জন্মায় তোমরা জান, তাই ওর নাম—"

একজন বৃদ্ধগোছের লোক উৎসাহিতভাবে বলিল—"হ্যাঁ, হীরেলাল থাকুক বটে, দিব্যি টুকটুকে ছাওয়াল।"

মাস্টারমশাই হাসিয়া বলিলেন—"ওই রইল, তবে একটু বদলে। তোমাদের আমাদের যুগ যে যাচ্ছে কত্তা, আমাদের নাতিদের ও-নাম পছন্দ হবে কেন? আজকাল চাই দীপক, অলক,—তোমাদের নূতন ডাক্তারবাবুর নাম দেখছ না?—পুলক; ওর নাম রইল হীরক।…এসো টুলু।"

উঠিয়া আসিয়া লিফ্‌টের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় সেই স্ত্রীলোকটি চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল—"দেখোঁ, ছাওয়াল কেড়্যা নিলেক, আমার কাপোড় ছিঁড়্যা দিলেক, আমার জামা ছিঁড়্যা দিলেক, চুল ছিঁড়্যা দিলেক, দেখোঁ—তুমাকো বলছেঁ—বড়া মানুষ, ট্যাকার চকমকি দেখায়!—আমার ছাওয়াল দে।…এই দেখোঁ, চলো তুমরা!—"

আলুথালু কেশ, পিঠের কাছে কাপড়টা ছেঁড়া, মুখের একজায়গায় খামচানোর দাগ। আরও কয়েকজন স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইল।

মাস্টারমশাই প্রশ্ন করিলেন—"কে?"

"উই চম্পা—চরণদাসের বিটি—দেখোঁ তুমরা—ই মাইয়্যারা সাক্ষী রইছেঁ—"

মাস্টারমশাই আর টুলু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন; মাস্টারমশাইয়ের মুখে এক অদ্ভুত ধরনের হাসি। টুলু বোধ হয় নিতান্ত যান্ত্রিকভাবেই ফিরিয়া ওদিকে পা বাড়াইয়াছিল, মাস্টারমশাই তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন—"পাগল হয়েছ?"

পকেট থেকে একটা টাকা বাহির করিয়া দিয়া স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন—"আর নেই আমার কাছে। তুই সেই পাঁচ টাকার সঙ্গে মিলিয়ে কাপড়-জামা করিয়ে নিস।"

লিফট নামিয়া আসিল, দুইজনে গিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

॥ নয় ॥

বাহিরে আসিয়া দুইজনে গঞ্জের দিকে চলিলেন। রাত্রি বেশি না হইলেও সন্ধ্যা বেশ ভাল ভাবেই উৎরাইয়া গেছে। গভীরতা মৌন—অনেক দূর পর্যন্ত কোন কথাই হইল না দুইজনের। যেখান হইতে টিলার পথটা আলাদা হইয়া গেছে, তাহার কাছাকাছি আসিয়া টুলু প্রশ্ন করিল—"এর কোন উপায় নেই স্যার?"

কোন্‌টা যে টুলুর মনে বেশি চাপ দিবে মাস্টারমশাই এখনও আন্দাজ করিয়া উঠিতে পারেন নাই, প্রশ্ন করিলেন—"চরণদাসের মেয়েটার ব্যবহারের কথা বলছ?"

"না; ভেবে দেখলাম ওটা ভালই হয়েছে, আমিই ভুল করছিলাম। আমি বলছিলাম খনির এই সমস্ত ব্যাপারটা, আরও কত ভীষণ বোধ হয় খুঁটিয়ে দেখাও হ'ল না। বলছিলাম, বুজিয়ে দেওয়া যায় না?"

কথাটা সহজভাবেই বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বেশ বুঝা গেল এই কয়েক ঘণ্টার সমস্ত অভিজ্ঞতার আতঙ্কটা তাহার পিছনে রহিয়াছে।

মাস্টারমশাই বলিলেন—"সেটা সম্ভব নয়।...যদি সম্ভব হ'ত তো উচিতও হ'ত না টুলু।"

টুলু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"উচিত হ'ত না!"

"সভ্যতার চাকা পেছন দিকে ঘোরাতে যাওয়া অস্বাভাবিক টুলু, আর সেইজন্যে বোধ হয় ভুলও। যদিও এটাও সত্যি যে সভ্যতার গতি কুটিল।"

টুলু নির্বাকই দাঁড়াইয়া রহিল। মাস্টারমশাই বলিলেন—"একটা বেয়াড়া প্যারাডক্সের মত শোনাচ্ছে, না? বেশ, তার গতিপথের বেশ বড় বড় দুটো ল্যাণ্ডমার্ক নাও—একটা মানুষের উচ্চাশার (দুরাশারও বলা চলে) আর একটা তোমার ধর্মের। প্রথমটার নজির হিসেবে রইল ইজিপ্টের পিরামিড, আর

দ্বিতীয়টার—জগন্নাথদেবের মন্দির। ভাবতে পার প্রত্যেকটাতে কত লোকক্ষয় হয়ে থাকবে—কত বেদনা, কত দুঃখ, কত অত্যাচার, কত হা-হুতাশ ?”

আবার নীরবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। টিলার গোড়ায় দুইটি পথের সঙ্গমে আসিয়া বলিলেন—“জগন্নাথের মন্দিরের উদাহরণটাই দিই টুলু—ঠিক এই রকম, আমাদের এই সভ্যতার দেউলটাও গড়তে অনেক কিছু লাগল—দুঃখ-কষ্ট অত্যাচার-অনাচার—বোধ হয় অনিবার্য ছিল এসব। এবার দুঃখ দিয়ে তৈরি মন্দিরে দেবতা প্রতিষ্ঠার সময় এসেছে—মানুষের আনন্দ-দেবতা। আমাদের যুগের এই ব্রত, আর এই ব্রত উদ্‌যাপন করতেও খানিকটা দুঃখ আছে। সভ্যতার দেবতা আরও বেশি চান, দেউল তুলতে যা হ’ল—হ’ল, এখন তাঁর বেদী তুলতেও তো তোমাদের মতন অনেককে আত্মবিসর্জ্জন দিতে হবে।··আজ যাও, রাত হয়েছে, বেশ ক্লান্তও আছ।”

নিজে স্কুলের টিলার পথে পা দিলেন।

প্রশ্ন যাই করুক, মাটির উপর পা দেওয়া পর্যন্ত টুলুর মনে একেবারেই একটা উল্টা স্রোত বহিতেছিল। কি আনন্দ! এই মাটি, এই বাতাস, এই আকাশ প্রতি মুহূর্ত আমাদের ঘিরিয়া আছে বলিয়াই যেন ভাল করিয়া পাওয়া যায় নাই এত দিন! কত মধুর! খনির সঙ্গে খনির সমগোত্র যাহা কিছু—দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ, অত্যাচার-অনাচার সব কিছুর সঙ্গেই সম্বন্ধ ঘুচাইয়া দিল। যাহারা ইচ্ছা করিয়া জোয়াল ঘাড়ে করিবে—লোভের, মায়ার, মোহের—তাহারা তো ভুগিবেই এমন করিয়া; বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য—সবাই তো এক সুরে এই কথাই বলিয়া গেছেন। টুলু কি করিবে? না, ফিরিয়া চলো আশ্রমে, যেখানে বিরাটতর মুক্তির আলো কোন্ এক সুদূর অলক্ষ্য জগৎ হইতে আসিয়া পড়িতেছে! টুলু মনে মনে শিহরিয়া উঠিল—বুদ্ধ নিজের সন্তানের মায়াডোর ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া গেলেন, আর ও গিয়াছিল পরের সন্তানকে বুকে জড়াইতে! চমৎকার! প্রসূতি-মেয়েটির প্রশংসা করিতে হয়—নিজে মুক্ত হইয়া তাহাকে বাঁধিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল মন্দ নয়! চম্পা বাঁচাইয়াছে তাহাকে; শত ধন্যবাদ চম্পাকে।

কিন্তু কি ভীষণ জীবন! টুলু সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া আসিয়াছে—খনির সঙ্গেও,

বস্তির সঙ্গেও, তবু তাহাদের স্মৃতি হইতে যেন কোনমতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিতেছে না। মাস্টারমশাই বলিয়াছিলেন—বস্তিতে তুমি পরিণামটা দেখেছ, খনির মধ্যে তার কারণটা দেখবে। সত্যই অসহ্য জীবন—শুধু একবার একটু দেখার অভিজ্ঞতাতেই টুলুর যখন এই অবস্থা, যাহারা ভুক্তভোগী তাহারা সাদা চোখে এর উগ্রতাটা কি করিয়া বহন করিবে? চরণদাসের আবার এর ওপর আছে চম্পা,—নিজের কন্যা, খনি-জীবনের—আর তারই পরিণাম বস্তি-জীবনের গ্লানি মাখিয়া চোখের সামনে ডুবিয়া যাইতেছে। কি করিয়া দেখা যায় এ দৃশ্য? চম্পার কথা মনে হইতেই টুলুর দৃষ্টি যেন তাহার ছবিটির উপর নিবদ্ধ হইয়া গেল—প্রত্যুৎপন্নমতি—শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে দুধের জন্য ছুটিয়াছে। তাহার পর সেই ছেলেকে কাড়িয়া লওয়া! এতগুলা স্ত্রীলোকের মধ্যে—এতগুলা মানুষের মধ্যেই বলা চলে, এই মেয়েটিরই একটা ব্যক্তিত্ব আছে। তবুও কষ্ট হয়, বরং সেইজন্যই বেশি করিয়া কষ্ট।···আরও একটা কথা, চম্পাদের পরিবার ওরই মধ্যে ভদ্র, অবস্থাগতিকে নামিয়া গেছে। চরণদাসের সেই কথাগুলা সেই অবস্থাতেও টুলুর কানে বড় বাজিয়াছিল—কি করি, পেট বড় দুশমন, নইলে বোষ্টমের ছেলে—

টুলু বাড়ির দিকে গেল না, ওদিকে যাইতে পা উঠিতেছে না। বস্তি আর স্কুলটা বাদ দিয়া এই দিকেই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। জীবনে তাহার আজিকার মত অভিজ্ঞতাও হয় নাই কখনও, মন এত ভারাক্রান্তও হয় নাই। অথচ ভাবটা যেন শূন্যতার! টুলু এতদিন যাহা আশ্রয় করিয়াছিল—ধর্ম, তাহা হইতে সে স্খলিত। সত্যই পৃথিবীর এই দিকটা দেখিয়া ধর্মকে মনের একটা বিলাস বলিয়া বোধ হয়, অথচ এই ধর্ম থেকে যে মাস্টারমশাই তাহাকে স্খলিত করিলেন, তিনিও আজ টুলুর জীবন থেকে অস্তমিত। বস্তি-জীবন আর খনি-জীবনের সঙ্গে সংস্রব ঘোচানো মানেই তো তাহার জীবনে মাস্টারমশাইকেও অস্বীকার করা। ভালমন্দ সব হারাইয়া এ যেন একটা বিরাট শূন্যতা।

রাত হইয়া চলিয়াছে; নিতান্ত নিশিতে পাওয়ার মতোই টুলু নিরুদ্দেশভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তৃষ্ণা পাইয়াছে, এই অনুভূতিটা যেন খনির মধ্যে প্রবেশ

করা থেকেই ছিল, এখান ওটাকে স্বীকার করায় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া আরও একটা অনুভূতিকে স্পষ্ট করিয়া তুলিল—ক্ষুধা, অসহ্য ক্ষুধা পাইয়াছে।

টুলু একটা কাজ, একটা অবলম্বন পাইয়া যেন বাঁচিল। পকেটে হাত দিয়া দেখিল, খুচরা তিন আনা পয়সা পড়িয়া আছে। হনহন করিয়া গঞ্জের দিকে চলিল। দোকান প্রায় সব বন্ধ হইয়া গেছে, অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া একটা মুড়ি আর ফুলুরি-বেগুনির দোকান পাওয়া গেল; দোকানী বুড়ী ঝাঁপ ফেলিবার ব্যবস্থা করিতেছে।…আহার্যের অপূর্ণতা জলে মিটাইয়া টুলু আবার ফাঁকায় আসিয়া দাঁড়াইল।…মুখে একবার একটু হাসি ফুটিল—চমৎকার! খনি-বস্তি-জীবনের যেন ছোঁয়াচ লাগিয়াছে, খাবার যা জুটিল তাহাও নেশার চাট্। বাঃ, জীবনে অপূর্ব একটি রাত্রি দেখা দিয়াছে, চিরদিন মনে থাকিবে।

তবু চিন্তাটা একটু স্বচ্ছ হইল, টুলু এটা বেশ বুঝিতে পারিল যে, দুই দিক ছাড়িয়া বাঁচা চলিবে না। আর এটাও ঠিক যে আশ্রম অচল, মাস্টারমশাইয়ের একটি কথাও ভুল নয়—ও-জীবন নিজের শঠতায় আরও ভয়ঙ্কর। তবে?—আবার মাস্টারমশাইয়ের শরণাপন্ন হইবে?

হঠাৎ যেন একটা বিদ্যুৎবিকাশে টুলুর মনটা দীপ্ত হইয়া উঠিল—পাওয়া গেছে—পাওয়া গেছে! মাস্টারমশাইয়ের পা জড়াইয়া বলিবে, আমায় অন্য পথ দেখান—চম্পার মত সর্পিণী যে পথ আগলে বেড়াচ্ছে, সে পথে আমায় দেবেন না ছেড়ে।…বোধ হয় এত করিয়া বলিতেও হইবে না, আজকের ব্যাপারের পর তিনি বোধ হয় তাহার জন্য অন্য পথ বাছিয়াও রাখিয়াছেন। জানিয়া বুঝিয়া কে সাপের মুখে ফেলিয়া দিতে পারে একজনকে—অতি-বড় শত্রু না হইলে?

টুলু স্কুলের পথ ধরিল।

টিলায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মত গেল বদলাইয়া। এত সত্ত্বেও মাস্টারমশাই যদি সেই বস্তির কথাই ধরিয়া থাকেন? আর সেইটেই বেশি সম্ভব নয় কি?—মাস্টারমশাইকে তো এতদিন দেখিল…

মনটা উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে—আজ একটা কিছু স্থিরনিশ্চয় করিয়া লইতেই হইবে। মনের আলোড়নেই একবার সিদ্ধবাবার কথাটা হঠাৎ উপরে আসিয়া পড়িল। টুলু একেবারে দাঁড়াইয়া পড়িল—একটা ছবি একেবারে যেন প্রত্যক্ষ

করিয়া চোখের সামনে ওই তুলিতেছে—নদীর ধার—লতায় ফুলে সাজানো একখানি বাড়ি—তার দোতালার প্রশস্ত বারান্দায় কম্বলের উপর একটি কৃষ্ণাজিনে সিদ্ধবাবা বসিয়া—গৌর কান্তির উপর সকালের আলো আসিয়া পড়িয়াছে—দীর্ঘায়ত চোখে অপরিসীম শান্তি আর প্রসন্নতা—বিনা আয়াসেই যেন তাহা হইতে প্রসন্নতা ঝরিয়া পড়িতেছে।...টুলুর চোখ দুইটি ছলছল করিয়া উঠিল—সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়া তাহার মন যেন বলিয়া উঠিল—না, আমায় মার্জনা কর, আমায় বাঁচাও; আমার যা পথ তা তোমার ঐ স্নিগ্ধ প্রসন্ন দৃষ্টির নিচে; আমি বুঝেছি; অনেক দেখে, অনেক ভুগে, অনেক সংশয়ের পর আমি শেষ বারের মত চিনেছি তোমায়, হে দেব, আমায় ডেকে নাও, আমায় উদ্ধার কর...

একটা অদ্ভুত শক্তি আসিয়া গেছে। সমস্ত দিনের ক্লান্ত পা দুইটায় যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ নামিয়াছে, মনটা এক মুহূর্তেই হইয়া উঠিয়াছে বকের পাখনার মতই হালকা—যেন কাহার আশীর্বাদেই। টুলু চড়াই ঠেলিয়া উঠিতেছে, যেন ঢালু বাহিয়া নামিয়া যাইতেছে—মনটা চলিয়াছে আগে আগে, তাহার সঙ্গে পাল্লা দেওয়াই যেন দায় হইয়া উঠিয়াছে।...স্কুলের সামনে আসিয়া পায়ের জুতা দুইটা খুলিয়া লইল—ঘর্ষণের শব্দে যদি মাস্টারমশাইয়ের ঘুম ভাঙিয়া যায়—যদি জাগিয়াই থাকেন মাস্টারমশাই!

স্কুল অতিক্রম করিয়া আবার জুতা জোড়াটা পায়ে দিয়া টুলু হনহন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কত রাত হইবে?—ঘড়ি নাই, তবে কতকগুলা নক্ষত্রপুঞ্জের সংস্থান দেখিয়া বুঝিতে পারিল, প্রায় মধ্যরাত্রি—আজকাল অনেকগুলাকে চেনে। একটা কথা মনে পড়িয়া টুলুর একটু হাসি ফুটিল—মাস্টারমশাই একদিন বলিয়াছিলেন—টুলু, রাত্রির গভীরতার সন্ধান না পেলে মানুষে জীবনের গভীরতার সন্ধান পায় না।...বড় খাঁটি কথা, এই কটা দিনের অভিজ্ঞতা লইয়া কত বিনিদ্র রাত্রিই না তাহার কাটিল! কি গভীরভাবেই না সে দেখিল জীবনকে! নিজেই অনুভব করে বয়সের গণ্ডী ছাড়াইয়া সে যেন কত দূর আগাইয়া গেছে—কত দূর!—কত দূর!...

স্কুলটি ডান দিকে রাখিয়া রাস্তাটা নামিয়া গেছে তাহার পর আবার ধীরে ধীরে একটি টিলার উপর উঠিয়াছে; প্রায় স্কুলের টিলার মতোই উঁচু, মাঝের ব্যবধানটুকু

প্রায় আধ মাইল হইবে। এইখানে আসিয়া কি ভাবিয়া টুলু একবার ফিরিয়া চাহিল। খনিচক্রের অসুস্থ আলোকবিন্দুগুলা টিলার অন্তরালে অবলুপ্ত হইয়া গেছে—একটা দুঃস্বপ্নের মতোই। মাস্টারমশাইয়ের বাসার মাথাটা কিন্তু দেখা যায় ; আর ঐ ছায়ালিপ্ত কাঞ্চন গাছ। ঐটুকুকেই আশ্রয় করিয়া এক মুহূর্তে সব যেন আবার জাগিয়া উঠিল—খনিচক্র, দূষিত ক্ষতের মতো সর্বাঙ্গে তাহার রাঙা দাগ—বস্তি—খনি—চম্পা—চরণদাস, অন্ধকার গহ্বরে, যমের মুঠার চাপের মধ্যেই সেই মরা প্রসূতি—হীরক—মাস্টারমশাই। সমস্ত মনটা যেন মোচড় দিয়া উঠিল,—সে ছাড়িয়া আসিল ?—সে ঐ পূতচরিত্র অনাড়ম্বর সন্ন্যাসীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নয় ?—কালই তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া চরণদাসের হাতের রান্না খাইতে রাজি হইয়া সে যুগ-যুগের একটা সংস্কার ভাঙিয়া বাহির হইয়া আসিল, তাহার পিছনে কি একটা নূতন ব্রতগ্রহণের প্রতিজ্ঞা ছিল না ?

টুলু অনেকক্ষণ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া ভাবিল।···এক সময়ে সে আবার স্কুলের দিকে পা বাড়াইল। কিন্তু কয়েক পদক্ষেপ মাত্র, তাহার পর আবার দাঁড়াইয়া পড়িল। মাথার মধ্যে যেন একটা ঝড় বহিতেছে। কি সর্বনাশ !—এই রকম অনিশ্চিত মন লইয়া সমস্ত রাত এই দুইটি টিলার মধ্যে ঘড়ির মতো তাহাকে এদিক ওদিক করিয়া কাটাইতে হইবে নাকি ?

সমস্ত শক্তি দিয়া টুলু আবার ফিরিল—অস্ফুট অথচ স্পষ্ট স্বরেই ব্যাকুলভাবে যেন সামনে কাহার মুখ চাহিয়া বলিল—"আমায় বাঁচাও এ জীবন আমার নয়। হে গুরুদেব, টেনে নাও আমায় তোমার পানে—তোমার সমস্ত তপোবল প্রয়োগ ক'রে টেনে নাও—হে অন্তর্যামী সিদ্ধপুরুষ !"

এই দ্বিতীয় টিলা পার হইয়া টুলু আবার একটা উৎরাই ধরিয়া বালিয়াড়ি পথে নামিতে লাগিল ; একবার ঘুরিয়া দেখিল প্রথম টিলাটি পর্যন্ত অন্তর্হিত। 'আঃ !' বলিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল, তাহার পর যে সময়টা নষ্ট হইয়াছিল সেটাকে পর্যন্ত উসুল করিয়া লইবার জন্য গতিবেগ আরও বাড়াইয়া দিল।

সঙ্গে সঙ্গেই আকাশে বাতাসে একটা মধুর বিপর্যয় ঘটিয়া গেল ; একেবারে দিক্‌রেখার ওপর একটা কালো মেঘের ফালি ছিল, সেইটার অন্তরাল হইতে কৃষ্ণা-সপ্তমীর চাঁদ একেবারে আকাশের খানিকটা উপরে উঠিয়া চারিদিক একটা

অর্ধস্ফুট জ্যোৎস্নায় ডুবাইয়া দিল; এই জ্যোৎস্নার মতোই নিতান্ত যেন কোথা থেকে একটি মৃদুসমীরণ উঠিয়া চারিদিকে একটা পুলক-শিহরণ জাগাইয়া তুলিল, আর সব চেয়ে যা আশ্চর্য—অপার্থিব গন্ধ! ফুলের কথা তো দূরে, একটি তৃণ পর্যন্ত দেখা যায় না কোথাও সেই রুক্ষ ঊষর পাহাড়ের গায়ে, কিন্তু মনে হইতে লাগিল যেন কে কোথায় অলক্ষ্যে সমস্ত নন্দনকাননটা তুলিয়া আনিয়া বসাইয়া দিয়াছে।

টুলুর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চ দিয়া উঠিল। হে প্রভু, চিনেছি তোমায়, এই মেঘান্তরিত জ্যোৎস্নার মতোই আমার সংশয়াকুল দৃষ্টিকে তুমি স্বচ্ছ ক'রে দিয়েছ—এই আমার ফেরার পুরস্কার, এই তোমার আহ্বান। এত তোমার করুণা?—এমন ক'রেই কি নিতান্তই তোমার এই অকিঞ্চন ভক্তটির দিকে দৃষ্টি দিয়ে আছ?—তা হ'লে তুলে নাও আমায় আমার অন্তরের সমস্ত গ্লানি থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে—আমার এই একটা দিনের সমস্ত পাপ ধুয়ে ফেলে। হে প্রভু, আমি আসছি—তোমার এই আশীর্বাদ সর্বাঙ্গে মেখে, নন্দনগন্ধস্নাত হয়ে আমি এখুনি এসে উপস্থিত হচ্ছি তোমার রাতুল চরণতলে···

একটি পরম নির্ভরতা, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, আর প্রগাঢ় ভক্তিরসে টুলুর চক্ষু দুটি সজল হইয়া উঠিল। এত হালকা শরীর—টুলু মাটির স্পর্শ যেন অনুভবই করিতেছে না। যতই অগ্রসর হইতেছে গন্ধটা ততই স্পষ্ট, বাতাসটা যেন আরও উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। ডান দিকে টিলাটা একেবারে খাড়া, সামনে কয়েক হাত পরে একটা বাঁক—কেমন যেন মনে হইতেছে বাঁকের ওদিকেই তাহার জন্য আরও অপূর্ব একটা কি অপেক্ষা করিতেছে—গুরুদেবের আরও বড় একটা করুণা, আরও সুমিষ্ট একটা আহ্বান।

টুলু আরও পা চালাইয়া দিল—কি জানি, এ সব দৈব জিনিস যেমন হঠাৎ আসে তেমনি হঠাৎই মিলাইয়া যায় যে···

মোড় ঘুরিয়াই দেখিল, অল্প দূরে একটি স্ত্রীলোক।···এত রাত্রে, এই জায়গায়! আগেকার পুলক আবেগের ঝোঁকেই টুলু যেন হনহন করিয়া আগাইয়া গেল, তাহার পর তাহার সারা শরীরের রক্ত যেন একযোগে সমস্ত ধমনী বাহিয়া

নামিয়া গেল। চম্পা! আর তাহার সামনে আর একটি স্ত্রীলোক—মাঝবয়সী, গেরুয়াপরা; টুলু তাহাকে একদিন সিদ্ধবাবার আশ্রমে হাতে কি একটা পাত্র লইয়া একটা ঘরে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিল···বালিয়াড়িতে যাইতেছে, এদিকে পিছন। চম্পার কবরী বেড়িয়া একটি টাটকা বেলফুলের মালা—তার গন্ধের সঙ্গে কি একটা মিষ্ট এসেন্সের গন্ধ মিলিয়া তাহার চারিদিকের হাওয়াটাকে যেন মাতাল করিয়া তুলিয়াছে। পরনে একটি পরিষ্কার শাড়ি, এইটিই বোধ হয় প্রথম দিন দেখিয়াছিল।

টুলুর নন্দনকানন এক মুহূর্তেই মিলাইয়া গেল।

সমস্ত মনটা যেন তোলপাড় করিয়া উঠিতেছে। প্রথমটা ভাবিল অপরিজ্ঞাত থাকিয়াই চুপি চুপি ফিরিয়া যায়। তাহার পর হঠাৎ কি মনে হইল, ত্বরিত পদে আগাইয়া গিয়া বেশ স্পষ্ট, কতকটা রূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"তোমরা কোথায় যাচ্ছ?"

দুই জনে ফিরিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার পর চম্পা মুখটা একটু নিচু করিয়া রাস্তার এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। অপর স্ত্রীলোকটি স্থির দৃষ্টিতে টুলুর মুখের পানে একটু চাহিয়া রহিল, একটু পরেই তাহার মুখে একটা হায়াহীন দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল, স্পষ্ট কণ্ঠে উত্তর করিল—"কেন? সিদ্ধবাবার আশ্রম।"

আজ বিস্ময়ের উপর বিস্ময় উপলব্ধি করার দিন টুলুর: চম্পা পর্যন্ত আগাইয়া আসিল, প্রবল লজ্জার ঘোরটা কাটিয়া গেছে। বেশ সোজাভাবে মুখ তুলিয়া খুব অল্প একটু হাসির সঙ্গে বলিল—"কেন, আশ্রম পুরুষদেরই একচেটে নাকি?"

একটা ঝোঁকে একটু চৈতন্য হইয়াছিল, টুলুর শরীর-মন আবার যেন অসাড় হইয়া গেল।···আলো নাই—যে-গন্ধ দূর থেকে এত স্পষ্ট ছিল, নাকের নিচে আসিয়া তাহা একেবারে বিলীন—বিলীন, না বীভৎস?—চারিদিকে যেন নর্দমা—আশ্রমের নর্দমার সঙ্গে বস্তির নর্দমা মিশিয়া গেছে কি করিয়া? কি করিয়া?···

টুলুর আবার যখন সম্বিৎ হইল—দেখে দুই জন খানিকটা দূরে আগের চেয়ে লঘু গতিতে আবার আগাইয়া যাইতেছে।

একটু কি ভাবিল, তাহার পর আবার দ্রুত কম্পিত চরণে অগ্রসর হইল। এবার স্ত্রীলোকটি আর চম্পার মাঝামাঝি দাঁড়াইয়া চম্পার পানে মুখ ফিরাইয়া কঠিন স্বরে বলিল—"তুমি যেতে পারবে না ওখানে।"

চম্পারও মুখটা কঠিন হইয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল—"কেন?"

"নরক…"

"স্বর্গ কোথায় পাব আমি?"

টুলু একটু ভাবিল, তাহার পর হঠাৎ যেন মনে পড়িয়া গেছে এই ভাবে দ্রুত কণ্ঠে বলিল—"হ্যাঁ-ইয়ে-বনমালী-স্কুলের চাকর, সে তোমার ঠাকুরদাদা নয়?—তার ভয়ানক অসুখ—স্কুল থেকেই আসছি আমি…"

এমন কথাটার উত্তর যে তাহার মূঢ়তায় সেটা নিজেই যেন শেষের দিকে এলাইয়া গেল।

চম্পার মুখটা কিন্তু নরম হইয়া আসিল, স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া শুনিতেছিল, একটু স্পষ্ট করিয়া হাসিয়াই বলিল—"স্বর্গের দরজাতেই মিথ্যে?…বেশ, চলুন, যাচ্ছি।"

ফিরিয়া স্ত্রীলোকটিকে বলিল—"তাঁকে আমার প্রণাম দিয়ে দেবেন তা হ'লে।"

॥ দশ ॥

রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহরে মাস্টারমশাইয়ের রাস্তার দিকের জানালায় ঘা পড়িল, প্রশ্ন হইল—"স্যার ঘুমোচ্ছেন?"

সাড়া পাওয়া গেল না। টুলু আরও কয়েকবার ডাকিল, প্রতিবারেই গলা একটু বেশি উঁচু করিয়া। খোলা জানালার গরাদে মুখটা চাপিয়া লক্ষ্য করিতেছে, একটা ছোট্ট গলা-খাঁকারির শব্দে চমকিয়া ফিরিয়া চাহিতে দেখে, বনমালী দাঁড়াইয়া। একটা চাবি বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"কেন আজ্ঞে।"

টুলু ঘাড়টা একটু পিছনে টানিয়া লইয়া দেখিল, সদর-দরজায় তালাবন্ধ। অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"মাস্টারমশাই নেই?"

বনমালী মাথা নাড়িল।

"নেই মানে ?···আমার সঙ্গে টিলার নিচে পর্যন্ত এলেন। গেছেন কোথায় ?"

বনমালী খুব বুদ্ধিমানের মতো ঠোঁট বাঁকাইয়া একটু হাসিল ; একটা চোখ একটু বুঁজাইয়া নিজের মাথার ডান দিকে তর্জনী দিয়া গোটা কতক টোকা মারিল, তাহার পর হাসিসুদ্ধ এই সমস্ত ইঙ্গিতটুকুর টীকা-স্বরূপ বলিল—"একটু ক্ষ্যাপা আঁছে বটে ; এই আচে, ঘুর‍্যে দেখো···"

"নেই"—কথাটার জায়গায় একটা টুসকি বাজাইয়া দিল। আবার চাবিটা বাজাইয়া বলিল—"লেন আজ্ঞে।"

টুলু অন্যমনস্ক ভাবে বলিল—"খোল দরজাটা।"

ঘুরিয়া সামনের দিকে চাহিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। চিন্তার যেন কোন সূত্রই ধরিতে পারিতেছে না। এই কয়টা দিন ধরিয়া সমস্ত ব্যাপারগুলা যেন একটা ভোজবাজি।···মাস্টারমশাই নাই—এর অর্থ কি ?—সব-কিছুর গোড়ায় যে তিনি, তাঁহারই ভরসায় টুলু আজ সবচেয়ে দুঃসাহসের কাজ করিয়া বসিয়াছে—বিষধরা সর্পিণীকে সঙ্গিনী করিয়া ফিরাইয়া আনিয়াছে। এ আবার কি নূতন সমস্যায় পড়িল এখন ?

বনমালী তালা খুলিয়া দরজার পাল্লা দুইটা ভিতরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া দুই পা আগাইয়া আসিল—"চলেন আজ্ঞে। টেলিগেরাম এল, উই সুদ্দু সেক্কেটিরি বাবুর কাছে ছুটির দরখাস্ত নিয়ে গেলুম···

"ক'দিনের ছুটি ?"

বনমালী সে কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। মাথাটা বার দুই চুলকাইয়া, তাহাতে একটা ছোট্ট ঝাঁকানি দিয়া বলিল—"তা কি বললেক ? ফির‍্যা দেখি দুয়ার বন্ধ, তালার মধ্যে চাবিটি। আর একবার এই রকমপারা চ'লে গেল বটে···পাঁচ দিন···"

মাথাটা একটু নিচু করিয়া কয়েকবার ডাইনে বাঁয়ে নাড়িয়া দিল—অর্থাৎ গতিক বেশ ভাল নয়, লোকটির মাথায় আছেই কিছু গোলমাল।

টুলু প্রশ্ন করিল—"তা তুমি সেক্রেটারিবাবুকেই জিজ্ঞেস করলে না কেন ?"

বনমালী একটু বিরক্ত হইল, বলিল—"তুমি কথাটি বুঝোক নাই বাবুমশয়, সেক্কেটিরি বাবু ছিলোক নাই। উর চাকরকে দিয়ে আলুম।···কথাটি তুমি বুঝোক নাই।"

একবার বাহিরের দিকে পা বাড়াইয়া তখনই ফিরিয়া নিজের কোমরের কাপড় হইতে একটা চিঠি বাহির করিয়া বলিল—"আর ই লেন, আপুনারও একখানা চিঠি ছিলোক।"

দিয়া বাহির হইয়া গেল।

টুলু খামের মধ্যে থেকে চিঠিটা বাহির করিয়া দেখিল—ছুটির দরখাস্ত বনমালীকে ডাকিল, কিন্তু তখন সে চলিয়া গেছে।

ভিতরে গিয়া টুলু মাস্টারমশাইয়ের বিছানাটি পাতিয়া লইয়া হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। একেবারে চিন্তার অতলে ডুবিয়া গেছে। বনমালী নিজের থেকে দেশলাই আনিয়া আলোটা জ্বালিল, ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রশ্ন করিল—"পাক হবেক আজ্ঞে?"

প্রশ্নটা আরও একবার করিল, কোন উত্তর না পাইয়া মাথায় দুইবার টোকা মারিয়া মাথাটি দুলাইতে দুলাইতে চলিয়া যাইতেছিল—অর্থাৎ টুলুরও মস্তিষ্কে কিছু গোলযোগ আছে। কপাটের বাহিরে পা দিতে টুলু প্রশ্ন করিল—"আমায় কিছু বললে বনমালী?"

বনমালী ঘুরিয়া প্রশ্ন করিল—"পাক হবেক আজ্ঞে?"

"না, আমি খেয়ে এসেছি। আর রাতও তো ফুরিয়ে এল, এখন রান্না চড়ালে···ঠিক কথা, বনমালী, ভুলেই যাচ্ছিলাম, তুমি চিঠির গোলমাল করেছ।"

বনমালী রগ চুলকাইতে চুলকাইতে বিমূঢ় ভাবে চাহিয়া রহিল। টুলু বলিল—"এটা দরখাস্ত, আমার চিঠিটা তুমি চাকরের হাতে দিয়ে এসেছ।"

"এই কথাটি আছেঁ? তা সকালে উকে দরখাস্তটি দিয়ে এলেই উ তোমার চিঠিটি দিয়ে দিবেক, এত ভাবনা কেন গো? চিঠি লিয়ে করবেক কি সে?"

ওর সমস্যা-সমাধানের ভঙ্গিতে টুলুর একটু হাসি পাইল, কিন্তু সেটা চাপিয়া বলিল—"ও যাক্, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলাম···"

"বলুন আজ্ঞে।"

"চরণদাসের মেয়ে···মানে, চরণদাস তো তোমার ছেলে হয়, না?"

"ছেলে হয় আজ্ঞে, উর মেয়ে চম্পা আমার লাতনি বটে।"

"আমি চরণদাসের কথা জিজ্ঞেস করছিলাম।"

"ছেলে বটে বাবুমশয়, ছেলে বটে।"

বনমালী চৌকির পাশে হাতের বেড়ে দুই হাঁটু জড়াইয়া উবু হইয়া বসিল; রেকর্ড বাজিয়া চলিল—"চরণদাসের ছেলে বটে আজ্ঞে, আর ভাল ছেলে বটে। উ এমনটি ছিলোক নাই। ইয়া বুকের ছাতি, ইয়া হাতের কব্জি—আমি চরণদাসের মাকে বুলতাম—তুর ছাওয়াল সিংহীর বাচ্ছা বটে গো। উর মা বুলত—তুর নজর গ'লে যাক, আমার ছাওয়ালকে খুঁড়ছিস মিন্‌সে।...উ রস ক'রে বুলত আজ্ঞে—উর মা মাইয়াটি ছিল খুব ভালো, আমায় ভাবতাটির পারা পতিভক্তি করত। রস ক'রে বুলত—তুর নজরটি গ'লে যাক্ মিন্‌সে...হি-হি...মাইয়াটি ছিলোক খুব ভালো আজ্ঞে। সিটি যত্তোদিন বেঁচে ছিলোক চরণকে খনির মধ্যি ঢুকতে দিলেক নাই। আমায় বুলত—তু এ দুশমনের চাকরি থেকে খালাস হ, আমি আমার চরণকে ফিরিঁয়ে লিয়ে গিয়ে আবার রাইগাঁয়ে সংসারটি পাতবোক। আমার ক্ষেত, আমার গরু-বাছুর পাঁচ ভূতে ভোগ করছেক, চরণ আমার আবার কেড়ে লিবেক।...কথাটা বুঝলেক নাই বাবুমশয়?—সিটি বহুৎ-বহুৎ দিনের কথা আজ্ঞে—লোতুন খনি হৈছেঁ—আড়কাটিরা টিপসই করিয়ে আমাদের ঘর থেকে লিয়ে এল আজ্ঞে—হপ্তাঁয় হপ্তাঁয় অ্যাত্তো ট্যাকা পাবিক—এ-রকম আরামে থাকবিক—লগদ দু'কুড়ি ক'রে ট্যাকা হাতে দিলেক আজ্ঞে—রাইগাঁ থেকে আমাদের পাঁচ জনকে ফুসলে লিয়ে এলেক—আমি, বিরিঞ্চিদাস, চন্দন বৈরিগির ছাওয়াল নিতাই, মাখন হাজরা আর অভিরাম। অভিরাম আর বিরিঞ্চি ছ'মাসের মধ্যি মারা গেলোক আজ্ঞে।...টিপসই করা কাজ কিনা বাবুমশায়!—চরণের মা বললেক—তু খালাস হ, আমি আমার চরণকে রাইগাঁয়ে লিয়ে গিয়ে আবার সংসারটি পাতবোক। আমি খালাস হবার আগে উ নিজে খালাসটি হ'ল আজ্ঞে। আমি চরণদাসকে কইলাম—'তুর মা রাইগাঁয়ে ফিরলেক না রে, চরণ, রাইমণির পাঁয়ে ফিরে গেলোক। সবাই বললেক—বনমালী, ধৈরয ধরো, আবার বিয়া করো। আমি বুললাম—এ যে কি পুত্রশোক তোমরা বুঝবেক না রে ভাই।...উর মা থাকতে কোন বিটা সাহস করত নাই বাবুমশয়। একবার ম্যানেজারবাবু নিয়েছিল চরণের টিপসই, মাগী সিংহীরপারা আপিস চড়াও হয়ে পাট্টা ছিঁড়িয়ে ছাওলের হাত ধ'রে বাড়ি লিয়ে এল—উই একাশি সনম। উর

মা যেতে আমারও মাজা ভেঙে গেলোক, উকে দিয়ে টিপসই করালোক। চেহারার ওপর বরাবর নজোর ছিলোক আজ্ঞে, উকে লোতুন সুড়ঙে দিতে লাগলোক। চন্দনের বিটী নক্ষীর সঙ্গে উর বিয়া দিলাম। নামে নক্ষীটি, কাজেও নক্ষীটি বটে। লোতুন সুড়ঙের কাজ কঠিন মেহনতের কাজ, নেশা করিয়ে ছাড়েক আজ্ঞে। তা নক্ষী যত্তোদিন বেঁচে ছিলোক নেশাটি ক'রে ঘরে ঢুকতে দিলেক নাই, নামে নক্ষী, কাজেও নক্ষী বটে। বলত, তু নেশা ক'রে ঘরে ঢুকলে ঝাঁটার চোটে তুরসাত পুরুষের নেশা ছুটিয়ে দিব বটে—হুঁ! আমি সে বাপের বিটীটি নয়! নিজের কানে শোনা আজ্ঞে। দু'কম বিশ বছর বেঁচে ছিল নক্ষীটি, দুটি ছাওয়াল দিলেক, আর উই চম্পা গঞ্জড়ি'তে মিশনরা তিনটি বছর মাইয়া স্কুল বসালেক, চম্পা দুটি বছর পড়লেক আজ্ঞে। তারপর ছাওয়াল দুটি মারা গেলেক, নক্ষীটি—তারপর—চ—র—ণ—দা—স এ—ক— দিন...”

কথাগুলি ধীরে ধীরে টুলুর কানে মিলাইয়া গেল।

একটি মৃদু উত্তাপের স্পর্শে আবার এক সময় জাগিয়া উঠিল। খোলা জানালা দিয়া প্রভাত-সূর্যের কিরণ মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। বনমালী ঠিক একই ভাবে তাহার রেকর্ড ঘুরাইয়া চলিয়াছে—“আমি বুললাম তা বিটীকে তু ইস্কুলে দিতে গিছলি ক্যানে? আমাদের চাষাভুষাদের মাইয়া ইস্কুলে গেলে বেয়াদপি শিখবেক না তো শিখবেক কি গো?”

আবার চোখ দুইটা বুজিয়া আসিল টুলুর। অসম্পূর্ণ নিদ্রার জড়তায় কথাগুলা একবার স্পষ্ট হইয়া আবার অস্পষ্ট হইয়া গিয়া একটা অলস সঙ্গীতের সৃষ্টি করিতেছে। এখন চম্পার কথাই চলিতেছে। রাত্রের কথাগুলা আবছা আবছা মনে পড়িতেছে—লক্ষ্মীর শাসন—চম্পার মিশন স্কুল—লক্ষ্মীর মৃত্যু—তাহার পর চরণদাস হঠাৎ যেন এদিকে কি একটা করিয়া বসিল।

টুলু জড়তাটা জোর করিয়া ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া উঠিয়া বসিল, বলিল—“বনমালী, একটু জল তুলে দিতে পার আমায়? মুখ হাত ধুয়ে আমি একটু চান ক'রে নিই; ঘুম হয় নি, শরীরটা বিশ্রী হয়ে রয়েছে।”

“তা দিবোক, দিবোক নাই ক্যানে গো?”—বলিয়া বনমালী উঠিয়া গেল। টুলু বিছানার উপর বসিয়া বসিয়াই আবার ভাবিতে লাগিল; কাল সমস্ত দিনের

ঘটনাগুলা একে একে মনে পড়িতে লাগিল ; কতকগুলা একেবারে নূতন ধরনের অভিজ্ঞতায় ঠাসা—এমন একটা দিন জীবনে আসে নাই, বিশেষ করিয়া বালিয়াড়ির পথের অভিজ্ঞতা—গভীর রাত্রে। উঃ! মাস্টারমশাই একদিন বলিয়াছিলেন—টুলু, আমাদের ধর্ম থেকে অভিসার কথাটা যদি তুলে দেওয়া যায় তো সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বাঁকা মেরুদণ্ড অন্তত আধাআধি সোজা হয়ে ওঠে। যাক্, একটু দরকার ছিল প্রত্যক্ষ করা। টুলু ফিরিয়াছে একেবারেই ; কিন্তু পথ যে একেবারে অন্ধকার। কি করিবে সে ? কোথায় আরম্ভ করিবে ? মাস্টারমশাই এ কি করিলেন ?

চিন্তাটা এক সময় অবসন্ন হইয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল ; অনিদ্রাদুর্বল মস্তিষ্ক জটিল চিন্তাটাকে যেন বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারিল না। বনমালী দুই বালতি জল আনিয়া উঠানে রাখিল ; ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্নানের বন্দোবস্ত করিতেছে। টুলু অন্যমনস্ক ভাবে তাহার শরীরটার দিকে চাহিয়া রহিল—মাঝাটা খুব সরু, নিচের দিকটাও ছিমেই বলিতে হয় ; কিন্তু মাঝার উপরেই পাঁজরা বুক আর কাঁধ লইয়া শরীরের সমস্ত অংশটা ধীরে ধীরে খুব চওড়া হইয়া গেছে, বয়সের ভারে একটু বাঁকা। রঙটা অল্প একটু লালচে ; সর্বসাকুল্যে বনমালী যেন একটি গোখরো সাপের চক্র।

মুগ্ধ নেত্রে টুলু অলসভাবে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। অজ্ঞাতসারেই একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল,—বয়সের অনুপাতে চক্রটা ঢের বেশি শিথিল।—খনির জীবন—তাহার উপর চরণদাস—তাহার উপর আবার চম্পা...

চিন্তার মোড় ঘুরিল। মাস্টারমশাই একটা চিঠি দিয়া গেছেন, সেক্রেটারির কাছে আছে। টুলু একটু যেন আলোর আভাস দেখিতে পাইল। বনমালী গিয়া চিঠিটা আগে বদলাইয়া লইয়া আসুক।

স্নানের ব্যবস্থাটা ঠিক হইয়া গেলে বলিল—"আমি ততক্ষণ নেয়ে-টেয়ে নিচ্ছি বনমালী, তুমি এক কাজ কর, দরখাস্তটা দিয়ে আমার চিঠিটা নিয়ে এস সেক্রেটারিবাবুর কাছ থেকে ; কতক্ষণ লাগবে বল দিকিন ?"

বনমালী রগ চুলকাইতে লাগিল। পথের দীর্ঘতার হিসাব করিয়া লইয়া তাহার সঙ্গে নিজের চলার আন্দাজ এবং তদুপরি সময়ের আন্দাজ মেলানো একটু

সময়সাপেক্ষ তাহার পক্ষে, বেশ একটু আয়াস-সাধ্যও। টুলু সেই সময়ের মধ্যে একটু চিন্তা করিয়া লইল। নিজে গেলে কেমন হয়? কিছু দরকার হইলে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে পারে। কি দরকার অথবা কিছু দরকার আছে কি না, সেটা টের পাওয়া যাইবে ওখানেই মাস্টারমশাইয়ের চিঠিটা পড়িয়া—কি ধরনের চিঠি—মাস্টারমশাই কি সব কথা লিখিয়াছেন তাহা বুঝিয়া।

আসল কথা টুলু একবার দেখিতে চায় লোকটিকে। টুলু ঠিক করিয়াছে মাস্টারমশাই চিঠিতে কিছু নির্দেশ দেন বা না দেন, তিনি না আসা পর্যন্ত কোন একটা হালকা কাজ লইয়া থাকিবে—যেমন চরণদাসের সঙ্গে দেখা করিয়া আস্তে আস্তে নেশা থেকে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা। এতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আজ না থাক্, খনি-বস্তি লইয়া কাজ করিতে গেলে একদিন সংঘর্ষ হয়তো অবশ্যম্ভাবী। এই লোকটাকে দেখিয়া রাখিতে ইচ্ছা হইতেছে।

আর চরণদাসকে একটু কথা বুঝিবার মতো অবস্থায় পাইতে হইলে খনিতে দেখা করা ভিন্ন তো উপায় নাই। তার জন্য ম্যানেজারের হুকুম দরকার। পরিচয় নাই, শুধু শুধু হুকুমের জন্য যাওয়াটাও অস্বস্তিকর। চিঠির গোলমালটি বেশ একটা সুযোগ দিয়েছে।

টুলু বলিল—"থাক্, আমি নিজেই যাচ্ছি বনমালী। তুমি এক কাজ কর; মাস্টারমশাইয়ের ভাঁড়ার খোলা আছে?"

বাসার চাবির সঙ্গে আর একটা চাবি বাঁধা ছিল, বনমালী কোমরের ঘুনসি হইতে খুলিয়া বলিল—"ই চাবিটি ভাঁড়ারের আছেঁ বটে।"

"দেখো তো কি আছে; রুটি, পরোটা, হালুয়া, যা হয় কিছু ক'রে দাও একটু। না হয় কাঠ-খোলায় দুটো চাল ভেজেই দাও, একটু তাড়াতাড়ি।"

॥ এগারো ॥

বনমালী আয়োজনটা তাড়াতাড়িই করিয়া দিল, টুলুর জলযোগ শেষ হইলে কিন্তু বেশ একটু দেরি করিয়াই যাইতে পরামর্শ দিল, বলিল—"ম্যানেজারবাবু উঠেন অনেক বেলায়।" টুলু যখন পৌঁছিল তখন প্রায় নয়টা।

হলদে রঙ-করা অ্যামেরিকান ফ্যাশানের দোতলা বাড়ি, দেয়াল, আলসে প্রভৃতির প্রান্তগুলায় কালো বর্ডার টানা। গাড়ি-বারান্দায় একটা মোটর দাঁড়াইয়া আছে। বাড়ি থেকে একটুখানি সরিয়া দুটি বড় বড় ঘর, বাড়ির সঙ্গে করিডোর দিয়া সংযুক্ত। এরই একটি বাড়ি আপিস-ঘর, সকালের দিকে ম্যানেজারবাবু এইখানেই কাজ করেন; দেখা-সাক্ষাৎ, নালিশ-ফরিয়াদ—সে সবও এইখানেই সম্পন্ন হয়। টুলু খবর লইয়া জানিতে পারিল একটু আগে নামিয়াছেন।

ঘর দুইটার চারিদিকেই খানিকটা করিয়া বারান্দা। সামনের বারান্দায় কড়া রোদ আসিয়া পড়িয়াছে। ঘরের সামনেই খসখস দিয়া খানিকটা ঘেরা, দরজায় একটা সবুজ পর্দা টাঙানো। বারান্দা থেকে একটু সরিয়া একটা মাঝারি-গোছের আমগাছ, তাহার ছায়ায় দাঁড়াইয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—একটা লোক খুঁজিতেছে, যাহাকে দিয়া খবরটা দেওয়া যায়। ঘরের ভিতরে ভারি গলায় কে কথা কহিতেছে। নিশ্চয় ম্যানেজার।

মনে হইলে, এদিকটায় রোদ, আর্দালি-জাতীয় কেহ ওদিকটায় থাকিতে পারে। তাহারই উদ্দেশ্যে ঘুরিয়া ওদিকে যাইতেই একেবারে ম্যানেজারের সামনে পড়িয়া গেল। ম্যানেজার কে সেটা অবশ্য আন্দাজেই বুঝিল।

বারান্দার ওদিকটায় একটা ইজিচেয়ারে দুই পা তুলিয়া গা এলাইয়া পড়িয়া আছে। পরনে বেশ ভালো করিয়া কোঁচানো ধুতি, গায়ে একটা জালিদার গেঞ্জি, তাহার নিচে সোনার একগাছা সরু চেন চিকচিক করিতেছে, দক্ষিণ বাহুতে একটা সোনার তাগা, ঢলা সোনার চেনে আটকানো। চেয়ারের হাতলে একটি

সিগারেটের টিন, ডান হাতের আঙুলে একটা জলন্ত সিগারেট।···ম্যানেজারবাবু আবার কর্তাদের বাড়ির জামাই এক দিক দিয়া।

মুখটা এই দিকে ফিরানো ; কাহার সহিত গল্প করিতেছে, থামের আড়ালে পড়িয়া যাওয়ায় টুলু তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না।

দূর থেকে দেখিয়াই প্রশ্ন করিল—"কি চাই ?"

টুলু একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেল, বলিল—"ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে একটু দরকার আছে, খবর দেওয়ার কোন লোক ওদিকে না পাওয়ায় ভাবলাম···"

"উঠে আসুন ; আমিই।"

প্রথম কুণ্ঠা এড়াইয়া উঠিয়া যাইতে টুলুর যতটুকু বিলম্ব হইল, তাহার মধ্যেই আবার ওদিকে গল্প জুড়িয়া দিয়াছে—"হুঁ, তা হ'লে তুই আমার কথার উত্ত র দে···"

টুলু কাছে গিয়া একটু থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল—পিছনে দুইটি হাত দিয়া থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া চম্পা। একবার মুখ ফিরাইয়া টুলুর পানে চাহিল, তাহার পর যেন কোন পরিচয়ই নাই এই ভাবে মুখটা ম্যানেজারের পানে ফিরাইয়া লইয়া সমস্ত শরীরটাতে একটু দোল দিয়া আবদারের স্বরে বলিল—"না, আমি ওসব শুনতে চাই না, বাঃ !···"

একটা চেয়ার ছিল, ম্যানেজার টুলুকে দেখাইয়া বলিল—"বসুন। আগে চম্পাবতীর কথাটা সেরে নিই। Ladies first—খনির বাইরে চম্পা নিজেকে লেডিই বলে কিনা···কি রে, না ?"

সিগারেটটা নিভিয়া গিয়াছিল, আবার দেশলাই জ্বালিয়া হাতের আড়াল দিয়া ধরাইতে লাগিল, মুখে হাসি লাগিয়া আছে।

বসিবার জন্য অবশ্য অনুমতির দরকার ছিল না টুলুর, সে দিক দিয়া তাহার মর্যাদাজ্ঞান যথেষ্ট আছে, ইদানীং কি করিয়া যেন বাড়িয়াছেও, বসে নাই, এইজন্য যে এমন হঠাৎ একটা অভিনব অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে যে, নিজেকে লইয়া কি করিবে যেন বুঝিতেই পারিতেছে না। চম্পাকে সে আজ অনেকটা জানে, সে দিক দিয়া বিস্ময় নাই, তবে ব্যাপারটা অন্য দিক দিয়া অত্যন্ত বিসদৃশ যেন—এত বড় খনির ম্যানেজার—আর একটা

লোক আসিয়া পড়িয়াছে, তবু তো এতটুকু 'কিন্তু' ভাব নাই! বরং ডাকিয়া আনিল আরও।

"হ্যাঁ, এই যে।"—বলিয়া টুলু চেয়ারটা নিজের দিকে টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। দৃষ্টিটা কোথায় রাখিবে স্থির করিতে পারিতেছে না।

চম্পা আবার শরীরে একটা মৃদু দোলা দিয়া বলিল—"আমি অত ইংরেজী জানি না, লেডি-ফেডি কাকে বলে বুঝি না। আপনার যা দোষ—কথার ভাঁওতায় ফেলে আসল কাজ চাপা দেবেন—দেখে আসছি তো?···বাঃ, আমি গরীব মানুষ, গতর খাটিয়ে খাই, আমি একটা ছেলের খরচ জোগাব কোথা থেকে?"

চেষ্টা সত্ত্বেও টুলুর দৃষ্টিটা কে যেন টানিয়া চম্পার মুখের ওপর ফেলিল, একচুল এদিক-ওদিক নাই।

ম্যানেজার একটু হাসিয়া বলিল—"একটা শিশু, তার আবার খরচ! বেশ যা লাগে দুধের দু-এক টাকা আমার কাছ থেকে নিয়ে যাস। কোম্পানি দিতে যাবে কেন? তুই দেমাক দেখিয়ে নিতে গেলি···"

এবার চম্পা অস্ত্র পরিবর্তন করিল, মানভরে মুখটা ঘুরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বোধ হয় হাতে পাকানো সিগারেট আবার নিভিয়া গেছে; ধরাইতে ধরাইতে ম্যানেজারের মুখে একটু হাসি ফুটিল, একটু চোখ তুলিয়া দেখিল, তাহার পর দেশলাইটা ফেলিয়া দিয়া টুলুর দিকে চাহিয়া বলিল—"হ্যাঁ, আপনার—?"

টুলু ক্রমেই যেন জমিয়া যাইতেছিল। এ-রকম অসহ্য অবস্থায় জীবনে কখনও পড়ে নাই, যদিও ম্যানেজারের গাঢ় স্বর আর ঈষৎ রক্ত চাহনি দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছিল সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে রাত্রির অসংযম-অনিয়মের একটা জের আছে, পূর্ণ প্রকৃতিস্থ একটা মানুষ নয়। নিজের কথাটুকু বলিয়া বিদায় লইবার ফাঁক একটুও না পাইয়া আরও অস্থির হইয়া পড়িতেছিল, ম্যানেজারের প্রশ্নে তাড়াতাড়ি ঘাড়টা একটু বাড়াইয়া উত্তর দিতে যাইবে, চম্পার উত্তর আসিয়া পড়িল। ঘাড়টা ঘুরাইয়া রাগ রাগ স্বরে বলিল—"দেমাক দেখলেন! ভাল করতে গেলুম—মরছিল ছেলেটা...যশের দুনিয়া তো নয়..."

ম্যানেজার মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। টুলু আবার একবার চেষ্টা করিল—"আমার দরকার—" বলিয়া আরম্ভও করিয়াছে, চম্পা প্রবল আকারে মাথা

নাড়িয়া বলিল—"না, আপনাকে ক'রে দিতেই হবে ব্যবস্থা—কোম্পানিকে দিয়ে একটা পাকারকম। আজ নয় শিশু, বাড়বে না? এক ঝিনুক দুধ খেয়েই থাকবে? তা ভিন্ন জামা আছে, বিছানা-মাদুর আছে...না, আমি অত খরচ পোয়াতে পারব না..."

"গেছলি কেন ভার নিতে?"

বেশ বুঝা যায় কথা বাড়াইয়া বাড়াইয়া শুধু সংসর্গ লাভের মেয়াদটা বাড়ানো।...টুলুর মনে হইতেছে নরক-যন্ত্রণা কি এই ধরনেরই একটা কিছু?

চম্পা উত্তর দিল—"তাই চোর-দায়ে ধরা প'ড়ে গেছি?"

ম্যানেজার হাসিয়া বলিল—"গেছিস বইকি।—নিজে দিয়েছিস ধরা।"

তাহার পর হঠাৎ চেয়ারে সোজা হইয়া বসিল, বলিল—"হ্যাঁ, এই যে, বেশ মনে প'ড়ে গেছে—তুই যেমন মা, শুনলাম ছেলেটার তেমনি মুফতে একটা বাপও জুটে গিয়েছিল—মাস্টারমশাইয়ের কে একজন আত্মীয় বেশ টাকাওয়ালা..."

চম্পার মুখটা মুহূর্তেই রাঙা টকটকে হইয়া উঠিল, এবং এইবার তাহার দৃষ্টিটাকে কে যেন টানিয়া লইয়া গিয়া টুলুর মুখের উপর ফেলিল—অবশ্য নিতান্ত এক খণ্ড-মুহূর্তের জন্যই, তখনই চম্পা যেন আরও জোর করিয়া সেটাকে ফিরাইয়া লইল।

টুলুও আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিল না, মনের অস্থিরতাটুকুকে সংযত করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যেন আপনা হইতেই দাঁড়াইয়া উঠিল, পকেট হইতে দরখাস্তের খামটা বাহির করিয়া বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"ওঁর এই দরখাস্তটা, বনমালী ভুল ক'রে এর বদলে চিঠিটা রেখে গেছে।"

ম্যানেজারের চেহারাটা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া গেল। এতক্ষণ মুখে চোখে যে একটা হালকা কৌতুকের ভাব ছিল, একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেল। ভ্রূ একটু কুঞ্চিত, চাহনি তীক্ষ্ণ, তাহার পিছনে ইতিপূর্বেই যেন একটা কুটিল চক্রান্ত আরম্ভ হইয়া গেছে। কয়েক মুহূর্ত টুলুর পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল—"আপনি মাস্টারমশাইয়ের আত্মীয়?"

হঠাৎ এই ভাব পরিবর্তনে টুলু একটু বিস্মিত নিশ্চয়ই হইল, তবে উত্তর বেশ

সহজ কণ্ঠেই দিল ; হয়তো হিসাব করিল না, না হয় জানিয়া শুনিয়াই বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ ; চিঠিটা আমার জন্যেই রেখে গেছেন।"

কথাটা বলিয়া মনে পড়িল, সে তো এখানকারই ব্যানার্জি কোম্পানির বাড়ির ছেলে। কিন্তু সে-তথ্যটা ম্যানেজারের জানা নাই দেখিয়া আর কি ভাবিয়া শোধরাইতে গেল না। একটু উঠিয়া দরখাস্তটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল—"চিঠিটা কাছেই আছে আপনার ?"

ম্যানেজার দরখাস্তটা হাতে লইয়া পড়িতে লাগিলেন, কিন্তু যাহা সময় লাগিতেছে তাহাতে অমন ডজনখানেক দরখাস্ত পড়িয়া শেষ করা যায়। হঠাৎ হাওয়াটা যেন গুমোট হইয়া গেছে। টুলু বেশ অস্বস্তির সঙ্গে খানিকটা অপেক্ষা করিল, তাহার পর তাহার দৃষ্টিটা আপনা হইতেই একবার চম্পার মুখের উপর গিয়া পড়িল ; চম্পা ভীত উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে ম্যানেজারের নিচু-করা মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

টুলু বলিল—"চিঠিটা—"

"অ্যাঁ ? এই যে।"—বলিয়া ম্যানেজার মুখ তুলিল। একটা মালী চৌহদ্দির দেয়ালের গোড়ায় ফুলগাছ নিড়াইতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া বাড়ির ভিতর হইতে চিঠিটা চাহিয়া আনিতে বলিল। সে চলিয়া গেলে টুলুকে প্রশ্ন করিল,—"এখানে কি করেন ?"

"করি না কিছু।"

"কত দিন হ'ল এসেছেন ?"

"মাসখানেকের কমই।"

"হুঁ।"

অন্য দিকে মুখ করিয়া কি ভাবিল একটু, তাহার পর আবার—

"এর আগে কি করতেন ?"

টুলু বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে, তবু সংযতভাবেই বলিল—"তেমন কিছু নয়, পড়তাম।"

মালী চিঠিটা লইয়া আসিলে টুলু একটু হাত বাড়াইতে ম্যানেজার মালীটাকেই বলিল—"না, এদিকে।"

পড়া চিঠি তবু নিজের হাতে লইয়া একবার মনে মনে পড়িয়া গেল। তাহার পর সেটা দরখাস্তের সঙ্গে চেয়ারের হাতলের ওপর রাখিয়া সিগারেটের টিনটা চাপা দিয়া আবার ভাবিতে লাগিল। টুলুর কানের গোড়া পর্যন্ত আবার রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, বলিল—"আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে—অনেকটা দূর..."

সংযত হইয়া বলিবার চেষ্টা সত্ত্বেও অধৈর্যতা একটু প্রকাশ হইয়াই পড়িল। ম্যানেজার বলিল—"চিঠি আপনাকে দিতে পারি না।"

"সে কি!—কেন?"

দুই জনের দৃষ্টি বেশ সোজাসুজি দুই জনের মুখের ওপর, একদিকে ভ্রূভঙ্গি, একদিকে বিদ্রোহ। ম্যানেজার বলিল—"ও চিঠি আমাদের দরকার।"

"আপনাদের কি দরকার জানি না, তবে চিঠিটা আমার, সবচেয়ে বেশি দরকার তো আমারই।"

এতটা উদ্ধত উত্তরে ম্যানেজার যেন অভ্যস্ত নয়—এইভাবে চাহিয়া ঘাড়টা ফিরাইয়া লইল।

চম্পা যেন কঠিন হইয়া থামটার সঙ্গে এক হইয়া গেছে।

ম্যানেজার আবার দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল—"আপনার দরকার, একবার পড়ে নিলেই হবে, আমাদের দরকার তার পরে পর্যন্ত। দিতে পারি, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করতে হবে, প'ড়ে এক্ষুনি ফিরিয়ে দেবেন।"

টুলু চেয়ারের হাতলটা চাপিয়া ধরিল, বলিল—"আমি অমন প্রতিজ্ঞা করি না—নিজের জিনিস সম্বন্ধে।"

ম্যানেজার তাহার উদ্ধত দৃষ্টির পানে একটু স্থিরভাবে চাহিয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ সিগারেটের টিনটা সরাইয়া, চিঠিটা তুলিয়া বলিল—"শুনুন।"

টুলুকে আর একটুও সময় না দিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল—'

"কল্যাণাস্পদেষু,

আমায় নিতান্ত হঠাৎ চ'লে যেতে হল, কেন, তা এসে বলব। আপাতত এক সপ্তাহের ছুটির দরখাস্ত করেছি, কিছু বাড়াতেও পারি। তোমাকে খনিতে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য আমার সিদ্ধ হয়েছে; কদর্যতা আর [illegible] মূর্তি নিজের চোখে না দেখলে তোমার মনের দ্বন্দ্ব মিটত না, তুমি নিশ্চিতভাবে

ফিরতে না। এবার তুমি সত্যিই ফিরলে। কাজের কথায় আসা যাক—জীবনে কোন্ অদৃশ্য শক্তির কাছ থেকে যে নির্দেশ আসে, বিধান পাওয়া যায়, বলা যায় না,—কাজ তুমি পেয়েছ, সেই অদৃশ্য বিধানেই। তোমার কাজ তিনটি বিষয় নিয়ে হবে—বস্তিতে নেশার বিরুদ্ধে অভিযান, শিশুমঙ্গল, আর দুর্নীতির সঙ্গে লড়াই। সেই অদৃশ্য শক্তি এই তিনটিই তোমার সামনে ধ'রে দিয়েছেন—চরণদাস, হীরক। তৃতীয়টির নাম না করলেও বুঝতে তোমার দেরি হবে না। একটা মেয়ে শুধরে গেলে একটা জাতি শুধরে যেতে পারে—এই আমার বিশ্বাস টুলু। আমি তোমার কর্মপন্থা বেঁধে দিলে বোধ হয় অন্যরকম ব্যবস্থা করতাম; কিন্তু এই বিধানের মধ্যে একটা সুবিধে এই যে, এতে খনির কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে কোন সংঘর্ষের সম্ভাবনা নেই—অন্তত আপাতত নেই—তুমি ধীরে সুস্থে কাজ ক'রে যেতে পারবে। তারপর আবার হয়তো নতুন বিধানই পাবে সেই অদৃশ্য শক্তির কাছ থেকে। তখন আমিও পাশে থাকব। আর সময় নেই, দশটি মাইল হেঁটে আমায় সকালে ট্রেন ধরতে হবে। তুমি এখানেই থেকো, কাজের সুবিধে হবে। বনমালীর কাছে ভাঁড়ারের চাবি দিয়ে গেলাম, ওই চাবিরই একটা তালা বাক্সয় লাগানো, তাইতে খরচপত্রের টাকা আছে। ইতি মাস্টারমশাই।"

শেষ করিয়া ম্যানেজার টুলুর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল,—"এই চিঠি।"

টুলু স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"বেশ তো আপনিও সাহায্য করুন, এর মধ্যে অন্যায়টাই বা কোথায়, আর চিঠিটা না-দেওয়াই বা কি আছে?"

ম্যানেজার যে রক্তাভ চোখে একটু আগে হালকা রহস্যের মাদকতা লাগিয়াছিল, সে দুইটা ক্রোধে একেবারে উগ্র হইয়া, চেয়ারে সটান সোজা হইয়া বসিয়া, গলা চড়াইয়া বলিল,—"তোমার মধ্যে যে দুঃসাহস আছে তা মুখ খুলতেই টের পেয়েছি, তবে সেটা যে এত বেশি তা বুঝেত পারি নি। তুমি আমার খনির কুলিদের বিগড়োবার জোগাড় করছ—তোমাতে আর মাস্টারমশাইতে মিলে—আর আমি তোমায় তাইতে সাহায্য করব?—I am surprised at your cheek!—তুমি—তুমি…"

"এর মধ্যে বিগড়ে দেওয়ার কি দেখলেন?"

টুলুর কণ্ঠস্বর সংযতই, কিন্তু চোখের দীপ্তি আরও উজ্জ্বল।

ম্যানেজারের গলা আর এক পর্দা চড়িল—"সমস্তটাই বিগড়োবার ব্যাপার, I can see through the game, আমি আজ ম্যানেজারি করছি না, আর এ সব ব্যাপার কি ক'রে দাবাতে হয় ভালো রকম জানি! সংঘর্ষ!...কদর্যতা আর অত্যাচারের মূর্তি!—দেশপ্রেমিকের দল জুটেছেন!—অত্যাচারের আসল মূর্তি দেখতে এখনও ঢের বাকি আছে!"

"যদি বাড়াচ্ছেনই কথা—নেই কি কদর্যতা আর অত্যাচার?—মেয়েটা যে ক'বে বেঘোরে মারা গেল..."

ম্যানেজার একবার হুঙ্কার দিয়ে উঠিল, চেয়ারের দুইটা হাতল ধরিয়া অল্প একটু উঠিয়া বলিল—"But that's none of your business!...তোমাদের তার সঙ্গে কি সম্পর্ক?—আমার খনির মজুর—আমি মালিক..."

টুলু নিজের কণ্ঠস্বরটা একটুও বিচলিত হইতে দিল না, তবে বলিবার ভঙ্গিতে তাহার মনের দৃঢ়তা অক্ষরে অক্ষরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল; মেরুদণ্ডটাকে আরও সিধা করিয়া লইয়া ম্যানেজারকে বাধা দিয়াই বলিল—"আপনি মজুরদের যা দেন তার বদলে খানিকটা শরীরের শক্তি পাবার অধিকারী আপনি; নিচ্ছেন কিন্তু তার স্বাস্থ্য, তার প্রাণ, তার নীতিজ্ঞান, তার ধর্ম—মানে, মনুষ্যত্ব বলতে যা বোঝায় তার সবটুকুই। কোন্ অধিকারে, আমরা তা বুঝতে পারি না; আর বুঝতে পারি না ব'লে আমরা মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবই। আশা ছিল আমার হাতে ভগবান নিজে যে কাজটুকু তুলে দিয়েছেন তাতে আপনাদের কিছু বলবার থাকবে না, কেননা, ওদের মনুষ্যত্বের যে দিকটা তার সঙ্গে সব মানুষেরই একটা সহজ সম্বন্ধ আছে, আপনার যেমন ওদের খানিকটা দেহের শক্তি নেবার অধিকার আছে, আমারও তেমনি ওদের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে রাখবার অধিকার আছে—বোধ হয় বেশি। এতে বিপদ যদি এসেই পড়ে আমি তোয়ের আছি।"

কথাগুলা এক তোড়ে এমন বলিয়া গেল, ম্যানেজারকে বাধা দেওয়ার অবসরই দিল না। বোধ হয় বিস্ময়ে ক্রোধে তাঁহার কতকটা বাক্‌রোধের মতোও হইয়া গিয়া থাকিবে। টুলু থামিলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাহিরের দিকে হাত দেখাইয়া আরও উগ্র ভাবে গর্জন করিয়া উঠিলেন—"Get out! Out

with you!—বেরিয়ে যাও!—শুধু এখান থেকে নয়, ও বাসায় পর্যন্ত তুমি আর ঢুকতে পাবে না। ও-সব আত্মীয়-টাত্মীয় আমি বুঝি না…গণ্ডিডিহিতেও. যদি তোমায় চব্বিশ ঘণ্টার পরে দেখি…”

মালীটা নিড়ানি হাতে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে, শোফারটা গাড়িবারান্দা থেকে খানিকটা আগাইয়া আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে, বাড়িটার দোতলায় দুই-তিনটা জানালা খট্-খট্ করিয়া খুলিয়া গেল।…ম্যানেজারের ওঠার সঙ্গে সঙ্গে টুলুও দৃপ্ত ঋজুতায় উঠিয়া দাঁড়াইল, ঘাড়টা শুধু একটু হেলিয়া গেছে; চোখের উপর চোখ রাখিয়া সেই রকম দৃঢ় অবিচলিত কণ্ঠে বলিল—“আপনার কথায় মনে হচ্ছে কুলিদের ভয় দেখিয়ে ভয় দেখানোর একটা বদ অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেছে আপনার। তবে শুনুন, মাস্টারমশাই আমার আত্মীয় নন—আত্মীয়ের চেয়ে বড় ব'লে আমি আলগা ভাবে তখন স্বীকার করেছিলাম; কিন্তু তবু আমি ঐ বাড়িতেই চললাম, আপনার সাধ্যি থাকে আপনি আমায় জ্যান্ত সেখান থেকে বের ক'রে দেবার চেষ্টা করবেন।”

যেমন অবিচলিত কণ্ঠস্বর তেমনি অবিচলিত পদক্ষেপে বারন্দা হইতে নামিয়া গেল।

সেবার আগেই সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়া গেল।

॥ বারো ॥

বালিয়াড়ির অর্ধেক পথ হইতে চম্পা টুলুর সঙ্গে ফিরিল। টুলু সামনে, চম্পা [illegible] পিছনে। স্তব্ধ রাত্রি, চারিটি পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই নাই কোথাও, শুধু চম্পার শাড়ি পায়ে এক-একবার বেশি জড়াইয়া গিয়া একটা মৃদু খস্‌খস্ শব্দ করিতেছে।…প্রায় ক্রোশখানেক পথ অতিক্রম করিতে যে সময়টা লাগিল তাহাতে চাঁদ আকাশে আরও উঠিয়া জ্যোৎস্নাটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। রাত্রির গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াটাও আর একটু চঞ্চল হইল, খানিকটা জায়গা লইয়া চম্পার কবরীর মালার গন্ধের আবর্ত সৃষ্টি করিয়া চলিল।

সমস্ত পথ দুই জনের মধ্যে আর একটি কথাও হইল না। স্কুলের টিলায় উঠিয়া টুলু মাস্টারমশাইয়ের বাসা ছাড়াইয়া স্কুলের সামনে গিয়া দাঁড়াইল, ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—"[illegible] ডেকে দোব?"

চম্পা অল্প একটু হাসিয়া বলিল—"তার যে অসুখ করে নি, এটা না দেখলেও বিশ্বাস হবে আমার।"

টুলু বিদ্রূপটা গ্রাহ্য করিল না, আবার প্রশ্ন করিল—"তা হ'লে?"

"আমি বাসায় ফিরে যাব—বস্তিতে।"

"সঙ্গে যাব?"

চম্পা মুখটা একটু ঘুরাইয়া লইল, একটু হাসিয়া বলিল—"পুরুষ হ'লে বলতাম সঙ্গে যেতে।" সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া নিজের কথাটার টীকা হিসাবেই যেন বলিল—"পুরুষ মানুষকে এ-রকম মিথ্যে বলতে কখনও শুনি নি, তাই···বেশ, এইবার আমি যাই।"

টুলু অনেকক্ষণ একভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর মাস্টারমশায়ের জানালার কাছে আসিয়া ডাকিল—"স্যার, ঘুমোচ্ছেন?"

টিলা হইতে নামিয়া চম্পা বস্তির পায়ে-হাঁটা পথটা ধরিল—যেটার উপর দিয়া টুলু প্রথম দিন বস্তিতে যায়। রাস্তার খানিকটা একটা খোয়াইয়ের ধার দিয়া গেছে—প্রায় একটি ক্ষুদ্র নদীর মতো; কিনারায় একটা চ্যাটালো পাথরের উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, শরীরের চেয়ে মনের ক্লান্তি অত্যন্ত বেশি। নানা রকম চিন্তা মনে আসিতেছে—কোনটা মিষ্ট, কোনটা তিক্ত, কোনটা আবার তিক্ত হইয়াও মিষ্ট—সবগুলারই একটা মোহ আছে; কোনটারই কিন্তু মনের মধ্যে বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি হইতেছে না। একটা ধরে আবার ছাড়ে, আবার নূতন একটা ধরে, এই ভাবে মনটা ক্রমে বড় বেশি আলোড়িত হইয়া উঠিল এবং এক সময় অহেতুকভাবেই চোখ ছাপাইয়া অশ্রু নামিল।···চম্পা মুছিল না, সমস্ত মনটাকে দুইটি ধারার মধ্যে ভাসাইয়া দিয়া কোলে দুইটি হাত জড়ো করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ গেল, কখন্ সে ধারা দুইটি বন্ধ হইয়া গেছে জানিতেও পারে নাই। সম্বিৎ

ফিরিতেই একবার চোখ দুইটা মুছিয়া লইয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিল। শরীর-মন বেশ হাল্‌কা বোধ হইতেছে।

এর পর চিন্তা বেশ একটা স্পষ্ট গতি লইল, কিন্তু বিপরীতমুখী। মুখটা ধীরে ধীরে কঠিন হইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ এই ভাবেই গেল, তাহার পর সে কবরী হইতে মালাটা খুলিয়া লইয়া আস্তে আস্তে দুই হাতে লুফিতে লাগিল—মুখটা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিতেছে, ঠোঁটের কোণ এক এক বার হইয়া উঠিতেছে কুঞ্চিত। চম্পা হঠাৎ হাত দুইটা আল্‌গা করিয়া দিল, মালাটা নিচে পড়িয়া যাইতে দুই-পা দিয়া সেটাকে নির্মম ভাবে চাপিয়া ধরিল···বেশ লাগিতেছে, অধরের উপর ওষ্ঠটা চাপিয়া বসিয়াছে; চম্পা উঠিয়া দাঁড়াইল; দুই পায়ে কচলানো মালাগাছটা ডান পা দিয়া গভীর অবজ্ঞাভরে খোয়াইয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া শিলাখণ্ড হইতে নামিয়া পড়িল।

খোকা হীরকের জন্য মনটা হঠাৎ বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। চম্পা হনহন করিয়া বস্তির পানে চলিল। অনুভব করিল বুকটা কিসে যেন উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে—মায়ের বুক দুধে কি এই রকম তোলপাড় করিয়া উঠে? পা চালাইয়া দিল আরও জোরে। বস্তির ছিয়াত্তর নম্বর বাসায় হীরক থাকে, সেই মেয়েটিরই কাছে—টুলু টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়া যাহার কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছিল। ঝগড়ার উত্তেজনাটা কাটিয়া গেলে চম্পা বাসায় আসিয়া তাহারই হাতে পায়ে ধরিয়া আবার রাজী করিয়াছিল—মেয়েটি ভালো, প্রচুর দুধ, আর শরীরে কোন্‌ রোগ নাই; সেটা বেশি দরকারী কথা। আরও সুবিধা, ওর বাসাটাও একাশি নম্বরের কাছে। ব্যবস্থা হইয়াছে, চম্পা যখন খুশি লইয়া আসিবে, যখন খুশি দিয়া আসিবে, টাকাটা দিবে সে-ই—মাসে পাঁচটি করিয়া; টুলুর কাছে বা কাহারাও কাছেই ও হাত পাতিতে পারিবে না। চম্পা বলে—"আমার হীরাকে ট্যাকা দিয়ে কে কিনবেক গো?—ইস্‌, বড়া লোক, ট্যাকার চকমকি দেখায়!"

মেয়েটির সঙ্গে ভাব করিয়া 'মিতিন' পাতাইয়াছে, সব পাকা বন্দোবস্ত।

বস্তির ভিতরে পা দিতেই খোকার কান্না কানে গেল। দুইটা ছেলের কান্নার খুব বেশি—হীরকের বয়সই তো মাত্র এই কয়েক ঘণ্টা। এক রকম

দৌড়াইয়াই ছিয়াত্তর নম্বরের বারান্দায় উঠিয়া দুয়ারে ধাক্কা দিয়া ডাকিল—"মিত্তিন গো, উঠবিক নি ?···মিত্তিন গো !"

মেয়েটি আগেই উঠিয়াছে, হীরকের কান্না একেবারে থামে নাই, তবে অনেকটা চাপা পড়িয়াছে, ক্ষুধায় খুব বেশি রাগিয়া উঠিয়াছিল, এখন স্তন মুখে পড়ায় গেঙাইতেছে এবং এক-একবার মুখটা সরাইয়া লইয়া গলা ছাড়িয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। দুধের প্রাচুর্যে গেঙানিটাও এক-একবার বেশ অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয় বার ডাকে মেয়েটি উত্তর করিল—"ওঠা করেছি গো, তোর ছাওয়ালটি দজ্জাল বটেক ! রা—গ দেখ্ছো ছাওয়ালের ! অঃ !"

"দুয়ারটি খোল্ তুই আগে।"

মেয়েটি হীরককে বুকে লইয়াই উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। চম্পা তাহাকে এক রকম কাড়িয়া লইয়াই নিজের বুকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"উ উর মা'টিকে দেখে নাই গো, কাঁদবেক নাই ? তুই দুধ দিস তো মা'টি হয়ঁ। গেঁইছিস্ আর কি !—ই—স্ গো। নে, দুধ দে, আমি নিয়া যাব। মা'টি ছেড়ে কি করে থাকবেক গো ? তুর আপ্‌পুন ছাওয়ালটি পারেক ?"

ফিরাইয়া দিয়া একটু অপেক্ষা করিয়া রহিল। একটু হালকা রহস্যও হইল ; বেশভূষা লইয়া চম্পার সঙ্গে সাক্ষাতে কেহ আলোচনা করিতে সাহস করে না ; তবে এ মেয়েটির সাহস বাড়িয়াছে একটু। 'মিতিন' হইয়া অবধি একটা ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, তাহার সঙ্গে স্বার্থের এই যোগ, ও না হইলে অচল, জানে একটু প্রশ্রয় পাইবেই। অবশ্য আসল ব্যাপারের কিছু ভাঙিল না চম্পা ! হীরকের দুধ খাওয়া শেষ হইলে তাহাকে ঢাকিয়া বুকে চাপিয়া লইয়া গেল।

দরজায় কুলুপ লাগাইয়াই দিয়াছিল। চরণদাস ছোট বারান্দাতে উনানের কাছে পড়িয়া। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ; ওর নেশাও পাতলা হইয়া আসিয়াছে, দুয়ার খোলার শব্দে জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"কে বটে ?"

চম্পা কোন উত্তর না দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। চরণ হাতে ভর দিয়া একটু উঠিয়া আর একটু রুক্ষভাবে প্রশ্ন করিল—"কে বটে ?—কে বটে গো ?"

চম্পা ভিতর থেকে উত্তর করিল—"আমি, চুপ ক'রে প'ড়ে থাক্ ক্যানে, রাত দুপুরে চিচ্চায় না।"

চরণদাস ঘাড়টা গুঁজিয়াই কথাগুলার অর্থ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল খানিকক্ষণ, তাহার পর তর্কের ভঙ্গিতে নিজের ডান হাতটা উল্টাইয়া বিড়বিড় করিতে লাগিল—"রাত তিন পহরে চিচ্চায় না!—ই আমার আপ্পুন বাসা নয়! যার খুশি ঢুকবেক—আমার আপ্পুন বাসাটি নয়!..."

খুব রাগিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়া ঝিমাইয়া পড়িল। একটু পরে আবার একটু সচেতন হইয়া উঠিয়া বলিল—"চম্পাটি বটে গো? কুথা গেঁইছিলি?"

চম্পা হীরককে বিছানায় শোয়াইয়া ডিবা জ্বালিল, হাত দিয়া বিছানাটা টানিয়া টানিয়া মসৃণ করিয়া দিতে দিতে ধমকের স্বরে বলিল—"তু ঘুমা ক্যানে। কুথা যাবে চম্পা? তুর আপ্পুন ঠিকানা নাই বটে!"

হীরককে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল, বিড়বিড় করিতে করিতে চরণদাস আবার নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িল।

এই কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে হীরককে যেন আবার নূতন করিয়া পাইয়াছে চম্পা, ক্রমাগতই চাপিয়া চাপিয়া ধরিতে লাগিল, বুকের সমস্ত উত্তাপ দিয়া। সন্তানের মতোই ও যেন টুলু আর চম্পার মধ্যে একটা সেতু—এই অনুভূতিটাই অতি-নিবিড় একটি মমতার আকারে হীরকের উপর যেন উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। না কোন সম্বন্ধ থাক্, টুলুর স্পর্শ পর্যন্ত নাই থাক্ হীরকের গায়ে, তবু ঐ যে টুলু তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিল ঐটুকুতেই তাহার মনের স্পর্শ যেন পাওয়া যায় সদ্যজাত এই শিশুটির মধ্যে। ঠিক তাহারই মতোই একটি স্নেহের ধারা, একটি সন্তানের মায়াই তো টুলুর বুক থেকে উৎসারিত হইয়া হীরককে অভিসিঞ্চিত করিয়াছিল? চম্পা নিজের স্নেহ দিয়া সেইটিকে অনুভব করিতে লাগিল;—মাঝখানে হীরা, তাহার ওদিকে আছে টুলু, এদিকে চম্পা নিজে। এ কি এক অপূর্ব অভিনব অনুভূতি! যাহাদের এই সম্বন্ধ তাহারা সন্তানের মধ্যে এইভাবে দুই দিক থেকে দুইটি স্নেহের ধারায় আসিয়া মেশে নাকি?—চমৎকার তো!—চমৎকার!—কত নিগূঢ় ভাবে মিষ্ট হীরক—দুই জনের সঞ্চিত স্নেহ! যেন অত

পাওয়া যায় না। অন্ত পাওয়ার জন্যই যেন চম্পা হীরককে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিতে লাগিল।

তাহার পর এক সময় বালিয়াড়ি থেকে স্কুল পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাটুকু চোখের সামনে জাগিয়া উঠিল। চম্পা সমস্তটাই যেন স্পষ্টভাবে দেখিতেছে এইভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। বারান্দার পথে নক্ষত্রখচিত এক ফালি আকাশ, তাহার গায়ে সমস্তটুকু যেন একখানি চিত্রের আকারে আঁকা রহিয়াছে।···নীরব নির্জনতার মধ্য দিয়া টুলু চলিয়াছে—সমস্ত শরীরটি একটা লাঠির মত সোজা, মাথাটা একটু সামনে নোয়ানো। জ্যোৎস্নায় ভরা আকাশ বাতাস গন্ধে যেন মাতাল হইয়া উঠিয়াছে—টুলুর পিছনে হাত কয়েকের মধ্যেই বিলাস-সজ্জায় একটি যুবতী।—স্থির দৃঢ়পদে টুলু চলিয়াছে, দীর্ঘ পথের মধ্যে একটি কথা বলিল না, একবারটি ফিরিয়া চাহিল না।···এত বড় বিস্ময় চম্পার অভিজ্ঞতায় জীবনে আর ঘটে নাই। আকাশলগ্ন ছবিটির দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেছে না।

এই পৌরুষকে চম্পা দিল কিনা ধিক্কার!

হীরকের চারিদিকে বাহুবন্ধনটা আপনি কখন শিথিল হইয়া গেছে। তাহার সুপ্ত চোখ দুইটির উপর দৃষ্টি রাখিয়া চম্পা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। মনটা যেন এক জায়গায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার পর সেটা একেবারেই বিপরীত একটা চিন্তার ধারায় গড়াইয়া চলিল। নিজেকে যেন অত্যন্ত অশুচি বোধ হইতেছে। মনে হইতেছে টুলুর মনের স্পর্শে এই নিষ্পাপ শিশু যেন আরও শতগুণ পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে, ইহাকে স্পর্শ করা চলিবে না তাহার,—দেহ দিয়া তো নয়ই, এমন কি মনের ক্ষীণতম আকাঙ্ক্ষাটুকু দিয়াও না।

দুয়ারটা ভেজানোই ছিল, আস্তে আস্তে খুলিয়া চম্পা আবার বাহিরে আসিল, চায় না যে একটু কোন শব্দ হয় আর বুড়ো চরণদাসের কচ্‌কচানি আরম্ভ হইয়া যায়। কথা কহিতেই কেমন একটা নিস্পৃহতা বোধ হইতেছে। ছিয়াত্তর নম্বরের দরজায় আবার করাঘাত করিল—"মিত্তিন গো! হেই মিত্তিন!"

মেয়েটির নিজের শিশু উঠিয়াছে, জাগিয়াই ছিল—"ম—র্‌ ক্যানে!" বলিয়া দরজাটা খুলিয়া দিল, প্রশ্ন করিল—"কি বটেক? খোকাটি কুথা?"

"ঘুমাচ্চে, তু নিয়া আসবি চল্‌।"

"মিয়া আসবি চল্! ঘুমাচ্চে তো ঘুমাক, তুও ঘুমাগা। এক রাতের ছাওয়াল টান্তে টান্তে শেষ করবেক গো! বড়ো মা হইছে!"

"তু চল্ বটে; আমি ঘুমাব, উ চিচ্চায়েঁ উঠায়েঁ দিবেক।"

"তা এনে দে, আমার অপ্পন খোঁকাটি চিঁচাচ্চে।"

"তু যা মিত্তিন, হেঁই গো, যা। উটি বড়ো কচি বটে, ডর লাগে। তু যা গো, আমি তুর খোঁকাকে দেখছি…"

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহাকে একটু ঠেলিয়াই বাহির করিয়া দিল। মেয়েটি ঘাড় ফিরাইয়া একটু দাঁড়াইল, ভ্রূকুটির সঙ্গে একটু হাসিয়া বলিল—"ম—র্ ক্যানে। না বিয়াঁয়ে কানাইয়ের মা হবেক গো! ঢঙ!…"

মিত্তিন চলিয়া গেলে চম্পা একটা তর্জনী দাঁতে চাপিয়া চৌকাঠের উপর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; শিশুটি চীৎকার করিতেছে, হুঁশ নাই! মিত্তিন ফিরিয়া বারান্দায় উঠিয়া সে কথা বলিলও, তবুও হুঁশ নাই যে চম্পার, তর্জনী দাঁতে দাঁতে কামড়াইয়া সামনের দিকে চাহিয়া আছে। বড় অনিশ্চিত মেজাজ মেয়েটার, বিশেষ করিয়া এই রকম হঠাৎ গুম হইয়া গেলে কেহ আর ঘাঁটাইতে সাহস করে না। মিতিন পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, চৌকাঠ ডিঙাতেই চম্পা ঘুরিয়া তাহার কাঁধে মুখ গুঁজিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল—"তু উকে ফিরায়েঁ নে গো মিত্তিন, উ আমার কাছে বাঁচবেক নাই, আমার শরীলের পাপ উকে পুড়ায়েঁ ফেলবেক, ছাইটি ক'রে দিবেক—উ হীরার বটে, উতে পাপটি সইবেক নাই গো মিত্তিন, তু উকে ফিরায়েঁ নে…"

॥ তেরো ॥

উঠিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। একটা স্বপ্ন দেখিতেছিল, দুঃস্বপ্ন কি সুখস্বপ্ন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না, ঠিক যেমন কালকের রাত্রিটা সুখের ছিল কি দুঃখের তাহার মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারে নাই। উঠিয়া দুই হাতে হাঁটু দুইটি জড়াইয়া চুপ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া রহিল। কেমন একটা অলস উদাস ভাব মনটা অধিকার করিয়া রহিয়াছে, কেমন চিন্তার গোড়া বসিতেছে না।

আজ আর কাজে যাইবে না। অনেক বেলাও হইয়া গেছে, তাহা ভিন্ন শরীরটাও একেবারে ভালো নাই। কাজে না যাওয়া স্থির করার সঙ্গে একটি চিত্র স্পষ্ট হইয়া উঠিল মনে—অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজার পরেশবাবু তাহাকে খুঁজিতেছে। ঠিক যে নাম ধরিয়া ডাকাডাকি এমন নয়, ছুতানাতা করিয়া এ-সুড়ঙ্গ ও-সুড়ঙ্গ ঘুরিয়া বেড়ানো, যেখানে যেখানে চম্পার থাকা সম্ভব। আজ যত বেলা বাড়িবে, আরও অধীর হইয়া ঘুরিবে।...চমৎকার একটি পুলকানুভূতি, আজকের স্বপ্ন কিংবা কাল রাত্রের অনুভূতির মত ধোঁয়াটে কিছু নয়; বেশ স্পষ্ট একটি বিজয়ের আনন্দ একটুর মধ্যেই চম্পার অবসাদগ্রস্ত মনটাকে সচেতন করিয়া তুলিল; চম্পা যেন হারানো নিজেকে ফিরিয়া পাইল।

নিতান্ত স্বাভাবিক নিয়মেই এই বিজয়ের পাশে কালকের রাত্রে পরাজয়ের স্মৃতিটা আসিয়া মনের একটা কোণ দখল করিয়া ফেলিল। টুলুর একটি নির্দেশে বালিয়াড়ির পথ হইতে ফেরা থেকে স্কুলের টিলার উপর তাহার নিকট হইতে বিদায় লওয়া—একটা একটানা পরাজয়...চম্পার চোখ দুইটা ধীরে ধীরে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল—নিজের দীপ্তিতেই যেন জ্বালা করিতেছে। বুকের মধ্যে একটা আহত সর্পিণী যেন গর্জাইতেছে। বিজয় চাই; খুব বড় একটা বিজয় দিয়া এই পরাজয়ের গ্লানিটা মুছিয়া ফেলিতে না পারিলে স্বস্তি নাই—একেবারেই স্বস্তি নাই।...টুলু? না, বেশ বুঝা যায় ওখানে পরাজয়ই যেন বাঁধা; টুলু যেন একটা বাজিকরের যষ্টি; ঋজু, শুভ্র, শুষ্ক একখানি হাড় যেন—দেখাও দরকার হয় না, চিন্তাতেই সর্পিণীর চক্র নুইয়া আসে।...আনত মুখ, পিঠের শিরদাঁড়াটি একেবারে সিধা, জ্যোৎস্নাপ্লুত মধ্যযাম রজনীতে দীর্ঘপথ বাহিয়া টুলু চলিয়া আসিল—পিছনে অভিসার-সজ্জায় চম্পা।...আগুনের মধ্য দিয়া যে শীকর-স্নানের স্বচ্ছন্দতায় উঠিয়া আসিতে পারে তাহাকে পরাভূত করিবার অস্ত্র চম্পার তূণীরে নাই।

তবুও বিজয় চাই—বড় একটা; যৌবনের মর্যাদায় কঠিন আঘাত লাগিয়াছে।...

অনেকক্ষণ একভাবে চিন্তা করিয়া চম্পা একটা পন্থা আবিষ্কার করিল, খুব নূতন না হোক, তবু বিশিষ্ট।

চম্পা হাত মুখ ধুইয়া প্রসাধন করিল, খুব হালকা, সূক্ষ্ম, কিন্তু অমোঘ রহস্যটা

ওর অধিকার আছে। চরণদাস অনেক পূর্বে কাজে গেছে, দরজায় একটা কুলুপ আঁটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

ম্যানেজার রতিকান্তবাবুকে বরাবর একটু রহস্যময় বলিয়া বোধ হইয়াছে চম্পার। লোকটি সাহাদের জামাই, প্রায় মাস ছয়েক হইল এখানে আসিয়াছেন। বয়স চল্লিশের দুই এক বছর উপর বলিয়াই মনে হয়; সুপুরুষ, শৌখিন, আর চম্পা এইটুকু পর্যন্ত জানিয়াছে যে জিভটা বেশ একটু আলগা। তবে সে আলগাপনার একটা বিশিষ্টতা আছে—অত্যন্ত মুক্ত। চম্পা, আরও কয়েকটি মেয়ে, খনিচক্রের মধ্যে যাহাদের সুনাম নাই, আর যাহারা সুনামের জন্য মাথাও ঘামায় না, সবার সামনেই তাহাদের সঙ্গে একটু-আধটু হালকা রহস্য করিতে রতিকান্তের—ম্যানেজার হইয়াও, কর্তাদের বাড়ির জামাই হইয়াও—বাধে না—খনির মধ্যে, খনির বাহিরে, যেখানেই হোক। একটু পানদোষও আছে। যাহার জন্য সকাল থেকে খানিকটা কাটিয়া রাত্রির সঙ্গে জুড়িয়া লইতে হয় রতিকান্তকে। কিন্তু লোকটি অত্যন্ত রাশভারি, কাজের কথা আসিয়া পড়িলে একেবারে অন্য মানুষ হইয়া পড়িবার একটা বিস্ময়কর ক্ষমতাও আছে। ম্যানেজারের হাল্কা রহস্য কান পাতিয়া, অল্প একটু হাসিয়া শোনা যায়, কিন্তু উত্তর দিতে সাহস হয় না, কিংবা উত্তরে সামান্যও একটু সীমা লঙ্ঘন হইল কি না, সে বিষয়ে নিজের দিক থেকেই খুব বেশি লক্ষ্য রাখিতে হয়।

আর একটা কথা অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজার পরেশবাবুর মতো তো নয়; একেবারে সর্বময় কর্তা, খুবই উচ্চে অবস্থিত, তাই ম্যানেজার রতিকান্তবাবুর কথা খুব বেশি মনেই হয় নাই কখনও চম্পার; আজ কিন্তু বিশেষ করিয়া সেই-জন্যই তাঁহার কথা আগে মনে পড়িল। বিজয়-অভিযানে পা বাড়াইল চম্পা।

একটা অজুহাত চাই দেখা করিবার, চমৎকার অজুহাত পাওয়া গেছে হীরককে লইয়া। বাঃ! ওঁদের খনির দায়িত্ব হীরক; চম্পা ভালোমানুষি করিয়া না হয় ভারই লইয়াছে' কিন্তু তাহার খরচ যোগাইবে কোথা হইতে?—নিজের পেটই চলা দায় এই বাজারে; একটা ব্যবস্থা না করিলে চলে? করিতেই হইবে একটা ব্যবস্থা।

বেশ অনুকূল অবস্থায় পাওয়া গেল ম্যানেজারবাবুকে। চতুর শিল্পীর

মতোই চম্পা এই আনুকূল্যকে কাজে লাগাইয়া আনিতেছিল, এমন সময় টুলু আসিয়া উপস্থিত হইল। চম্পা একবার ফিরিয়া দেখিয়া নিজের কথা চালাইয়া গেল; ম্যানেজারকে দেখাইল—টুলুকে চেনেই না; টুলুকে দেখাইল—আমি লোকটা যে কে দেখিয়া রাখো, ভাবো কতদূর পর্যন্ত আমার দৌড়। ওর সামনেই ম্যানেজার টুলুকে ডাকায় চম্পার সাহস যেন আরও বাড়িয়া গেল, আরও একটু গা ঢালিয়াই অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিল।

তাহার পর আসিল মাস্টারমশাইয়ের দরখাস্ত। ম্যানেজারের মুখের উপর থেকে সমস্ত লঘুতা নিরবশেষ হইয়া মুছিয়া গেল। চম্পা পড়িয়া রহিল একেবারে দূরে। ম্যানেজার দরখাস্তটা পড়িতেছেন—নত দৃষ্টি, সময় যাহা লইতেছেন তাহাতে অমন এক ডজন দরখাস্ত পড়িয়া শেষ করা যায়। প্রগল্‌ভা চম্পা নিশ্চুপ হইয়া শঙ্কিত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে লাগিল—মুখের কোথায় কোন্ রেখাটুকু কি ভাবে ফুটিতেছে বা মিলাইতেছে! পরিচয় আরম্ভ হইল। চম্পা থামের গায়ে ঠেস দিয়া ক্রমে যেন অসাড় হইয়া যাইতেছে; দারোগার মত এজাহারে টুলু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে—চম্পা চকিত তির্যক দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া দেখিল।… অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট বিদ্রোহে গিয়া দাঁড়াইল; চিঠি ফিরাইয়া দেওয়ার কথায় টুলু চেয়ারের হাতল চাপিয়া দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর করিল—"আমি অমন প্রতিজ্ঞা করি না, নিজের জিনিস সম্বন্ধে।"

মনটা প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে, তবু চম্পা যেন একবার চমকিত হইয়া টুলুর পানে ফিরিয়া চাহিল।

তাহার পর আসিল মাস্টারমশাইয়ের চিঠি। চম্পা এই প্রথম টুলুর আসল পরিচয়টা পাইল। তাহার কঠিন শরীরটা ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া আসিতেছে। কি অদ্ভুত সে অনুভূতি, যেন বুঝিয়া উঠা যায় না; কয়েকবারই অবাধ্য দৃষ্টিটা টুলুর উপর গিয়া পড়িল—মাস্টারমশাইয়ের কথাগুলা তাহাকে যেন এক অপূর্ব নূতন আলোয় উদ্ভাসিত করিয়া দিতেছে। কোথাকার দেবদূত! এ কি অভিনব ব্রত লইয়া অবতরণ তাহার! তাহার ললাট ঘিরিয়া কি অপার্থিব বর্ণচ্ছটা!…তাহার পর চিঠির সেই কথাটি "তৃতীয়টির নাম না করলেও চিনতে তোমার দেরি হবে না"। কে সেই তৃতীয়া, চম্পা মুহূর্তেই চিনিয়া লইল।

এর পরেই, কিছু একটা ভাবিতে পারার পূর্বেই সেই চরম কথা কয়টি—"একটা মেয়ে শুধরে গেলে একটা জাতি শুধরে যেতে পারে—এই আমার বিশ্বাস টুলু।"

চম্পার মনে হইল এক মুহূর্তেই কে যেন তাহার শরীরে শত বৃশ্চিকের জ্বালা ঢালিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে অমৃতের প্রলেপ লাগাইয়া দিল। সমস্ত শরীরটা রোমাঞ্চ দিয়া দিয়া উঠিতে লাগিল, কি একটা অসহ্য সুখদুঃখের অনুভূতিতে চম্পা ঘাড়টা অন্য দিকে ফিরাইয়া লইল। এদিকে আর চেতনা নাই, মনে হইতেছে রোমাঞ্চে রোমাঞ্চে সমস্ত শরীরটা কাঁপাইয়া হালকা করিয়া কে যেন—কি যেন তাহার মধ্যে থেকে আলাদা হইয়া যাইতেছে, সে নিজেই যেন পাথরের মত ভারী, কিসের থেকে হইয়া যাইতেছে পৃথক, পুলকের অসহনীয়তায় চোখ দুইটি আসিতেছে বুজিয়া।

চেতনা হইল ম্যানেজার যখন একেবারে উগ্র হইয়া একটা কি ইংরেজী বলিয়া উঠিয়াছেন। চম্পার সমস্ত শরীরটা তখন আবার কঠিন হইয়া উঠিল। তাহার পর স্পষ্টই বচসা—এক দিকে উগ্র হুঙ্কার, এক দিকে অবিচলিত, ধীর, নির্ভীক কণ্ঠে উত্তর—অধিকারের তারতম্য লইয়া টুলুর সেই দীর্ঘ বক্তৃতা। চম্পার সঙ্গে ম্যানেজারও যেন স্তম্ভিত হইয়া গেছে—অবশ্য দুই জনে দুই ভাবে। চম্পার কানে যেন লাগিয়া আছে—"আমারও তেমনি ওদের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে রাখবার অধিকার—বোধ হয় আরও বেশি।" চম্পার চোখ দুইটি আবার বুজিয়া আসিল।

তাহার পর ম্যানেজারের সেই প্রায় লাফাইয়া উঠিয়াই ইংরেজীতে হুঙ্কার। একটা উৎকট আশঙ্কায় চম্পা আপনা হইতেই সামনে এক পা আগাইয়া গেল; স্ত্রী-সুলভ অনুপ্রেরণাতেই দুইজনের মধ্যে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করিতে গিয়া তখনই আবার টানিয়া লইল।

টুলু স্পর্ধিত বিক্রমে ম্যানেজারের আস্ফালনের উত্তর দিয়া বারান্দা হইতে নামিয়া গেটের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। চম্পা যেন চোখ না তুলিয়া পারিল না;—বালিয়াড়ি থেকে ফেরার পথের সেই ঋজু, নিস্পন্দ গতি—এতটা আবেগ, তবু তাহার চেয়ে এতটুকুও দ্রুত নয়।

টুলু চলিয়া গেলে দুইজনেই খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিল। অভিনয়ের আসর গেছে ভাঙিয়া, কিন্তু পা উঠিতেছে না বলিয়া চম্পা যাইতে পারিতেছে না। ম্যানেজার স্থিরদৃষ্টিতে এক দিকে চাহিয়া আছেন, গাঢ় নিশ্বাস, বুকটা উঠানামা করিতেছে। একটু পরে ঘুরিয়া চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"এরই কাছ থেকে তুই ছেলেটাকে কেড়ে নিয়েছিলি?"

চম্পা উত্তর করিল—"হ্যাঁ।"

"যা, মাসহারা বরাদ্দ হয়ে যাবে ছেলেটার।"—বলিয়া ম্যানেজার উঠিয়া পর্দা ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। দাঁতে-পেষা একটা ইংরেজী শব্দ চম্পার কানে আসিয়া বাজিল।

পথটা পরিস্কার হওয়ায় চম্পা যেন বাঁচিল। ছুটিতে ইচ্ছা করিতেছে, তবু খুব সংযত পদক্ষেপেই গেট পর্যন্ত রাস্তাটা অতিক্রম করিল, পার হইয়া কিন্তু গতি যতটা সম্ভব দ্রুত করিয়া দিল। বাজারের পিছন দিয়া একটা পায়ে-হাঁটা পথ গঞ্জের উল্টা দিকে চলিয়া গেছে, আগাছার পাশ দিয়া, কয়েকটা খোয়াই পার হইয়া, কয়েকটা ছোট ছোট টিলা অতিক্রম করিয়া। লোক-চলাচল খুব কম। চম্পা সেই পথ ধরিয়া চলিল। বাজার পিছনে ফেলিয়া পথটা বড় রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে, তাহার পর সেটা অতিক্রম করিয়া বস্তির দিকে চলিয়া গিয়াছে। বড় রাস্তাটা বালিয়াড়ির পথ; স্কুল ডাহিনে রাখিয়া পাশ দিয়া নামিয়া গেছে। এই চৌমাথার উপর আসিয়া চম্পা একটু দাঁড়াইয়া পড়িল। একবার নিজের শাড়িটার দিকে দৃষ্টি নত করিয়া দেখিল; কি একটা দ্বিধায় পড়িয়া গেছে। বহুদূরে স্কুলটা দেখা যায়, একবার সেই দিকেও দৃষ্টি তুলিয়া দেখিল, তাহার পর আরও দ্রুতপদে বস্তির পানে চলিল; ত্রস্ততার জন্য শরীরটা কাঁপিতেছে। ঘর খুলিয়া খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া লইল; যেটা পরিল সেটা ওর মজুরখাটার শাড়ি—মোটা, একটু খাটো; কয়লার দাগ ও থাকিতে দেয় না, তবু বেশ মলিন।...আবার দরজায় কুলুপ দিয়া স্কুলের পথ ধরিল।

বস্তি হইতে বাহির হইয়া বাজার থেকে স্কুল পর্যন্ত প্রায় সমস্ত রাস্তাটা দেখা যায়। চম্পা আগাগোড়া একবার দেখিয়া লইল। টুলুকে খুঁজিতেছে। চম্পা

হাঁটাপথে নিজে যে রেটে আসিয়াছে তাহাতে বড় পথ ধরিয়া টুলু কখনই তাহার আগে পৌঁছিতে পারে না।...টুলুকে দেখে গেল,—যে চৌমাথাটা চম্পা এইমাত্র অতিক্রম করিয়া আসিল, তাহার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। চম্পা একরকম ছুটিলই বলা চলে। একটি ছোট টিলা সামনে খানিকটা আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, সেটা যতক্ষণে অতিক্রম করিল, টুলু ততক্ষণে চৌমাথা পার হইয়া স্কুলের দিকে খানিকটা অগ্রসর হইয়া গেছে। চম্পা পা চালাইয়া একটুর মধ্যে ধরিয়া ফেলিল, পিছন হইতেই বলিল—"শুনুন।"

টুলু ফিরিয়া একেবারে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মিনিট কুড়িও হয় নাই বোধ হয়, এর মধ্যে চেহারায় আর বেশে এত পরিবর্তন—সে নিজের দৃষ্টিকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। চম্পা বলিল—"আমি চম্পাই, চরণদাসের আর মেয়ে নেই।...ইয়ে, আপনি ও-বাসায় কোনমতে আর ঢুকবেন না।"

টুলু উত্তর না দিয়া চাহিয়াই রহিল, আগে চেহারা আর বেশের জন্য বিস্ময় ছিল, এখন আবার কথার জন্যও ভ্রূ দুইটা শুধু আরও কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

চম্পা বলিয়া চলিল—"ঢুকবেন না আপনি ও-বাসায়। বড় ভীষণ লোক ও; এমনিই এক রকম, চেনা যায় না, কাজের বেলায়—মানে, নিজের কাজ হাসিল করতে এমন কিছু নেই যা ও করতে পারে না—আমরা এই ছ-মাস থেকে দেখছি—কত ব্যাপার দেখেছি—এক-একটার কথা মনে হ'লে শিউরে উঠতে হয়—যাবেন না আপনি—ও যে কত ভয়ঙ্কর!..."

রোদে, আবেগে চম্পার মুখ সিঁদুর হইয়া উঠিয়াছে; কপালের চুল ঘামে ভিজিয়া কপালে, কানের গোড়ায় সাঁটিয়া সাঁটিয়া গেছে, চোখে একটা উগ্র আতঙ্ক, সেই সঙ্গে গভীর মিনতি।

টুলু শান্ত কণ্ঠে বলিল—"যতই ভীষণ হোক ও, আমায় যেতেই হবে ও-বাসায়।"

চম্পা অসহায় দৃষ্টিতে একবার এদিক ওদিক চাহিল, কোন পথিককেও যদি পায় তো যেন নিজের সাহায্যে টানে। চারিদিক নির্জন, চম্পা আরও মিনতির কণ্ঠে বলিল—"না, যাবেন না, কোন মতেই যাবেন না।"

"তুমি তো শুনলেই ওখানে, খুন হওয়াকে আমি ভয় করি না, তার জন্যে আমি তৈরিই আছি।"

"হ্যাঁ, শুনেছি, কিন্তু সে রাগের মাথায় বলেছিলেন ব'লে···খুন হওয়াকেও যদি ভয় করেন না বলছেন, তা হ'লে···"

"তার চেয়ে একটা বড় জিনিস আছে, আমি সেইটেকে ভয় করি।"

"কিন্তু খুন হওয়ার চেয়ে আর বেশি ভয়ের কি আছে? মানুষের—"

উত্তেজনায় কাঁপিতেছে। টুলু বলিল—"ভেবে দেখলে নিজেই কোন সময় বুঝতে পারবে সে কথা; এখন তোমার মন বড় চঞ্চল রয়েছে। আমায় যেতে দাও চম্পা, তুমি বাড়ি ফিরে যাও।"

চম্পা নিজের নামের এই প্রথম উচ্চারণে যেন সামান্য একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেল। তাহার পর আরও ব্যাকুলভাবে সামনের দিকে গিয়া কতকটা পথ-আগলানো গোছের করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"না, যাবেন না—কোন মতেই না—মাস্টারমশাই পর্যন্ত বাসায় নেই যে···"

—টুলু প্রশ্ন করিল—"আমার পথ আগলাচ্ছ তুমি?"

"যাবেন না, দয়া ক'রে যাবেন না; এই পায়ে ধরছি আপনার।"

একটু ঝুঁকিতেই টুলু দুই পা পিছাইয়া গেল। চম্পা সোজা হইয়া মুহূর্ত কয়েক মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, চোখের দৃষ্টিতে একটু কি পরিবর্তন হইয়াছে। তাহার পর বেশ ভালো ভাবেই মুখামুখী হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"হ্যাঁ, আগলাচ্ছি পথ। আমি নোংরা, আমি নরক, আমায় না ছুঁয়ে, আমায় না মাড়িয়ে তো আপনি যেতে···"

অতিমাত্র উত্তেজনায় একটু অসম্বৃত হইয়া গেছে, ভারী শাড়ির আঁচলটা গড়াইয়া মাটিতে ঠেকিতেই টুলু শান্তভাবে সেটা তুলিয়া চম্পার দিকে একটু বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"নোংরা, না-ছোঁওয়া—এসব কোন কথাই নয় চম্পা। আসল কথা, আমায় যেতেই হবে ও-বাসায়। সত্যি, একজন মেয়েছেলেকে ঠেলে তো আমি যেতে পারব না; আমার অনুরোধ, তুমি পথ ছেড়ে দাও আমায়।"

চম্পা নিজের পরাভবটা ডান হাতে তুলিয়া লইল। আরও যেন অসহায়

হইয়া গেছে। কোন উপায় নাই দেখিয়া ব্যাকুলভাবেই শান্ত হইয়া গেছে একটু ; আঁচলটা যথাস্থানে তুলিয়া নিয়া বলিল—"কেন যাবেন বলুন আপনি ?"

টুলু একবার তর্কের মোড় ফিরাইল, যদি এই দিক বোঝানো যায় এই অশিক্ষিতা মেয়েটাকে ; বলিল—"না গিয়ে কোথায় যাব ? এখানে…"

চম্পা সঙ্গে সঙ্গে স্থিরদৃষ্টি মুখে রাখিয়া বলিল—"আপনি ব্যানার্জিবাবুদের ভাইপো ; ম্যানেজারবাবু জানেন না ব'লে কি আর কেউ…"

হঠাৎ থামিয়া গেল ; দৃষ্টিটা কিন্তু মুখ থেকে সরাইল না। টুলু বলিল—"বেশ, তা হ'লে আসল কথাটা বলি—যদিও বলার দরকার নেই, কেন না এক্ষুনি ম্যানেজারবাবুর ওখানে শুনলে—মাস্টারমশাই আমায় এই বাসায় থাকতে ব'লে গেছেন, তাঁর কথা…"

চম্পা জিতিতেছে ; আবার বাধা দিয়া বলিল—"কিন্তু মাস্টারমশাই জানতেন না তো যে, ব্যাপারটা এই রকম হবে ; দাদু চিঠিটা ভুল ক'রে দিয়ে গিয়েছিল ব'লেই তো এই অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে।"

টুলুর মুখটা শান্ত ; কিন্তু ভিতরের শান্তি হারাইতেছে ; তবু একবার চেষ্টা করিল, বলিল—"তা হ'লেও—তাঁর হুকুম…"

চম্পা বিজয়িনীর মতোই একটু সিধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; আর কি—হইয়া আসিল তো ; বলিল—"বাঃ, তিনি না জেনে হুকুম দিয়েছেন ব'লে আপনি জেনে শুনে এগিয়ে যাবেন ? আপনার যা সর্বনাশ তা থেকে কোন মতেই ফিরবেন না ?"

টুলুর দৃষ্টি হঠাৎ যেন অগ্নিবর্ষী হইয়া উঠিল, কতকটা গর্জন করিয়াই বলিল—"মেয়েদের একটা বড় অস্ত্র অযথা তর্ক, তুমি তাই ধরেছ চম্পা ; কিন্তু জিজ্ঞেস করি—কেউ কি ফেরে নিজের সর্বনাশ থেকে ?—তুমি ফিরেছ ?—কাল তোমার সর্বনাশের একেবারে মধ্যিখান থেকে তোমায় ফিরিয়ে এনেছিলাম আমি, কিন্তু এলে কি ফিরে ?—আবার কি তুমি নেমে যাও নি ?—বল, কথা কইছ না কেন ? আজ এই একটু আগে ম্যানেজারের ওখানে যে…"

নিজেকে সংযত করিয়া লইল ; সঙ্গে সঙ্গে চম্পার পাশ কাটাইয়া স্কুলের টিলার দিকে পা বাড়াইয়া বলিল—"যাও, পথ ছেড়ে দাও আমায়।"

॥ চৌদ্দ ॥

মনটা এই যে একটা নূতন ধাক্কা খাইল, আবার গুছাইয়া লইতে সময় লাগিল চম্পার। যে চায় না, যাহার কাছে অনাদর, তাহার কাছ থেকে দূরে সরিয়া যাইতেই চাহিল সে—কতকটা অভিমানে, কতকটা আক্রোশেও; আদর তো তাহার চারিদিকে ছড়ানো রহিয়াছে, তবে এ অকিঞ্চনবৃত্তি কেন? অনেকক্ষণ এই কথাটাই রহিল মনে স্পষ্ট হইয়া, তাহার পর কখন যে ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল টেরও পাইল না। একটা উদ্বেগেই মনটা রহিল ভরিয়া—টুলু আজ নিতান্তই বিপন্ন, বিপদটা যে-কোন আকারেই আজ রাত্রে উপস্থিত হইতে পারে, অথচ লোকালয় থেকে অতটা দূরে সে প্রায় একাই। সবচেয়ে ভাবনার কথা বিপদ সম্বন্ধে সচেতন নয় টুলু—চম্পা অত করিয়া পারিলও না সচেতন করিতে; এখন একমাত্র উপায় ওর বিপদকে যদি কেহ আপন বিপদ করিয়া লয়। কে লইবে আপন করিয়া?

অভিমান, আক্রোশ সব গেল উবিয়া। এই প্রশ্নটির চারিদিকে মনটা ঘুরপাক খাইতে লাগিল। কখন যে টুলুর বিপদ চম্পার আপন বিপদ হইয়া গেছে বুঝিতেও পারিল না, শুধু সকালের চেয়ে আরও একটা তীব্রতর উৎকণ্ঠায় মনটা অস্থির হইয়া উঠিল,—কি করা যায়? কি করিয়া বাঁচানো যায় টুলুকে এই নিদারুণ সঙ্কটে? সে তো স্ত্রীলোক—অসহায়, কি করিবে?

লোকের দরকার—বেশ সুস্থ সবল পুরুষ মানুষের। কিন্তু ম্যানেজারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে কে? বিকাল হইয়া গেছে, আর সময়ই বা কোথায়? অন্ধকার একটু গাঢ় হইয়া আসিলেই টুলুর পাশে লোক থাকা দরকার; কে যাইবে, কাহাকে রাজি করা যায়?

মনের অস্থিরতায় চম্পা কয়েক বার ভিতর-বাহির করিল, তাহার পর তাহার মনে পড়িল চরণদাসের কথা। একটা অবলম্বন পাইয়া মনটা কতকটা যেন সুস্থির

হইল—কেন যে চরণদাসের কথা গোড়াতেই মনে পড়ে নাই…কিন্তু চরণদাসকেই বা কি বলিয়া লইয়া যাওয়া যায় ?

ঘরের চৌকাঠের উপর চুপ করিয়া বসিয়া চম্পা ভাবিতে লাগিল, তাহার পর এক সময় হঠাৎ তাহার টুলুর কথা মনে পড়িয়া গেল—বালিয়াড়ির পথে চম্পাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য মিথ্যা রচনা করিয়া বলিতেছে—"হ্যাঁ—ইয়ে—বনমালী—স্কুলের চাকর—তোমার ঠাকুরদাদা নয় ?—তার ভয়ানক অসুখ—স্কুল থেকেই আসছি আমি…"

যতি, ভঙ্গি—সবসুদ্ধ প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মনে আছে চম্পার, যেমন তাহার অন্য সব কথাও আছে মনে গাঁথিয়া। একই মিথ্যা—এক জনের মুখে যদি দোষের না হয় তো অন্য জনের মুখেই বা হইবে কেন ? চম্পা ঐ মিথ্যাকেই বুনিয়াদ করিয়া তাহার ইতিকর্তব্যের একটি পরিপূর্ণ রূপ গঠন করিয়া লইল।

সন্ধ্যার একটু আগে খনিতে নামিয়া সে চরণদাসের সুড়ঙ্গের সামনে দাঁড়াইয়া ডাকিল—"একবার বাইরে আসবিক নাই ?"

গাঁইতা রাখিয়া চরণদাস সুড়ঙ্গের মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কপালের ঘাম আঙুল দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল—"তুকে আজ সমস্ত দিন দেখি নাই ক্যানে গো ? কাজে আসিস নাই, আমার ভাত আনিস নাই; আমি বাজার যেঁয়ে মুড়ি আনায়্যাঁ খেলাম বটে।"

চম্পা একটু রাগের ভান করিয়া বলিল—"বাপের অসুখ, তুর কাজের ঘটা পড়ে গেইছে বটে, এক জনকে রইতে তো হবেক উখানে ?"

"বুড়ার অসুখ ! কই জানতে তো পারি নাই !"

"তু গাঁইতো চালা ক্যানে, জানতে পারবিক। সমস্ত দিনটি আমার ন'ড়ে বৈস্‌তে দিলেক নাই, বিকালেঁ একটু ঘুমোলেক, তুরে খবর দিতে আঁইছি তাড়াতাড়ি।"

চরণদাস গাঁইতা রাখিয়া সত্যসত্যই বাহির হইয়া আসিতেছিল, চম্পা বারণ করিল, কেন না তাহার একটু সময় দরকার, চরণ সঙ্গে গেলে তাহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইবে না। বলিল—এর পর বেশিরকম ছুটি লইবার দরকার হইতে পারে,

আপাতত সে যেন নিজের ডিউটিটুকু সারিয়াই আসে, বিশেষ ভয়ের কারণ নাই, চম্পা আগাইয়া যাইতেছে। সুড়ঙ্গের মুখের কাছটিতে চরণদাসের সুরার বোতলটি রাখা থাকে, ডিউটির মধ্যে অর্ধেকের কিছু উপরটা শেষ করে, তাহার পর বাসার পথে সেটাকে দোকান থেকে পূর্ণ করিয়া লয়—রাতের খোরাক, দোকানে যেটুকু খাইয়া লয় সে তো আলাদা!···চম্পা বোতলটি তুলিয়া লইল, একটু কড়া চোখেই বাপের দিকে চাহিয়া বলিল—"আমি ইটি সঙ্গে নিলাম বটে, তু আজ দোকানেও খাবিক নি; বুড়া মরছে···রাতেঁ ডাক্তারবণ্ডি ডাকতে সে তো আমি যাবোক নাই।"

মেয়ের দৃষ্টির সামনে চরণ স্পষ্টই একটু সঙ্কুচিত হইয়া গেল যেন, আমতা আমতা করিয়া বলিল—"তু যাবিক ক্যানে গো ?···তা নিয়া যা ক্যানে বোতলটা, ছুকানে যাবোক নাই···উতে একটু আছে বটে, যেন নষ্টটি করিস নাই, ছুকানে যাবোক নাই, তু নষ্টটি করিস নাই—নক্ষী বিটিটি আমার···চম্পা বিটিটি··"

বস্তিতে আসিয়া চম্পা একেবারে ছিয়াত্তর নম্বরে উপস্থিত হইল। মিতিন কাজে বাহির হয় না, শিশুটি বড়ই ছোট; অবশ্য ওর চেয়েও ছোট শিশু লইয়া বস্তিতে অনেককে গতর খাটাইতে হয়, কিন্তু মিতিনের স্বামী প্রহ্লাদ লোকটা ভালো,—নেশাটেশার দিকে ঝোঁক খুব কম, আর স্ত্রীর খুব অনুগত, ফলে উপার্জন যা করে তার প্রায় সবটুকুই ঘরে উঠে, এই রকম, সব অসময়ের জন্য কিছু সঞ্চয়ও হয়।

চম্পা মিতিনের নিকট হইতে একটা রাতের জন্য প্রহ্লাদকে চাহিয়া লইল—ঠাকুরদাদার বড্ড অসুখ, বাপকে লইয়া যাইতেছে, তবে একেবারে নির্জন জায়গা, গঞ্জ থেকে অতটা দূর, অন্তত দুইজন পুরুষও না থাকিলে ভরসা হয় না। ধরো, রাত তিন পহরে হঠাৎ ডাক্তার-বৈদ্য ডাকিতে হইল, চরণদাসকে বাহিরে যাইতে হইল, একা স্ত্রীলোক রোগীর শিয়রে বসিয়া কি করিয়া কাটাইবে চম্পা ?

একটা পুরুষ বাড়ির মধ্যে কোথাও যদি পড়িয়াও থাকে, একটা ভরসা থাকে মনে।

গোছালো মেয়ে সবদিকেই গোছালো হয়, সব দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া চলে,—মিতিন চম্পার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া সবটুকু শুনিল, সোজা 'না' বলিল

না, তবে মাস্টারমশাইয়ের কথা তুলিল, টুলুরও,—ছুই জন পুরুষ তো রহিয়াছেই কাছে, কতটুকুই বা দূর স্কুল আর মাস্টারমশাইয়ের ডেরায় ?

চম্পা মুহূর্তখানেক মুখটা ঘুরাইয়া কি ভাবিয়া লইল, মাস্টারমশাইয়ের অনুপস্থিতির কথা আর বলিল না, বলিল—ওরা বড়মানুষ, কথায় কথায় টাকার চকমকানি দেখায়, গরিবের ডাকে ওরা যদি সাড়া দিত তো দুনিয়া উল্টাইয়া যাইত। এমনি ভারি তো ভরসা, তাহার উপর ছেলে কাড়িয়া লইয়া চম্পা আবার ওদের শত্রু করিয়া তুলিয়াছে। চম্পা অভিমানের সঙ্গে একটু বিদ্রূপ মিশাইয়া বলিল—"কপালটি ভাঙলে এমনিটি হয় গো মিত্তিন, ভাল লোককে দুশমন বানালাম বটে, নিজের মিত্তিন মুখ ঘুরায়েঁ নিবেক নাই ? তুর ডর লাগে—তুর বরকে কেড়্যা লিবোক, আঁচলে বেন্ধে রাখ্ ক্যানে ; কপালটি ভেঙেছে আমার, বুড়া মরবেক, এ সময় কে আপ্পুন হবেক গো ?"

মিত্তিন মনে মনে হিসাব করিল ; যে সত্যই কাড়িয়া লইতে পারে সে যখন চাহিয়া লইতেছে, তখন রাজি হওয়াই সুবুদ্ধির কাজ নয় কি ? যুদ্ধের ভাবের চেয়ে শান্তির ভাবই ভালো, মানুষের একটা ধর্মজ্ঞান তো আছেই ? হাসিয়া বলিল—"তা যাবে গো, এত কথা ক্যানে ? পাঠাইয়েঁ দিবোক রাইয়েঁর কুঞ্জে ; আসুক ক্যানে, খাইয়া-দাইয়া যাবেক, কেড়্যা লিবেক তো ডর কি আছে গো !"

যে হিসাবের উপর চালায়, একটা রাত্রের খোরাক তাহার হিসাবের বাইরে পড়ে না, চম্পাও লোভটুকুর রাস্তা খুলিয়াই রাখিল, হাসিয়াই বলিল—"রাইয়েঁর কুঞ্জে যাবেক তো কুব্জাবুড়ীর ভাত ক্যানে খেতে যাবেক ? রাইয়েঁর তো সবখানিই কলঙ্ক, ই কলঙ্কটি ক্যানে ঘাড় পেতে লিবেক গো ?"

দুইটি লোক হইল, প্রহ্লাদ আবার একটা লোকের মতো লোক। চম্পা হীরককে লইয়া একটু ঘাঁটাঘাঁটি করিল, সমস্ত রাত দেখিতে আসিতে পারিবে না, বার বার কত করিয়া বলিয়া দিল। বলিল—"একটু জেগেঁ ঘুমাস-গো মিত্তিন, তুর ঘুমটি না চণ্ডালটি বটে—উর মা কাছে থাকবেক নাই, তু একটু জেগেঁ ঘুমাস বটে।"

সমস্ত দিনের নানা রকমের আবেগ মনে যেন একটা চাপ বাঁধিয়া রহিয়াছে, হঠাৎ চোখ দুইটি ছল ছল করিয়া উঠিল, গলা ভারী হইয়া উঠিল, হীরকের ছোট্ট

বুকে মাথাটা রাখিয়া চম্পা চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল, বার দুই তিন একটু ফোঁপানির শব্দ হইল। মেয়েরা বোঝে—এই সব ভুল পথে হঠাৎ অশ্রুর পিছনে অনেক কথা লুকানো থাকে, মিতিন কিছু বলিল না।

একবার বাসায় গিয়া কিছু চালডাল আলু আর কয়েকটা টুকিটাকি লইয়া দোরে তালা আঁটিয়া চম্পা স্কুলের পথে বিদায় হইল। যখন পৌছিল অন্ধকার একটু গাঢ় হইয়াছে। স্কুলের হাতাটা দেওয়াল দিয়া ঘেরা, তাহার একপাশে বনমালীর বাসা। দুইটা পাশাপাশি ঘর, নিচু ছাত, সামনে একটা বারান্দা। সমস্তটা দেওয়াল দিয়া ঘেরা। একটা ঘরে বনমালী রান্না করে, একটায় থাকে। ফটকটা ভেজানো ছিল, চম্পা প্রবেশ করিয়া যখন বাসার সামনে উপস্থিত হইল, বনমালী হাতে একটা টেমি লইয়া রান্নাঘরের দিকে যাইতেছিল, উনান ধরিয়াছে, এইবার রান্নার ব্যবস্থা করিবে।

চম্পাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, একে দৃষ্টিশক্তি কমই তাহার উপর হাতে টেমিটা থাকায় একটু আলো-আঁধারি গোছের হইয়াছে, প্রশ্ন করিল—"কে বটে ?"

চম্পা উত্তর করিল—"আমি চম্পা।"

বনমালী আলোটা চম্পার মুখের দিকে একটু বাড়াইয়া ধরিল, ঠাহর করিয়া দেখিয়া বিস্মিতভাবে একটু মাথা নাড়িয়া বলিল—"হুঁ, তাই তে বটে ; তা রাত-বিহারে ? একা আইছিস নাকি ? খবর কি আছে গো ? চরণদাস…"

চম্পা বারান্দায় উঠিয়া আসিল, ভ্রূ দুইটা কুঞ্চিত করিয়া গম্ভীরভাবে বনমালীর পানে চাহিয়া বলিল—"খবর থাক্, তুর না শক্ত বেমারি হইছেঁ, তু রান্নার তরে যাচ্ছিঁস !"

ঠাকুরদাদার দুর্বলতা নাতনীর ভালো রকমই জানা, তাহারই ভরসায় সন্ধ্যা হইতে এত তোড়জোড় ; বনমালী একেবারে ভ্যাবাচাকা খাইয়া গিয়া অপলকনেত্রে চম্পার পানে চাহিয়া রহিল, বাক্‌স্ফূর্তিই হইল না। অবস্থাটা স্পষ্টভাবে বুঝিবার জন্ম মাথার ডান দিকটা কয়েকবার চুলকাইয়া লইল, তাহার পর বলিল—"শক্ত বেমারি ! কই, আমি তো জানি নাই বটে !"

"তু জানলে রান্না করতে যাস ? তুর মাথায় কিছু আছে যে জানবিক ?"

বনমালীর আরও গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল, একটু কম্পিতহস্তে টেমিটা জানালার খাঁজে রাখিয়া দিয়া বলিল—"তুকে কে বুললে ?"

চম্পা একটু মুখ-ঝামটা দিয়াই বলিল—"কে বললে সেই কথাটি এখন বলো বুড়াকে। কেউ বুললেক নাই তো রাতবিহারে আইছিঁ কি ক'রে তাই ভাব ক্যানে।"

সত্যই তো কেহ না বলিলে চম্পা আসিবেই বা কেন, আর অসুখ না হইলে কেহ বলিতেই বা কেন যাইবে ? বনমালীর মাথাটা আরও গুলাইয়া গেল, মূঢ় দৃষ্টিতে চম্পার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"তা হ'লে ?"

"তা হ'লে শুয়ে থাক যেয়েঁ, বেমারিতে পাক করে কোন্ দেশে শুনেছিঁস ? আমি পাক সেরে তুকে দেখছিঁ। বাবাকে আসতে বুলেছিঁ, পেল্লাদ আসবেক, উ দুজনে রাত্তিরে আসবেক বটে। তুর শুধু বুক হাঁইপাঁই করছেঁ, কি মাজাতেও বিঁথা আছে বটে ?"

আবার দুই জনের রাত্রে কাছে থাকিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে! ব্যাপার এতটা সঙ্গীন দেখিয়া বনমালীর মুখ আরও শুকাইয়া গেল, একটা হাত বুকে একটা হাত কোমরে দিয়া বলিল—"মাজাতেও তো রইছেঁ বিঁথা,—হুঁ, রইছে, বটে—রইছেঁ…"

চম্পা আবার মুখ-ঝামটা দিয়া বলিল—"রইছেঁ তো রাঁধ যেয়েঁ!…আয় ইদিকে।"

টেমিটা লইয়া পাশের ঘরে বনমালীর সংক্ষিপ্ত বিছানাটা ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া দড়ির খাটটাতে ভালো করিয়া বিছাইয়া দিল, বনমালী উঠিয়া শয়ন করিলে বলিল—"বাবা আর পেল্লাদ এলে মাজায় বিথাঁর কথাও বুলবি, লুকাবিক নাই, দেখি তোর হাতটা।"

বনমালী বাড়াইয়া ধরিলে নাড়ীটা টিপিয়া বলিল—"নাড়িতে বেগ রইছেঁ। বুড়া হ'লে, আপ্‌নি অসুখ বুঝে না; দেখথো না গো।"

বনমালী একটু হতাশ ভাবেই বলিল—"বাঁচবোক নাই ?—হ্যাঁ রে চম্পা ?"

"মরতিস ; আর বাঁচবিক নাই ক্যানে ? সব্বাই তো এসে গেলাম, চিকিচ্ছাটি

শুরু হয়ে গেল ; আর বাঁচবিক নাই ক্যানে ?···সুজির সেক দিব, বাড়িতে আটা আছে বটে ?"

"টুলুবাবুটি রুটি খায়—উই যে মাস্টারমশায়ের কে হয় বটে—উর জন্যে আটা আনছি···"

চম্পার ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল—"উর পাক তুই করিস ? তুর হাতে খায় ?"

বনমালী বলিল—"খাবেক নাই ? আমি বোষ্টমের পো, খাবেক নাই ? ডোম আছি, না চাঁড়ালটি আছি গো ? খাবেক নাই ক্যানে ?"

চম্পা একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেছে, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তাহার পর একটু অন্যমনস্ক ভাবেই বলিল—"না, উরা বামুন, তাই বুলছিলাম, খায় না সবার হাতে।"

আরও একটু চুপ করিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর দৃষ্টিটা ফিরাইয়া আনিয়া বলিল—"উরা আমাদের ঘেন্না করে যে—চাঁড়ালটি না হই, নিচু জাত বটে তো গো !"

তাহার পর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় সচকিত হইয়া উঠিয়া বলিল—"তু একটু র, আমি আসছি।"

হঠাৎ সকালের কথা মনে পড়িয়া গেছে, ম্যানেজারের সেই রুদ্রমূর্তি ; চম্পা তাড়াতাড়ি স্কুলের গেট খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে। সন্ধ্যা উৎরাইয়া গেছে, অন্ধকার এখন ম্যানেজারের সহায়, এর মধ্যে কিছু হইয়া যায় নাই তো ? নিঃশব্দে একটি জীবনের শিখা নির্বাপিত করিয়া অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া যাইবার মতো মানুষের অভাব নাই ম্যানেজারের। চম্পা অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া উঠিল, রাস্তায় নামিয়া অন্ধকার ভেদ করিয়া নিজের দৃষ্টিকে যত দূর পারিল প্রসারিত করিয়া দিল, কেহ কাজ শেষ করিয়া চলিয়া যাইতেছে না তো ?···কেহ আসিতেছে না তো ঐ উদ্দেশ্যে ? কিছুদূর পর্যন্ত নামিয়াও গেল, তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া মাস্টার-মশাইয়ের বাসার দিকে অগ্রসর হইল। রাস্তার ধারের ঘর থেকে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা রাস্তার উপর আসিয়া পড়িয়াছে ; চম্পা পা টিপিয়া টিপিয়া

অগ্রসর হইল, তাহার পর খুব সন্তর্পণে জানালার পাল্লা আর চৌকাঠের ফাঁক দিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিল। টুলু চিৎ হইয়া শুইয়া গভীর অভিনিবেশে কি একখানা মোটা বই পড়িতেছে। চম্পা ধীরে ধীরে একটি স্বস্তির নিশ্বাস মোচন করিল, তাহার পর সেই সংকীর্ণ অবকাশের মধ্য দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। কি দেখিল সে-ই জানে, একসময় নিচু হইয়া জানালার সামনেটা অতিক্রম করিয়া দেয়ালের বাহিরে বাহিরে চারিদিকটা ঘুরিয়া আবার স্কুলের দিকে চলিয়া আসিল। একটা পাহারা শেষ করিয়া আবার ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

টুলু তাহা হইলে খায় বনমালীর হাতে! ছেলেবেলায় মিশন স্কুলে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনিয়াছিল; ওসব লইয়া উত্তর-জীবনে মাথা না ঘামাইলেও টুলু ব্রাহ্মণ হইয়াও যে খায় ওদের হাতে, এ সংবাদটাতে ওর মনটা তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। টুলু বিশিষ্টই, আরও বিশিষ্ট হইয়া উঠিল চম্পার চোখে; ও যেন এক-আকাশ তারার মধ্যে চাঁদ; এ চাঁদ শুধু বিশিষ্টই নয়, বড় আপন, বড় নিকটের, হাত বাড়াইলেই যেন পাওয়া যায়।···টুলু তা হ'লে চম্পার হাতে খাইবে!···

একটা অব্যক্ত পুলক বুকে করিয়া চম্পা রন্ধনের যোগাড় করিতে গেল। কিন্তু আয়োজন বেশি দূর অগ্রসর হইবার আগেই টুলু যে কত দূর তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। কাল রাত্রিশেষের সেই অনুভূতিটা আবার কোন্ দিক দিয়া আসিয়া পড়িয়াছে, সেই নিজেকে অশুচি বলিয়া মনে হওয়া, যাহার জন্য হীরক টুলুর মনের স্পর্শ পাইয়াছে বলিয়াই চম্পা তাহাকে বুক দিয়া জড়াইয়া ধরিতে পারিল না তখন। অনুভূতিটা হয়তো স্থায়ী হইতে পারিতেছে না, কিন্তু সময়ে অসময়ে কয়েকবারই উঁকি মারিয়া গেছে চম্পার মনে।

খুব উৎসাহের সঙ্গে তাড়াতাড়ি কুটনা কুটিল, মশলা বাটিল, আটা মাখিল, —টুলুকে রাঁধিয়া দিবে আজ···তাহার পর রুটি বেলিয়া ভাজিতে যাইবে, হাত-পা গুটাইয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। বনমালীর হাতে খাক, কিন্তু চম্পার-বনমালীতে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ—টুলু তপঃভ্রষ্ট হইবে। চম্পা

মনকে অন্য ভাবেও যে বুঝাইতে চেষ্টা না করিল তেমন নয়, কিন্তু যেন সাহস হইল না অগ্রসর হইতে।

বনমালীকে আবার উঠাইল, বনমালী কলের মানুষ, ওর মাথার মধ্যে সুকৌশলে একটা আইডিয়া প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিলেই হইল। রহস্যটা চতুরা নাতনির ভালোরকমই জানা আছে। বনমালীকে বুঝাইল, তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেছে বামুনের রান্না করিয়া দেওয়া এসব রোগের একটা বড় চিকিৎসা। সুতরাং বনমালী একবার বুকে দিয়া একবার কোমরে হাত দিয়া রুটি সেকিয়া, তরকারী করিয়া দুধটুকু জ্বাল দিয়া দিল। শেষ হইলে চম্পা চোখের ওপর চোখ রাখিয়া প্রশ্ন করিল—"কি বুলিস—একটু ভাল বোধ হইছে না?"

বনমালী আর একবার বুকে আর কোমরে হাত দিয়া রোগের অবস্থাটা অনুভব করিল, মাথা নাড়িয়া বলিল—"হঁ, আধাআধি কাবার হইছেঁ বেমারিটা গো।"

"হবেক নাই? যা দিয়া আয় ক্যানে। পুছ করলে বুলবি তু বাসায় একাটি আছিস, বামুনকে মিছা বুলবিক নাই।" নাতনির হাতে পড়িয়া বনমালীর আজ সত্য-মিথ্যায় জট পাকাইয়া গেছে, একটু মাথা চুলকাইয়া চম্পাকে যেন একটা অস্পষ্টতার মধ্য দিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল—"মিছা কেন বুলতে যাবো গো? বুলবো একাটি আছি বটে।"

"দিয়াঁ আয়, তুও দুখানা ব্যাতে দিয়াঁ শুয়াঁ পড়বি, বুকে পিঠে সুজির সেঁক দিয়া দিব।

চরণদাস আর প্রহ্লাদ যখন আসিল, চম্পা তখন তাহাদের জন্য ব্যস্ত। বনমালী তখন নাতনির হাতের সেবা পাইয়া গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। চম্পা বাপকে জানাইল, অবস্থাটা খুবই খারাপ হইয়াছিল, এখন লক্ষণ ভাল, রোগী ঘুমাইতেছে। আহার করিয়া ওরা দুই জনে স্কুলের বারান্দায় শুইয়া রহিল; চম্পার যতক্ষণে আহার শেষ হইল, ততক্ষণে ওরাও গাঢ় নিদ্রায় অচৈতন্য।

নিদ্রা গেল না শুধু চম্পা। ওর মন অনেকটা প্রশান্ত—সবল সুস্থ পুরুষ রক্ষী, তা ভিন্ন চম্পাও তো সর্বস্ব পণ করিয়া বসিয়া আছে, হঠাৎ কিছু ঘটিতে দিবে না টুলুর উপর। টুলু নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাক।

আহার শেষ করিয়া ফটকের মুখে একটা শিলাখণ্ডের উপর আসিয়া বসিল। দিনের বেলা যখন স্কুল হইতে থাকে, বনমালী এইখানটায় বসিয়া দ্বার রক্ষা করে। চম্পা সমস্ত রাত বসিয়া রহিল, গঞ্জের পথ বাহিয়া, কখন কে আসে সেই অপেক্ষায়—নিশ্চিন্ততার মধ্যেও একটা উদ্বেগ বুকে লইয়া। এদিকটা বেশ গেল, তাহার পর গভীর রাত্রে দেখা গেল, দুইটি লোক চড়াই বাহিয়া উঠিয়া আসিতেছে। চম্পার সমস্ত চেতনা যেন, দুইটি চক্ষে আসিয়া জড়ো হইয়াছে; বুকের ঢিপঢিপানিটা এত বাড়িয়া উঠিল যে, শব্দটা যেন স্পষ্ট শোনা যায়। উহারা আগাইয়া আসিলে চম্পা উঠিয়া থামের আড়ালে দাঁড়াইল···ও লোকটার হাতে ওটা কি যেন?—একবার মনে হইল, চরণদাস আর প্রহ্লাদকে ডাকিয়া তোলে, তাহার পর আবার কি ভাবিয়া অসহ্য উৎকণ্ঠা লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, নিশ্চিন্ত বিপদের সামনে যেন সম্মোহিত হইয়া গেছে। লোক দুইটা কাছাকাছি আসিয়া পড়িতে আরও একটু আড়ালে চম্পা গেল। ভয়ে উৎকণ্ঠায় এমন সংযম হারাইয়াছে নিজের ওপর, বোধ হয় ডাকিয়াই ফেলিত ওদের, কিন্তু ঠিক এই সময় চরণদাস ডাকিয়া উঠিল—"চম্পা আছিঁস?"

কিছু নয়, ওর একটা অভ্যাস—বস্তিতে নেশার মধ্যে নিতান্ত যান্ত্রিক ভাবেই এক-আধবার ঐ রকম চেঁচাইয়া ওঠে,—মেয়ের খোঁজ নেয়। সাড়া পাইয়া চম্পার যেন সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল শরীরে, স্তব্ধ ভাবে আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

স্কুল পার হইয়া লোক দুইটি আগাইয়া চলিল, চম্পা আবার অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া এক পা এক পা করিয়া ফটকের বাহিরে আসিল, তাহার পর নিচু হইয়া চৌহদ্দির দেয়াল ঘেঁষিয়া অগ্রসর হইল।···না, ভয়ের কিছু নয়, বাসা পারাইয়া উহারা আগাইয়া গেল; একবার ফিরিয়াও চাহিল না এদিকে, ভিন্ গাঁয়ের লোক, নিজের কাজে যাইতেছে উহারা—ওদিককার ঢালু পথে অনেকখানি নামিয়া গেলে চম্পা ধীরে ধীরে ফিরিয়া গেল। কি ভীষণ কয়েকটা মুহূর্তই যে কাটিল!

ফিরিবার সময় জানালা আর চৌকাঠের অবকাশ-পথে আবার ঘরের মধ্যে একবার উঁকি মারিয়া দেখিল—আলোটা সেই রকম জ্বলিতেছে, টুলু চিৎ হইয়া

শুইয়া আছে, নিদ্রাময়, বুকের ওপর সেই মোটা বইখানা, তাহার উপর দুইখানা হাত, নিশ্চিন্ত নিদ্রায় সব কটিই ধীরে ধীরে ওঠা-নামা করিতেছে। চম্পা আস্তে আস্তে আসিয়া আবার সেই শিলাখণ্ডটির উপর বসিল। সমস্ত রাত কাটিল এই বিচিত্র প্রহরায়।

একেবারে ভোরে—অন্ধকারের গহ্বর থেকে পঞ্চকোট পাহাড় যখন অল্প একটু আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, চম্পা গিয়া চরণদাস আর প্রহ্লাদকে তুলিয়া দিল এবং তাহারা কাজে বাহির হইয়া গেলে নিজেদের উপস্থিতির সমস্ত চিহ্ন মিটাইয়া দিয়া চম্পাও বস্তির পথে অগ্রসর হইল।

উঠিয়া বিস্ময়ের ঘোর কাটিতে বনমালীর বেশ খানিকটা সময় লাগিল!··· হঠাৎ কি হইয়াছিল? চম্পা···চরণ···প্রহ্লাদ···কোমরে ব্যথা—কোথায় সে সব? কোমরটা টিপিয়াও দেখিল···নাঃ, কোথায় কি? মাস্টারমশাইয়ের বাসায় যখন গেল, টুলুকে হাত মুখ নাড়িয়া বলিল—"কাল রেতে খাসাঁ এক স্বপ্ন দিখলাম গো বাবু মশায়—বুকের বিথা! মাজায়ই বিথা। মরবার পারা হইছিঁ; চম্পা আলেক, সেঁক দিলেক সুজি ধিপায়ে...কুথা আর বিথা গো? এই তো চলা-ফিরাটি করছিঁ বটে—যেন সাঁইতাড়ার কুমার বাহাদুর।"

হাত দুইটা সামনে চিতাইয়া ধরিয়া একটু হাসিল; সেদিন সন্ধ্যায় চম্পা আসিলে তাহাকেও বলিল—কাল স্বপ্ন দেখিল, তাহার যেন বেমারি—চম্পা আসিয়াছে—আজকের মতোই সেক দিল ইত্যাদি।

চম্পা ঈষৎ হাসির সহিত চোখ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া শুনিল, মাথায় নূতন একটা আইডিয়া আসিয়াছে, বলিল—"তা আর টুলুবাবুকে বলিস নাই তুই, স্বপ্নের কথা বললে ফ'লে যায় বটে, শেষে বুক আর মাজার বিথাঁয় কেলেশ পাবিক।"

বনমালী ক্রমান্বয়ে সাত দিন এই রকম স্বপ্ন দেখিল।

॥ পনেরো ॥

একাদিক্রমে সাত দিন কোন রকম সাড়াশব্দ না পাওয়ায় চম্পা মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এসব ব্যাপারে ম্যানেজারের এত দেরি হয় না, তবে এই নিশ্চেষ্টতার কারণটা কি?…একবার একটু খোঁজ না লইলে চলে না; ভয়ঙ্কর লোকের আওয়াজ-আস্ফালনের চেয়ে মৌনই বেশি ভয়ঙ্কর যে।

প্রথমে কিন্তু সোজা ম্যানেজারের কাছে গেল না, গেল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট পরেশ-বাবুর কাছে। এর বাসাটা খনির কাছাকাছি। চাকর বামুন লইয়া একলাই থাকে, এখনও বিবাহ করে নাই। প্রকৃতিটা চাপা, ম্যানেজারের প্রকৃতির উল্টা। ম্যানেজার অন্তর থেকে বিশেষ কিছু চায় না বলিয়া যেমন তাহার ব্যবহারটা বেপরদা, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট তেমনি অন্তর থেকেই বেশি চায় বলিয়া একটা ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় ভাব আছে। একটা নূতন অভ্যাস হইয়াছে সন্ধ্যার সময় একটু সুরা সেবন—খুব সামান্যই। কিন্তু সেটা এখনও প্রকাশ পাইতে দেয় নাই, পাছে প্রকাশ পায় এইজন্য প্রভাবটুকু একেবারে না কাটিয়া গেলে বাসার বাহির হয় না।

রহস্যটুকু জানা আছে শুধু চম্পার।

সন্ধ্যার সময় সে গিয়া উপস্থিত হইল। পরেশ এই সময়টা বাসার ভিতরেই থাকে, আগন্তুক বুঝিয়া বাহির হয় বা হয় না, চাকরের মুখে চম্পা আসিয়াছে শুনিয়া বাহির হইয়া আসিল, প্রশ্ন করিল—"তুই? এ রকম অসময়ে যে?" বারান্দার থামের গায়ে পা দুইটা ঠেকাইয়া একটা চেয়ারে বসিল। চম্পা পাশের থামটা ঠেস দিয়া দাঁড়াইল হাত দুইটা পিছনে করিয়া, হাসিয়া বলিল—"আমার এই সময়, বড়মানুষের সময়ে আর গরীবের সময়ে কখনও মিল হতে পারে?—গতর খাটিয়ে ফুরসৎ হবে তবে তো আসতে পারব?"

"হুঁ! তারপর? আসবার উদ্দেশ্যটা কি? কোন কাজ আছে?"

"শোন কথা ম্যানেজারবাবু—কাজ না থাকলে এসেছি! কাজ মাজে গরীবের ঘোড়া রোগ, শুনেছেন তো একটা হাঙ্গাম ক'রে বসেছি, সেদিন বদনদাসের বউটা একটা ছেলে প্রসব হয়ে মারা গেল, কেউ ঘেঁসে না দেখে নিজের ঘাড়ে তুলে নিলুম, এখন..."

পরেশ চোখ দুইটা তুলিয়া বাধা দিয়া বলিল—"ঘেঁষবে না কেন?—মাস্টার-মশাইয়ের ভাইপো না কে হয় সেই তো ছেলেটাকে নিয়েছিল, ব্যবস্থাও করেছিল, তুই-ই বরং হৈ-হল্লা ক'রে পেল্লাদের বউয়ের কাছ থেকে কেড়ে নিলি ছেলেটাকে—তাই তো শুনলাম।"

পরেশের পক্ষে ঘটনাটার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে, স্থির দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া রহিল। চম্পা সুযোগটা ছাড়িল না, চোখে চোখ রাখিয়াই বলিল—"কোথাকার একজন কে ট্যাকা দেখিয়ে খনি থেকে আমাদের একটা ছেলেকে নিয়ে যাবে, মুখ বুজে স'য়ে যেতে হবে?...আমি তো..."

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিয়া যাহা খুঁজিতেছিল যেন পাইয়াছে পরেশ, আবার বাধা দিয়া কতকটা সন্তুষ্টভাবে বলিল—"বেশ, ঘাড়ে তুলে নিয়েছিস, তারপর?"

"ঐ তো বললাম—গরীবের ঘোড়া রোগ; নিলাম তো ঝোঁকের মাথায়, কিন্তু ওসব হ্যাপা কি আমরা সামলাতে পারি? বলে—নিজের পেটই চলে না! তাই বড়কর্তাকে ধরেছিলাম একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে কোম্পানি থেকে; বললেনও—দোব। কিন্তু কই, সাত দিন হয়ে গেল, এখনও তো কিছু টের পেলাম না, তাই জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম আপনাকে যদি কিছু ব'লে থাকেন।"

এটা গেল ভূমিকা, দেখা করিয়া কথা পাড়িবার একটা অছিলা।

পরেশ বলিল—"কই, না তো।"

চম্পা একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—"তা হ'লে হয় নি বের হুকুমটা। মানুষের একটা কাজ থাকে তবে তো; এত বড় তিন-তিনটে খনি চালানো।...আবার শুনছি একটা নতুন উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে..."

"কি?"

প্রশ্নটা করিয়া পরেশ একটু উৎসুক দৃষ্টিতেই চাহিয়া দেখিল, চম্পাও তীক্ষ্ণ

দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া আছে। চোখাচোখি হইতে সহজ বিস্ময়ের কণ্ঠে বলিল—"ঐ মাস্টারমশাইয়ের ভাইপো না কে একদিন বড়কর্তার বাসায় গিয়ে হুমকি দিয়ে এসেছে, আপনি কিছু জানেন না?"

দৃষ্টি আবার সেই রকম সুতীক্ষ্ণ, প্রশ্নে ঠাসা; পরেশ বেশ সহজভাবেই বলিল—"কই, না তো। ওঁকে হুমকি দিয়ে গেল, অথচ কিছু ব্যবস্থা করলেন না যে?...কবেকার কথা?"

এই পর্যন্তই দরকার চম্পার, টের পাওয়া গেল কথাটা পরেশ পর্যন্ত অগ্রসর হয় নাই। এর পর বাড়াইতে গেলে তাহার নিজের সেখানে উপস্থিতির কথাটা আসিয়া পড়িবে, নানা কারণে যেটা আপাতত চায় না চম্পা; প্রসঙ্গটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—"তা হ'ল বইকি ক'দিন; মরুকগে আদার ব্যাপারী, আমার জাহাজের খবরের দরকার কি?...আসলে যার জন্যে আসা,—ছেলেটার একটা ব্যবস্থা একটু করিয়ে দিতে হবে আপনাকে..."

"তোর আবদারই যখন শুনলেন না..."

"ঠাট্টা রাখুন।" বলিয়া চম্পা একটু চুপ করিয়া গেল, কি যেন একটু ভাবিয়া লইল, তাহার পর বলিল—"আমার আবদার তো ওঁর শুনবার কথাও নয়, যিনি দয়া ক'রে শোনেন, তাঁর কাছে তাই ক'রে গেলাম।"

আর দাঁড়াইল না। "এবার যাই, অনেকগুলো কাজ ফেলে এসেছি,... ভুললে চলবে না কিন্তু।"—বলিয়া নামিয়া গেল।

পরেশ একটু বিস্মিত হইল। এর আগেও আসিয়াছে চম্পা কোন একটা ছুতানাতা লইয়া, এত তাড়াতাড়ি কখনও চলিয়া যায় নাই, এমন হঠাৎ তো নয়ই। কয়েক দিন হইতে তাহার মধ্যে একটা যেন পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছে।

ম্যানেজার রতিকান্তের সহিত দেখা হইবে সকালে দিনের আলোয়। রাত্রিটা চম্পার বড় অশান্তিতে কাটিল। বনমালীর স্বপ্ন রচনা আর তাহার পর ফটকের ধারে বসিয়া সেই ঠায় পথের দিকে চাহিয়া পাহারা—এসবের মধ্যে একটা প্রশ্ন তাহার মনটাকে বড়ই উদ্বিগ্ন করিয়া রাখিল—ম্যানেজার অ্যাসিস্ট্যাণ্টকে কিছু বলেন নাই কেন? শান্তি, প্রতিশোধ, কিংবা কোন চক্রান্তে অ্যাসিস্ট্যাণ্টকে প্রায়ই বলেন, স্ত্রীসুলভ কৌতূহল মিটাইবার জন্যই পরেশের নিকট হইতে কত

খবর কতবার পাইয়াছে চম্পা এর আগে; এবার এত গোপনের চেষ্টা কেন? চক্রান্তটা কি এতই গভীর? প্রতিশোধটা কি এবার এতই ভীষণভাবে লইতে চায় ম্যানেজার?

সকালে আবার সেই জায়গাটিতেই সাক্ষাৎ হইল। ম্যানেজার নিবিষ্টচিত্তে একটি কাগজ পড়িতেছিল, শুধু নিবিষ্টই নয়, বেশ যেন চিন্তিতও—ভ্রূ দুইটা কুঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, চম্পার উপস্থিতি সম্বন্ধেও কোন খেয়াল হইল না।

চম্পা নিজের জায়গায় নিজের ভঙ্গীতে হাত পিছনে রাখিয়া থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইতেই দৃষ্টি পড়িল। তখন আবার কাগজটা পাশে রাখিয়া আগেকার মতো সরল লঘুতার সঙ্গেই আরম্ভ করিল—"চম্পাবতী যে, কি মনে ক'রে হঠাৎ শুভাগমন?"

চম্পা 'শুভাগমন' কথাটার কাটান্ দিয়া একটু হাসিয়াই বলিল—"বিরক্ত আপনি হবেন জেনেশুনেও আসতে হয়, সেবারে বদনদাসের ছেলেটার খোরপোষের একটা ব্যবস্থা ক'রে দেবেন বললেন কোম্পানি থেকে, তা আজ পর্যন্ত..."

ম্যানেজার চোখ দুইটা একটু তুলিয়া প্রশ্ন করিল—"তার দরকার আছে আর?"

চম্পার বুকটা ধক্ করিয়া উঠিল, দুইটা ঢোঁক গেলার পর তবে প্রশ্নটা কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল—"কেন—ওকথা বললেন যে?"

"খোরপোষের ব্যবস্থাটুকু হওয়া নিয়ে বিষয়, কোম্পানিকেই যে করতে হবে এমন তো কোন কথা নেই।"

অনেক কষ্টে চম্পা মুখের সহজ ভাবটা ধরিয়া আছে, একটা উত্তর দিয়া হেঁয়ালিটাকে স্পষ্ট করিয়া লইতে যেন সাহস হইতেছে না। ইজিচেয়ারে ঘাড়টা এলাইয়া দিয়া ম্যানেজার মিঠে টানে একটা সিগারেট ফুঁকিতেছে, দৃষ্টিটা চম্পার মুখের ওপর। হেঁয়ালিটা সে নিজেই আর একটু স্পষ্ট করিয়া দিল, বলিল—"খোরপোষের সঙ্গে যেখানে প্রাণের টান সেখানেই সেটা বরঞ্চ বেশি মিষ্টি নয় কি?"

যেন অমানুষিক চেষ্টায় চম্পা মুখে একটু হাসিও টানিয়া আনিল, উত্তর

করিল—"সেই ভরসাতেই তো আপনার কাছে আসা, এখানে আপনিই সবার বাপ-মা, আপনার চেয়ে বেশি দরদ কার কাছে আশা করা যায় ?"

ম্যানেজারের মুখেও হাসি ফুটিল, টোকা মারিয়া সিগারেটের ছাইটুকু ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল—"শোন্ চম্পা গাছের খাবি আবার তলারও কুড়ুবি তা হয় না।...আমি যদি বাপ-মা হই-ই তো সে সরকারী বাপ-মা, নিজের বাপ-মা যখন ওর রয়েছে..."

বিপদের সামনাসামনি হইয়া এই অন্তরালটুকু চম্পা আর সহ্য করিতে পারিতেছে না, যেন স্পষ্ট রূপটাই দেখিয়া লইবার জন্য ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল—"আমায় নিয়ে একি করছেন আপনি ?—আপনার দাসীর দাসী হবারও যুগ্যি নই আমি—কি বলবেন স্পষ্ট ক'রেই বলুন—কি কথা শুনেছেন আমার সম্বন্ধে ?—জানেনই তো আমার শত্রুর অভাব নেই..."

"স্পষ্ট কথা তুই যদি বুঝেও না বুঝিস আমি কি করব ? তুই আবার মাস্টারমশাইয়ের বাসায় সেই ছোঁড়াটার সঙ্গে..."

চম্পা এমনভাবে চাহিয়া চোখ দুইটা হঠাৎ ম্যানেজারের মুখের ওপর ফেলিল যে, সব শেষের কদর্য কথাটা তাঁহার মুখে যেন আটকাইয়া গেল ; পরের ব্যাপারটুকু চম্পাই সামলাইয়া লইল, ইঙ্গিতে যেটুকু কদর্যতা প্রকাশ পাইল সেটা যেন গা-সওয়া বলিয়া গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিল না ; দৃষ্টি পরমুহূর্তেই খুব সহজ করিয়া লইয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল..."তাই বলুন। আমি তো ভয়ে কাঁটা হয়ে গেছলাম—আবার নতুন ক'রে কে আপনার কাছে কি লাগাইয়াছে, শত্রুর তো অভাব নেই। তা আমি স্কুলে ক'দিন থেকে তো যাচ্ছি—ঠাকুরদাদাটা ক'দিন ধ'রে অসুখে পড়ে গেছে, বিশেষ ক'রে রেতের বেলা হয় বাড়াবাড়ি। যাচ্ছি ক'দিন থেকে—বাবাকে ডেকে নিই, কখন কি হয়, একলা মেয়েমানুষ।...তা এর মধ্যে মাস্টারমশাইয়ের বাসায় তাকে ঢুকিয়ে কে আপনার কাছে ফলাও ক'রে কেচ্ছা গ'ড়ে নিয়ে এসে লাগাল ? বদনদাসের ছেলেটাকে নিয়ে কি কাণ্ড একচোট হয়ে গেল তার সঙ্গে, আর কেউ না জানুক, আপনি তো জানেন।...আপনার কাছে সেদিন ও-রকম দাবড়ানি খেয়ে সে রইল কি ভাগল তাও জানি না। বলিহারি মাথা লোকের।"

ম্যানেজার চেয়ারে সেই রকম ঘাড়টা এলাইয়া দিয়া স্থির প্রশংসার দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। মুখে অল্প একটু হাসি—ভাবটা যেন—হ্যাঁ, সেয়ানা মেয়ে বটে! এটা বেশ বুঝিতে পারা যায় স্পষ্ট ধরা পড়িয়া চম্পা তাহার কৌশল বদলাইয়া ফেলিয়াছে, কত শীঘ্র যে, আর কত নিখুঁত ভাবে সেইটিই তাহার আশ্চর্য বোধ হইতেছিল। শোনার সঙ্গে সঙ্গে, প্রশংসার পাশে পাশে একটা সংকল্পও তাহার স্থির হইয়া উঠিতেছিল—এ মেয়েকে হাতছাড়া করা চলিবে না।

সোজা হইয়া বসিয়া বলিল—"শোন্ চম্পা, তুই হাজার বুদ্ধিমতী মনে করিস নিজেকে—না হয় স্বীকার ক'রে নিলাম, তাই—কিন্তু আমার ওপরও কি টেক্কা দিয়ে যাবি? তবে দেখে যেতে পারছিস কিনা—তোর ঠাকুরদাদার অসুক-টসুক তোর ভাঁওতা—ও একটা আধপাগলা, পুরো পাগল হতে হতে মাঝখানে থেমে গেছে কি ক'রে, ওর মাথায় যদি ঢুকিয়ে দেওয়া যায়—তুই বীর হনুমান তো ছাত থেকে লাফ দিয়ে মরবে; আর যদি বলা যায়—তুই একটা কোলের শিশু, এই সবে জন্মেছিস, তো হাত পা ছুঁড়ে ওয়াঁও ওয়াঁও কান্না শুরু ক'রে দেবে; তুই নাতনি, সেটা জানিস, কিন্তু আমিও তো ঐ স্কুলের সেক্রেটারি। যাক্!···সুধু তোর বাপ আসে না, পেল্লাদ সাধু আসে, কেন তাও বলব?"

চম্পা একটু হাসিয়া কতকটা অবহেলাভরে বলিল—বলুন।···পেল্লাদের নামটা আমার ছেড়ে গেছল বটে। মাথার ঠিক থাকে তবে তো···"

"ছেড়ে যায় নি,—মাথার ঠিক বেশি রকম আছে ব'লেই লুকিয়েছিলি। যাক্ সে কথা। ওরা আসে ওই ছোঁড়াটাকে পাহারা দিতে।···"

চম্পা একেবারে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, অল্প একটু গা-নাড়া দিয়াই বলিল—"আমার বেয়াদবি হয়ে যাচ্ছে আপনার সামনে, দোষ নেবেন না, কিন্তু আপনার চর চমৎকার খবর দিয়েছে আপনাকে। বাবা আর পেল্লাদ স্কুলেই ঠাকুরদার বারান্দায় শুয়ে থাকে।"

ম্যানেজারের দৃষ্টিটা আবার নূতন করিয়া সপ্রশংস হইয়া উঠিল, তাহার সঙ্গে বিদ্যুৎস্ফুরণ দেখিলে যেটা আসিয়াই পড়ে।—চম্পা একটা অভিনয় করিল বটে, খাসা! কিন্তু চম্পার এ সব কথার উপর মন্তব্য না করিয়া নিজের

জোর ধরিয়াই বলিল—"আর তুই সমস্ত রাত স্কুলের দরজায় থাকিস জেগে ব'সে।"

চম্পার হাসি-হাসি ভাবটা যেন দপ করিয়া নিবিয়া গেল ; সেও কিন্তু ক্ষণিক, অভিনয়ও ছাড়িল না। মুখটাকে চেষ্টা করিয়া আরও বিষণ্ণ করিয়া লইয়া বলিল —"আপনার মাথার মধ্যে যখন ঢুকে গেছে—পাহারা দেবার জন্তেই এই ব্যবস্থা —যার জন্তে আমার মতন একটা অসহায় মেয়েছেলেকেও মস্ত বড় একজন মন্ত্রী ব'লে আপনি ধ'রে নিয়েছেন, তখন আমি আর কি বলব ? তর্ক যতটুকু করতে হ'ল, তাইতেই তো যথেষ্ট বেয়াদবি হয়ে গেছে।···ছেলেটার সম্বন্ধে আর কোন আশা নেই তা হলে ?"

"তুই যতটুকু আশা ক'রে আছিস তার চেয়ে লাখো গুণ বেশি ব্যবস্থা ক'রে দোব তোর ছেলের !"

চম্পা অতিমাত্র আশ্চর্য এবং কতকটা বিমূঢ় হইয়া মুখের পানে একটু চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"আপনার দয়া। কিছু করতে হবে আমায় ?"

"কিছু না ; যেমন আছিস তেমনি থাকতে হবে, শুধু আর একটু ভালো ক'রে।"

"বুঝলাম না !"

"এখন শুধু রাত্তিরে থাকিস, দিনে স্কুলে থাকবি, স্কুলে বলি কেন ?— মাস্টারমশায়ের বাসায়।"

চম্পা যেন একটু চমকিত হইয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল—"কেন ?"

"কেন, তা নিজেই ভেবে দেখলে বুঝতে পারবি। এখন নাও যাস, মাস্টার-মশাই ফিরে এলেও গেলে চলবে।"

চম্পার সমস্ত শরীরটা ভিতরে ভিতরে শিহরিয়া উঠিল। ম্যানেজারের হাসিটা হইয়া উঠিয়াছে বীভৎস, দৃষ্টিতে যেন একটা বিষের নীলাভা ঠিকরাইয়া পড়িতেছে ; চম্পা অনেকক্ষণই চোখ ফিরাইতে পারিল না। কিন্তু সে খেলায় মাতিয়াছে, পিছাইয়া গেল না, যে এত বড় একটা সুযোগ শত্রুর হাতে তুলিয়া দেয় সেও বুদ্ধির গুমর করে।

সত্যই তাহার একটু হাসি পাইল, সেইটাকেই কাজে লাগাইয়া একটু লজ্জার

অভিনয় করিয়া বলিল—"আপনার যেমন হুকুম—আমি ওখানে গিয়ে উঠিলেই যদি আপনার কোন উপকার হয়…"

চম্পা চলিয়া গেলে ম্যানেজার আবার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া খবরের কাগজে মনঃসংযোগ করিল, একটা খবরে সকাল থেকে তাঁহাকে বড় অন্যমনস্ক করিয়া তুলিয়াছে—একেবারে দূরে কাতরাসগড় অঞ্চলে খনির কুলি-মজুরদের মধ্যে একটা খুব বিশ্রী রকম গুলতান আরম্ভ হইয়াছে—শীঘ্রই চরমে আসিয়া দাঁড়াইবে এরূপ আশঙ্কা হয়।

এটুকু সাধারণ; ম্যানেজারের পক্ষে যা অসাধারণ, বিশিষ্ট—যাহার জন্য ভ্রূকুঞ্চন তাহা এই যে, একজন আধা-সন্ন্যাসী গোছের লোক এর মূলে।… লোকটি মাঝবয়সী, গৌরবর্ণ, শীর্ণ, মাথায় বড় চুল; সপ্তাহখানেকও আসে নাই; কিন্তু এরই মধ্যে কুলিমজুর-মহলে অগাধ প্রতিপত্তি।

খুব চিন্তিত ম্যানেজার,—লোকটির সঙ্গে সেই নিরীহ স্বল্পবাক্ মাস্টার-মশাইয়ের খুব একটা মিল পাওয়া যাইতেছে না?

॥ ষোলো ॥

ম্যানেজারের নিকট হইতে চলিয়া আসিতে এবারেও চম্পার যেন পা উঠিতেছিল না। একটা মোক্ষম হার হইয়াছে। অবশ্য সে হারটা স্বীকার করিল না। অভিনয়টা করিয়াই গেল, এবং আজকের দাবার চালে শেষ জয়টি রহিল তাহারই; তবুও এই সমস্ত সপ্তাহব্যাপী পরাজয়ের সঙ্কোচটা তাহার পা দুইটিকে যেন আকৃষ্ট করিয়া রাখিলই খানিকটা পর্যন্ত; আসিতে আসিতে মনে হইতে লাগিল ম্যানেজারের বক্র হাসি এবং বিদ্রূপে ভরা দুইটি চোখের দৃষ্টি তাহাকে পিছন হইতে বিদ্ধ করিতেছে।

কোন রকমে গেটের বাহির হইয়া এদিক দিয়া অনেকটা স্বস্তি অনুভব করিল; তখন বিস্ময়ের সঙ্গে চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল, এত সব কথা—প্রত্যেক খুঁটিনাটিটি পর্যন্ত ম্যানেজার জানিতে পারিল কি করিয়া!

সমস্ত রাত্রি জাগিয়া আজকাল দিনের বেলা শরীরে কিছু থাকে না, সেইজন্য রান্নার হাঙ্গামাটা আর রাখে না। মিতিনকে চাল-ডাল সব দিয়া আসে, সে-ই নিজের রান্নার সঙ্গে নামাইয়া দেয়। অন্য দিন চম্পা এই সময়টা ঘুমায়, আজ কিন্তু চিন্তায় তাহার ঘুম হইল না।…কি করিয়া টের পাইল ম্যানেজার তাহার সারা রাত বসিয়া পাহারা দেওয়াটি পর্যন্ত!

ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার এক সময় যেন মনে হইল উত্তরটা পাওয়া গেছে। বনমালীর মস্তিষ্কের যে-দুর্বলতার উপর তাহার সমস্ত ব্যবস্থাটুকু গড়া সেই দুর্বলতাই ম্যানেজারও কাজে লাগায় নাই তো? চম্পার যা কিছু সব, সন্ধ্যা হইতে শেষরাত্রি পর্যন্ত। তাহার পর আর সমস্ত দিন ওদিক মাড়ায় না; ক্লান্তও থাকে খনিতে কাজও আছে; তাহা ভিন্ন যাহা সবচেয়ে দরকারী কথা—ওর ইচ্ছা নয় যে টুলু জানুক বনমালীর সঙ্গে চম্পা কোনরকম সংস্রব রাখিয়াছে—যাওয়া-আসা করে, কেননা এর আগে তাহাকে কখনও দেখে নাই ওখানে। এই দিনের বেলা তাহার অনুপস্থিতিতে বনমালীকে বাসায় ডাকিয়া লইয়া, মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া সমস্ত কথা বাহির করিয়া লয় নাই তো ম্যানেজার? বনমালীর স্বপ্নে টুলু কোন সন্দেহ করে নাই, কেননা টুলুর ও-রকম একটা সম্ভাবনার কথা মনেই হয় নাই; ম্যানেজার অনেক কথা জানে, তাহা ভিন্ন বাহ্যিক ঔদাসীন্যের পিছনে চম্পার সহানুভূতিটা যে টুলুর দিকেই—এটুকু ধরিয়া ফেলা তাহার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়; সুতরাং বনমালীর স্বপ্ন যে আদতে কি, সেটাও ধরিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইবার কথা নয়।

আহার করিয়া শরীরটা একেবারেই ভারী হইয়া পড়িল, তাহা ভিন্ন রোদও অত্যন্ত কড়া, একটা ঘুম দিয়া চম্পা স্কুলের দিকেই পা বাড়াইল। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার পরেশবাবু বাঁচিয়া থাক্, খনিতে হাজরি সম্বন্ধে ওর তত ভাবনা নাই।

স্কুলের রাস্তা আর বস্তির মাঝামাঝি যে একটা ছোট টিলা আছে সেটার গোড়ায় আসিতে হঠাৎ স্কুলের দিকে নজর পড়ায় চম্পা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। একটি লোক স্কুলের দেওয়ালের বাহিরের দিকে পাশে পাশে আসিয়া রাস্তার ধারে দাঁড়াইল, তাহার পর যেন খুব সন্তর্পণেই একবার এমুড়ো-ওমুড়ো চারিদিকটা দেখিয়া লইয়া রাস্তার উপর উঠিয়া পড়িয়া খুব সহজ পদক্ষেপে গঞ্জের দিকে অগ্রসর হইল।

বড় আশ্চর্য বোধ হইল চম্পার। স্কুলের পিছন দিকে একটা ছোট্ট দোর আছে, যে-কোন কারণে হোক লোকটা সেই দোর দিয়া বাহির হইয়াছে, ইহাতে আর সন্দেহ নেই।

টিলার উপর একটা ঝাঁকড়া-ঝোঁকড়া বুনো কুলের গাছ, তাহার গায়ে কি একটা লতা উঠিয়া বেশ একটি আড়ালের সৃষ্টি করিয়াছে; চম্পা তাহার পাশটিতে বসিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। রাস্তাটা প্রায় দুই শত গজ দূর দিয়া চলিয়া গেছে, লোকটা একটু কাছে আসিলে চম্পার বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল,—রাত্রে দেখা, তবু চলার ভঙ্গি এবং আরও দু-একটা বিষয়ে মনে হইল, প্রথম রাত্রে এবং পরে আরও তিন রাত্রে যে দুটি লোককে স্কুলের সামনে দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিল একদিন, একটু অসাবধানতার জন্যে নিজেও হঠাৎ যাহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া পড়িয়াছিল, এ তাহাদেরই মধ্যে একজন। চম্পা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—যতই কাছে আসিতেছে লোকটা, ততই চম্পার সন্দেহটা কাটিয়া যাইতেছে। আবার এদিকে একটা ভয় লাগিয়া আছে—লোকটা যদি বস্তির পায়ে-হাঁটা এই পথে নামে, চম্পার আত্মগোপনের কোন উপায়ই থাকিবে না। —কয়েকটা অসহ্য মুহূর্ত—সমস্ত মন দুইটি চক্ষে জড়ো করিয়া হাত পা যেন সিঁটকাইয়া বসিয়া রহিল চম্পা। দুই রাস্তার সঙ্গম যতই কাছে আসিতেছে ততই তাহার চৈতন্য তীব্র হইয়া উঠিতেছে— চম্পা ওর ধাপ গুণিতে লাগিল—লোকটা ঠিক তেমাথার কাছে আসিয়া মুহূর্তখানেক ইতস্তত করিল—কোন্ দিকে যাইবে যেন স্থির করিতে পারিতেছে না, একবার ছমছমে দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল—চম্পার বুকটা ধড়াস ধড়াস করিতেছে—তাহার পর সোজা গঞ্জের দিকেই অগ্রসর হইল।

একটা টানা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল চম্পার, যতক্ষণ লোকটাকে দেখা গেল স্থিরনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সে বাজারের মোড়ে অদৃশ্য হইলেও একটু বসিয়া রহিল ওই দিকে চাহিয়াই—যদি লোকটা কোন রকমে ফেরে—কোনও কারণে —এ ধরনের লোকের পক্ষে যেন সবকিছুই সম্ভব···তাহার পর বেশ একটু সময় দিয়া কুলগাছের আড়াল হইতে সরিয়া আসিয়া স্কুলের দিকে অগ্রসর হইল।

বড় রাস্তায় উঠিয়া চম্পাও ঠিক ঐ লোকটির পদ্ধতিই অবলম্বন করিল, সামনে

পিছনে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তাহার পর মাস্টারমশাইয়ের বাসাটা যাহাতে স্কুলের আড়ালে পড়িয়া যায় এইভাবে রাস্তার ডান দিক ঘেঁষিয়া দ্রুত-পদে অগ্রসর হইল। স্কুলের কাছে আসিয়াও সে ঐ লোকটির মতোই দেওয়ালের পাশে চলিয়া গেল এবং সেই ভাবেই আড়ালে আড়ালে অগ্রসর হইয়া পিছনের ছোট ফটকটি দিয়ে স্কুলে প্রবেশ করিল।

চম্পা এড়াইতেছে টুলুকে।

স্কুল আজকাল সকালে; বনমালী বোধ হয় এতক্ষণ দাওয়ায় বসিয়া তামাক সেবন করিতেছিল, দরজার চৌকাটে সেটাকে ঠেস দিয়া রাখিয়া ঘরের মধ্যে যাইবে, চম্পা প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, "তু কেমনটি আছিস বটে গো?"

বনমালী বেশ একটু ধাঁধায় পড়িয়া স্থিরনেত্রে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। দিনের বেলায় রাত্রের সমস্ত ঘটনাকে স্বপ্ন বলিয়া মনে করিতে এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, চম্পাকে চোখের সামনে দেখিয়া সময়টা দিন কি রাত্রি, এ স্বপ্নের চম্পা কি বাস্তব, যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছে তাহার; একটু ঠাহর করিয়া থাকিয়া বলিল—"চম্পা দেখি তো!"

তাহার পর দুপুরটা যেন সর্বাঙ্গ দিয়া বেশ ভালো রকম অনুভব করিয়া প্রশ্ন করিল—"এ দুপ্পুরে আইছিস যে?"

"শোন কথা বুড়ার! দুপুরে তো রোজ দিন আইছিঁ, তু কুথায় যেয়েঁ ব'সে থাকিস তাই দেখাটি হয় না।"

কথাটা বলিয়া খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

বনমালী অনেকক্ষণ মাথার ডান পাশটা চুলকাইল—স্মৃতি খুঁড়িয়া যেন কি বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে, হার মানিয়া বলিল—"কুঁথা যাই গো?"

"তা তাব্ ক্যানে, তু যাবি আর আমি বুলব?"...তুদের সেক্রেটারির বাঁলায় যাস্ নাই তো? আর কুথায় যাবি?"

বনমালী আবার খননকার্য আরম্ভ করিল, তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিল—"সিক্রেটিরির বাঁলায় কেন যাব গো? কি দরকার আছেঁ বটে?"

তাহার পর ওখানে যে যায় না; তাহার প্রশ্নটা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল,

বলিল—"আমি উখানে যাই তো কে তুর শ্বশুরটির সঙ্গে তুর বিয়ার কথাটি কয় গো ?"

চম্পা একেবারে শিহরিয়া প্রশ্ন করিয়া উঠিল—"আমার শ্বশুর ? কে বটে ?"

"হ, তুর শ্বশুর। ছিল না তো, হবেক, কথাটি চলছে। এতক্ষণটি তো ছিল গোঁ, তু দেরি করলিস, না তো দিখতিস—দিখতিস শ্বশুরকে—কেমন বুকের ছাতি ; কেমন টানা চোখ ; ডান পা'টি একটু ছোট বটে ; তা তুর বরের পা ছোট লয়, ভাবনা ক্যান গো ? আমি তল্লাস লিইছি, তু দু'পা সমান পাবে বটে..."

নাতনির সঙ্গে রসিকতায় বনমালীর মুখে হাসি ফুটিল, পা লইয়া শ্বশুর আর বরের প্রভেদটা নানা রকমে সরস করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

চম্পা কাঠ হইয়া গেছে। ঐ লোকটি, রাত্রে এই পথে একজন সঙ্গী লইয়া যে নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে হনহন করিয়া চলিয়া যায়, এই মাত্রই যে স্কুলের দেওয়াল ঘেঁষিয়া বাহির হইয়া আসিয়া গঞ্জের পথে নামিয়া গেল। বনমালী দুপুরে ম্যানেজারের কাছে যায় কি না জানিয়া লইয়া ওর কথাই কৌশলে তুলিতে যাইতেছিল চম্পা, প্রসঙ্গটা আপনিই, আর অদ্ভুত আকারে আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটা তাহা হইলে কোন নিগূঢ় কারণে তাহার বিবাহের অছিলায় এখানে জমাইয়া বসিয়াছে। ম্যানেজার যখন বনমালীকে বাসায় ডাকে নাই, তখন এ লোকটি যে তাহারই চর তাহাতে আর তাহার সন্দেহ রহিল না। নিজের মূঢ়তায় একটু হাসিও পাইল—অমন ঝানুলোক ম্যানেজার, তাহাকে সে এত ভাবিলই বা কি করিয়া যে, বনমালীকে দিনের বেলায় বাসায় ডাকিয়া এসব কথা আলোচনা করিতে যাইবে ?

এইবার দরকার 'শ্বশুরের' রহস্য ভাল করিয়া ভেদ করা। বনমালীকে নিজের রেকর্ড ঘুরাইয়া যাইতে দিয়া চম্পা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল ; এক সময় বাধা দিয়া প্রশ্ন করিল, "তা শ্বশুরের সঙ্গে তুর রোজ কথাটি হয় বটে ; তুর তো একটি নাতনি গো !"

বনমালী হাসিয়া বলিল—"লাতজামাইও একটিই বটে, তু ডর করিস ক্যানে ? বিয়ার কথা যে গো লাখ কথাটি হবেক, তবে তো ? তারা ঘর, কুল, বিটি—ই সবের খবর লিবেক তবে তো ?"

"তুদের বিটি তো গেছো বিটি গো, শুনলে কেটি বিয়া দিবেক তাই ক ?"

বনমালী একটু কি ভাবিল, তাহার পর কিরূপ দক্ষতার সঙ্গে যে সে বিবাহের কথাবার্তা চালাইয়া যাইতেছে বর্ণনা করিয়া চলিল। একটা স্বপ্ন দেখে বনমালী; সেইটাকে চম্পার ভাবী শ্বশুরের কাছে সত্য বলিয়া চালাইয়া দিয়েছে। আজই না হয় বনমালী বিষ হারাইয়া ঢোঁড়া সাপ হইয়া বসিয়াছে, নয় তো বিবাহ দিতে দিতে মাথার চুল পাকিল,—বোনেদের বিবাহ দিল, চম্পার বাপ খুড়া পিসীদের বিবাহ দিল, আর আজ চম্পার শ্বশুরের কাছে হার মানিয়া যাইবে ?···বনমালী একটা স্বপ্ন দেখে আজকাল,—প্রতি রাত্রেই সেইটেকে বেশ গুছাইয়া-গুছাইয়া সত্য বলিয়া চালাইয়া দিয়াছে। বলিয়াছে, আরে কর্তা, ওসব যা শুনিয়াছ একেবারে ভুলিয়া যাও—গেরস্তর মেয়ে, তায় সমর্থ মেয়ে, খনিতে গতর খাটাইয়া খাইতে হয়, ও-ধরনের পাঁচ রকম কথা রটেই, তা বলিয়া চম্পা কি সেই ধরনের মেয়ে নাকি ? এই তো অথর্ব হইয়াছে, বনমালীর শরীরটা সন্ধ্যা হইতেই বিগড়াইয়া থাকে, তা রোজ সন্ধ্যা হইতেই চম্পা আসিয়া ঠাকুর-দাদার হেপাজতে লাগিয়া যায়—রান্না করা, বিছানা পাট করা, খাওয়ানো, সেক দেওয়া—সুজির সেক—সে সবা এক দেখবারই জিনিস ! বাড়িতে বাপের জন্য সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া আবার এতটা পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া ঠাকুরদাদার হেপাজত—চম্পার মতন মেয়ে আর হয় নাকি ? এতটা পথ একা আসে শুনিয়া পাছে চম্পার শ্বশুরের মনে কোন খটকা লাগে বনমালী সে-পথও মারিয়া রাখিয়াছে। আরে ছিঃ গেরস্তর মেয়ে চম্পা—হলধর বোষ্টমের বংশের মেয়ে—মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনে যান, যে হলধর তাঁর জলের ঝারি বহিত—সেই চম্পা কি সন্ধ্যার পর এতটা পথ কখনও একা আসিতে পারে ? সঙ্গে থাকে ওর বাপ চরণদাস আর পাঁচ-ছয় জন তাহার বন্ধু—চম্পার দিকে কেউ চোখ তুলিলে সেই চোখসুদ্ধ তার ধড়টা তখনি মাটিতে লুটাইতে থাকিবে না ! সমস্ত রাত সবাই এইখানে দেয় পাহারা। অবশ্য পাহারার এত আছেই বা কি ? চম্পা কি সেই ধরনের মেয়ে যে তাহাকে অষ্টপ্রহর পাহারার মধ্যে রাখিতে হইবে ? চম্পার শ্বশুর ওসব যাহা শুনিয়াছে নিছক মিথ্যা—বদ লোকেদের কিছু একটা লইয়া থাকা চাই তো ! ঐ সব মিথ্যা রটনা লইয়া থাকে, কি আর

করিবে? রাত্রিটি শেষ হওয়া মাত্র চম্পা বাপ আর তার সাথীদের সঙ্গে বস্তিতে নিজের বাসায় চলিয়া যায়—সেখানকার পাট আছে তাহার পর খনির কাজ আছে—হাঁ, ঐ একা মেয়ে! দু-দুখানা সংসার, তারপর আবার খনিতে ঐ হাড়ভাঙা খাটুনি সব একলাটি সামলাইয়া যাইতেছে। আর রূপের কথা? নিজের নাতনি, কত আর তারিফ করিবে বনমালী—একটু কথাবার্তা অগ্রসর হোক, এইখানেই ডাকাইয়া আনিয়া একদিন দেখাইয়া দিবে; সব মিলাইয়া বউ যে হইবে সে আর দেখিতে হইবে না। বিবাহ যে এত দিন হয় নাই—অথচ এত বয়স হইল—চম্পাই বলে, বাপকে কেহ দেখিবার নাই, ঠাকুরদাদাও বুড়া হইল, বিবাহ করিবে না; বোষ্টমের মেয়ে বিবাহ যে করিতেই হইবে তাহার মানে কি? আসলে তাহাও নয়, ভাল পাত্র—মানে, চম্পার উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাইতেছে না—বাপের ফুরসৎ নাই, বনমালীও অথর্ব হইয়াছে, শরীরের সে জুৎ নাই যে বাহির হইয়া একটু খুঁজিয়া পাতিয়া দেখে; এইবার এই ভালো পাত্র পাওয়া গেছে—বনমালীই ছাড়িবে নাকি? ঘাড় ধরিয়া নাতনির বিবাহ দিবে···

ছেলের বাপেরও খুব তারিফ করে বনমালী—অতিশয় ভালো লোক। ও-রকম সচরাচর দেখা যায় না, কত রকম গল্প করে—এদিককার কথা তো আছেই, স্কুলের, এমন কি মাস্টারমশাইয়েরও, টুলুরও—যাহাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই। রোজ খোঁজটুকু লওয়া আছে—কোথায় আছেন মাস্টারমশাই, কবে আসিবেন, কোনও চিঠি আসে কি-না, টুলু সমস্ত দিন কি করে, কি করিয়া খাওয়া-দাওয়া হয় বেচারির—চম্পার শ্বশুর কোন রকম সাহায্য করিতে পারে কি-না তাহাকে—এইসব নানা কথা—শুধু টুলুবাবুর কাছে বলিতে মানা আছে—বিয়ের কথা পাঁচ কানে তুলিতে নাই কিনা। তা বনমালী চম্পার কাছেই বলিল, আর এত দিন তো বলে নাই, আজই বলিল—কথাটা পাকা হইয়া আসিয়াছে তো! আর চম্পা তো টুলু নয়। আর সর্বোপরি কনের ঠাকুরদাদা বলিয়া কি ভক্তি বনমালীর ওপর! আসিয়াই সাষ্টাঙ্গ হইয়া একটা প্রণাম, পায়ের কাছে একতাল বিষ্টুপুরের এক নম্বর তামাক রাখিয়া—প্রথম দিন, একটি টাকা দর্শনি সমেত··· না বিশ্বাস হয় চম্পা নিজের চক্ষেই দেখুক না।

বনমালী উঠিয়া গেল। এতক্ষণ ধরিয়া যা-কিছু বলিল সমস্তরই যেন বাস্তব প্রমাণ হাজির করিতেছে এই হিসাবে বলিতে বলিতে গেল—"হ, তু দেখ্ না গো, বুলবি ঠাকুরদাদা বুড়া হইছে, মিছা বলছে—ই ট্যাকা দেখ, ই তামাক দেখ—গমকে ঘরটি মাৎ কর্‌্যা দিছেঁ বটে।"

॥ সতেরো ॥

আজ আট দিন হইল টুলু মাস্টারমশাইয়ের বাসায় অন্তরীণ হইয়া আছে, একেবারেই বাহির হয় না। অবশ্য স্ব-ইচ্ছায়ই, তবে ইচ্ছাটা অবস্থাগতিকে। বাড়ি থেকে বাহির হইতে সাহস হয় না। প্রাণের ভয় না, সে ভয় বরং এইখানেই বেশি, সঙ্গীর মধ্যে তো ঐ এক পাগল—তাও দেড়শ' হাত দূরে, একটা কিছু ঘটিলে বাইরের জগতে তাহার এতটুকুও সাড়া পড়িবার সম্ভাবনা নাই। টুলু এ বিপদের দিকটা ভাবেও না একরকম; ঠিক সাহস নয়, তবে এই কয়টা দিনের অভিজ্ঞতায় নিজের সম্বন্ধে এক ধরনের বৈরাগ্য আসিয়াছে। কাজ লইয়া একটা নেশা জাগিয়াছে মনে—আরও বেশি কাজ, আরও বড় কাজ; কিন্তু সেই কাজের জন্যই যে প্রাণটাকে চারিদিক থেকে ঘিরিয়া-ঘুরিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে এ কথা কখনও মনে হয় না। অবস্থাটাকে বৈরাগ্য না বলিয়া এক ধরনের বিস্মৃতি বলাই ভালো, তীব্র কর্মলিপ্সার মধ্যে অন্য কিছুই আর মনে থাকে না। কড়া আলোর ছায়াও হয় ঘন—প্রাণের অনুভূতিটা সেই ঘন ছায়ায় পড়িয়া গেছে।

টুলু বাড়ি ছাড়ে না অন্য কারণে; 'ওর ভয়···বাসা ছাড়িলেই ম্যানেজার নিজের লোক বসাইয়া দিবে, তা যদি নাও করে সদর-দরজায় নিজের তালা ঝুলাইয়া তাহাকে বেদখল করিবে। উকিলের ছেলে টুলু অন্তত এটুকু জানে যে, এ বাসায় তাহার কোন অধিকার নাই। একটু অধিকার বোধ হয় দিয়াছিল মাস্টারমশাইয়ের চিঠি—তাও বোধ হয়—খুব কৃতনিশ্চয় নয় টুলু; তা সে চিঠিও তো ম্যানেজার হস্তগত করিয়াছে। আর সে-হাত যে কত শক্ত হওয়া সম্ভব,

টুলু তাহা ম্যানেজারের সঙ্গে কথাবার্তাতেও বুঝিয়াছে, তাহার পর চম্পার কাছেও আঁচ পাইয়াছে।

সমস্ত দিন বাসায় বসিয়া বসিয়া হাঁপ ধরে। যে কাজের জন্য এত আকুতি তাহার যেন নাগালই পাইতেছে না। খনিতে প্রবেশ করিয়া যেন মনে হইয়াছিল, এবার আরম্ভ করা গেল কিছু হীরককে অবলম্বন করিয়া; হীরক কিন্তু হাত থেকে সঙ্গে সঙ্গেই ফসকাইয়া গেল। বস্তির পথ বন্ধ। ম্যানেজার সাধ্যমত বাধা দিবে। বাধা অগ্রাহ্য করিয়াও টুলু নামিত কাজে, কেননা তাহার কাজই দাঁড়াইল তো বাধা অগ্রাহ্য করা; কিন্তু ঘটনাচক্রে বাসা লইয়া পড়িয়া থাকিতে হইল। বাকি ছিল চম্পা—মাস্টারমশাই চিঠিতে যে তিনটি কাজের ইঙ্গিত দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে অন্যতম। বেশ ভালো ভাবেই আরম্ভ করিয়াছিল; চম্পাকে বালিয়াড়ির পথ থেকে যে-রাত্রে ফিরাইয়া আনে, সে-রাত্রের পুলক-স্পন্দনের কথা টুলু কখনও ভুলিবে না, একটা রাজ্য জয় করার উল্লাস বোধ হয় এই ধরনেরই কিছু। সে-উল্লাস কিন্তু পরদিনই ভাঙিয়া গেল ম্যানেজারের বাসায়। সেদিন সেখানে চম্পার নির্লজ্জ মোহ-বিস্তারের চেষ্টা দেখিয়া নিরুপায় নীরবতার মধ্যে একটা সংস্কৃত প্রবাদ বার-বারই মনে পড়িতেছিল—অঙ্গারং শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি—অঙ্গারের খনিতে চম্পার একেবারে অন্তস্তল পর্যন্ত অঙ্গার হইয়া গেছে, ও কালিমা ঘুচিবে না, কোন উপায় নাই। টুলুর রাত্রের জয় করা রাজ্য দিন হইতে না হইতে ধূলিসাৎ হইয়া গেল।···কিছু হয়তো বলিত না টুলু—বলার আর সম্বন্ধই নাই কোন, তবু স্কুলের পথে চম্পা আবার জোর করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল—শেষ পর্যন্ত অন্তরের বিতৃষ্ণাটা টুলু না প্রকাশ করিয়া পারিল না। ওদিকেও তার কাজ নাই। যোগসূত্র ছিঁড়িয়া গেছে।

তাহা ভিন্ন আর একটা কথা; চম্পাকে টুলুর যেন ভয় হয় আজকাল—হীরক···বেশ একটা স্পষ্ট কাজ, বস্তিও স্পষ্ট কাজ, কিন্তু চম্পা একটা রহস্য। বালিয়াড়ির পথের চম্পা, খনির চম্পা, ম্যানেজারের বাসার চম্পা, আর স্কুলের পথের চম্পা—সব যেন আলাদা। কে জানে এ-রহস্যের আরও কত রূপ আছে? একটা অস্বস্তি আসায়, মনে হয়, ও দূরে দূরেই থাক্, যদি কাছে আসিয়াই পড়ে

সে সময় যেন মাস্টারমশাইও থাকেন টুলুর কাছেপিঠে—কেন যে এমনটা মনে হয় টুলু ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

চারিদিক ভাবিয়া দেখিতে গেলে বেশ বুঝা যায় আসল গোল বাধিয়েছে মাস্টারমশাইয়ের অনুপস্থিতি লইয়া। যেমন সূত্রপাত হইয়াছিল, তিনি উপস্থিত থাকিলে আজ অনেকটা পথই অগ্রসর হইতে পারিত। ঠিকানা পর্যন্ত রাখিয়া গেলেন না যে অবস্থাটা জানায় টুলু, পরামর্শ লয়! কি ভাবিয়া যে কি কাজ করেন মাস্টারমশাই, বোঝা যায় না।

যতটা পারে সময়টা বই পড়িয়া কাটায়। বইগুলো বেশির ভাগ দুষ্প্রবেশ্য—রাজনীতি, সমাজতন্ত্র এই সব লইয়া মোটা মোটা ইংরাজী বই বেশির ভাগ; কিছু কৌতূহল উদ্রেক করে—তবে বুঝিবার চেষ্টাতেই প্রায় সব শক্তি ক্ষয় হইয়া যায়। তবু সম্বল বলিতে, সাথী বলিতে ঐ কয়খানি।

একটি জায়গায় যাইতে লোভ হইত, স্কুলে। আজকাল গরমের জন্য সকালে স্কুল বসিতেছে। প্রত্যূষে গঞ্জের দিক থেকে ছেলেরা আসে, টিলার রাস্তাটা মুখর করিয়া; বস্তির দিক থেকেও কিছু কিছু আসে, আর মাত্র দুটি ছেলে যায় তাহার বাসার সামনে দিয়া; বালিয়াড়ির পথে, অনেক দূরে সাঁকরেল বলিয়া একটা গ্রাম আছে—সেইখান থেকে আসে তাহারা। এক দিন ডাকিল টুলু, পরিচয় লইল, একটু গল্পও করিল। রাত থাকিতে তাহাদের মা উঠাইয়া দেয়, ভোর হওয়ার আগেই মুড়ি-মুড়কি খাইয়া উহারা বাহির হইয়া পড়ে, আসিতে ঠিক এক ঘণ্টা লাগে।…উহারা জাতিতে মাহিষ্য—বাপ রাণীগঞ্জের একটা কি খনির আপিসে কেরানী ছিল। গত বৎসর মারা গেছে। সেই থেকে উহারা চলিয়া আসিয়াছে—মা, একটি বড় বোন—স্কুলে পড়িত রাণীগঞ্জে, আর তারা এই দুটি ভাই।…দুইজনেই খনির ম্যানেজার হইবে—মার তাই ইচ্ছা।… ছোট গ্রাম তাহাদের; না, আর কেহই পড়িতে আসে না তাহাদের গ্রাম হইতে।…বড় ছেলেটিই বেশি গল্প করিতেছে, ছোটটি বলিল—"আগের মাস থেকে তো আরও আসবে দাদা, সে কথা বললে না?" বড়টি একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া লইয়া টুলুর মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"সে যখন আসবে

তখন আসবে, কি বলেন? দিদি সবার বাড়ি গিয়ে ছেলেদের স্কুলে পাঠাতে বলে না তাদের—ও সেই কথা বলছে।"

স্কুলের ঘণ্টা বাজিতে ছেলে দুটি চলিয়া গেল।

বড় সুন্দর লাগিল টুলুর। হাফপ্যাণ্ট আর কামিজ পরা ছেলে দুটি, ভাল করিয়া চুল আঁচড়ানো, ঘরে তৈয়ারী সাচেলের মতো থলে, তাতেই বই শ্লেট, দুটি থলের ওপরই নামের তিনটি ইংরাজী আদ্য অক্ষর রঙীন সূতা দিয়া তোলা। এই আধপাড়াগাঁ জায়গায় ছেলে দুটি একটু বেমানান; শুধু তাই নয়, অজ-পাড়াগাঁয়ে এর চেয়ে বেমানান একটি কৃষ্টিসম্পন্ন ছোট পরিবারের ছবি চোখের সামনে আনিয়া দেয়—বড় কৌতূহল হয়।

বিকালে কিছু বিস্কুট আনিয়া রাখিল। পরদিন সকালে ছেলে দুটিকে দিল। একটি সলজ্জ হাসির সঙ্গে তাহারা গ্রহণ করিল। আরও গল্প হইল আজ—বাড়ীর গল্প, গ্রামের আরও সবাইদের গল্প। ছোট ছেলেটি বেশির ভাগ ঘাড় হেঁট করিয়াই ছিল, হঠাৎ একবার মুখ তুলিয়া কুণ্ঠিত ভাবে বড়টির দিকে চাহিয়া বলিল—"দাদা!"

বড়টি ফিরিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে একটু চাহিয়া রহিল; ছোটটি চোখের একটু ইঙ্গিতের মতো করিয়া আরও কুণ্ঠিত ভাবে বলিল—"সেই যে সেকেণ্ড মাস্টার-মশাই বলেছিলেন—"

"ও!" বলিয়া একটা যেন ভুল শুধরাইয়া লইয়া ছেলেটি উঠিয়া পড়িল। টুলু বলিল—"বোস না খোকা আর একটু, এখনও ত ঘণ্টা হয় নি।"

বড়টি যেন একেবারে কি রকম হইয়া গেল, ঘাড়টি অল্প বাঁকাইয়া ম্লান হাসিয়া বলিল—"না, আমরা যাই। আপনি ফুল নেবেন?"

কি একটা মিষ্ট গন্ধের বুনো ফুল কাল হাতে দেখিয়া টুলু প্রশংসা করিয়াছিল, আজ একগোছা আনিয়াছে, চৌকির উপর রাখিয়া, আর একবার ঘাড় ফিরাইয়া অপ্রতিভভাবে হাসিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

উহারা চলিয়া যাইতে টুলুর হুঁশ হইল। সেকেণ্ডমাস্টার আজকাল হেড-মাস্টারের জায়গায় কাজ করিতেছেন, উপর হইতেই তাঁহার উপর কোন আদেশ পৌঁছিয়াছে—টুলুর সঙ্গে ছেলেদের মেশা মানা। ম্যানেজারের সঙ্গে যে দিন

দেখা হয় তাহার পর তৃতীয় দিনের কথা এটা, টুলুর ইচ্ছা ছিল সকালকোটা স্কুলে গিয়া কাটাইবে, জনচারেক শিক্ষক আছেন, আলাপ করিবে, এক-আধটা ক্লাসও লইবে সেকেণ্ডমাস্টারকে বলিয়া—বেশ কাটিয়া যাইবে সকালটা। স্কুল জিনিসটা কূটনীতির সঙ্গে এত নিঃসম্পর্কিত বলিয়া ওর বিশ্বাস ছিল যে, এ সম্ভাবনার কথাটা মনেই উদয় হয় নাই। যাক্, অত হুমকির পরেও দুই দিন ম্যানেজারের তরফ থেকে কোন সাড়া শব্দ না আসায় টুলু বেশ একটু ধোঁকায় পড়িয়া গিয়াছিল; তাহা হইলে এখন যেরূপ দেখিতেছে একেবারে 'বসিয়া নাই সে। তবে, শত্রু হিসাবেও লোকটার প্রতি একটু শ্রদ্ধা হইয়াছিল, কিন্তু আক্রোশ মিটাইবার পদ্ধতি দেখিয়া সে-শ্রদ্ধার অনেক-খানিটাই নষ্ট হইয়া গেল। ম্যানেজার অমন গম্ভীর ব্যাপারটাকে যেন মেয়েলি কাণ্ডে পরিণতি করিয়া ফেলিয়াছে। মেয়েরাই পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া হইলে নিজের নিজের সন্তানদের বলিয়া দেয়—ওর বাড়ি যাস নি, কথা কস নি ওদের সঙ্গে···

সকালটা এখন এমনই কাটে, বসিয়া গড়াইয়া, খানিকটা বই পড়িয়া। স্কুল বন্ধ হইবার প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে বনমালী ভাত লইয়া আসে; সমস্ত দিনের মধ্যে এই সময়টুকু টুলুর যা একটু ভাল ভাবে কাটে, আহার্যের স্বাদিষ্টতার জন্য নয়—কোনটাতে নুন কম, কোনটাতে ঝাল বেশি, কোনটা আবার নুনের চোটে মুখে দেওয়া যায় না। সময়টুকু লোভনীয় বনমালীর গল্পের জন্য। গল্পের বিষয়ও এমন কিছু নয়, তবে ভাষা!—বড় চমৎকার লাগে এখানকার ভাষাটা টুলুর—বড় সুরেলা।—একটু অনুস্বরের ছুট্‌টা বেশি, মাঝে মাঝে শব্দগুলা হঠাৎ দ্বিত্ব হইয়া যায় আর তার সঙ্গে থাকে একটি চমৎকার টান; হাজারই বুড়ো হোক কেউ, মনে হয় যেন ছেলেমানুষের আধো-আধো বুলি; বাংলা-বিহারের সীমাভূমির ভাষা বলিয়া এক আধটা হিন্দি শব্দও আসিয়া পড়ে মাঝে মাঝে—"স্বপন দিখলাম ব্বিমার্‌রিটি হইছেঁ, তা আপ্‌্‌—ন নাতনি দিখবেক নাই? কি কথাঁ—টি বুলছ তুমি!···"

শুধু ভাষার জন্যই অন্য এক এক সময়ও ডাকিয়া লয়। নিজেও বলিবার চেষ্টা করে।

বনমালী মাথা নাড়িয়া হাসিয়া বলে—"উ তুমি পারবেক নাই। ই

আমাদের মেটেঁ। ভাষা আছে, তুমাদের নরো—ম জবানে আসবেক কুথাঁ। থিকে গো ?"

কষ্ট হয় বিকালবেলাটায়। দিনের মধ্যে বিকাল সময়টাই বড় উদাস, ঐ সময় মানুষ নিজের নিজের কাজের 'শেষটুকু গুটাইয়া আনিতে থাকে ব্যস্ত, পরস্পরকে সঙ্গ দিতে পারে না ; এ দিকে প্রকৃতিকেও যায় না পাওয়া, কাজের ক্ষিপ্রতার মধ্যেও মানুষের নিজেকে একটু নিঃসঙ্গ বলিয়া মনে হয়। যাহার হাতে কাজ নাই সে তো নিজের কাছে নিজে দুর্বহই হইয়া পড়ে।…বনমালী এই সময়টা পরদিনের জন্য স্কুলে ঝাঁট-পাট দেয়, বেঞ্চিগুলা গুছাইয়া-সুছাইয়া রাখে। একটু বাগানের মতো আছে, স্কুলের সঙ্গে সেইটুকুতেও এই সময়টাতেই দেখিয়া শুনিয়া নিজের দিনের মজুরি শেষ করে। টুলু বিছানায় পড়িয়া জানালা-পথে বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকে ; ঢেউ-খেলানো নিচু জমির উপর দিয়া অনেক দূর দৃষ্টি যায় ; সঙ্গে সঙ্গে জীবনের উপর দিয়াও।…কি করিতেছে জীবনটাকে লইয়া—এখন পর্যন্ত তো এই তরঙ্গায়িত উষর ভূখণ্ডের মতোই নিস্ফল ; কখনও কি ফল ফলিবে এ জীবনে ?…এক-এক দিন নৈরাশ্য আরও নিবিড় হইয়া গিয়া ঔদাসীন্যে দাঁড়ায়, ফল ফলিয়াই বা ফল কি ? সন্ন্যাসীদের পিছনে পিছনে যদি ঘুরিয়া কিছু পাইতই, ধরো যদি চরম বস্তুই পাইত তো কি সার্থকতা ছিল তাহাতে ? আর আজ ছুটিয়াছে কর্মের উন্মাদনায়, ধরা যাক, চম্পারা ফিরিয়াছে, চরণদাসেরা নেশা ছাড়িয়া একটা উন্নত জীবনের সন্ধান পাইয়াছে, শিশুরা সুস্থ, সুখলালিত, শিক্ষার সংস্পর্শে তাহাদের জীবন ধীরে ধীরে কল্যাণে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে ; কিন্তু তাহাতে টুলুর কি ?—কি পাইল সে ?…যশ ? প্রতিপত্তি ? অন্য কোন জীবনের পাথেয়—অন্য কোন লোক ?…কি ফল তাহাতেই বা ?… বড় রহস্যময় বলিয়া মনে হয় জীবনকে—কি যে চায় ! সব চেয়ে বড় প্রশ্ন—কেনই বা সে চায় !

সন্ধ্যার একটু আগে স্কুল আর বাসার সামনে খানিকটা পায়চারি করে, এই সময় এক-আধজন লোক চলে,—বেশির ভাগই গঞ্জের দিক থেকে বালিয়াড়ির দিকে। মানুষ না দেখিয়া দেখিয়া এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, এই নিত্যদিনের অতি-সাধারণ মানুষগুলিকেও বড় চমৎকার লাগে—শুধু চলার পথে তাহাদের ঐ

অন্তভঙ্গী, পায়ে পায়ে তাহাদের বাড়ির দিকে আগাইয়া যাওয়া—এইটুকুই যেন পরমাশ্চর্য ঘটনা বলিয়া মনে হয়; টুলু একটু দূরে থাকিয়া পিছনে পিছনে যায়, সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে—টিলা ঘুরিয়া ঐ নামিয়া গেল, আবার ধীরে ধীরে উঠিতেছে, তাহার পর দূরের ঐ টিলা—তাহার পিছনেই অদৃশ্য হইয়া গেল—কর্মজীবন আরও দূরে, আরও দূরে—গৃহের শান্তি আরও নিকটে আসিয়া পড়িতেছে; বৈকালের এই নিরর্থক জীবনই সন্ধ্যামুখে যেন একটু অর্থবান হইয়া উঠে।

বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়া আসিলে, টুলু কাঞ্চনতলাটিতে গিয়া বসে। সমস্ত দিনরাতের মধ্যে এই সময়টুকুর দিকে যেন সতৃষ্ণ নয়নে থাকে চাহিয়া। পশ্চিমে খণ্ডমেঘের মধ্যে বিচিত্র বর্ণবিন্যাসের সঙ্গে সূর্য অস্ত যায়, দূরে পঞ্চকোট পাহাড়ের উপর খুব হালকা একটা গোলাপী আভা কাঁপিতে থাকে। বস্তিটায় ঘরে-ফেরা আর গৃহস্থালীর একটা অস্পষ্ট চাঞ্চল্য উঠে। বালিয়াড়ির পথে লোকের চলাচল আর একটু যায় বাড়িয়া, গতি আর একটু হইয়া পড়ে ত্রস্ত। …এদিকে একটি মিষ্ট হাওয়া উঠে, তার নরম দোলানিতে এক-আধটা কাঞ্চনের ফুল টুপ টুপ করিয়া পড়ে ঝরিয়া।

জীবনের যেটুকু পায় তাহা পূর্ণও নয়, স্পষ্টও নয়—দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত থাকিয়া একটু আধটু আভাস দিয়ে যায় মাত্র; কিন্তু লাগে বড় চমৎকার; এই বিরাটত্বের মধ্যে বসিয়া জীবনে যেটুকু পায় তাহার একটা পূর্ণ বিরাট রূপ দেখিতে ইচ্ছা করে। থাকিয়া থাকিয়া নিতান্ত অহেতুক ভাবেই মনটা আনন্দের আবেগে ছলছল করিয়া উঠে—টুলু বার বারই মনে মনে প্রার্থনা জানায়—হে দেব, যশ নয়, প্রতিপত্তি-প্রতিষ্ঠা নয়, কোন অমৃত-লোকের পাথেয়ও আমি চাই না; আমার শুধু চারিদিকের এই জীবনকে পূর্ণতর ক'রে তুলতে দাও, আমার জীবনের সার্থকতাই হোক ঐটুকু—ওর অতীত আর কি চাইবারই বা আছে দেখি না তো…

সন্ধ্যা একটু গাঢ় হইয়া আসিলেই এই সংসার আবার অন্য রূপ ধরে,—ভয় হয় ম্যানেজারের লোক আসিয়া বাড়ি দখল করিল না তো?…ধীরে ধীরে সব দরজায় নিজেদের কুলুপ আঁটিয়া তাহাকে নিতান্তই নিঃসাড়ে বেদখল করিয়া গেল না তো?

একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া টুলু ধীরে ধীরে নামিয়া আসে।

॥ আঠারো ॥

আট দিনের দিন মাস্টারমশাইয়ের নিকট হইতে একটি থাম পাওয়া গেল। ভিতরে সেক্রেটারির নামে আর একখানি দরখাস্ত, আরও দশ দিনের ছুটির জন্ত। টুলুকে লেখা চিঠি বলিতে কিছু নাই, একটি ছোট কাগজে, সেক্রেটারির কাছে নিজে বা বনমালীকে দিয়া দরখাস্তটা পৌছাইয়া দিবার কথা; তাহার পরেই আশীর্বাদ। আগের চিঠির মতোই ঠিকানার নামগন্ধ নাই। থামের উপর বর্ধমান পোস্ট আফিসের ছাপ।

চিঠি না পাওয়ায় মনটা খারাপ ছিল, পাইয়া কিন্তু আরও খারাপ হইয়া গেল, বিশেষ করিয়া কোন ঠিকানা না থাকার জন্য। প্রথমটা মনে হইল মাস্টারমশাইয়ের এটা অবিশ্বাস; না অবিশ্বাস হয়, অবহেলা!···মনকে বুঝাইল—ভুলও হইতে পারে, কিংবা দরকার মনে করেন নাই। এতেও কিন্তু যে অনাত্মীয়তার ভাবটা ফুটিয়া রহিল তাহা পীড়াই দিল মনকে, একটা অভিমান লাগিয়া রহিল।

চিঠিতে আর একটা জিনিস যাহা দাঁড় করাইল তাহা অধৈর্য। যে সপ্তাহটা কাটিয়াছে সেটাও বেশ শান্তিতে কাটে নাই, তবে একটা আশা ছিল—একটা সপ্তাহ কোন রকমে কাটিয়া যাইবে, তাহার পর মাস্টারমশাই তো আসিয়াই যাইতেছেন। আরও দশ দিনের ছুটির কথায় হাঁপ ধরিয়া গেল, মনে হইল সে যেন একটা জায়গায় বন্দী হইয়া গেল। বন্দী মনের প্রতিক্রিয়া বিদ্রোহ, টুলু মরিয়া হইয়া উঠিল,—না দশটা দিনের কথা দূরে থাক্, সে আর একটা দিনও এ ভাবে কাটাইতে পারিবে না। আজ বাহির হইবেই। বাড়ি বেদখল হয়, আসিয়া উৎপাত লাগাইবে, একাই হোক, পাঁচ জনকে জড়ো করিয়াই হোক; তাহার পরিণাম যাহা হয় হোক না কেন। এ রকম নিশ্চেষ্ট জীবন আর এক দিনও সে সহ্য করিতে পারিবে না।

চিঠিটা পাইল বেলা প্রায় বারোটার সময়। তখনই একটা রসিদ লিখিয়া বনমালীকে ম্যানেজারের বাসায় পাঠাইয়া দিল; বলিল, রসিদটা যেন দস্তখত করাইয়া ফিরাইয়া আনে।

বনমালী ফিরিল প্রায় চারিটার সময়, বলিল—"রসিদটি দিলেক নাই।"

"তুই তা হ'লে···" বলিয়া টুলু চুপ করিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, বনমালী তাহা হইলে চিঠিটা দিল কেন ; প্রশ্নটা নিরর্থক জানিয়া আর শেষ করিল না। রাগে কান দুইটা পর্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, মনে হইতেছে যে, বনমালীর মারফৎ এই অপমানটা পৌছিল তাহার কাছে, তাহাকে দিয়াই সুদে আসলে সেটা ফেরত দেয়,—টাট্‌কা-টাট্‌কিই। কি উপায়ে, ভাবিতে গিয়া এখনই যে সঙ্কল্পটা মনে মনে আঁটিতেছিল তাহার কথা মনে পড়িয়া গেল, বনমালীর দিকে গম্ভীরভাবে চাহিয়া বলিল—"আমি একটু বাইরে যাব আজ বনমালী, তুমি বাড়িটা একটু আগলাতে পারবে ?"

বনমালী বলিল—"তা যাও না ক্যানে, আমিও তো তাই বুলছিলাম, জোয়ান মরদ হয়েঁ বাবুটি নতুন বউয়ের মুতোন ঘরে ব'সে থাকে ক্যানে গো?··· তুমি যাও, বাড়ি কুঁথায় যাবে ?"

টুলুর একটু হাসিও পাইল, দুঃখও হইল—তাহার সম্বন্ধে চমৎকার ধারণাটি দাঁড়াইয়াছে তো বনমালীর মনে ! বলিল—"বাড়ি আর কে উঠিয়ে নিয়ে যাবে ? তা নয়, তবে জিনিসপত্র সব ফেলে ছড়িয়ে হঠাৎ চ'লে গেছেন মাস্টারমশাই, লক্ষ্য রাখতে হবে তো ?"

"তা তুমি যাও, তোমার জিনিসে কে হাতটি দেয় আমি দিখবো বটে—সে আমি দিখবো, তুমি যাও, মাস্টারমশাইয়ের জিনিসে কে হাতটি দিবেক গো ? বনমালী বোষ্টোম জিন্দা থাকতে···তুমি যাও ক্যানে—কোন্ সম্বন্ধিটি হাত দেয় আমি দিখবো না ? হুঁ !—বনমালী মরে গেইছেঁ গো !"

টুলু একটু আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল। বনমালী রীতিমত চটিয়াই উঠিয়াছে, চাটালো বুক আর ছিনে মাথা লইয়া গোখরোসাপের ফণার মতো তাহার ঈষৎ বক্র শরীরটা অনেকটা সোজা হইয়া উঠিয়াছে, মুখটা রাঙা, চোখে বিদ্যুৎ—যেন ফণা ছোবল মারিতে উদ্যত হইয়াছে।···বড় আশ্চর্য বোধ হইল টুলুর, কোথায় চোর, কোথায় মাস্টারমশাইয়ের শত্রু তাহার ঠিক নাই, শুধু উল্লেখেই এই রকম নিরীহগোছের লোকটা একেবারে যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

...টুলু মুখটা ফিরাইয়া কি ভাবিতে লাগিল—অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া গেছে—বহুদূর চলিয়া গেছে তাহার মনটা। পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা অমূল্য রত্ন কুড়াইয়া পাইয়াছে যেন, সেইটাকে ঘিরিয়া তাহার কল্পনা হইয়া উঠিয়াছে সচেতন। সেই কল্পনা বাস্তবে কি রকম দাঁড়াইবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্যই টুলু মুখটা ঘুরাইয়া বলিল—"মাস্টারমশাইকে তুমি কি রকম ভক্তি কর আমার অজানা নেই বনমালী, কিন্তু তুমি তো একা, ধরো খনির কোন লোক বা কয়েকজন লোক এসে হঠাৎ বাড়িটার ওপর চড়াই করলে..."

বনমালী অতিরিক্ত বিস্ময়ে টুলুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল একটু, যেন বাকস্ফূর্তির মত অবস্থা হইলে বলিল—"তুমি কি বলছ বাবুমশয়? খনির লোক মাস্টারমশাইয়ের বাসাঁয় চড়াইটি করবেক! উ তো দেবতাটি আছেঁ গো, খনির কোন্ সুমুন্ধি উর উবগারটি না পাইছে? বিন্দাবনের বউয়ের বেমারিতে মাস্টারমশাই ডাগদর-দাবাইয়েঁর পাই-পাইটি খরচ দিলেক নাই? হুল্লভের ছাওয়াল যখন মরবার পারা, উ মাস্টারমশাই আপ্পুনি যেঁয়ে বাঁচালেক নাই? লক্ষ্মণ পাঁজার ঘর জ্ব'লে গেলোক, সিটি না হয় কোম্পানি আবার তুলে দিলেক, জিনিস-পত্তোর কে ট্যাকা দিয়ে কিনে দিলেক গো?"

টুলু নিশ্চল হইয়া শুনিয়া যাইতে লাগিল, বনমালী লম্বা একটা ফিরিস্তি আওড়াইয়া বলিল—"হঁ মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি চড়াই করবেক। উ ঢাক বাজায়েঁ দিলেক নাই তো কি? আমি ই হাতে করে দিয়ঁা এসেছিঁ বটে, আমি জানি না?—আর উ জানে না? উ গো, যিটি উপরে ব'সে ব'সে ভালো মন্দ সবটি খাতায় জমা করছেঁ..."

কতকটা রাগের ওপরেই এই পর্যন্ত বলিয়া বনমালী একটু ঠাণ্ডা হইল; তাহার পর টুলুকে আশ্বাস দিয়া বলিল—"না গো, আপ্পুনি যাও ক্যানে কুথা যাবে, উ দেবতাটি আছেঁ, সারা খনি উকে দেবতাটি মনে করে, উর বাড়িতে কে ঢুকবেক গো?"

টুলু আবার একটু কি ভাবিল, তাহার পর বলিল—"তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু ধরো উনি বাড়ি নেই, শত্রুতা ক'রে কেউ লোক লাগিয়ে দিলে—খনির লোক না হোক্, অন্য লোকদেরই।"

বনমালী আবার বিস্মিতভাবে একটু চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—"হুঁ! উনির শত্রু কে বটে গো? উনির শত্রু কে বটে?"

শত্রু সবারই হয় বনমালী, মানুষ মাত্রেরই শত্রু আছে!"

"মানুষের থাকবেক নাই কেন গো? মানুষের আছে, কিন্তু উ তো দেবতা বটে।"

একটা মস্ত বড় সুযোগ আপনা হইতে হাতে আসিয়া পড়িয়াছে, টুলু কোনো রকমে পাকে-প্রকারে ম্যানেজারের কথাটা আনিয়া ফেলিয়া ভাবগতিকটা একটু বুঝিয়া লইতে চায়; বলিল—"কিন্তু দেবতারও তো শত্রু আছে বনমালী।"

"দেবতার শত্রু কে গো? তুমি কি কথাটি বুলছ?"

"কেন, দত্যিরা, রাক্ষসেরা; রামচন্দ্রের শত্রু রাক্ষসদের রাজা রাবণ ছিল না?"

অনেকটা কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, টুলু একটু চুপ করিল, আর কতকটা অগ্রসর হওয়া চলে যেন ঠিক করিতে পারিতেছে না, তাহার পর বলিল, "রাবণের ভাই অহি রাবণের নাম শুনেছ বনমালী।"

"হুঁ, পাতালের রাজা অহি রাবণ; নাম শুনবোক নাই? কত যাত্রা দিখলাম বটে, ই গঞ্জডিহিতেই কত যাত্রা দিখলাম।"

খুব পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইতে হইতেছে, টুলু আবার একটু থামিল, তাহার পর বলিল—"এখানে যেমন যাত্রা দেখেছিলে তেমনি পাতালও তো রয়েছে।"

বনমালী মুখ তুলিয়া চাহিতে বলিল—"কেন তোমাদের খনি; পাতাল তো আর গাছে ফলে না।"

বনমালী একটু ভাবিয়া যেন মিলাইয়া লইয়া চোখ দুইটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বলিল—"হুঁ, খনিটি পাত্তাল বটে; খনিটি পাত্তাল বটে···তা রাজা কুথা গো?"

প্রশ্নটা করিয়াই বনমালীর চোখ দুইটা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, ওর মতো দুর্বল মস্তিষ্কের এক-এক সময় হঠাৎ বুদ্ধির স্ফুরণও হয়; মাথাটা দুলাইয়া দুলাইয়া একটু হাসিয়া বলিল—"হুঁ বুঝেছিঁ, আপুনি ম্যানেজার বাবুকে বুলছঁ—ম্যানেজার বাবুটি রাজা হইছেঁ, অহি রাবণ হইছেঁ আমি বুঝেছিঁ।..."

যে চরম কথাটিকে খুব সন্তর্পণে আনিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল সেটা

এই রকম আপনা হইতে আসিয়া পড়ায় টুলু একটু থতমত খাইয়া গেল, সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"না তা কি বলতে পারি? রাজা না হয় হ'ল তা ব'লে অহি রাবণ কি বলতে পারি ম্যানেজার বাবুকে?..."

বনমালী কিন্তু নিজের তালেই চলিয়াছে, বলিল—"তা বুলবেক নাই ক্যানে গো? আপুনি জানো নাই তাই বুলবেক নাই, আমরা জানি, বুলবোক নাই ক্যানে? উ লোকটি মন্দ বটে, কত খুন করেছে, কত সব্বনাশটি করেছে, আপুনি জানো নাই তাই বুলবেক নাই, আমরা জানি, বুলবোক নাই ক্যানে গো?"

টুলু খানিকক্ষণ বলিয়া যাইতে দিল, তাহার পর আসল কথাটা আনিয়া ফেলিল, বলিল—"আমি অবশ্য বলছি না অহি রাবণ, তবে তোমার কথা ধ'রেই বলি—বেশ, ম্যানেজারই যদি কোন কারণে লোক পাঠিয়ে শত্রুতা করতে চায়, অত কথা কি, এই আমিই মাস্টারমশাইয়ের হুকুমে তাঁর বাসা আগলাচ্ছি—আমাকেই যদি ওর পছন্দ না হয়, বাসা ছাড়া করতে চায় লোক পাঠিয়ে—"

বনমালী আবার বুকে চাড়া দিয়া কতকটা সোজা হইয়া উঠিল, চোখ মুখ সেই রকম উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিল—"হুঁ পাঠাক্ ক্যানে লোক, বনমালী ম'রে গেইছেঁ বটে! আজতক আমায় খনির লোক 'বনমালী-খুড়ো' ব'লে ডাকে, আমার ছাওয়াল চরণকে সর্দার বলে মানে বটে! আপুনি অমন কথাটি বুলো বাবুমশয়, আমার মাথাটি কাটা যায় বটে। মাস্টারমশাই আপুনিকে সুদ্দু আমার হাঁথে রেখে গেল—বুললে, বনমালী, ই ছোকরাটি আমার আপ্‌ন জন—ছাওয়ালের পারা, তুমি দিখবেক।...আপুনিকে বাড়িছাড়া করে কুন সুমুন্দী আমি দিখবো—হুঁ দিখবো আমি!...

॥ উনিশ ॥

অনেকগুলো কথা নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই জানা গেল, মাস্টারমশাইয়ের চরিত্রের একটা গভীরতম রহস্য পর্যন্ত; অবশ্য বেশি আশ্চর্য হইল না টুলু।

বাহির হইয়া প্রথমে গেল কর্তাপাড়ায় কাকার বাড়ি। দিনচারেক হইল মেয়েরা হঠাৎ দেশে চলিয়া গেছে। কাকার সঙ্গে দেখা হইল, দোকানে বাহির

হইবার জন্ত তৈয়ার হইতেছিলেন। মুখটা বেশ ভার ভার। বলিলেন—“চিরকালটা ভবঘুরের মতন ঘুরে বেড়াবি—কেন, বাড়িতে থেকে সেবাব্রত হয় না?”

সেবাব্রত কথাটায় বেশ জোর দিলেন।

টুলু মাথা নিচু করিয়া চুপ করিয়াই রহিল।

কাকা একটু থামিয়া বলিলেন—“ম্যানেজারবাবুর কাছে সব শুনলাম। কিন্তু আমার এখানে যা কিছু ঐ খনির ভরসাতেই ..”

টুলুর মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গেল—“তা হ’লে কি এ বাড়ি বন্ধ হ’ল আমার?”

কাকা অসংযতভাবেই চিৎকার করিয়া উঠিলেন—“তার মানে তাই হ’ল—খুব তার্কিক হয়েছিস মাস্টারের শাকরেদি ক’রে?—যাদের নিয়ে সব, তাদের সঙ্গে একটু মানিয়ে চলতে হবে না? এই দুশো মাইল দূরে কত কাটখড় পুড়িয়ে লোকের মত সাধ্যিসাধনা ক’রে একটা আস্তানা দাঁড় করিয়েছি, হাঘরেদের সঙ্গে হাঘরে হতে গিয়ে সেটা নষ্ট করতে হবে? দাদাকে লিখেছি, এইখানে এসে থাক, ওসব চলবে না।”

রাগের ঝোঁকেই যেন একটু তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

ঠাকুর চাকর ছিল, ভালোরকম করিয়া কিছু জলযোগ তৈয়ার করিয়া পরিতৃপ্ত-ভাবে আহার করিয়া টুলু বাহির হইয়া গেল। আজ মনটা বেশ প্রফুল্ল, কোন কথা গায়ে মাখিতে ইচ্ছা করিতেছে না।

অনির্দিষ্টভাবে খানিকটা ঘুরিয়া বেড়াইল বাজারে, শুধু কাকার দোকানের দিকটা বাদ দিয়া। রোদ মন্দ কড়া নয় তখনও, কিন্তু কড়া কথার মতো রোদও আজ যেন কড়া লাগিতেছে না, মনে হইতেছে—এসব অবান্তর, গায়ে আসিয়া পড়িবেই, তবে গা পাতিয়া লইয়া আশকারা দিবার দরকার নাই।···ভিতর থেকে জাগিতেছে কাজ করার আনন্দ—না পাইয়াও যাহাতে এত আনন্দ, সমস্ত মন আজ যেন তাহাই হাতড়াইয়া খুঁজিতেছে।

বাজার থেকে গেল বস্তির দিকে। প্রথমটা মনে হইল, ভিতরে প্রবেশ করিবে না, তাহার পর কি ভাবিয়া প্রবেশ করিয়াই বসিল। সঙ্গে সঙ্গেই

সেদিনকার আসা আর আজকের আসার মধ্যে বেশ একটা প্রভেদ উপলব্ধি করিল। আজ অনেকের দৃষ্টিতে কৌতূহলের সঙ্গে একটা সম্ভ্রমের ভাব রহিয়াছে। সেদিন খনির মধ্যে হীরক-সম্পর্কিত ব্যাপারে অনেকগুলি লোক সমবেত হইয়াছিল, টুলুকে দেখিয়াছিল, টুলু বুঝিল এ তাহারই জের। কয়েকজনই বর্ষীয়ান তাহাকে বেশ ঝুঁকিয়া প্রণাম করিল, একজন বারান্দা হইতে একটু নামিয়া মৃদু হাস্য সহকারে প্রশ্ন করিল—"কোথায় আগমন হলেন কর্তার?"

টুলু বলিল—"এই একটু বাজার থেকে ফিরছি—ভাবলাম এ দিক হয়েই যাই না হয়।"

একেবারে—অকারণে এই রৌদ্রে এতটা পথ ঘুরিয়া যাওয়া নিজের কাছেই কেমন বোধ হওয়ায় কতকটা যেন অজ্ঞাতসারেই জুড়িয়া দিল—"সেই খোকাটি কেমন আছে?"

লোকটি অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিল, আরও আগাইয়া আসিয়া বলিল—"দিখবেন তারে? তাই বলি, কর্তা খামোকা এমন রোদে বস্তিতে আলেন ক্যানে..."

এতটা ভাবিয়া বলে নাই, টুলুর মুখটা একেবারে শুকাইয়া গেল,—মনে পড়িল ছেলে লইয়া চম্পার সেই উগ্র মূর্তি—মেয়েটির মুখ খামচানো,—আসিয়া আলুথালু বেশে নালিশ করিতেছে—"দেখোঁ, ছাওয়াল কেড়্যা নিলেক। আমার জাম্মা ছিঁড়্যা দিলেক;.. আমার চুল ছিঁড়্যা দিলেক!...উই চম্পা—চরণদাসের বিটি।..."

আমতা আমতা করিয়া লোকটাকে বলিল—"না, ইয়ে—দেখবার তত দরকার নেই...তোমার গিয়ে, আছে কেমন ছেলেটি?..."

লোকটি বুঝিল, একটু ভয়-ভাঙানো গোছের হাসির সঙ্গে বলিল—"না, আপুনি আসুন আজ্ঞে—চরণদাসের বিটি পাগলি আছে—সিদিনটি খেয়ালের মাথায় অমোনটি করেছিল—কিছু বুলবেক নাই..আপুনি আসুন আজ্ঞে—দিখবেন বইকি..."

বস্তিতে এখনও সবাই কাজ থেকে ফেরে নাই, তবু মেয়ে-পুরুষে ছেলের-

মুড়োয় অনেকগুলি লোক জমা হইল। একজন স্ত্রীলোক বলিল—"আজ উ তো পেল্লাদের বউকেই আবার দিয়াঁ দিলেক গো।"

লোকটি বলিল—"ঐ শুনুন আজ্ঞে; উ পাগলিটি আছেঁ। আপুনি দিখুন—অতো দয়াটি করলেন—দিখবেন নাই?"

আর একটি মেয়ে সাহস দিবার ভঙ্গিতে বলিল—"আর চম্পা এখন কোথায় গো?—সে তো খনিতে বটে।"

সবাই অগ্রসর হইল। পিছনে চাপা গলায় আলোচনা হইতেছে—"হঁ, ই বাবুই তো ট্যাকা দিলেক, বুললে—আরও দিবো তু পুষ ক্যানে!"

"ইয়া দেবতা আছে গো, মানুষটি লয়…"

"তা হবেক নাই?—মাস্টারমশাইর আপ্পন জন যে…স্কুলটিতেই থাকা করে…"

কয়েকটা বাসার বারান্দা থেকে ছেলেমেয়েরা ত্রস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়া গিয়া মায়েদের ডাকিয়া আনিল, কেহ চেনে, কেহ চেনে না, কেহ শুধু কৌতূহল লইয়া, কেহ কৌতূহলের সঙ্গে একটি শ্রদ্ধার স্মিত হাস্য মিশাইয়া বারান্দার খুঁটা ধরিয়া দাঁড়াইল, কেহ নামিয়া আসিয়া সঙ্গ লইল। চাপা প্রশ্ন হইতেছে—"কে বটে গো? কি হইছেঁ?" চাপা উত্তর হইতেছে।

সঙ্কোচ বোধ হইতেছে, তবু বড় ভাল লাগিতেছে টুলুর; সবাই গরীব, বেশির ভাগই ন্যাকড়া-পরা, অপরিচ্ছন্ন; তবে সবার মধ্যে থেকে একটি অনাবিল শ্রদ্ধা আর প্রীতির ধারা তাহার উপর উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে—কথায়, চাহনিতে, হাসিতে এমন কি সঙ্গে থাকার আগ্রহের মধ্যেও।

ছিয়াত্তর নম্বরের সামনে আসিয়া পড়িল।

"কুথা গো বউ—ছাওয়ালটিকে বের কর্…চম্পার ছাওয়ালটিকে বের কর্… হীরাটিকে বের কর্…" বলিতে বলিতে কয়েকজন মেয়ে বারান্দায় উঠিয়া পড়িল, কয়েকজন ভিতরে ঢুকিয়া গেল। একটু পরেই পেল্লাদের বউ একটি ফুলকাটা পরিষ্কার কাথায় মোড়া রাঙা সালুর জামা পরানো চোখে-কাজল-টানা শিশুকে কোলে করিয়া সামনে আসিয়া মৃদু হাসিয়া লজ্জিতভাবে দাঁড়াইল। এক জন

বর্ষীয়ান বলিল—"ঈস্‌ রে! চম্পার দশ দিনের পোলায় ভাবো—ন'টি দিখো! ···অ রে! ব্যাটা শৌখীন হইছেঁ!···"

সবাই খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

একটা অদ্ভুত ধরনের—নিতান্তই নূতন ধরনের অনুভূতিতে টুলুর মনটা পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে—এই শিশুটিকেই না সে সেদিন কয়লার ধূলি থেকে নিজের করিয়া তুলিয়া লইয়াছিল?—তারপর চম্পা লইল কাড়িয়া।···সমস্ত ঘটনাটা কেমন যেন রহস্যময় বলিয়া মনে হইতেছে। সেদিন যাহা করিয়াছিল এত কিছু ভাবিয়া করে নাই, খনির সেই আবহাওয়ার মধ্যে অত বড় একটা ট্র্যাজেডিতে অভিভূত হইয়া নিতান্ত দয়াপরবশ হইয়া তুলিয়া লইয়াছিল ছেলেটি। আজ একেবারে অন্য রকম, মনের ভাবটা গোলমালের মধ্যে গুছাইয়া বুঝিতে পারিতেছে না, তবে মনে হইতেছে—সেদিনের দয়া আজ কি করিয়া মমতায় পরিণত হইয়া গেছে—কেউ নয়, অথচ মনে হইতেছে আমারই তো—আমারই তো—আমিই তো তুলিয়া লইয়াছিলাম···

আর, চমৎকার ছেলেটিও, যেন টানিতেছে, অন্যমনস্ক ভাবেই টুলু দুই পা আগাইয়া যাইতে মেয়েটিও ভুল বুঝিয়া ভুল করিয়া বসিল, বারান্দা থেকে নামিয়া পড়িয়া ছেলেটিকে সামনে বাড়াইয়া ধরিল। টুলু একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া ক্ষণমাত্রের জন্য একটা দ্বিধায় পড়িয়া গেল, তাহার পরই হাতটা বাড়াইয়া একটু হাসিয়া বলিল—"দেবে? তা দাও।···কি চমৎকার হাসছে ছেলেটি! সুন্দর চুলের···" শেষের কথাটি বলিতে বলিতে সবার দিকে ঘুরিয়া চাহিতেই আরও অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া গেল; সমস্ত দলটি—ছেলে বুড়ো সবাই, একেবারে নিশ্চুপ হইয়া গেছে—আর মুখে বিস্ময়, প্রশংসা আর আনন্দের কী যে একটা অপরূপ মিশ্রণ—যেন সবাই সম্পূর্ণই অপ্রত্যাশিত, কল্পনার অতীত কোন দৈব লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছে।

একটুর মধ্যে ফিস্‌ফিসানি আর চাপা মন্তব্য আরম্ভ হইয়া গেল—"দেবতাই তো আছেঁ গো, উনিদের কাছে ছোট বড়োটি আছেঁ নাকি?···হাঁ, তুরা কি বুলিস গো! চম্পা কেড়ে নিলেক, না তো উ তো রাজাটি হোত বটে···আর, পোলা—তারা তো দেবতা গো, দেবতার কোলটি পাবেক নাই?···"

টুলু এমন একটা সঙ্কোচের মধ্যে পড়িয়া গেছে, কি যে করিবে স্থির করিতে পারিতেছে না, এমন সময় আর একটি শিশু-কণ্ঠে কান্নার রব উঠিল। প্রহ্লাদের ছেলেটি বোধ হয় ঘুমাইতেছিল, জাগিয়া উঠিয়া মাকে কাছে না পাইয়া চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছে।

টুলু যেন বাঁচিল, ছেলেটিকে বাড়াইয়া দিতে দিতে বলিল—"ওটি বুঝি তোমার ছেলে?"

মেয়েটি হাত বাড়াইয়া লইতে লইতে মুখটা একটু নিচু করিয়া হাসিল, কিছু উত্তর করিল না।

ছেলেটিকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই টুলুর সে সঙ্কোচের ভাবটা কাটিয়া গেছে; একটু হাসিয়া বেশ সহজভাবেই বলিল—"তা নিয়ে এস, ওটিকেও একবার দেখি।"

দলটা আবার নিশ্চুপ হইয়া গেল।...দেবতার লীলার কি শেষ নাই?

মেয়েটি কিছু না বলিয়া একভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল, শুধু হাসিটি যেন একটু ম্লান; সেই বর্ষীয়ান লোকটি বলিল—"নিয়ে আয় না গো, বাবুমশয় বুলছেঁ..."

মেয়েটি নড়িল না, বলিল—"হঁ, আমার পোলা উনি কি দিখবেন?—উ মিতিনের পোলার পারা নাকি?—গরীবটি—কালোটি—জামা নেই শরীলে..."

টুলু হাসিয়া বলিল—"তা হোক, নিয়ে এস, না দেখে নড়ব না আমি।"

একটা চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। মেয়েদেরও কয়েকজন তাগাদা দিল—"আয় না নিয়াঁ...আবার দাঁড়িয়েঁ থাকে দেখোঁ!..."

একটি মেয়ে মায়ের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই ভিতরে চলিয়া গেল এবং ছেলেটিকে উঠাইয়া আনিল। মাস পাঁচ-ছয়ের ছেলেটি। কালোই, কিন্তু স্বাস্থ্যের সৌন্দর্যে যেন ভরপুর হইয়া আছে। জামা-টামা গায়ে নাই, তবে কোমরে একটা রূপার গোট ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। বাহিরে আসিয়া হঠাৎ এ-রকম ভিড় দেখিয়া টানা টানা চোখে ফ্যালফ্যাল করিয়া অবোধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

"দাও আমায়।"—বলিয়া টুলু বেশ সহজেই ছেলেটিকে চাহিয়া লইল; হীরকের মতো একেবারে কাদার ড্যালা নয়, একটু প্রাণের চাঞ্চল্য আছে, বেশ সহজেই টুলু একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আদর করিল, প্রকৃতই শিশু-সঙ্গের আনন্দে

বুকে বার-দুয়েক চাপিয়া ধরিল, তাহার পর বোধ হয় মনের আবেগে এদের ভাষা নকল করিয়াই বলিল—"ইটি তো নাড়ু-গোপালটি আছেঁ বটে গো!"

এমন কিছু হাসির কথা নয়, তরে অন্তরের আনন্দকে মুক্ত করিয়া দিবার এক সুযোগ পাইয়াই যেন সমস্ত দলটা হাসিতে ভাঙিয়া পড়িল। কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে আনন্দের চোটে কুঁজা হইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে দুলিয়া দুলিয়া বলিতে লাগিল—"আমাদের কথা বুলছেঁ গো বাবুটি···নাড়ু-গোপালটি আছেঁ বটে।"

টুলু যেন একেবারেই মিশিয়া গেছে এদের সঙ্গে, সঙ্কোচের আর এতটুকুও কোথাও নাই, চারিদিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—"এত হাসি কেন তোমাদের গো? নয় নাড়ুগোপালের মতন? কেমন গোল গোল হাত, গোল গোল পা—"

মেয়েটি লজ্জিতভাবে বারান্দার এক পাশটিতে গিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, টুলু তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—"তোমাদের ছেলের দিব্যি ক'রে চূড়া বেঁধে দিও গো, ঠিক নাড়ুগোপালটির মতন দেখতে হবে।"

হাসির যেন পথ খুঁজিতেছে সবাই—আবার হাসি ছলছলিয়া উঠিল।··· "চূড়া বেঁধে দিস···খোকাটির চূড়া বেঁধে দিবে।···"

টুলু ছেলেটিকে ফিরাইয়া দিয়া, তাহার পর পকেটে হাত দিয়া ভিতরেই ব্যাগের মুখ খুলিয়া দুইটা টাকা বাহির করিল, মেয়েটির দিকে বাড়াইয়া বলিল —"এই ধর, তোমার ছেলেটিকে হীরার মতন একটা জামা ক'রে দিও···নাও, নেবে বইকি···"

মেয়েটি নড়িল না, একবার দেখিয়া লইয়া লজ্জিতভাবে মুখটা গুঁজিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল। যে মেয়েটি শিশুটিকে লইয়া ছিল, সে শিশুর হাতটা বাড়াইয়া ধরিল, বলিল—"লিবেক নাই ক্যানে গো? আপুনি দাও ক্যানে, জামা করায়ে দিবে।"

টাকা পাইয়া শিশুটি মুখে পুরিতেই এক জন বলিয়া উঠিল—"হুঁ, জামা পেট্টের মধ্যে ঢুকলোক!"

আবার একটা হাসির লহর উঠিল।

টুলু আবার পকেটে হাত দিয়েছে, সমস্ত অন্তরাত্মা চাহিতেছে হীরুকের হাতেও দুটি টাকা দেয়, কিন্তু কোথা থেকে সেই সঙ্কোচ আসিয়া জুটিয়াছে আবার, হাতটা কোন মতেই যেন বাহির করিতে পারিতেছে না। একটি মেয়ে বলিল—আর হীরাটির কি দোষ হইছেঁ গো ?"—বলিয়াই হাসিয়া মুখটা ঘুরাইয়া লইল।

"হীরাবাবুরও চাই ? তা এই নে !···ওর বরং একটা গোট ক'রে দিস, কেউ কারুর হিংসে করবে না তা হ'লে।"

দুইটা টাকা বাহির করিয়া দিতে অপর একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল—"দু ট্যাকায় গোট হয় নাকি গো ? দু ট্যাকায় রূপার গোট !"···বলিয়াই হাসিয়াই প্রথম মেয়েটির ঘাড়ে মুখ গুঁজিয়া দিল।

হয় না যে টুলুর সেটা জানা, তবে দুই শিশুর মধ্যে ইতরবিশেষ করিতে রাজি হইল না। হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ, আমি বেশি দিই আর তোদের চম্পা এসে সেদিনকার মতন রসাতল কাণ্ড করুক—'বড়া মানুষটি হইছেঁ।—ট্যাকার গুমোর দেখাইছেঁ।'···"

নিজেও হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, ওদের কেহও বাদ গেল না।···হাসির জাত নাই, হাসিতে হাসিতে সব যেন একাকার হইয়া গেল।

বস্তি থেকে এদিক দিয়া স্কুলে যাইবার পায়ে-হাঁটা পথ আছে দুইটা—একটা একটু সোজা, সেটা দিয়া চম্পা রোজ যায়, আর একটা একটু ঘুরিয়া ; বোধ হয় এত শীঘ্র বাসায় ফিরিবার ইচ্ছা না থাকায় টুলু দ্বিতীয় পথটাই ধরিল। এই পথে বস্তি আর স্কুলের মাঝামাঝি একটা প্রকাণ্ড বটগাছ আছে, এই বিরলপাদপ দেশে বড় বিশিষ্ট দেখায়! তাহার তলাটিতে আসিয়া টুলু একটা পাথরের উপর বসিল। মনটা আজ পূর্ণ হইয়া আছে—এ ধরণের পূর্ণতা টুলু জীবনে আর কখনও অনুভব করে নাই। এই পূর্ণতার পরিধির মধ্যে আজ সমস্তকেই টানিয়া লইতে ইচ্ছা হইতেছে—কোথাও কিছু একটুকেও বাদ না দিয়া! অতীত জীবনের দিকে চাহিয়া কেবলই মনে হইতেছে—আজ বস্তির মাঝে ঐ বাধাহীন, জাতিহীন, পূর্ণ মিলনের মধ্যে যাঁর আনন্দময় রূপকে প্রত্যক্ষ করিলাম, আশ্রমে আশ্রমে কি তাঁহার সন্ধানেই বৃথা অন্বেষণে ঘুরিয়া মরিয়াছি ? এত সহজের জন্য

অত তপস্যার কিই বা প্রয়োজন ? তিনি যখন এমনি করিয়া পথের ধূলা মাড়াইয়া চলিয়াছেন, তখন কি ফল তোমার দৃষ্টিকে অমন আকাশলগ্ন করিয়া ?

জায়গাটি বড় স্নিগ্ধ। বস্তির আর এদিক-ওদিকের যত কিছু গরু-বাছুর, ছাগল, ভেড়া এই বৃক্ষটিকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত দিন থাকে চরিতে, তাদের রক্ষী ছেলে-মেয়েরা এর ছায়ায় করে খেলা। টুলু নিজের আনন্দকে আশ্রয় করিয়া অনেকক্ষণ রহিল বসিয়া। আর সব খেলা সাধারণ, একটি খেলার দিকে বিশেষ করিয়া টুলুর নজর গেল, বড় নূতন ধরনের খেলা, যেমন নূতন, তেমনি মর্মস্পর্শী।

কতকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ভিক্ষে-ভিক্ষে খেলা করিতেছে। বটগাছের ধারেই একটা খোয়াই, সূতার মতো একটা জলের ধারা আছে, কোথাও কোথাও তাহাই একটু মোটা হইয়া গিয়া খানিকটা করিয়া জল জমিয়াছে; এইটা হইয়াছে বরাকর গাং, এক দল যেন সেই গাঙে মেলায় স্নান করিতে যাইতেছে আর পাঁচ-ছয়টি ছেলেমেয়ে—যাহারা একেবারেই ন্যাকড়া-পরা—তাহারা হইয়াছে ভিখারী। সারি সারি বসিয়াছে, যাত্রীদের কাছে বিনাইয়া বিনাইয়া ভিক্ষা চাহিতেছে—যে যত বিনাইয়া বলিতে পারিতেছে তাহার যেন তত বাহাদুরি—"এ বাবুমশয় গো, একটা পয়সা দি—ন বঁটে, দু'দিন খেতে পাই নাই গো···দাও মা, তুমার কোলে রাঙা পোলা দিবেক মা গঙ্গা—দুটি পয়সা দাও বটে গো—"

একটা ছেলের মাথায় নূতন আইডিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ উঠিয়া পড়িল এবং কোমরের ন্যাকড়াটুকু খুলিয়া ফেলিয়া সামনে বিছাইয়া বসিল, বাস্তবের সঙ্গে কতটা মিল আনিয়া ফেলিয়াছে সেই গর্বে সবার দিকে চাহিয়া বলিল—"তুরা দেখ্, কাপড়টি না থাকলে উরা দিবে কুথায় ?"

তিনটি ছেলে, বাকি ছেলে দুইটিও বিবস্ত্র হইয়া সামনে কাপড় পাতিল। দুটি মেয়ে, তাহারা একটু লজ্জিত ভাবে হাসিয়া আরও গুটাইয়া-গুটাইয়া বসিল। আবার ভিক্ষা চাওয়া চলিল। একটি মেয়ে হঠাৎ উঠিয়া পড়িল এবং পাশের ছেলেটির ন্যাকড়াটা খপ করিয়া তুলিয়া লইয়া খোয়াইয়ের দিকে ছুটিল। ছেলেটি ওর ভাই—"দিদি, দিদি গো !"—বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মেয়েটি দাঁড়াইল না—"তু বোস্ ক্যানে, আমি সবাইকে হারায়েঁ দিব, তু দিখবি···" বলিতে বলিতে ছুটিয়া গেল। একটুর মধ্যেই ন্যাকড়াটা ভিজাইয়া

সবার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে সেটা গায়ে মাথায় জড়াইয়া বসিয়া পড়িল এবং দুলিয়া দুলিয়া কাতরানি আরম্ভ করিল। একটি যাত্রীছেলে আহ্লাদে হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল—"হঁ—তু ঠিক তুর দিদিমার পারা হইছিঁস বটে!"

বড় কৌতূহল হইল টুলুর; মেয়েটিকে ডাকিল। সে একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেলে ছেলেটি বলিল—"যা না, কিছু বুলবেক নাই।"

মেয়েটি একটু কুণ্ঠিত পদে আসিয়া দাঁড়াইতে টুলু প্রশ্ন করিল—"তুই কার মেয়ে?"

মেয়েটি ঘাড় নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া আড়চোখে একবার সঙ্গীদের পানে চাহিল, ছেলেটি বলিল—"উ কারুর মেয়ে লয় গো, উর দিদিমার লাতনি বটে।"

টুলু মেয়েটিকে প্রশ্ন করিল—"তোর বাপ মা নেই?"

মেয়েটি একবার ঘাড় নাড়িল, তাহার পর বলিল—না।"

"দিদিমা কি করে?"

"ভিক্ষে।"

ছেলেটি বলিল—সিটি আগে খনিতে কাজ করত; চোখ গেইছেঁ।"

টুলু মেয়েটিকেই প্রশ্ন করিল—"কোথায় ভিক্ষে করে?"

"বাজারে।"

"খনির বাবুরা খেতে দেয় না?—ম্যানেজারবাবু?"

মেয়েটি একটু অবোধভাবে শুধু মুখ তুলিয়া চাহিল। ছেলেটি বলিল—"উ কাজ করে নাই, খেতে দিবেক ক্যানে গো?"

টুলু আবার মেয়েটিকেই প্রশ্ন করিল—"উটি তোর ভাই?"

"হঁ।"

"কোথায় থাকিস তোরা?"

"কুথাও লয়।"

"গায়ে ভিজে ন্যাকড়া জড়িয়েছিস কেন?"

"দিদিমাটি জড়ায় বটে।"

"কেন?"

মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল, উত্তর দিল সেই ছেলেটি, বলিল—"চণ্ডাল রোদটি

বটে যে গো, সিখানে গাছ নাই, ভিজা কাপোড়টি জড়ায়েঁ ব'সে থাকে।...বুড়ী কতো চালাকটি বটে!"

এত গাম্ভীর্য ওরা সহিতে পারে না, শেষের কথায় সবাই খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। দলটা আসিয়া জমিয়াছিল—"চাল্লাকটি বটে!...বুড়ী চাল্লাকটি বটে!"—বলিতে বলিতে সমস্ত দলটা যেন হাসিতে হাসিতে ছিন্নভিন্ন হইয়া ছড়াইয়া পড়িল।

টুলু স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল, চোখ দুইটি ছলছল করিয়া উঠিয়াছে, যা বোধ হয় বহু—বহু দিনই হয় নাই উহার। মেয়েটির পিঠে হাত দিয়া একটু কাছে টানিয়া লইল, বলিল—"না, ও-রকম ক'রে ভিক্ষে ভিক্ষে খেলিস নি...মা-লক্ষ্মী তা হ'লে ভিক্ষে দেন না।"

শেষের কথাটায় নিজেই একটু যেন চমকিত হইল,—মাস্টারমশাইয়ের মুখের এমন ঠাকুর-দেবতা-ঘেঁষা ব্যঙ্গটা তাহার মুখে হঠাৎ আসিয়া পড়িল কি করিয়া!

একটু অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া রহিল, হাতটি পিঠেই আছে; তাহার পর বলিল—"তোর দিদিমাকে কাল সকালে 'মাস্টারমশাইয়ের বাসায় নিয়ে আসবি। ...ঐ স্কুল দেখতে পাচ্ছিস তো?—তার পাশেই ওই বাসা।"

॥ কুড়ি ॥

এত করিয়া সঞ্চিত মনের স্নিগ্ধতা কিন্তু এক মুহূর্তেই বিনষ্ট হইয়া গেল।

সূর্যাস্ত হইয়া গিয়াছে, ঘুর পথে পৌঁছিতেও সময় লাগিবে, টুলু উঠিল। পকেটে ডান হাতটা দিয়া ব্যাগটা ধরিল, সবাইয়ের হাতে দুটা করিয়া পয়সা দিলে কেমন হয়?...একটু ভাবিল, তাহার পর হাতটা বাহির করিয়া লইল, "ভিক্ষে-ভিক্ষে" খেলার পর এ যেন নেহাত ভিক্ষা দেওয়াই হইবে; আনন্দটুকুকে এভাবে কলুষিত করিতে মন সরিতেছে না আজ। বলিল—"কাল আসবি, তোদের দিদিমাকে নিয়ে—নিশ্চয়, বুঝলি?"

হাওয়াটা চমৎকার লাগিতেছে, নিজেকে তাগিদ দিতে ইচ্ছা করিতেছে না। ধর, যদি গিয়া দেখেই, ম্যানেজারের লোক আসিয়া ভিতরে বাহিরে তালা লাগাইয়া দিয়াছে, বনমালী আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। টুলু প্রসন্ন মনেই ব্যাপারটাকে গ্রহণ করিয়া প্রতিকারে লাগিয়া যাইবে, প্রসন্ন মনেই আজ ভাল মন্দ সব কিছুকেই তাঁহার দান বলিয়াই মাথা পাতিয়া লইতে ইচ্ছা করিতেছে, যিনি অযাচিত ভাবেই অঞ্জলি ভরিয়া এতখানি দিলেন। আঁকা-বাঁকা নির্জন পথের সব মাটিটুকু মাড়াইয়া টুলু ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

যখন ইস্কুলের কাছাকাছি, তখন অন্ধকার বেশ গা-ঢাকা গোছের হইয়া আসিয়াছে। পথের ধারটিতে একটি বুনো ফুলের গাছ, একটু লক্ষ্য করিতেই বুঝিল সাঁকরেলের সেই ছেলেটি যে ফুল সেদিন উপহার দিয়াছিল এ সেই ফুল। বোধ হয় ছেলেটির মিষ্ট স্মৃতির সহিত জড়িত বলিয়াই একটা মায়ায় ভরা কৌতূহল হইল। বড় কাঁটা গাছটায়। হাত বাঁচাইয়া এক মুঠা ফুল সংগ্রহ করিতে খানিকটা সময় লাগিল। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া আবার স্কুলের দিকে পা বাড়াইবে, সামনে খানিকটা দূরে স্কুলের উঁচু রাস্তাটার উপর নজর পড়ায় একেবারে নিশ্চল হইয়া পড়িল।

একটি স্ত্রীলোক—নিঃসঙ্গ—টিলার পথ বাহিয়া সামনে চলিয়াছে; অন্ধকারে সামান্য একটু সন্দেহের পরই টুলু বুঝিতে পারিল—স্ত্রীলোকটি চম্পা। চম্পার গতি ত্রস্ত, মাঝে মাঝে চারিদিকে একবার চকিত দৃষ্টি বুলাইয়া লইতেছে; হালকা অন্ধকারে যে গোপনতাটুকু দিতেছে সেটা যেন যথেষ্ট নয়।

মুহূর্তেই টুলুর মনটা তিক্ত হইয়া উঠিল। সেদিন পথ আগলাইতে চম্পাকে অমন করিয়া বলিলেও টুলুর কোথায় একটু বিশ্বাস লাগিয়াছিল, সে একেবারে না ফিরুক, কিন্তু ফিরিতেছে; আজ আবার এই সন্ধ্যায় তাহাকে সেই বালিয়াড়ির পথে দেখিয়া তাহার মনটা ঘৃণায় আক্রোশে যেন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল। এই একটু আগেই যে মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিল, ভালমন্দ আজ যাই আসুক সমান ভাবেই প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিবে—সেটা কোথায় তলাইয়া গেল, মনে হইল, এ পৃথিবী অনিবার্য ভাবেই অভিশপ্ত, এখানে কিছুই করিবার নাই তাহার, দুঃখ-দারিদ্র্য-ব্যভিচারের ক্লেদ অঙ্গে লেপিয়া চলিবেই এ নিজের পথে, নিবারণের

চেষ্টা একেবারেই নিষ্ফল।...পাছে দুর্বলতার জন্য আবার ফিরাইতে চায় চম্পাকে, এই জন্য টুলু যেন জোর করিয়া পা দুইটা পুঁতিয়া নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।... যাক্ পাপীয়সী নিজের পথে।

স্কুলের কাছাকাছি গিয়া চম্পা যেন গতিবেগ শ্লথ করিয়া দিল; শুধু তাই নয়, রাস্তার এধার থেকে ওধার চলিয়া গেল, এবং টুলুর দুই-একবার যেন মনে হইল, গলা একটু বাঁকাইয়া দেখিয়া লইল, মাস্টারমশাইয়ের বাসা থেকে কেহ লক্ষ্য করিতেছে কিনা! একটু আশ্চর্য বোধ হইল, কিন্তু একটা কিছু আন্দাজ করিবার পূর্বেই চম্পা হঠাৎ স্কুলের দেয়ালের পাশে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বর্ধিত বিস্ময়ে টুলু সামনে পা বাড়াইল। একবার শিহরিয়া উঠিল এই ভাবিয়া যে, পিশাচী স্কুলটাকেই তাহার পাপের নিকেতন করিয়া তুলিল না তো! কিন্তু যে কারণেই হউক, মন যেন এ চিন্তাটাকে প্রশ্রয় দিতে চাহিল না। বেশ হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া টিলার উঁচু রাস্তাটায় উঠিল, তাহার পর গতিটা খুব সহজ করিয়া দিল,—চম্পা যদি দেখেই তাহাকে তো এটা যেন সন্দেহ না করে যে, টুলু তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছে। নেহাতই যেন বেড়াইয়া আসিল, এইভাবে ধীরে ধীরে শিকল খুলিয়া বাসায় প্রবেশ করিল; কেহ তালা লাগাইয়া যায় নাই।

একবার মনে হইল, বনমালীকে ডাকে, কিন্তু কি ভাবিয়া সদ্য সদ্য ডাকিল না; সম্ভব অসম্ভব অনেক কিছু ভাবিল, তাহার পর অন্ধকার আর একটু গাঢ় হইলে ঠিক করিল, নিজেই গোয়েন্দাগিরি করিবে।

উঠানের তেপায়ার উপর বসিয়া গোয়েন্দাগিরি প্ল্যান কষিতে কষিতে হঠাৎ হুঁশ হইল নিঃসাড়েই বেশ একটু রাত্রি হইয়া গেছে। বনমালী তখনও ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়া যায় নাই। আর একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল, নার্তনি আসিয়া নিশ্চয় কিছু জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার জন্য বনমালীর এই ভুল, নয়তো প্রতিদিন সন্ধ্যা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তো সে ঘর দুয়ার ঝাঁট দিয়া এ কাজটুকু শেষ করিয়া চলিয়া যায়। টুলু বসিয়া বসিয়া আরও খানিকটা ভাবিল। তাহার চিন্তা নয়, তবু যেন সমস্যাটা টানিতেছে মনকে। আরও প্রায় আধ-ঘণ্টাটাক্ বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া নিজের এই

কৌতূহলে টুলুর নিজের মনেই হাসি পাইল; এমন কি ব্যাপার হইয়াছে যে, একটা বিরাট সমস্যা খাড়া করিয়া সে এমন উৎকট ভাবে উৎকণ্ঠিত! এখানে বনমালী থাকে—চম্পার ঠাকুরদাদা সে, কোন কারণে খনির ছুটির পর চম্পা দেখা করিতে আসিয়াছে, নিতান্ত পারিবারিক ব্যাপার ওদের, এর মধ্যে মাথা ঘামাইবার আছে কি? কাজ হইয়া গেলেই চলিয়া যাইবে, হয়তো এতক্ষণ গেছেই চলিয়া, না হয় থাকিবেই—তাহার মধ্যেই বা সমস্যার এমন কি?···ওর আসার মধ্যে একটা লুকাচুরির ভাব ছিল বলিয়া মনে হইয়াছিল তখন··· কিন্তু আসলে ছিল কি? দূর হইতে অন্ধকারে দেখা তো। মনটা হালকা হওয়ায় টুলু মনে মনে হাসিয়া নিজের কাছেই স্বীকার পাইল যে মেয়েটাই এমন, তাহার প্রত্যেক গতিবিধি টুলুর রহস্যময়, বোধ হয় যেন একটা রোগে দাঁড়াইয়াছে। টুলু উঠিয়া দাঁড়াইল, সমস্ত ব্যাপারটা মন থেকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া বাহিরে গিয়া বেশ সহজ কণ্ঠেই বনমালীকে ডাক দিল। একটু পরেই দেখা গেল হাত দুইটা কাপড়ে মুছিতে মুছিতে বনমালী ফটক হইতে বাহির হইল; টুলুর খাবারের ব্যবস্থা করিতেছিল, ও হাঙ্গামটা চুকিলেই পৌছাইয়া যাইবে; তাহার পর কোমরে পিঠে দারুণ ব্যথা লইয়া অসুস্থ হইয়া পড়িবে, চম্পা তাহাদের রান্না শেষ করিয়া তাহাকে আসিয়া খাওয়াইবে, সেক দিবে, সেবা করিবে...তাহার পর গাঢ় নিদ্রার প্রলেপে সমস্ত ব্যাপারটি স্বপ্নে রূপান্বিত করিয়া বনমালী সকালে উঠিবে জাগিয়া...এর মধ্যে সে শয্যা লইবার পর কখন নাকি চরণ আর পেল্লাদও আসে, কিন্তু এমনই রোগের ধকল, কখনও দেখা হয় নাই তাহাদের সঙ্গে।

টুলু বলিল—"বনমালী, এখনও যে আলো জ্বালো নি আমার ঘরে? দেশলাইটাও পাচ্ছি না।"

বনমালী কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া হনহন করিয়া তাহার পাশ কাটাইয়া ভিতরে চলিয়া গেল, বলিতে বলিতে গেল—"তুমি ছিলেক নাই, আলো জ্বেলে কার উবগারটি কুরতাম গো? তেল খরচ হয় না? তেল কিনতে পয়সা লাগে না?"

টুলুর মুখে একটু হাসি ফুটিল, তাও তো বটে। বনমালী যে হঠাৎ এক

এক সময় অতিমাত্র বুদ্ধিমান বিচক্ষণ হইয়া ওঠে! চম্পার কথা জিজ্ঞাসা করিবে কি না বা কি ভাবে করিবে মনে মনে ভাবিতেছিল টুলু, স্থির করিবার পূর্বেই আলোটা জ্বালিয়া তেমনই হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেল বনমালী। টুলু রাস্তার ধারে জানালার খাঁজে আলোটা রাখিয়া একটা ইংরেজী বই লইয়া শুইয়া পড়িল।

পাঁচ মিনিটও গেল না বনমালী খাবার লইয়া আসিল। রাত্রে ও বসে না, বসার দরকারই হয় না, কেননা টুলু খাইতে রাত্রি করে, বনমালী ঠাঁই করিয়া খাবারটা ঢাকা দিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। বুড়া মানুষ ক্লান্ত থাকে বলিয়া টুলুও রাত্রে গল্পের জন্য আটকায় না। আজ কিন্তু নিজেই ক্লান্ত ছিল, ঠাঁই করিয়া খাবারের থালাটা রাখিতেই উঠিয়া পড়িল, আসন গ্রহণ করিতে করিতে বলিল —"খেয়েই নিই, অনেক ঘুরে শরীরটা ঠিক নেই। বনমালী, ব্যস্ত আছ নাকি একটু আজ?"

প্রশ্নটা এমনই বিশেষ কিছু না ভাবিয়াই করিল; হয়তো ভিতরে ভিতরে ইচ্ছা ছিল আজ একটু গল্প করিবার, মনটা আছে ভালো। বনমালী ঢাকনাটা বসাইতে যাইতেছিল, হাতটা সরাইয়া লইয়া বলিল—"না, ব্যস্ত থাকব ক্যানে?"

হঠাৎ ছেলেমানুষী কৌতূহল জাগিল টুলুর মনে—চম্পার কথাটা না হয় তোলাই যাক্ না, প্রশ্ন করিল—"তোমার নাতনিকে আসতে দেখলাম, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।"

বনমালী হকচকিয়া টুলুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল একটু। রাত্রের ঘটনাগুলি নিদ্রার ওদিকে স্বপ্ন হইয়া পড়িলেও এদিকে থাকে বাস্তবই; কারণটা ভাল করিয়া না বুঝিলেও এর কোন অংশই যে টুলুর কানে তোলা মানা এটা তাহার সর্বদাই মনে থাকে। টুলু কখনও প্রশ্ন না করায় তোলাও দরকার হয় নাই কোন দিন, আজ টুলু স্বয়ং কথাটা উত্থাপন করিল, এ অবস্থায় এখন কি করা যায়?

অনেক দিন থেকে দেখিতেছে বনমালীকে, টুলু মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিল, ব্যাপারটার মধ্যে কিছু রহস্য আছে, আর অগ্রসর হওয়া সমীচীন হইবে কি না ভাবিয়া ঠিক করিবার পূর্বেই কিন্তু বনমালী সামনেটাতে হাঁটু দুইটা জড়াইয়া

বসিয়া পড়িল, বলিল—"তা দিখবেক নাই ক্যানে গো? ইর মধ্যে লুকুবার কি আছেঁ বটে? দিখেছুঁ তো হইঁছে কি?"

এই ধরনের দুর্বল মস্তিষ্ক, যা অপরের সঙ্কেতেই চলে বেশির ভাগ, সমস্যার মুখে বিচারের ক্ষমতা রাখে না। বনমালীর পক্ষে মাত্র দুইটি জিনিস সম্ভব ছিল, হয় সাধ্যমত চুপ করিয়া থাকা, না হয় আগাগোড়া সব প্রকাশ করিয়া দেওয়া। টুলু যখন স্বয়ং দেখিয়াছে চম্পাকে, তখন চুপ করিয়া থাকার পথ বন্ধ। বনমালী আজকের রাত্রের চম্পার আসার সঙ্গে আগেকার কয়েক রাতের স্বপ্নকাহিনী মিলাইয়া সমস্ত ব্যাপারটি খুঁটিয়া খুঁটিয়া বলিয়া গেল। বিবরণ একটু অদ্ভুতই হইল, তবে টুলুর আর এটা আন্দাজ করতে বেগ পাইতে হইল না যে, যে কারণেই হোক, আজ কয়েক রাত্রি হইতে চম্পা বাপ আর প্রহ্লাদকে লইয়া স্কুলে আস্তানা গাড়িতেছে। তাহারও মাথা গুলাইয়া গেল যখন রেকর্ড ঘুরাইতে ঘুরাইতে বনমালী তাহার দিনের অভিজ্ঞতার কাহিনী আনিয়া ফেলিল—অর্থাৎ চম্পার ভাবী শ্বশুরের আনাগোনার কথা।

টুলু কিন্তু কৌতূহল দমন করিয়া চুপ করিয়াই আহার সাঙ্গ করিল, তাহার মনে হইল, ভিতরের কথা যাহাই হোক, প্রশ্ন করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করাটা ঠিক উচিত হয় না। আহার শেষ হইলে বনমালী জায়গাটা নিকাইয়া এঁটো বাসনগুলা মাজিয়া রাখিয়া নিজের বাসায় চলিয়া গেল।

কৌতূহল হইতে টুলু কিন্তু এত সহজে পরিত্রাণ পাইল না, একক অবস্থায় সেটা ক্রমেই বাড়িয়া গেল। যতই ভাবিতে লাগিল, মনে হইল, ব্যাপারটা পারিবারিক কিছু নয়, কোন উদ্দেশ্যে একটা যেন সাজানো ব্যাপার। কিন্তু কে এর শিল্পী, তাহার উদ্দেশ্যই বা কি? যতই রাত্রি বাড়িতে লাগিল, টুলুর অস্বস্তিটাও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। শুইয়া ছিল, কিন্তু নিদ্রা হইতেছে না, রাত্রিটাই গরম, নিদ্রার অভাবে আরও গরম বোধ হইতে লাগিল! উঠিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল, সেখানেও গরম, দুয়ার খুলিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

উন্মুক্ত জায়গার একটা প্রভাব আছে মনের উপর, টুলুর মনে হইল, লুকাচুরি না খেলিয়া সোজাসুজি ব্যাপারটার সম্মুখীন হইলে কেমন হয়? এর

মধ্যে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে তাহার বা মাস্টারমশাইয়ের অথবা উভয়েরই একটা বিপদের অঙ্কুরও থাকিতে পারে; সে ধরিতে পারিতেছে না, তবে এটা ঠিক যে চম্পায়-ম্যানেজারে গঞ্জডিহি জায়গাটা একটু অদ্ভুত। আর ইতস্তত না করিয়া টুলু স্কুলের দিকে পা বাড়াইল। একটু যাইতেই দেখে ফটকের এদিকের থামটিতে পিঠ দিয়া ওদিকে মুখ করিয়া একটি স্ত্রীলোক পাথরের বৈঠকটার উপর বসিয়া আছে; চম্পাই-যে, সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই; টুলু অগ্রসর হইল।

একটু যাইতেই কাঁকরের উপর চটি-জুতার শব্দে চম্পা চকিত হইয়া ঘুরিয়া একেবারে সোজা হইয়া দাঁড়াইল, আরও দুই পদ অগ্রসর হইতে একটু যেন স্বস্তির কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"ও, আপনি!"

॥ একুশ ॥

যে অবস্থায় দেখা, টুলুর মুখে একটা রূঢ় প্রশ্ন আসিয়াছিল, কিন্তু সেটা আর উচ্চারণ করিল না, নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল—"তুমি এখন এখানে! প্রায় দুপুর রাত যে!"

চম্পাও এইটুকুতে প্রথম ঝোঁকটা সামলাইয়া লইয়াছে, অল্প হাসিয়া বলিল—"রাত দুপুর তো আপনার পক্ষেও, জেগে থাকবার কথা নয় তো।"

টুলু বুঝিল, কথার কাটান্ দিয়া চম্পা ব্যাপারটা চাপা দিতে চায়; জানে ওর সে ক্ষমতাটা বেশ আছে, ঘুরাইয়া রহস্যটা বাহির করিতে গেলে ও বেশ খানিকটা এড়াইবার চেষ্টা করিবে। সেদিকে না গিয়া একেবারে সোজাসুজি প্রসঙ্গটা আনিয়া ফেলিল, বলিল—"শোন চম্পা, তুমি কয়েক দিন থেকেই এখানে রাত্তিরে এসে কি একটা করছ, তোমার বাবা থাকে, কে একজন পেল্লাদ থাকে। এত দিন জানতাম না, লুকানো ছিল, আজ তোমার ঠাকুরদাদার কাছে শুনলাম।"

চম্পা মুখের পানে চাহিয়া নিতান্ত সহজ কণ্ঠে বলিল—"ঠাকুরদাদার রোজ অসুখ হচ্ছে তাই…"

টুলু বাধা দিয়াই বলিল—"সে তো শুনেছি, বিশ্বাস হ'ল না ব'লেই তো যাচ্ছিলাম নিজে সন্ধান নিতে।"

ওর লুকাইবার চেষ্টায় বেশ একটু বিরক্তভাবেই কথাটা বলিয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

চম্পা বলিল—"বিশ্বাস না করলে আন্দাজ ক'রে নেওয়াই ভালো, আবার যে আমি মিথ্যেই বলব না কি ক'রে জানলেন? কিন্তু আপনি একটা ভুল করছেন—আমার সঙ্গে এ সময়ে এ ভাবে দাঁড়িয়ে কথা কওয়াটা...কখনো কখনো এ পথে লোক এসে পড়ে হঠাৎ...তা ভিন্ন বাবা, ঠাকুরদাদা..."

টুলু উত্তর করিল—"আমি যে পথের পথিক, তাতে আমার ওসব গ্রাহ্য করলে চলে না।"

"কিন্তু আমি?...মানে, আমায় যদি দেখেন তাঁদের কেউ?"

প্রসঙ্গটা সোজা আনিয়া ফেলা সত্ত্বেও চম্পার আবার অন্য কথা আনিয়া চাপা দেওয়ার চেষ্টায় টুলু উত্যক্ত হইয়া উঠিতেছিল, এবার যে রূঢ় মন্তব্যটা মুখে আসিল সেটা চাপিতে পারিল না, তবে যথাসম্ভব ছোট করিয়া বলিল—"ক্ষতি হবে?"

চম্পার চক্ষু দুইটা হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু কিছু বলিবার আগেই টুলু বলিল—"শোনো, বাজে কথা বেড়ে যাচ্ছে; কি ব্যাপারটা হচ্ছে আমায় স্পষ্ট ক'রে বল।"

তাহার পর একটু হুকুমের সুরে বলল—"আমি শুনতে চাই।"

চম্পার দৃষ্টি ছিল টুলুর মুখের উপর, ফিরাইয়া সামনে শূন্যে নিবদ্ধ করিল, কোন উত্তর নাই, তবে মন আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে। এই রকম স্তব্ধ রাত্রে, এই বিরাট পরিপূর্ণ শান্তির পিছনে যে শাশ্বত অশান্তি থাকে প্রচ্ছন্ন, মুহূর্তের মধ্যে সেটা উঠিল জাগিয়া। বালিয়াড়ি হইতে সেদিন ফেরার রাত্রিও ছিল এইরূপ,—এইরূপ কেন, আরও উন্মাদ; কিন্তু সেদিন একটা কথাও বলে নাই চম্পা, তাই হয়তো সেটা ছিল নিষ্ফলা। আজ বলুক না; বলুক—তোমারই জন্য আমার এই বিনিদ্র রজনীর সাধনা, তোমারই জন্য মরণ পণ ক'রে বসে আছি—এত কঠিন, এ রকম বধির তুমি হয়ে থেকো না আর...

টুলু একটু অপেক্ষা করিয়া প্রশ্ন করিল—"চাও না বলতে? আমি বলব তবে?"

"বলুন না।"

"আমায় তুমি সেদিন বাড়ি ছাড়তে বলেছিলে, দেখলে, রাজি হলাম না। এখন ভয় দেখিয়ে আমায় সরাবার চেষ্টা করছ তুমি। কি করছ তা জানি না, তবে ভয় দেখাবার যোগাড় বোধ হয় পুরোমাত্রায় ক'রে উঠতে পার নি এখনও। কিন্তু এটা তুমি খুব জেনো কোন রকম ভয় দেখিয়েই তুমি আমায় আমার সঙ্কল্প থেকে নিরস্ত করতে পারবে না। কেন, তাও বলি···"

চুপ করিল। চম্পা বলিল—"বলুন।"

"এক সময় আমার একটু মনে হয়েছিল তুমি আমার কল্যাণের জন্যেই মানা করছ আমায়—অবশ্য তবুও আমি শুনতাম না—কিন্তু এখন সন্দেহ হচ্ছে, ম্যানেজার তোমায় লাগিয়েছে এই কাজে—ভেবেছে, যদি কোন হাঙ্গামা না ক'রে অল্প-বিস্তর ভয় দেখানোর উপরই কাজ হয়ে যায় তো···"

চম্পার মুখটা বেদনায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, হাত দুইটা একত্র করিয়া চাপিয়া বলিল—"আর থাক্।···একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করি,—আপনি এখুনি আমায় স্পষ্ট ক'রে বলতে বলছিলেন, আপনি একটা কথা স্পষ্ট ক'রে বলতে পারবেন কি?"

"কি কথা?"

"এই যে কথাটা বললেন—এই যে আপনার সন্দেহ, এটা কি সত্যি, না, অপবাদ দিয়ে আমায় সরবার জন্যে এটা বললেন?"

টুলু একটু থতমত খাইয়াই চুপ করিয়া গেল।

"বলুন না। যদি সত্যি হয় তো আমি কথা দিচ্ছি, আপনি আর কখনও আমায় দেখতে পাবেন না এখানে বা অন্য কোথাও।"

গলা যেন একটু সিক্ত হইয়া আসিয়াছে। টুলু আর একটু নিরুত্তর থাকিয়া বলিল—"কিন্তু তুমি তো আমায় সত্যি কথা বল নি যে, আমার কাছে শোনবার আশা করছ!"

চম্পার এই দ্বিতীয় সুযোগ আরও ভালো ভাবে আসিয়াছে, কিন্তু ঐ যে

আঘাতটুকু পাইয়া একটু অশ্রু উদ্গত হইয়াছে ; ঐটুকুতেই মনের কালিমা দিয়াছে ধুইয়া। একবারও—এক মুহূর্তের জন্যও যে মনে হইয়াছিল, তাহার রাত জাগার কারণটা বলিয়া টুলুর মন ভিজাইবে, তাহাকে ব্রতচ্যুত করিবার জন্যই—এটুকুর চিন্তাতেই সে নিজের কাছেই যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। অত বড় তপস্যা, অত পবিত্র সম্পদ কি করিয়া সে বাজারের পণ্যে পরিণত করিতে যাইতেছিল ?

মনটা আরও স্বচ্ছ হইয়াছে, টুলুর থতমত খাওয়াতে বুঝিয়াছে ওটা ওর মনের কথা নয়, মিথ্যা অপবাদই। চম্পা নিজেও আর ঘুরপ্যাঁচের দিকে গেল না, টুলুর কথায় একটু নিরুত্তর থাকিয়া বলিল—"আমার স্পষ্ট বা সত্যি কথা এই যে, আমি এখানে এভাবে আসবার সত্যিকার কারণ আপনাকে কখনও বলতে পারব না।···আর সেটা এমন কিছু নয়, যার জন্যে আপনার মাথা ঘামাবার হেতু আছে। শুধু দয়া ক'রে এইটুকু বিশ্বাস করুন যে, আমি ম্যানেজারের চর নই—অন্তত হই নি এখনও, তবে···

হঠাৎ চুপ করিয়া দৃষ্টি নত করিল। টুলু প্রশ্ন করিল—"থামলে যে ?"

চম্পা মিনতির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"এখান থেকে একটু আড়ালে যাই চলুন, অনেক কথা। আপনার সম্ভ্রমের খেয়াল আপনার না থাকে, আমার আছে, আমি সেটা নষ্ট হতে দিয়ে পাপের ভাগী হব কেন ?"

টুলু বলিল—"আমার বাসায় চল।"

চম্পা বিস্মিতভাবে মুখের পানে চাহিল, তাহার পর একটু কি ভাবিয়া লইয়া বলিল—"বেশ, তাই চলুন।"

বাসায় আসিয়া টুলু বারান্দায় একটা চেয়ারে বসিল, চম্পা সামনের থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"বলছিলাম, চর হই নি, তবে হব ব'লে কথা দিয়ে এসেছি আজ।"

"কার কাছে ?"

"ম্যানেজারের কাছে।"

"কি রকম ?"

চম্পা আর একবার একটু ভাবিয়া লইল, তাহার পর আজ সকালে

ম্যানেজারের সঙ্গে যে যে কথা হইয়াছে—হীরকের জন্য খোরপোষের ব্যবস্থার কথা থেকে মাস্টারমশাইয়ের বাসায় চম্পার আসিয়া থাকার নির্দেশ পর্যন্ত—সমস্ত টুলুকে বলিয়া গেল।

টুলু নিশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিয়া গেল; তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চম্পার মুখের পানে চাহিয়া আছে, যেন তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ এক জন নূতন মানুষ তাহার দৃষ্টির সামনে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সেই সঙ্গে একটা চিন্তাধারাও চলিয়াছে টুলুর—চম্পা এসব করে কেন?…শেষ হইলে বোধ হয় একটু অনন্যমনস্ক হইয়া শুনিতেছিল বলিয়া প্রশ্ন করিল—"কিন্তু ক্ষতি কি তাতে, যদি থাকই এসে?"

চম্পা চুপ করিয়া রহিল।

টুলু আবার বলিল—"তুমি তো আমাদের কথা পৌঁছে দিচ্ছ না ওর কাছে, বরং অন্যকে না রেখে তোমায় রেখেছে সেই ভালো।"

"আমি সেই জন্যেই ওকে জানিয়ে এসেছি যে, ওর কথায় রাজি হলাম, থাকব এখানে এসে; কিন্তু ওর চালটা কি ভয়ঙ্কর তা তো বুঝতে পারছি। জেনে শুনে আপনাদের সর্বনাশ কি ক'রে করব?"

"সর্বনাশটা কি?"

প্রশ্নটা করার পরেই উত্তরটা কিন্তু তাহার আপনা হইতেই যোগাইয়া গেল, বলিল—"ও বুঝেছি; কিন্তু এর জবাব তো তোমায় আগেই দিয়েছি—আমরা যে-পথের পথিক, তাতে এ সব মিছে অপবাদের ভয় গ্রাহ্য করলে চলে না আমাদের, আর মাস্টারমশাই—তিনি তো দেবতার কাছাকাছি।"

"মানুষের মন কত পলকা জানেন না কি? মাস্টারমশাই…আপনারা দেবতাকে দেবতাই থাকবেন, কিন্তু আমাকে এখানে দেখলেই লোকের মন যাবে বদলে।...আমি সেদিন তো শুনলাম মাস্টারমশাইয়ের চিঠিটা—যাদের মধ্যে আপনাকে কাজ করতে বলেছেন তিনি, তাদের অত তলিয়ে দেখবার ক্ষমতা নেই, তারা যেই দেখবে আমি বা আমার মতন কেউ মাস্টারমশাইয়ের বাসায় যাওয়া-আসা করছে, অমনি তাদের মন যাবে ভেঙে। আর তাদের মধ্যে কাজ করা চলবে না। এই হচ্ছে ম্যানেজারবাবুর চাল। আপনি আজ দুপুরের একটু পরে বস্তিতে গিয়েছিলেন, তাদের যে কি আহ্লাদ, ব'লে বোঝানো যায় না, সত্যি,

কোন দেবতা নেমে এলেও এ রকম সাড়া প'ড়ে যেত না বোধ হয়; যার সঙ্গেই দেখা হয় যার কাছেই বসি, শুধু..."

টুলু বাধা দিয়া বলিল—"ও থাক্; তুমি সেদিন চিঠিটা শুনেছিলে—তিনটে বিষয় নিয়ে কাজ করবার কথা লিখেছিলেন—কুলিদের মধ্যে, শিশু নিয়ে, আর—"

একটু থামিয়া যাইতে চম্পা নিজেই পূরণ করিয়া দিল—"আর আমাদের নিয়ে।"

"তোমাদের সরিয়ে রেখে তোমাদের নিয়ে কি করে কাজ হবে? চম্পা, সেই চিঠিতেই তো দেখছিলে মাস্টারমশাইয়ের কত বড় আশা।"

চম্পার মনে পড়িল—'একটা মেয়ে শুধরে গেলে একটা জাতি বেঁচে যেতে পারে।'—ওরও যে কত বড় আশা কি করিয়া জানায়? কতকটা মনের পূর্ণতায়, কতকটা কুণ্ঠায় চুপ করিয়া দৃষ্টি নত করিল।

টুলুর হঠাৎ একটা কথা মনে উদয় হইল, বলিল—"কিন্তু আমি বড় আশ্চর্য হচ্ছি চম্পা, এখানে থাকবে ব'লে তুমি নিজে ম্যানেজারকে কথা দিয়ে এলে, এখন আবার থাকবার বিরুদ্ধেই তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করছ!"

চম্পা একটু নিরুত্তর থাকিয়া বলিল—"আমায় মাফ করবেন, আবার পুরানো কথা এনে ফেলছি, আপনি এখান থেকে যান। ম্যানেজারকে কথা দিয়ে আসবার পর অনেকটা সময় গেছে, আমি ভেবে দেখলাম, আপনার এখান থেকে চ'লে যাওয়াই সবচেয়ে বেশি দরকার; শুধু আপনার কেন, আপনার আর মাস্টার-মশাইয়ের—দুজনেরই। কাজের জীবন আপনাদের, কাজ আপনারা যেখানে যাবেন সেখানেই করবেন। অনেক ভেবে দেখলাম, ম্যানেজারকে কথা দিয়ে এলেও আমার এখানে আসা চলবে না, অথচ আপনারা যদি থাকেনই তো আমার না এসে উপায় নেই।"

যে পাহারা দিবার কথাটা গোপন করিতে চাহিতেছিল, সেটা প্রকাশ করিয়া ফেলিবার মুখে আসিয়া চম্পা চুপ করিয়া গেল। টুলু বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিল—"কেন, না এসে উপায় নেই?"

চম্পা ততক্ষণে আবার সামলাইয়া লইয়াছে, বলিল—"ঐ যে, ম্যানেজারকে কথা দিয়েছি।"

কিছু যে একটা গোপন করিয়া ফেলিল টুলু সেটা বুঝিতে পারিল, একটু মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। চম্পা তাড়াতাড়ি অন্য কথা আনিয়া ফেলিল—সেই পুরানো কথাই, বলিল—"না, আপনারা যান এখান থেকে, সত্যি অনেক বিপদ।"

টুলু একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল—"আবার ভূতের ভয় দেখাচ্ছ?"

চম্পা ব্যাকুল ভাবে বলিল—"ভয় নয়, সত্যি।"

"কি রকম?"

"আপনার পেছনে লেগেছে। আপনাকে আমি এখনও সব কথা বলি নি, ভেবেছিলাম, বলবার দরকার হবে না। দুপুরে যে-লোকটা দাদুর কাছে আসে, সে ম্যানেজারের চর,—চর বললে ঠিক বোঝায় না, চরের কাজ খবর নেওয়া, ওর উদ্দেশ্য কিন্তু অন্য রকম।"

"খুন জখম?"

"আশ্চর্য হবার কিছু নেই।"

"কি ক'রে জানলে?"

"ওকে আমি দেখেছি এই পথ দিয়ে গভীর রাত্তিরে যেতে। দুজন থাকে। চার দিন দেখেছি।"

"একটা লোক এই পথ দিয়ে যায় ব'লে তো এটা প্রমাণ হয় না, সে খুন করবার মতলবেই ঘুরে বেড়ায়।"

"কিন্তু ঠিক সেই লোকটাই দিনের বেলা নিত্যি দাদুর কাছে এসে কেন অত খোঁজখবর নেবে?"

"হয়তো—"

বলার উদ্দেশ্য ছিল—হয়তো লোকটা সত্যই চম্পার বিবাহের কথার জন্যই আসে, কিন্তু বলা ঠিক হইবে কি না বুঝিতে না পারিয়া একটু চোখ তুলিয়া চাহিতেই দৃষ্টি স্থির হইয়া গেল।

শোবার ঘরের দোরটা খোলা; দেখিল, বিছানার মাথার কাছে রাস্তার দিকে যে জানালাটা, তাহার দুইটা গরাদ ধরিয়া একটা লোক মাথা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ভিতরটা দেখিতেছে। বেশ সবল চেহারা, মাথাটা মনে হইল যেন মুণ্ডিত।

"কি দেখছেন ?"—বলিয়া চম্পা টুলুর দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া ফিরিয়া চাহিতেই লোকটা একবার মুখ তুলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা নামাইয়া লইল।

"কে ?"—বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া টুলু অগ্রসর হইতেই চম্পা গেঞ্জির নিচেটা টানিয়া ধরিল, বলিল—"যাবেন না,—সেই লোকটা।"

ভয়ে এক মুহূর্তেই তাহার চেহারা অন্য রকম হইয়া গেছে।

আটকা পড়িয়া টুলু একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কিছু না পাইয়া চেয়ারের নড়বড়ে হাতলটা ভাঙিয়া লইয়া গেঞ্জিটাতে একটা টান দিয়া বাহির হইয়া গেল। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে, চম্পা আসিয়া পাশে দাঁড়াইল। হাঁপাইতেছে, তাহারই মধ্যে চাপা স্বরে বলিল—"সেই লোকটা। আজ স্কুলে কাউকে না দেখে…"

"টুলু প্রশ্ন করিল—"কেন, স্কুলে ওরা কেউ নেই ? এই বললে…"

চম্পা হকচকিয়া গেল, বলিল—"না…সে কথা নয়…মানে…চলুন আপনি, ওদের তুলিগে।"

টুলু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চম্পার মুখের পানে চাহিয়া ওর এই অসংলগ্ন কথাগুলা শুনিতেছিল; একটু ভাবিল, তাহার পর বলিল—"না, তুলে কাজ নেই, অযথা একটা গোলমাল হয়ে ওদের মুখ দিয়ে খনি, বস্তি—সারা গঞ্জডিহিতে ছড়িয়ে পড়বে কথাটা। এই পর্যন্তই থাক্ না, ও আর আসবে না। চল, তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।"

চম্পা কতকটা তিরস্কারের স্বরেই বলিল—"পৌঁছে দিয়ে আপনি ফিরে আসবেন এখানে ?—তার মানে ?"

"বেশ, তবে ভেতরেই এস ; তোমার সঙ্গে কথাগুলো এখনও শেষ হয় নি।"

"ঐ একটা ভাঙা চেয়ারের হাতলের ওপর ভরসা ক'রে ?"

টুলু একটু হাসিয়া বলিল—"তুমি এসই না, আমি নিজে তো ভাঙা নয়। তা ভিন্ন আছে অস্ত্র ঘরে, তাড়াতাড়িতে খেয়াল হয় নি।"

ভিতরে আসিয়া আবার সেই ভাবে দুই জনে বসিয়া ও দাঁড়াইয়া রহিল। কথা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হইল না। টুলুর মুখটা বড় কঠিন, একটা বাধা পাইয়া ভিতরের প্রতিজ্ঞা যেন আরও কঠোর হইয়া উঠিয়াছে,

যেন কোন কঠোর উত্তর আশঙ্কা করিয়াই চম্পা আর কিছু বলিতে সাহস করিতেছে না।

দুই জনের মধ্য দিয়া স্তব্ধ রাত্রি গড়াইয়া চলিল। এক সময় যখন শেষ রাত্রের স্বল্পায়ু জ্যোৎস্নাটুকু ম্লান হইয়া আসিয়াছে, চম্পা বলিল—"এবার আমায় যেতে হবে; একটা কথা জিজ্ঞেস করি, এর পরেও আপনি থাকবেন এখানে?"

"না থাকার কথা কোথা থেকে আসে?"

"আজ রাত্রে প্রাণ হারাতে বসেছিলেন আপনি।"

টুলুর দৃষ্টিটা স্নিগ্ধ হইয়া আসিল, বলিল—"কি হারাতে বসেছিলাম সেইটেই দেখছ চম্পা, কি পেলাম আজ রাত্রে সেটা তো তোমার চোখে পড়ছে না।··· থাকবার লোভও ঢের বেড়ে গেছে আমার। তবে হ্যাঁ, প্রাণটাকে আগলে রাখতে হবে বইকি! তার উপায়ই ভাবছিলাম এতক্ষণ।"

"কি?"

"সকালে আর একবার ম্যানেজারের কাছে যেয়ো, ব'লো—তুমি হীরককে তো ছেড়ে থাকতে পারবে না, তিনি যেন পেল্লাদ আর পেল্লাদের স্ত্রীকেও এখানে এসে থাকতে হুকুম দেন। ব'লো আমায় রাজি করিয়েছ, আমাদের যে চাকরের ঘরটা আছে তাইতে এসে থাকবে।"

"তাতে কি হবে?"

"তাতে অনেক কিছুই হবে, ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, পরে দেখতেও পাবে। আপাতত এই হবে যে তোমায় সারারাত স্কুলের দরজায় ব'সে পাহারা দিতে হবে না, হীরক আর প্রহ্লাদের ছেলে গলাবাজি ক'রে সে কাজটা বেশ ভালো ভাবেই ক'রে যেতে পারবে।"

টুলুর স্নিগ্ধ ঈষৎ-হসিত দৃষ্টির উপর নিরতিশয় বিস্ময়ের দৃষ্টি ফেলিয়া চম্পা প্রশ্ন করিল—"আমি ব'সে ব'সে পাহারা দিই?—বাঃ, কে বললে?"

"তোমার সঙ্গে এত কথা হবার পরেও সেটা অন্যের কাছে জানতে হবে চম্পা?...যাও এবার, ভোর হয়ে এসেছে।"

॥ বাইশ ॥

টুলু এবং চম্পার নজর পড়িতে যে লোকটি জানালার নিচে অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহার নাম নিবারণ। এই লোকটিকেই চম্পা গভীর রাত্রে বার-চারেক বালিয়াড়ির পথে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিল এবং এ-ই প্রতিদিন দুপুরে আসিয়া বনমালীর কাছে তাহার বিবাহের ঘটকালি করিতেছিল। নিবারণের সঙ্গে ম্যানেজার রতিকান্তের পরিচয় এবং সম্বন্ধের ইতিহাস একটু নূতন ধরনের :

কলিকাতায় এক দিন সন্ধ্যায় ট্রাম হইতে নামিয়া বাসায় আসিবার সময় রতিকান্ত টের পাইল, সোনার চেনে গাঁথা তাগাটা অন্তর্হিত হইয়াছে। গরমের জন্য পাঞ্জাবির হাতটা কনুই পর্যন্ত গুটানো ছিল, এই সুযোগেই কে হাতসাফাই করিয়াছে। ট্রাম থেকে বাড়িটা অল্প দূরেই, গেট ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে, একটি লোক খুব সম্ভ্রমের সহিত নুইয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"হুজুরের সঙ্গে একটু প্রয়োজন আছে।"

রতিকান্ত প্রশ্ন করিল,—"কি প্রয়োজন ?"

লোকটা এক নজরে একবার চারিদিকটা দেখিয়া লইয়া বলিল, "একটু নিরিবিলি না হ'লে হবে না।"

রাস্তাটা একটু গিয়াই একটা প'ড়ো জমিতে পড়িয়াছে, নিজেই বলিল—"ঐখানটা মন্দ হবে না।"

রতিকান্তের একটু কি রকম মনে হইল বটে, রাত হইয়াছে, তায় পাড়াটা একটু নির্জন, তবু অগ্রসর হইল। সামনাসামনি হইয়া দাঁড়াইলে লোকটা কামিজটা তুলিয়া ফতুয়ার পকেট হইতে চেনসুদ্ধ তাগাটা বাহির করিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"হুজুরেরই মাল, চিনে নেন।"

চেনটা এক জায়গায় শুধু কাটা ; হাতে লইয়া রতিকান্ত অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিল,—"তুমি কোথায় পেলে ?"

লোকটা একটু দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল—"হুজুরের শরীল থেকে।"

"তুমিই সরিয়েছ?—নিজে তুমি?"

"হুজুর আর নজ্জা দেবেন না, এমন আর কি বাহাতুরির কাজ!"

রতিকান্তের আর কথা যোগাইল না, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল—"আবার ফিরিয়ে দিলে যে?"

"হুজুরের কাছে যদি কোন চাকরি পাই..."

"কি চাকরি?"

"অধীন কি দরের লোক একটা নমুনো দিলাম হুজুরকে, ভরসা পাই তো কাল সাট্টীফিটি হাজির করতে পারি, দেখে ব্যবস্থা করবেন।"

"সার্টিফিকেট!"···বিস্ময়ের উপর আর এক চোট বিস্মিত হইয়া রতিকান্ত একটু মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—"কিন্তু আমি তো গাঁটকাটার সর্দার নয়।"

লোকটা জিভ কাটিল, তাহার পর ঝুঁকিয়া ডান হাতটা রতিকান্তের পায়ের কাছাকাছি লইয়া আবার নিজের মাথায় ঠেকাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল, বলিল —"অমন কথা শুনলেও পাপ হুজুর; হুজুরদের কলকেতায়, বাইরে ফলাও কারখানা, অনেক রকম ভাল-মন্দ লোকের প্রয়োজন, তাই দারস্ত হয়েছে গোলাম—একখানি নোমুনো দেখিয়ে। এর চেয়ে বড় কাজেও গোলামের কারিগুরি আছে—সাট্টীফিটি দেখলেই বুঝতে পারবেন হুজুর!"

রতিকান্ত আর একটু চুপ থাকিয়া বলিল—"বেশ, এনো তোমার সার্টিফিকেট।"

"কাল এই সময়, এইখানে?"

"বেশ, এসো।"

গেট পর্যন্ত আসিল লোকটা, তাহার পর বিদায় লইয়া খানিকটা আগাইয়া গেলে, রতিকান্ত আবার গেটের বাহিরে আসিয়া ডাকিল, কাছে আসিলে বলিল—"বেশ পরিষ্কার ভাবে সরিয়ে আবার দিয়ে তো গেলে, তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে তো পারতাম—অন্তত কাল তো তার ব্যবস্থা করতে পারি।

লোকটা মুখের পানে চাহিয়া এবার একটু নূতন ধরনের হাসি হাসিল,

বলিল—"সে লোক নয় আপনি হুজুর, এটুকু না বুঝলে আমাদের ব্যবসা চলে কি ক'রে ?" তাহার পর আবার অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন যথাসময়ে রতিকান্তের হাতে সার্টিফিকেটটা পৌঁছিল। প্রায় ছয় ইঞ্চি×ছয় ইঞ্চি একখানি পার্চমেণ্টের কাগজ, বাঁ দিকে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত ছাপা সার্টিফিকেটের গৎ, ডান দিকে হাতে লেখা। রতিকান্ত বিস্মিত নয়নে পড়িয়া গেল :

নাম—নিবারণ পালধি

বয়স—চল্লিশ

ওজন—এক মণ সাতাশ সের

ছাতি—চল্লিশ ইঞ্চি

হাত সাফাইয়ের দাম

হাল তারিখ তক—আড়াই হাজার

খুন হাল তারিখ তক—তিন

বিশেষ—কানের পিছনে চোখ।

সর্দার কালুরাম

পিসিডেণ্ট

সার্টিফিকেটের মাঝখানে যথারীতি একটা বাদামি স্ট্যাম্প মারা, উপরে লেখা 'সর্দার কালুরামের আখরা,' নিচে লেখা 'হাড়কাটা লেন গলি', মাঝখানটায় সেই দিনের তারিখ বসানো।

এ-রকম অদ্ভুত ব্যাপার রতিকান্তের অভিজ্ঞতায় এই প্রথম, তিন-চার বার কাগজটা পড়িয়া মুখ তুলিয়া চাহিতে নিবারণ খুব ঘটা করিয়া সেলাম করিয়া একটু দন্ত বিকশিত করিল। রতিকান্ত প্রশ্ন করিল—"তা হ'লে তোমার নাম নিবারণ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।"

"হাড়কাটার গলিতে তোমাদের আখড়া ?

নিবারণ একটু হাসিয়া বলিল—"তা হ'লে কি সার্টীফিটিতে লেখা থাকত হুজুর ? অত কাঁচা কাজ কেউ করে ? দিব্যি গালভরা পছন্দসই নাম তাই

সর্দারজী ইস্টাম্পোরে বসিয়ে দিয়েছেন, যে রকম আপিস-পাড়া হ'ল ডালহৌসি স্কোয়ার সেই রকম,—গলির নামটাতে সার্টীফিটির মর্য্যেদা বাড়ল, এই আর কি।"

"আর কালুরাম?"

নিবারণ আবার জিভ কামড়াইয়া বলিল—"তিনি জলজ্যান্ত মহাপুরুষ। অধীনের ওপর নেকনজর হ'লে কোন-না-কোন সময় সাক্ষাৎ হবে।"

"কি চাকরি চাও?"

"বাঁধা চাকরি নয় হুজুর, বুঝতেই তো পারেন। সার্টীফিটি দেখা রইল, যেমন যেমন গোলামের দরকার পড়বে বলবেন, গোলাম খেদমতে হাজির হবে; এই আর কি!···কাজ দেখে বকশিশ, তার পর কৃপা হয়, কিছু বাঁধা খোরাকির হুকুম ক'রে দেবেন,.হুজুরদের ভরসাতেই তো বেঁচে থাকা।"

সমস্ত ব্যাপারটা কৌতুকে-গাম্ভীর্যে মেশানো, শেষের কথাটিতে বিশেষ করিয়া একটু কৌতুক বোধ হওয়ায় রতিকান্ত একটু মুখ তুলিয়া চাহিয়া হাসিল। তাহার পর প্রশ্ন করিল—"কিন্তু তোমার ঠিকানা? পাব কোথায় তোমায়?"

"এবার সুযোগ ক'রে নিত্যিই হাজরি দোব হুজুর। কৃপা একটু কায়েমী হয়ে গেলেই ঠিকানা লোট করিয়ে দেবে গোলাম। দুজন দুজনকে ভালো রকম না চেনা পর্যন্ত—বুঝতেই পারেন হুজুর···"

হাসিল একটু।

গেট পর্যন্ত সঙ্গে আসিয়া বিদায় লইবার সময় বলিল—"আজ থেকে হুজুরের সব মাল সর্দারজীর হেফাজতে জানবেন, রাস্তায় প'ড়ে থাকলেও কারুর খুঁটে নেবার বুকের পাটা নেই কলকেতা শহরে।···গোটা-পাঁচেক ট্যাকা হুজুর, নোতুন চাকরির ভেট দিতে হবে সর্দারজীকে। কপাল-জোরে নম্বর এক কেলাসের চাকরি হ'ল কিনা,—পাঁচ টাকা।"

পকেটেই ছিল, একটা পাঁচ টাকার নোট রতিকান্ত নিবারণের হাতে দিল।

আজও নিবারণ খানিকটা গেলে রতিকান্ত গেটের বাহিরে আসিয়া আবার ডাকিল, ফিরিয়া আসিলে বলিল—"একটা কথা নিবারণ, সার্টিফিকেটে তোমার

বিশেষ গুণের মধ্যে লেখা আছে—কানের পেছনে চোখ, ব্যাপারটা বুঝলাম না তো।"

নিবারণ আবার একটু দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিল, তাহাতে তাহার ভাঁটার মত চোখ দুইটা আরও যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল, বলিল—"হুজুর এখানে দাঁড়ান।"

নিজে আট-দশ হাত তফাতে চলিয়া গেল, তাহার পর বলিল—"এইবার যটা খুশি আঙুল তুলুন হুজুর।"

রতিকান্ত বুড়া আঙুল আর কড়ে আঙুল গুটাইয়া লইয়া ডান হাতটা একটু তুলিল। নিবারণের মুখ উন্টা দিকেই, ঘাড়টা একেবারেই সিধা, টের পাওয়া যায় না যে, কোন দিকে একটুও ঘোরানো, বলিল—"হুজুর তিনটে আঙুল তুলে ধরেছেন।"

তাহার পর ফিরিয়া কাছে আসিয়া সেই ভাবে হাসিয়া বলিল—"ভগবান এইটুকু খ্যামতা ফালতু দিয়েছেন হুজুর, জানেন—সংসারে পাঠাচ্ছি, লোকটাকে ক'রে খেতে হবে তো। মানে পিছনকার জিনিস ঘুরে দেখতে হয় না, তবে ঐ হাত-কয়েক তফাৎ চাই।"

এর পূর্বে কাজ লইয়া নিবারণের কয়েকবার গঞ্জডিহিতে আসা হইয়া গেছে। দু-একটা ছোটখাটো কাজ ছাড়া সার্টিফিকেটে আরও দুইটি খুন জমা হইয়াছে। পরিষ্কার হাত, গতিবিধি খুব প্রচ্ছন্ন। কানের পিছনে চোখ আছে বলিয়া বেশ নির্লিপ্ত ভাব বজায় রাখিয়া অনেক খবর রাখিতে পারে। এই ক্ষমতার জন্যই স্কুলের গেট পার হইয়া প্রথম দিনই টের পাইল স্কুলের গেটে চম্পা। চম্পার একটু সন্দেহেরও অবকাশ হইতে দিল না যে, সে ধরা পড়িয়া গেছে।... এর পর শ্বশুর সাজিয়া তাগ খুঁজিতে লাগিল, অবশ্য বুদ্ধিটা কতকটা ম্যানেজার রতিকান্তের।

ম্যানেজারের সঙ্গে নিবারণ দেখা করে গভীর রাত্রে, তার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

সকালে চম্পার সঙ্গে ম্যানেজারের যে ব্যবস্থা ঠিক হইল, তাহার পর নিবারণের এ-যাত্রায় গগুভিহিতে কাজ স্থগিত রহিল। কথাটা কিন্তু নিবারণকে বলা হয় নাই। যেখানে তাহার থাকার ব্যবস্থা সেখানে কয়েকবার লোক পাঠাইয়াছিল ডাকিয়া আনিবার জন্য, দেখা পায় নাই। ম্যানেজার একটু উদ্বিগ্ন ভাবেই অপেক্ষা করিতেছিল, এমন সময় রাত যখন প্রায় আড়াইটা, নিবারণ আসিয়া উপস্থিত হইল, সেলাম করিয়া বলিল—"আজও হ'ল না হুজুর, তবে একটা বড় জবর সংবাদ আছে।"

ম্যানেজার প্রশ্ন করিল—"কি?"

"আজ যুগল মূর্তি দেখলাম, ছুঁড়িটা ওরই বাসায়।"

ম্যানেজার এই সময় গোলাপী নেশায় থাকে, একটু যেন চকিত হইয়াই সোজা হইয়া বসিল, বলিল—"তাই নাকি!" গাম্ভীর্যের মধ্যে ভিতরের আনন্দটা একটু ফুটিয়া বাহির হইল।

নিবারণ বলিল—"এতে সুবিধে এই হ'ল হুজুর যে, দুটোকে একসঙ্গে পাচার ক'রে দিলে কারুর আর সন্দেহ করবার থাকবে না কিছুই—আপনি সব র'টে যাবে দুটোতে ভেগেচে। এখন হুজুরের হুকুমের যা দেরি, তবে আর একজন লোক চাই। একটু খলিফা-গোছের।"

ম্যানেজারের আনন্দের কারণ—প্ল্যানটা এত দ্রুত সফল হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া; চম্পা যে এত ত্বরায় কাজে নামিয়া যাইবে, আর সঙ্গে সঙ্গেই এতটা সফল হইবে আশা করিতে পারে নাই। শুধু যে আনন্দিত হইল তাহাই না, বেশ খানিকটা স্বস্তিও বোধ হইল, কেননা কতকটা প্রয়োজনে এবং কতকটা আক্রোশের বশে টুলুর পিছনে নিবারণকে লাগাইলেও এটা বুঝিতে পারিতেছিল যে, অন্য খুনে আর এ-খুনে তফাৎ অনেক। টুলু ব্যানার্জি কোম্পানির স্বত্বাধিকারীর ভাইপো; তাহার এটাও জানা যে, ম্যানেজার টুলুর উপর চটা—কিছু একটা ঘটিলে তাহার উপরই সন্দেহ হইবে। আরও টের পাইয়াছে, টুলুর পিতা রাজসাহীর বেশ বড় উকিল একজন। খনি নিষ্কণ্টক করিতে বোধ হয় অন্য কোন উপায় ছিল না, কিন্তু ব্যাপারটা বেশ গুরুতরই হইবার সম্ভাবনা ছিল। এখন এ বেশ হইল, চরিত্রের গলদ লইয়া ওসব বড় কাজ চলিবে না টুলুর, আমলই পাইবে না কাহারও

কাছে; এদিকে মাস্টারমশাই আসিলে তাঁহাকেও জড়াইয়া স্কুলের সুনামের জন্য তাঁহাকে সুদ্ধ সরাইয়া পথ পরিষ্কার করা সহজ হইবে; চিঠি তো রহিলই।... ব্যাপারটি বড় মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে; গোলাপী নেশার সঙ্গে বেশ মিলাইয়া মিশাইয়া উপভোগ করিল নিজের চালের এই সফলতাটুকু, তাহার পর নিবারণকে বলিল—"এটা আপাতত তোলা রইল নিবারণ, তোমাকে একটু অন্য কাজে যেতে হবে..."

নিবারণ একটু বাধা দিয়া প্রশ্ন করিল—"তোলা রইল কি হুজুর! এমন একটা দাঁও আপনি হ'তে পথ বেয়ে এল!..."

বেশ বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হইয়াই করিল প্রশ্নটা—একেবারে ডবল বকশিশের আশায় ছাই পড়ে...

ম্যানেজার সব কথা ভাঙিল না, বলিল—"মেয়েটা এসেই গোল বাধাল যে, বড় ঝানু, ওকে আমার হাতে রাখতে হবে নিবারণ, আপাতত কিছুদিন। অবশ্য তা ব'লে তোমার বকশিশের জন্যে ভাবনা নেই; বরং ফিরে যাবার আগে আর একটু কাজ ক'রে যাও, কাৎরাসগড়ের দিকে স্ট্রাইকের গোলমাল হব হব করছে; কে করছে, কি ভাবে করছে দেখে আসতে হবে, স্কুলের হেডমাস্টারকে তো তুমি দেখেছ। সেই লোকটাই কি না একটু জানা বিশেষ দরকার। যত শীগগির পার ফিরে আসবে কিন্তু, আমায় একটু বাইরে বেরুতে হবে।"

॥ তেইশ ॥

পরদিন সকালে চম্পা আসিয়া, প্রহ্লাদ আর প্রহ্লাদের বউয়ের স্থলে আসিয়া থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল, আবদার করিয়া বলিল, সে হীরককে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না।

ম্যানেজারের মনটা খুব ভাল ছিল, হুকুমটা সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া গেল। রহস্য করিয়া বলিল—"তুই যাকে যাকে ছেড়ে থাকতে পারবি নি সব এক জায়গায় ক'রে দিচ্ছি চম্পা।"

চম্পা একটু রাগের ভান করিয়া বলিল—"ঐ হীরাকে নিয়েই যার সুজে অমন

আড়াআড়িটা হয়ে গেল, জোর ক'রে তো তার সঙ্গেই এক রকম এক ছাতের নিচে থাকতে হচ্ছে—কি যে আপনাদের উবগার হবে জানি না—তার ওপর ঠাট্টা ক'রে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিন…"

নিবারণের কাছে 'আড়াআড়ি' যে কত দূর সে-খবর পাওয়ার পর অভিনয়টা বেশ উপভোগই করিল ম্যানেজার, শুধু একটু হাসিল, তাহার পর বলিল—"নে, তোর হীরার ব্যবস্থাও ক'রে দিই।"

সামান্য একটু থামিয়া অন্য দিনের চেয়ে একটু বেশি প্রশ্রয় দিয়াই বলিল—"ঘরের ভেতর থেকে আমার অফিস-লেটারের প্যাডটা নিয়ে আয়; চিনতে পারবি তো? আর ফাউণ্টেন পেনটা।"

চম্পা আনিয়া দিলে একটু হাসিয়া বলিল—"না চিনলে চলবে কোথা থেকে? তোকে যে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি করছি!"

চম্পা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"ঠাট্টা রেখে কাজ করুন।"

"তাও ভাবি আবার,—তুই হুকুম করবার মানুষ, তাঁবেয় থাকবি কি ক'রে?"

লিখিতে লিখিতে কথাটা বলিয়া এক জায়গায় একটু দাঁড়াইয়া অল্প একটু ভাবিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল—"টাকাটা কি লিখি বল দিকিন?"

চম্পা আবার রাগ করিয়া বলিল—"কিছু না বললেও তো বদনাম দিচ্ছেন যে, হুকুম করছি…"

"তবু বল্লই না।"

"আপনাদের তো হাত ঝাড়লে পাহাড়—গোটা দশ টাকা দিন না অন্তত।"

"অফিস-স্ট্যাম্প আর কপির প্যাডটা নিয়ে আয়, পাকা ব্যবস্থাই ক'রে দিই তোর ছেলের।"

আনিলে হুকুমনামাটা শেষ করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল—"দেখ্, সায়েবি স্কুলে দু' বছর পড়েছিলি তো, কিছু কিছু বুঝবি। নে, এবার স্ট্যাম্পটা বসিয়ে দে।"

আর কিছু না বুঝুক, সংখ্যাটা দেখিয়াই বুঝিল চম্পা—পনেরো টাকা! একটু যেন অন্যমনস্ক হইয়া গেল, তখনই সে ভাবটা চাপিয়া অল্প হাসিয়া বলিল—"আপনার দয়া।"

ম্যানেজার চেয়ারে গা ঢালিয়া দিয়া স্থিরভাবে সিগারেটে কয়েকটা টান দিল, তাহার পর বলিল—"চম্পা, তোকে একটা বড় কাজ দিয়েছি, তার মর্মও তুই বুঝিস, আর ভালো ভাবে আরম্ভও করেছিস। এখন তোকে ভেতরের কথা একটু বলার মতো সাহস পাচ্ছি।"

চম্পা বলিল—"বলুন।"

"খনিতে একটা বিপদ আসছে, বাইরে বাইরে এসে পড়েছে, এখানেও আসবে, আর সেটার বাহন যে মাস্টারমশাই আর এই ছোঁড়াটা, সেটা নিশ্চয় তুইও বুঝতে পেরেছিস।"

চুপ করিল, চম্পাও চুপ করিয়া আছে দেখিয়া প্রশ্ন করিল—"কথা ক'স্ না যে?"

চম্পা একটু হাসিয়া বলিল—"আমরা অত বুঝি?...তবে, দুজনকেই একটু কি-রকম কি-রকম মনে হয় বটে।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া উত্তরটা শুনিয়া বলিল—"এবার নিজের ঘরের কথা তোকে বলি একটু, আমায় দিন-কতকের জন্যে বাইরে যেতে হবে—আপাতত দিন দশেকের জন্যে যাচ্ছি, বোধ হয় আরও কিছুদিন হয়ে যাবে। অনেকদিন থেকেই ভাবছি বেরুব, কিন্তু উৎপাত ঘটতে পারে ব'লে বেরুইনি; এখন তুই এ কাজটুকু হাতে তুলে নিলে ভাবছি বেরুব।"

একটু হাসিয়া বলিল—"মানে, তুই-ই ম্যানেজার হয়ে রইলি আর কি!"

চম্পাও একটু হাসিয়া বলিল—"গরীবকে বাড়াচ্ছেন তো অনেকখানি, কিন্তু কি চাল দিয়ে ওরা কি কাজ করে, সে কি আর আমি বুঝতে পারব?"

"তোকে কিছু বুঝতে হবে না, কিছু করতে হবে না, তুই শুধু আগলে থাকবি, সেখানে তো তোর চাল পাকাই, মানে, যাকে বলে অব্যর্থ?"

সিগারেটটা নিভিয়া যাওয়ায় ধরাইতে ধরাইতে কথাটা বলিল ম্যানেজার, তাই দেখিতে পাইল না চম্পার মুখটা হঠাৎ গম্ভীর আর আরক্তিম হইয়া উঠিল; মুখটা ঘুরাইয়া লইলও একটু।

এর পরে বাজে কথা বলিয়াই আটকাইয়া রাখিল অনেকক্ষণ, লঘু রহস্য, কষ্টিনষ্টি—এই সব; অন্য দিনের চেয়ে একটু বেশি আশকারা দিয়া। চম্পা যোগ

দিয়াও গেল, তবে ম্যানেজারের যেন মনে হইল, কোথায় কিসের একটা অভাব ঘটিয়াছে ; আর এটা স্পষ্ট অনুভব করিল, রহস্যের মধ্যেও কথার মোড় ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া শালীনতার একটা সীমা বজায় রাখিয়া গেল, তাহার বেশি আগাইতে দিল না তাহাকে ; অবশ্য খুব সূক্ষ্মতার সঙ্গে। বেশ একটু নূতন ঠেকিল। চলিয়া গেলে নিজের মনেই বলিল—"মেয়েটা সত্যিই মজল নাকি ?"

অনেকক্ষণই একদৃষ্টে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়া রহিল। একটা মিশ্র চিন্তার স্রোত মনে বহিয়া চলিয়াছে, তাহার মধ্যে কি একটা বেদনারও রেশ আছে··· অথচ সে তো চায়ই যে, চম্পা খুব অন্তরঙ্গ হইয়া গিয়া টুলুকে নিচে টানিয়া আনুক।···নিজের মনকে নিজেই চেনা যায় না অনেক সময়···

চিন্তাটাকে অন্য দিকে ফিরাইয়া লইল—কাজের দিকে। যদি তাই হয়, অর্থাৎ এর মধ্যে যদি হৃদয়ের ব্যাপার আসিয়া গিয়া থাকে তো চম্পার হাতে এমন গুরুতর ব্যাপারটা ছাড়িয়া বাহিরে গিয়া বসা চলিবে কি ?···আবার একটা নূতন সিগারেট পুড়িল, তাহার পরে একটা কথা মনে হইল—যাইবার আগে ব্যাপারটা বোধ হয় একটু জানাজানি করিয়া দিলে মন্দ হয় না—এই যে চম্পার মত একটা যুবতী, কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ টুলুর সান্নিধ্যকামী হইয়া পড়িল।···কিন্তু কি করিয়া করা যায় ?

ভাবিতে ভাবিতে উপায়ও ঠাহর হইয়া গেল। বেশ সূক্ষ্ম অথচ ভদ্র উপায়—অতি সহজেই গঞ্জডিহির ভদ্রসমাজের নজর টুলুর উপর নিবদ্ধ হইয়া পড়িবে,—আপাতত টুলুর উপর, এর পর মাস্টারমশাইয়ের উপরও। তাঁহার অনুপস্থিতিতে আপাতত অনেকটা কাজ হইবে, তাহার পর শেষ পর্যন্ত মাস্টারমশাইকে সরাইতেও গোলমাল হইবে না।

ম্যানেজার পরের দিন বৈকালে স্কুল-কমিটির মীটিং ডাকিল। ছোট জায়গার স্কুলে মুখ-দেখাদেখি করিতে করিতে মেম্বার হইয়া পড়ে অনেক, অর্থাৎ বিশিষ্ট কেহই বাদ পড়ে না। মীটিঙে সবাই আসিতে না পারিলেও জন বারো লোক হইল—ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, বাজারের কয়েক-জন বিশিষ্ট আড়ৎদার, গঞ্জডিহির বাহিরেই একটি জমিদারী কুঠি আছে—তাহার নায়েব, আরও সব। ম্যানেজার ছাড়া খনির তরফ থেকে আছে পরেশবাবু। সবাই যে ম্যানেজারের

স্বপক্ষে এমন নয়, ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট কংগ্রেসী লোক, আর সবার মতো সব কথাতেই সায় দিয়া যায় না। আরও দু-এক জন আছে এই রকম, খদ্দর পরে, মাঝে মাঝে বেসুরা গায়। তবে ম্যানেজারের প্রতিপত্তি খুব বেশি, তাহার প্রস্তাবটাই বেশি খাটে।

মীটিঙের কাজ বেশ খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় হঠাৎ বনমালীর বাসায় শিশুকণ্ঠের আওয়াজ উঠিল। প্রহ্লাদের বউ তাহার আগের দিনই আসিয়া গেছে, হীরক বোধ হয় ঘুমাইতেছিল, উঠিয়া ক্রন্দন জুড়িয়া দিল। মেম্বারদের অনেকেই বিস্মিত ভাবে মুখ তুলিয়া চাহিল, দু-এক জন প্রশ্ন করিল—"কচি ছেলের গলা যে হঠাৎ?"

ম্যানেজার একটা সুযোগ খুঁজিতেই ছিল, মুখ তুলিয়া বলিল—"ও! সেই যে আমাদের খনির সেই ছেলেটা, সেই মেয়েটা যেটাকে 'অ্যাডপ্‌ট্' করেছে।"

পরেশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল—"কি নাম মেয়েটার পরেশবাবু?"

পরেশবাবুও নাম জানে না মোটেই, বলিল—"ও, চরণদাসের মেয়েটা?"

এসব মীটিঙে কাজের চেয়ে অকাজের কথাই চলে, তাহারই সন্ধান পাইয়া একজন বলিল—"তা এখানে এসে জুটল যে?···মেয়েটার তেমন সুনাম নেই গঞ্জডিহিতে, তাই জিজ্ঞেস করছি।"

অপর একজন বলিল—"মেয়েটা শুনেছি স্কুলের চাকরটার নাতনি। তাই বোধ হয়···"

ম্যানেজার একটা প্রস্তাব লিখিতেছিল, একটু ঠোঁঠ বাঁকাইয়া হাসিল, তারপর মুখ তুলিয়া বলিল—"তাই কি ঠিক?···পরেশবাবু বলুন না, আপনি তো ব্যাপারটা জানেন।"

তাহার পর নিজেই কলমটা রাখিয়া দিয়া বলিল···"আসলে ছেলেটিকে নেয় প্রথমে অন্য একজন, মাস্টারমশাইয়ের বাসাতেই থাকে, আমায় তো তাঁর আত্মীয় ব'লেই পরিচয় দিয়েছিল! সেই বোধ হয় কোন একটা বন্দোবস্ত করেছে।"

খদ্দরধারী একজন যুবক একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া শুনিতেছিল, বলিল—"সে ছোকরা ব্যানার্জি কোম্পানির অনুপমবাবুর ভাইপো। মাস্টারমশাই-ই আমায় বলেন।"

ম্যানেজার বলিল—"ও, তা হবে; আমার বললে মাস্টারমশাইকে

একজন প্রশ্ন করিল—"তা এ রকম লুকোচুরি খেলবার মানে?"

ম্যানেজার আবার কলম তুলিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়া বলিল—"অত মানে খুঁজে ফেরবার ফুরসৎ নেই আমার।" লেখার মাঝে একবার একটু কলম থামাইয়া বলিল—"মানে নিশ্চয় আধ্যাত্মিক নয়।"

ঐটেই আজকের মীটিঙে শেষ প্রস্তাব ছিল, লিখিয়া ফেলিয়া বলিল—"এই হ'ল, আপনারা শুনুন সবাই।

কাজ শেষ হওয়ার পরও কাগজপত্র গোছানোর মধ্যে গল্পের জেরটা চলিল একটু। খুব ভালো—বিশেষ করিয়া চরিত্রের দিক দিয়া খুব ভালো, এমন লোক আবার অনেকের চক্ষুশূল। একজন বলিল—"তা কতদিনকার ব্যাপার এটা? আমরা তো জানতাম যে মাস্টারমশাই..."

খদ্দরধারী যুবকটি বেশ একটু জানাইয়া বাধা দিল, বলিল—"তিনি দেবতা।"

ম্যানেজার এমন সুযোগটা হাতছাড়া করিল না। কাজ হইয়া গেছে, চেয়ার ঠেলিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল—"আমি তো সেইজন্যেই ও নিয়ে মাথা ঘামাই নি। তাঁকে দেবচরিত্র ব'লেই জানি, তিনি এসেই একটা ব্যবস্থা করবেন...মানে, সরিয়ে-টরিয়ে দেবেন এদের।"

সামান্য একটু বিরতি দিয়া বলিল—"কিন্তু তা যদি না করেন..."

নায়েববাবু প্রভৃতির মুখের উপর একবার দৃষ্টিটা বুলাইয়া আনিয়া বলিল—"চলুন, সে পরের কথা পরে হবে।—আমি আবার কয়েক দিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। একবার কম্পাউণ্ডটা ঘুরে আসি চলুন, সেকেণ্ড মাস্টারমশাই বলছিলেন—মাস্টারমশাইয়ের বাসার বাইরের দেয়াল খানিকটা ভেঙে গেছে..."

উদ্দেশ্য ছিল টুলুর চেহারাও এক বার সবাইকে দেখাইয়া দেওয়া, একটু বোধ হয় আশা ছিল চম্পাকেও ঐখানেই পাওয়া যাইতে পারে। চম্পা ছিল না, আসে নাই খনি হইতে। টুলু ঘরে ছিল, বাহিরে আসিয়া অনির্দিষ্ট ভাবেই হাত তুলিয়া সবাইকে নমস্কার করিল, দৃষ্টিটা অবশ্য শেষ পর্যন্ত ম্যানেজারের উপরই গিয়া দাঁড়াইল। সে বলিল—"আপনি তা হ'লে এখানেই আছেন! মাস্টারমশাই

তো আজও এলেন না, ব্যাপারখানা কি? আপনাকে নতুন ক'রে কিছু লেখেন নি আর?"

অতি সূক্ষ্ম একটু ব্যঙ্গের হাসি; টুলু স্পষ্ট করিয়াই হাসিয়া উত্তর দিল—"আজ্ঞে না, পুরনো কথা নতুন ক'রে আর কবার লিখতে হয় মানুষকে?"

এর তিক্তস্বাদটি অবশ্য মুখে আসিয়া রহিল; তবে সান্ত্বনা রহিল যে, বেশি গুলতন না করিয়া ইশারায়-ইঙ্গিতে সমস্ত ব্যাপারটি সবার সামনে বেশ ধরিয়া দেওয়া হইল। এর পর পথ নিশ্চয় সহজ হইবে।

নিবারণ আসিল তিন দিন পরে। খবর দিল গোলমাল ওদিকে প্রচুর। কিন্তু যে-লোকটি আগুন লাগাইয়াছে সে দিন-পাঁচেক আগে ওখান থেকে কোথায় চলিয়া গেছে। চেহারার যা বর্ণনা শুনিল, মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে অনেকটা মেলে বটে।

তাহা হইলে মাস্টারমশাই এইবার ফিরিবেন। দেখা হওয়া নিতান্ত দরকার, ম্যানেজার আরও দু-এক দিন রহিয়া যাওয়া স্থির করিল।

পরদিনই কিন্তু বনমালী আবার একটা দরখাস্ত আনিয়া হাজির করিল, আরও দিন-সাতেকের ছুটি চাহিতেছেন মাস্টারমশাই, অর্থাৎ গ্রীষ্মাবকাশ পর্যন্ত। গ্রীষ্মাবকাশটাও বাহিরেই কাটাইতে চান, অনুমতি চাহিয়াছেন।

কতকটা নিশ্চিন্ত এবং কতকটা নিরাশ ও বিমূঢ় হইয়া ম্যানেজার তাহার পরদিনই যাত্রা করিবার আয়োজন করিল।

॥ চব্বিশ ॥

প্রাণ হারাইতে বসার কথা বলায় টুলু উত্তর করিয়াছিল—কি হারাতে বসেছিলাম সেইটেই দেখছ চম্পা, কি পেলাম আজ রাত্রে সেটা তো তোমার চোখে পড়ছে না!

সেই থেকে সব কাজের মধ্যে চম্পার মন এই কথা কয়টির চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিতেছে। শুধু কথাই নয়, টুলুর কণ্ঠেও ছিল অপরূপ স্নিগ্ধতা। কিন্তু সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর এমন কিছু পাওয়ার ব্যাপার তো চোখে পড়ে না চম্পার সমস্ত ত্রিভুবন খুঁজিয়া। তবে?…

এক হয় উদ্যোগের সফলতা, ব্রতসিদ্ধি, সব কথা শুনিয়া টুলু কি নিঃসন্দেহ হইল যে, তাহার চেষ্টা ফলিয়াছে, চম্পা শেষবারের মত ফিরিয়াছে? সেদিন ম্যানেজারের ওখান থেকে ফিরিবার পথে চম্পা যখন টুলুকে আটকায়, টুলু দারুণ বিতৃষ্ণায় বলিয়াছিল—কেউ কি ফেরে নিজের সর্বনাশ থেকে? তুমি ফিরেছ?

শেলের মত বিঁধিয়াছিল চম্পার মনে সে কথা, কেননা ও সেই থেকেই ফিরিয়াছে, কিন্তু বলিবার তো উপায় ছিল না। টুলু যদি এত বিলম্বেও সে সত্যটুকু উপলব্ধি করিয়া থাকে...

এই সম্ভাবনার আনন্দটুকু চম্পার সব কাজে রহিল মিশিয়া। প্রথমটা সে তাহার নূতন গৃহস্থালি গুছোনোয় লাগিয়া গেল। মিতিনকে বস্তি হইতে লইয়া আসিতে বেগ পাইতে হইল না। প্রথমত গোছালো মানুষ চায়ই একটু ভালভাবে থাকিতে, সেদিক দিয়া নূতন জায়গা পছন্দই মিতিনের, তাহার উপর হীরককে লইয়া সে যেন জোড়াগাঁথা হইয়া গেছে চম্পার সঙ্গে, এক ধরনের আত্মীয়তা হইয়াছেই, সেই সঙ্গে আছে টাকার স্বার্থ। চম্পা আবার পাঁচ টাকাটাকে দশ টাকা করিয়া দিল—টাকা লইয়া তাহার বরাবর একটা উদারতা আছে—হীরকের খোরপোষের বাকি পাঁচটা টাকা নিজের হাতে রাখিল পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য। প্রহ্লাদের একটু অনিচ্ছা ছিল, খনিটা হইয়া যাইতেছে বেশ একটু দূর। কিন্তু খতাইয়া দেখিল, স্ত্রী কাছে থাকিলেই আর সবের দূরত্ব অগ্রাহ্য করা যায়।

বস্তিতে একটু চাঞ্চল্য উঠিল, তবে কৌতূহল সে রকম সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল না। ভিতরকার ব্যাপারটা কাহারও জানা নাই। ছেলে লইয়া চম্পার সঙ্গে টুলুর যা সম্বন্ধ সেটা বৈরিতারই; তাহা ভিন্ন মাস্টারমশাই যে এখানে নাই, টুলু একলা, সে কথাও প্রায় কেহই জানে না। মাস্টারমশাইকে আর টুলুকে যতটুকু দেখিয়াছে তাহাতে, এরা মানুষের খারাপ দিকটাই সচরাচর দেখিতে পায় বলিয়া, তাঁহাদের দেবতার কাছাকাছিই মনে হয়। মোট কথা, কোন কুটিল সন্দেহের পথে যাইবার অবসরই পাইল না বস্তির মনটা। চম্পা বলিল—ঠাকুরদাদা বুড়া হইয়াছে, তাহাকে ছাড়িয়া থাকাটা অধর্ম হয়, এই তো এক চোট ভুগিল খুব। লোকে বেশ বুঝিল; চম্পার সুমতি হইয়াছে দেখিয়া রুচি অনুযায়ী প্রশংসা করিল বা ঠোঁট উল্টাইল।

চম্পা জানে এ অজুহাত টিকিবে না বেশি দিন, ভাবিল, তবুও এই করিয়া ম্যানেজারের উদ্দেশ্যটা যত দিন ব্যর্থ করা যায়। এখন আর বলিবারই বা কি ছিল তাহার ?

প্রহ্লাদের স্ত্রীকে আনাইয়া লইবার কথায় প্রথম একটু ধোঁকা লাগিয়া গিয়াছিল চম্পার, মনে হইয়াছিল, টুলু বদনামের আর একটা ঘর বাড়াইল ; কিন্তু এর পরেই বুঝিতে পারিল উদ্দেশ্যটা,—চম্পার সঙ্গে আরও একটা পরিবার থাকায়ই বরং বদনামের আশঙ্কাটা কমিল। টুলু এর দ্বারা ম্যানেজারের চালের খানিকটা কাটান্ দিয়াছে।

দুইটির জায়গায় আবার তিনটি পরিবার হইল, অত্যুক্তি হইলেও ছোট একটি পাড়া বলা যায়।

যেদিন মীটিং হইল স্কুলের, যেদিন প্রহ্লাদের পরিবার আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার পর দিনের কথা। রবিবার, স্কুল বসে নাই ; খনিতে সবাই একটা দিন করিয়া ছুটি পায়, চম্পা পায় বুধবার, নূতন গৃহস্থালি পাতিবার জন্য একটি সঙ্গিনীর সঙ্গে বদল করিয়া লইয়াছে ছুটিটা, বুধবার তাহার হইয়া খাটিয়া আসিবে। দুইটি সংসারের জিনিসপত্র কাল খানিক আসিয়াছিল, বাকিগুলি আজ সকালে বনমালী, চরণ আর প্রহ্লাদ আনিয়া হাজির করিয়াছে। বনমালীর বাসার উঠানে ডাঁই করা আছে, চম্পা আর তাহার মিতিন তুলিয়া তুলিয়া গোছগাছ করিতেছে। অল্প জায়গা—সে অনুপাতে জিনিস বেশি ; কেননা দুইটি পরিবারই বস্তির হিসাবে একটু সম্পন্ন ; তোলাপাড়া গোছগাছ করার সঙ্গে একটু মাথাও ঘামাইতে হইতেছে।

এরা আসা পর্যন্ত টুলু আসে নাই এদিকে। আসিবার তো কোন দরকার নাই, নির্লিপ্ত ভাব বজায় রাখাই মনে হইল শোভন। দুইটা শিশুর পালা করিয়া, কখনও বা সমতানে কান্নায় একটু হইল আগ্রহ ; জানালা দিয়া দেখিল—একে, দুয়ে, তিনে স্কুলে নূতন লোক সব আসিতেছে, ম্যানেজারও তাহার মোটরে আসিয়া জন দুয়েককে লইয়া নামিল। টুলু বুঝিল, মীটিং হইবে, আর যাওয়া হইল না। মীটিং ভাঙিবার পর ম্যানেজার এদিকে আসিল, মাস্টারমশাইয়ের উপদেশ লইয়া একটু ব্যঙ্গোক্তি করিল, তাহার সঙ্কুচিত উত্তর দিলেও সন্ধ্যার পর

হইতে যতক্ষণ জাগিয়া রহিল টুলুর মনটা রহিল বিষাইয়া। বাহির হইতে ইচ্ছা হইল না।

ঠিক করিল আজ সকালে যাইবে। সকালটি বড় চমৎকার আজ—এক-একটা সকাল যেমন আসে মনের সমস্ত সঙ্কোচ সঙ্কীর্ণতা মুছিয়া দিয়া। মনে হইল, ওদের এক রকম ডাকিয়াই আনিয়াছে, গ্রহণ করার সহজ হাসি লইয়া দাঁড়াইতে হইবে বইকি ওদের উঠানে।···আনন্দের জোয়ারই ওকে ঠেলিয়া লইয়া গেল।

আনন্দ কিন্তু হঠকারী, চারিদিক কিন্তু ভাবিয়া দেখে না। বেশ লঘু পদেই গেট পার হইয়া যখন বনমালীর বাসার একেবারে কাছাকাছি আসিয়াছে, টুলুর হুঁশ হইল, এ ভাবে গিয়া উঠানের মধ্যে দাঁড়ানো চলিবে না তো। সে চম্পার সঙ্গে পরিচয়ের জোরে যাইতেছিল, কিন্তু চম্পার সঙ্গে তাহার এত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথাটা তো আর কেহই জানে না, কেননা তাহার সবটাই হইয়াছে এদের দৃষ্টির অন্তরালে। বনমালীর কথা বাদ দেওয়া চলে, কতকটা না হয় চরণদাসেরও, কিন্তু প্রহ্লাদ রহিয়াছে, আর বিশেষ করিয়া তাহার স্ত্রী—টুলুর এ রকম ওপর-পড়া হইয়া হঠাৎ উঠানে আসিয়া দাঁড়ানোটা ওরা কি ভাবে লইবে? এর ওপর চম্পা যদি আবার তাহাদের নূতন ঘনিষ্ঠতার সূত্র ধরিয়া বেশ সহজ আলাপেই কোন কথা বলিয়া বসে—বলিবেই, এটাও ঠিক—তো সে কি একটা বিসদৃশ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে না ওদের সবার চোখে?

টুলু নিদারুণ কুণ্ঠায় ঘামিয়া উঠিল যেন, আগাইতেও পারে না, অথচ চলিয়া আসিতেও পা ওঠে না,—ওদের কেহ হঠাৎ বাহির হইয়া দেখিলে কি মনে করিবে? কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় বনমালী বাহির হইয়া আসিল এবং তাহাকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"ছোটবাবু যে! কি দরকার বটে?"

একবার একটু আমতা আমতা করিয়া উত্তরটা যোগাইয়া গেল টুলুর, বলিল—"ইয়ে, তোমার বাসায় হঠাৎ ছেলের কান্না শুনে ভাবলাম···"

বনমালীর মনটা কাল থেকেই ভরাট হইয়া আছে, একেবারে উল্লসিত হইয়া উঠিল, বলিল—"আজ্ঞে লাতনি এলোক যে, আমার সেবাটি করবেক—তার ছাওয়াল কান্দে—হ্যাঁ, আমার লাতনির ছাওয়াল, আসুন আপনাকে দিখাই।

যা ভাবচেন সিটি নয় আজ্ঞে, আসুন, ভিতরে পায়ের ধুলো দিন, আপুনিকে বুলি সব কথা—সে রকম দোষের কথা নয় আজ্ঞে—আর পেল্লাদের বউ এলোক, পেল্লাদ এলোক…"

"কে বটে গো? কার সঙ্গে কথা বুলছ?"

বলিতে বলিতে চরণও আসিয়া উপস্থিত হইল, টুলুকে দেখিয়া করজোড়ে প্রণাম করিয়া বলিল—"আপুনি? আমি কই, বুড়া কার সঙ্গে কথাঁটি বুলে?"

প্রহ্লাদও বাহির হইয়া আসিল। বনমালী বলিল—"তা আসুন আজ্ঞে, ভিতরে পায়ের ধুলো দেন, আজ আপুনির আশীর্ব্বাদে আমার ঘর ভরে গেলোক।"

জীবনে যে নিরীহ প্রবঞ্চনার দরকার হয় মাঝে মাঝে, সেটা টুলুর ততক্ষণে উপলব্ধি হইয়াছে, একটু কি ভাবিয়া বলিল—"মেয়েরা রয়েছে বনমালী—থাক্ না এখন—আবার না হয়…"

বনমালী গম্ভীর হইয়া গেল, বলিল—"হঁ, রইছেঁ! রাজরাণী গো! আপুনির কাছে লজ্জা!"

গরগর করিতে করিতে ভিতরে চলিয়া গেল, এবং তখনই নেহাৎ টানিয়া না আনুক, কতকটা জোর করিয়া চম্পা আর তাহার মিতিনকে ডাকিয়া আনিয়া দরজার কাছে দাঁড় করাইল। চম্পা টুলুর গলা শুনিয়াই ভিতরে কান খাড়া করিয়া ছিল, আসিয়া এমন একটা ঔদাসীন্য লইয়া দাঁড়াইল যেন লোকটাকে পথের বাঁকে কোথাও দেখিয়া থাকিবে, এর বেশি নয়। টুলু একবার চাহিল, কত শীঘ্র যে চম্পা অবস্থাটা বুঝিয়া নিজেকে ঠিক মানাইয়া লইয়াছে, দেখিয়া আশ্চর্য হইল।

বনমালী ওদিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, ডান হাতটা চম্পার পিঠে দিয়া বলিল—"ই চম্পাটি আছেঁ, আমার নাতনি, আপুনি শুনেছেন ইর কথা কিন্তু দিখেন নাই, বড়ো ভালো মেয়েটি বটে…"

চুপ করিয়া না দেখার কথাই মানিয়া লইল টুলু, কিন্তু দেখার সাক্ষী সামনে রহিয়াছে—প্রহ্লাদের বউ, টুলু সত্যে মিথ্যায় মিলাইয়া বলিল—"না, দেখেছি একবার বনমালী, খনিতে।"

তাহার পর হাসিয়া বলিল—"কিন্তু তাতে খুব ভালো মেয়ে ব'লে তো মনে হয় নি, না হয় এই মেয়েটিকে জিজ্ঞেস কর না ?"

নাতনির তাহার বিশেষ সুনাম নাই; টুলুর ইঙ্গিতটা নিশ্চয় সেই দিক দিয়াই মনে করিয়া বনমালী উচ্ছ্বাসের মুখে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া দেখিয়াই কিন্তু চার জনের মুখেই হাসি দেখিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইয়া প্রশ্ন করিল—"কি কথাটি আছেঁ তোরা বুলবিক নাই বু়ঢ়াকে ?"

চরণদাস সে দিন ছিল না, তবে ব্যাপারটা জানে, বলিল—"গঞ্জভির সবাই জানে, তু জানিস না তো কি হবেক ?—উ ছাওয়ালটি তো বাবুই নিইছেঁলো, পেল্লাদের বউকে পুষবার তরে দিলেক, ট্যাকা দিলেক, তা তুর লাতনি কেড়ে লিলেক নাই ?"

প্রহ্লাদের বউ মুখটা চম্পার ঘাড়ের পিছনে লুকাইয়া বলিল—"আমাকে মারলেক নাই ? গালি দিলেক নাই ?—আমার জামা ছিঁড়ে দিলেক নাই ?··· হঁ, বড়ো ভালো মেয়ে বু়ঢ়ার লাতনি !"

সে নিজেও হাসিয়া উঠিল এবং অন্য সবার হাসিও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল—অবশ্য বনমালী ছাড়া। তাহার মুখটা গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে, চম্পার পানে চাহিয়া তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলিল—"ই কি শুনি গো! পরের ছাওয়াল আপ্পন ব'লে চালাস ?—উকে মারলিক ? হ !···"

হীরক কান্না জুড়িয়াছে, চম্পা তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়া তাহাকে লইয়া আসিল, বনমালীর পানে একটু বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"তা উনিকে দিয়া দে ক্যানে, কে এমন ছাওয়ালকে রাখবেক গো ?"

পরিচয় গোপন করিয়া নূতন পরিচয় হইল। এ নিরীহ প্রবঞ্চনাটুকুর দরকার ছিল; নগ্ন সত্য সব সময় চাহে না জীবনে, সময় বুঝিয়া তাহার অঙ্গে একটু আব্রু টানিয়া দিতেই হয়।

এর পর কিন্তু টুলু আর কোন ব্যবধানই রাখিল না। "এস তোমার নতুন গেরস্থালী দেখি বনমালী।"—বলিয়া নিজেই আগাইয়া গেল। সবাই যেন কৃতার্থ হইয়াই আগে-পিছে হইয়া তাহার সঙ্গে ভিতরে আসিল।

উঠানে পা দিয়াই টুলু দাঁড়াইয়া পড়িল। একরাশ জিনিসপত্র উঠানে গাদা

করা—শিলনোড়া বাসনপত্রের সঙ্গে চৌকি, খাটুলি, বাক্স, দু-একখানা অল্পবিস্তর শৌখিন আসবাব পর্যন্ত—আলনা, ব্রাকেট নিশ্চয় চম্পার। ঘরের ভিতরেও মেঝেতে কিছু কিছু ছড়ানো। চারিদিকটা একবার চাহিয়া লইয়া টুলু বিস্মিত ভাবে বলিল—"এ কি ব্যাপার ?"

চম্পা হাসিয়া বলিল—"আপনি গরিবদের জিনিসের ওপর নজর দিচ্ছেন ? একে তো হয়ই না।"

টুলু বলিল—"কিন্তু তোমার ঠাকুরদাদার বাসার কথাও একটু ভাবা উচিত তোমাদের। ঐ তো দুখানি ঘর।...তা নয়, আমি বলছিলাম মাস্টারমশাইয়ের তো একটা চাকরের বাসা আছে, কিছু না হয় সেখানে গিয়ে ওঠ না।"

চরণ বোধ হয় সমর্থন করিতে যাইতেছিল, তাহার আগেই চম্পা হাসিয়া বলিল—"ঠাকুরদার ঘর ভরস দেখে আপনার হিংসে হচ্ছে ?"

টুলু উত্তর করিল—"হিংসে ! এ রকম ক'রে ঘর যেন আমার কখনই না ভরে, ঘরের মালিককেই যাতে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়।...কি বল গো বনমালী ?"

একটু হাসি যা উঠিল, বনমালী একটু রসিকতা করিয়া সেটাকে বাড়াইয়া দিল—"আজ্ঞে, নাতনিকে ঘর ছেড়ে রাস্তায় দাঁড়াব সিটি তো ভাগ্যির কথা বটে।"

হাসির মধ্যেই টুলু বলিল—"আমার নাতনি নেই, সেই জন্যে বোধ হয় তোমার ভাগ্যির কথা বুঝব না, তবুও এ ভাগ্যির হিংসে করি না বনমালী। যাক, একেবারে রাস্তায় না দাঁড়িয়ে, না হয় আমার কাছেই চ'লে এস, আমার তবু সঙ্গী হবে একজন।"

চম্পা একবার মুখের পানে দেখিয়া লইয়া বলিল—"আর এদিকে ঠাকুরদাদার জন্যেই আমরা এলাম—বুড়ো হয়েছে, নিত্যি অসুখ—মিতিনদের পর্যন্ত টেনে নিয়ে এলাম। আপনার সঙ্গীর ব্যবস্থা আমরা আগেই করেছি,—বাবা আর পেল্লাদ-ভাই আপনার ওখানেই থাকবে, অবশ্য আমাদের মতন খনির কুলি-মজুরদের থাকা মানে রাতটুকু কাটানো।"

চরণ বলিয়া উঠিল—"আমি ক্যানে গো ? আমায় ছাড়ান্ দে। পেল্লাদ যাবে বটে, উনি একজন সঙ্গী চাইছেন, তু দুজন চাপাচ্ছিস—কষ্ট হবেক নাই।"

ওর শঙ্কিত বিপর্যস্ত ভাব দেখিয়া চম্পা একটু শব্দ করিয়াই হাসিয়া উঠিল, বলিল—"তুর রোগের কথা জানেন উনি।...তা রপ্তে রপ্তে ছাড়তে হবেক নাই উ অব্যেসটি ?"

চরণ একটু অপ্রতিভ হইয়া গেছে দেখিয়া টুলু বলিল—"না, তোমার মেয়ের মতন অভ্যেস নিয়ে আমি খোঁটা দেবার লোক নই চরণ, তুমি আমার দলেই এস।...অভ্যেস অভ্যেসই, যখন চাইবে এক দিনেই ছেড়ে দেবে তুমি।"

বনমালী হাতমুখ নাড়িয়া বলিল—"উর বাবার উ অব্যেসটি ছিলোক নাই ? ভাব্ ক্যানে।"

সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গীতে সবাই হাসিয়া উঠিল।

প্রহ্লাদ আর তাহার স্ত্রী—দুজনেই একটু লাজুক প্রকৃতির, নিঃশব্দে সবার কথাবার্তা শুনিয়া যাইতেছিল আর মাঝে মাঝে কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে হাসিতে যোগ দিতেছিল, টুলু তাহাদেরও কথাবার্তার মধ্যে টানিল—প্রহ্লাদকে টানিল তাহার কাজের পরিচয় লইয়া, ওর স্ত্রীকে—সেদিন বস্তিতে গিয়া ছেলে দেখার জন্য তাহাদের বাসায় যাওয়ার কথা লইয়া। জিজ্ঞাসা করিল, টাকা যে দিয়া আসিয়াছিল তাহাতে তাহার ছেলের জামা কেনা হইয়াছে তো ?

ছেলেটি ঘরে ঘুমাইতেছে—একটু ঘুমায় বেশি, চম্পা ছেলেটিকে দেখাইবার জন্যই মিতিনকে একটু ঠেলিয়া বলিল—"তু জামাটি পরায়েঁ নিয়ে আয় গো, উনির ধোঁকা হবেক নি তু আপ্‌নন পেটে পুরেছিঁস ব'লে ?"

হীরকের কোমরের গোটের জন্যও দুইটা টাকা দিয়াছিল টুলু; অবশ্য দুই টাকায় গোট হয় না, তবুও কিন্তু নজরটা একবার তাহার খালি কোমরে গিয়া পড়িল।

প্রহ্লাদের বউ সেটা লক্ষ্য করিল, বাসার দিকে দুই পা অগ্রসর হইয়া আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইল, চম্পার পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—"তু আগে হীরার গোটের ট্যাকার হিসাব দে উনিকে।"

চম্পা একটু দুষ্টামির হাসি ঠোঁটে আনিয়া বলিল—"আমি তুর মতন বোকা নাকি গো। ছেলের উপাজ্জনের ট্যাকা পেটে খেয়েঁছি। খাবো নাই ? তুর মতন বোকা নাকি ?"

হাসিভরা দৃষ্টিটা একবার টুলুর মুখের উপর দিয়াও বুলাইয়া লইয়া গেল।

স্কুলের গেট হইতে বাহির হইয়াই দেখে সদর-দরজার সামনে রাস্তার ধারটিতে এক বুড়ি একটা ছেঁড়া কাঁথা জড়াইয়া জবুথবু হইয়া বসিয়া আছে, তাহার পাশে একটি ছোট মেয়ে, একটি ছোট ছেলে রাস্তার অন্যধারে বোধ হয় নুড়ি সঞ্চয় করিতেছে। টুলুকে দেখিয়া মেয়েটি বুড়িকে কি বলিতেই সে মুখটা তুলিয়া একটু যেন প্রস্তুত হইয়া বসিল। টুলুর মনে পড়িল বটতলার সেই মেয়েটি, তাহার দিদিমাকে লইয়া আসিয়াছে ; পা চালাইয়া দিল।

একটু কাছে আসিতেই বুড়ি পায়ের শব্দ লক্ষ্য করিয়া দৃষ্টিহীন চক্ষু দুইটা টুলুর মুখের পানে তুলিয়া ধরিল এবং ডান হাতটা বাড়াইয়া ও মুখের ভাবটা যতদূর সম্ভব করুণ করিয়া আরম্ভ করিল—"দেন গো রাজাবাবু, কিছু দেন গরিব বুড়িকে—একটি লাতনি, একটি লাতি—খেতে পাই না…দুদিন থেঁকে…"

টুলু লক্ষ্য করিল, মেয়েটি ঘেঁষিয়া আসিয়া গা ঠেলিতেছে—উদ্দেশ্য নিশ্চয় ভাষা এবং ভঙ্গী আরও করুণ করিয়া তুলিতে ইঙ্গিত করা। ছেলেটিও আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছে। টুলু আসিয়া পড়িল, মেয়েটিকে প্রশ্ন করিল—"তোকে না পরশু আসতে বলেছিলাম ?"

মেয়েটি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল। ওর দিদিমা মুখে খোসামোদের হাসি ফুটাইয়া আরও করুণ কণ্ঠে বলিল—"উয়ার দোষ নাই গো রাজাবাবু, উ বুলছেঁ, আমার বুখারটি হ'ল, আসতে পারলাম নাই, উয়ার দোষটি নাই।"

টুলু একটু যেন কি রকম হইয়া গেছে ; ভিখারীও দেখিয়াছে ঢের এর আগে, মন কঠিন নয়, যথাসাধ্য দেয়ও, কিন্তু দারিদ্র্যের এমন মর্মন্তুদ ছবি এর আগে যেন দেখে নাই। হইতে পারে দৃষ্টি আজকাল এদিক সজাগ বলিয়াই এমন মনে হইল ; গলা যথাসম্ভব নরম করিয়া বলিল—"না গো বাছা, আমি সেজন্যে বলছি না, দোষ কেন হবে ?…তা জ্বর গায়ে এলে কেন এতটা পথ বেয়ে ? এই রোদ্দুর…"

ছেলেটি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"না গো, জ্বরকালে রোদ্দুর উর মিঠা লাগে বটে…উর…"

মেয়েটি হাতে একটা চাপ দিয়া ইশারায় থামাইয়া দিল, ওর ভয়—যেন বুড়ি

আর ছোট ভাইয়ে মিলিয়া কিছু বেফাঁস বলিয়া এমন একটা সুযোগ নষ্ট করিয়া না ফেলে। টুলু ছেলেটির দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, তাহার পর বুড়িকে বলিল—"জ্বরগায়ে না এলেই পারতে, যাক, এসেছ ভালই হয়েছে, ভেতরে এসো…"

বুড়ির হাত ধরিয়া তুলিয়া দরজার মধ্যে পা দিল। ছেলেটি আর মেয়েটি হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ঘুরিয়া বলিল—"আয় তোরাও, বাঃ!"

মাস্টারমশাইয়ের বাসার দেয়ালের বাহিরেই পিছন দিকে চাকরের বাসা, পাশাপাশি দুইটি ঘর, খিড়কির দরজার পাশেই পড়ে, উঠানের দেওয়ালটাই ঘর দুইটার পিছনের দেয়াল। সেইখানে লইয়া গিয়া বলিল—"তোমরা এইখানেই থাকবে, পাশেই আমি রইলাম।"

তিন জনেই কি রকম হইয়া গেছে। বুড়ি স্থির, দীপ্তিহীন চক্ষুসুদ্ধ মুখটা আন্দাজে টুলুর মুখের দিকে তুলিয়া একটু ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বলিল—"থাকব!"

একটা ছোট সিঁড়ি, তাহার পরেই এক ফালি বারান্দা, টুলু তাহাকে তুলিয়া লইয়া বলিল—"হ্যাঁ…তোমাদের জিনিসপত্র কিছু আছে?"

মেয়েটি হঠাৎ উৎসাহিত হইয়া উঠিল, বলিল—"আছেঁ গো! আছেঁ; আনি গিয়াঁ?"

বুড়ি এই হঠাৎ সৌভাগ্যটাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, লোভ-আশঙ্কা মেশানো কণ্ঠে স্খলিত ভাবে বলিল—"রাখবেন?…কিন্তু আমি তো কানা আছিঁ…কাজ তো কুরতাম…আর দিখতে পারি না…"

মেয়েটি জিনিসপত্র আনিতে যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছিল, শঙ্কিত ভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে, আবার বুঝি সব কাঁচিয়া যায়!—টুলু তাহার পানে চাহিয়াই বুড়িকে বলিল—"কেন, তোমার নাতনি রয়েছে তো, কাজ করবে আমার—কি রে, পারবি নি?"

মেয়েটির পা সামনের দিকেই বাড়ানো আছে, যেন চারিদিকেই সামলাইবার চেষ্টা; বলিল—"হঁ, পারব, পারব বটে…"

ভাই সিঁড়ির উপর উঠিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সুপারিশ করিল—"উ রান্ধে, দিদিমা যিদিন চাল আনে, উ রান্ধে; সিলাই করতে পারে…"

ভদ্রালয়ে আসিবার খাতিরেই হোক অথবা আনন্দেই হোক, মেয়েটি তাহার জীর্ণ কাপড়টাকে একটু মেরামত করিয়া লইয়াছে, একজায়গায় অপেক্ষাকৃত একটা ফরসা তালিও দেখা যায়। বোধ হয় তাই তাহারই উপর টুলুর দৃষ্টি টানিয়া আনিল ভাবিয়া একটু গুটাইয়া সুটাইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

ওর চলিয়া যাওয়ার একটু পরে টুলু ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি আছে তোদের সেখানে?"

উত্তর হইল—"আমার কাঁথা আছেঁ, উর কাঁথা আছেঁ, বুড়ির নোহার সানকি আছেঁ, নোহার গিলাসটি আছেঁ—"

"কোথায় আছে?"

"চরণদাসের বাঁসার পিছনটিতে নুকানো।"

আন্দাজ আধ ঘণ্টা পরে প্রায় ইস্কুলের কাছাকাছি একটা কান্নার শব্দ উঠিল—"আমাদের সব নিইঁছে, সব চুরি কর‍্যা নিইঁছে।"

"দিদি আইঁছে।"—বলিয়া ছেলেটা ব্যাকুল ভাবে ছুটিয়া গেল। বুড়ি মাথাটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া একটু শুনিল, তাহার পর গভীর নিরাশায় কপালে করাঘাত করিয়া বলিল—"যা, সব গেলোক!"

কান্নার আওয়াজটা নিকটবর্তী হইতে লাগিল এবং একটু পরেই মেয়েটি আকুল ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া উপস্থিত হইল—"আমাদের কাঁথা নিইঁছে! থালা নিইঁছে! গিলাস নিইঁছে!"

চম্পা প্রথমে গ্রাহ্য করে নাই, এ ধরনের কান্না বস্তির নিত্যকার ব্যাপার একটা; তাহার পর আওয়াজটা মাস্টারমশাইয়ের বাসায় ঢুকিল দেখিয়া একটু কান পাতিয়া শুনিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিল। আসিয়া দেখে বুড়ি কাঁথামুড়ি দিয়া দুলিয়া দুলিয়া কাঁপিতেছে, ছেলেটা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, মেয়েটা ব্যাকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া যাইতেছে, আর টুলু তাহার একটা হাত ধরিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছে। পিছনে ফিরিয়া ছিল বলিয়া চম্পাকে দেখিতে পায় নাই, চম্পা স্থির হইয়া খানিকক্ষণ দেখিল, তাহার পর একটু

আগাইয়া সামনে আসিতে টুলু ফিরিয়া চাহিল। তাহার চক্ষে ঝরঝর করিয়া জল ঝরিতেছে।

চম্পা শান্তকণ্ঠে একটু অনুযোগের সহিতই বলিল—"এত অল্পতেই যদি চোখের জল ফেলেন···"

টুলু চোখ দুইটা মুছিয়া লইয়া অপ্রতিভ ভাবে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"তা নয় চম্পা, আমি মনে করিয়াছিলাম দুঃখ-দারিদ্র্যের এরাই চরম, এদের জিনিস চুরি করবার মতনও মানুষ তা হ'লে আছে পৃথিবীতে? দুটো ভাঙা লোহার বাসন আর দুখানি কাঁথা—তার নমুনা ঐ সামনেই দেখো না।"

॥ পঁচিশ ॥

বুড়ির কাঁপুনিটা বাড়িয়াছে; অসুখটা বাড়িয়াছে নিশ্চয়, তাহার পর এই নূতন অবস্থায় হরিষে-বিষাদ। চম্পার পায়ে একটু কুণ্ঠা যেন চেষ্টা সত্ত্বেও ফুটিয়া উঠিল, তাহার পর সে সোজাই উঠিয়া গিয়া বুড়ির মাথায় হাত দিয়া প্রশ্ন করিল—"কাঁপিস কেন এত রাঙা ঠানদি?" সঙ্গে সঙ্গেই হাতটা কপালে চাপিয়া বলিল—"জ্বর হয়েছেঁ দেখছি যে!"

টুলু বলিল—"হ্যাঁ, এতটা হেঁটে এসে বোধ হয় বাড়লও। বুড়ি তোমার জানা দেখছি যে···!"

বুড়ি কাঁথাটা একটু টানিয়া জড়াইয়া ঘাড় গোঁজা অবস্থাতেই কাঁপা কণ্ঠে বলিল—"চম্পির গলা না?...এত্তোটুকু দেখেছি...এত্তোটুকু..."

কতটুকু সেটা দেখাইবার জন্য ডান হাতটা বাহির করিয়া একটু তুলিয়া ধরিল। একটু পরে সেটা কাঁপিতে কাঁপিতে আপনিই নামিয়া গেল।

বোধ হয় অদরকার বোধেই চম্পা আর টুলুর কথার উত্তর দিল না। "দাঁড়াও আসি।" বলিয়া টুলুর দিক থেকে একটু মুখটা ঘুরাইয়া বাসার দিকে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। কেন যে এমন করিল গলার স্বরে সেইটুকু বুঝিতে আর টুলুর বাকি রহিল না।

মেয়েটি চুপ করিয়াছে, বোধ হয় নূতন অবস্থায় অভিভূত হইয়াই। বুড়ি

বিড়বিড় করিয়া কয়েকবার কি বকিল—বোঝা গেল না, জ্বরের তাড়সে দু-একটা স্পষ্ট অক্ষরের সঙ্গে হিস হিস করিয়া শব্দ হইয়া মিলাইয়া গেল মাত্র। টুলু আগাইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল—"কিছু বলছ আমায় ?" বুড়ি একটু জোরেই বলিল এবার। ছেলেটি কাছেই ছিল, টুলু বুঝিতে না পারায় তাহার পানে চাহিতে বলিল—"বুলছে আগে সবাই রাঙা ঠান্‌দিই বুলত।"

টুলু একটু ভাবিল—তাহার পর প্রশ্ন করিল—"এখন কি বলে ?"

"রাঙি বুড়ি।"

মেয়েটি একটু তর্কের সুরে তাহার পানে চাহিয়া বলিল—"না, কানা বুড়ি··· কানা ভিখ-উলিও বলে !"

যেন অনেক দিনের নালিশ একজন বিচারক পাইয়া জানাইয়া দিতেছে। ছেলেটি বলিল—"হুঁ, তাও বুলে।"

বুড়ি আবার একটা কি বলিল—টুলু আবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতেই মেয়েটি বলিল—"বুললে—উর ডাকটা মিঠা লাগল তাই বললাম।"

বুড়ি একটা কম্পিত অঙ্গুলি তুলিয়া বলিল—"একটি বছরে···"
পুরানো একটি ডাকে মনটা বড় আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে, ছাড়িতে পারিতেছে না প্রসঙ্গটা।

টুলু এবার ওর কথাটা বুঝিল, মনে মনে ওর বক্তব্যটা পূর্ণ করিয়া লইল—একটি বছরে রাঙা ঠানদি থেকে কানা ভিখউলি।···একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

চম্পা আসিয়া উপস্থিত হইল। একটা মাদুরের মধ্যে গুটানো একটা কম্বল আর বালিস আনিয়াছে, এর অতিরিক্ত নিজেকেও আনিয়াছে বদলাইয়া, নূতন দৃশ্যটাতে যে একটু অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, সে-ভাবটা আর নাই, এবার বেশ সপ্রতিভ। আসিয়াই একটু বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল—"এখানেই দাঁড়িয়ে এখনও আপনি। যান এবার, নিজের কাজ আছে তো।"

টুলু একটু হাসিয়া বলিল—"কাজ তো দেখছ···আমার সামনেই···এনে তো ফেললাম, এখন···"

"ঐ এনে ফেলা পর্যন্তই আপনাদের কাজ, এখন আমার এলাকা, আপনি যান।···হ্যাঁ, তখন কি যেন জিজ্ঞেস করলেন—বুড়িকে জানি কি না ? জানি

বইকি, বস্তিরই তো মানুষ, খনি ছেড়েছে অনেক দিন, বছরখানেক আগে পর্যন্ত এর ওর ফরমাশ খেটে বেশ চালিয়ে এসেছিল।···বছর খানেকই হ'ল, না গা রাঙা ঠানদি ?"

বুড়ি বলিল—"উ শাওঁনে গেলোক চক্ষু।"

চম্পা বলিল—"আর এটা এই জষ্টি !···অদেষ্ট !"

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, একটু অন্যমনস্কও হইয়া গেল, তাহার পর টুলুর মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"নিন, এবার যান আপনি বেটাছেলের জায়গায়।"

টুলু যাইবার জন্য পা বাড়াইয়া আবার ঘুরিয়া বলিল—"কিন্তু···বেশ জ্বর রয়েছে।"

বুড়ি কি ভাবিয়া মাথা দু-তিনবার নাড়িল। মেয়েটি বলিল—"উর জ্বর থাকেক নাই···ভিখ মাঙতে হয় কিনা।"

চম্পা বলিল—"ঐ শুনুন থাকে না জ্বর ; জ্বর থাকলে পেট চলবে কি ক'রে ? আবদার না তো।···যান আপনি।"

খিড়কি দিয়া টুলু ভিতরের উঠানে পা দিয়াছে, চম্পা নামিয়া আসিয়া ডাকিল—"শুনুন।"

নিজেও আগাইয়া গেল, বলিল—"জ্বরের কথায় মনে পড়ল,—মাস্টারমশাই তো ওষুধ দিতেন,—হোমিওপ্যাথি। নিশ্চয় আছে বাক্স ঘরে।"

টুলু বলিল—"আমি একেবারেই জানি না যে···"

"ওতে একেবারেই জানবার কিছু নেই, বই দেখে দেখে লক্ষণ মিলিয়ে দেয়, আমি অনেককে দেখেছি। বইও নিশ্চয় আছে তা হ'লে ; দেখুন না একবার।··· লক্ষণ—জ্বর কাঁপুনি।...গায়ে ব্যথাও আছে রাঙা ঠানদি ?···বলছে, আছে। দেখুন গিয়ে এবার। আর যা ওষুধ, ভুল হ'লে ভয়ের কিছু নেই।"

আছে খানতিনেক হোমিওপ্যাথিক বই। টুলু একবার এটা একবার ওটা লইয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল। কৌতুক জাগাইতেছে। হোমিওপ্যাথির বিচারগুলা পড়িল, তিনটা বইয়েই, তাহার পর ঔষধ, রোগ-লক্ষণ। এক এক সময় বেশ লাগিতেছে, এক এক সময় বড় অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছে—মনের সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেছে বুড়ি, ছেলেমেয়ে দুটি, চম্পা। বড় অদ্ভুত মনে হইতেছে চম্পাকে—

তাহার আবার একটি রূপ নয়, কত দিনের কত রূপেই সে আসিয়া দাঁড়াইতেছে সামনে!...মন আবার অন্য দিকে ছুটিতেছে—আনিল তো তিনটি প্রাণীকে ডাকিয়া, রাখিতে পারিবে ধরিয়া এদের দায়িত্ব?...আর একটা কথা—চম্পা বড় বেশি কাছে আসিয়া পড়িল না? বুঝিতে পারিতেছে না টুলু, অনুভূতিটা সফলতার আনন্দ, কি অনিশ্চয়তার অস্বস্তি।...বইয়ে আবার মন দিতেছে, কিন্তু বড় গোলমেলে ব্যাপার—ঔষধে ঔষধে জড়াজড়ি হইয়া যাইতেছে—শুধু কাঁপুনি, জ্বর আর গায়ের ব্যথাতে কুলাইবে না, রোগীকে আরও একরাশ প্রশ্ন করা দরকার।...কিন্তু চম্পা এমনভাবে দখল করিয়াছে জায়গাটা যে যাইতে যেন সাহস হইতেছে না, একজন দিগ্‌গজ ডাক্তারের মত গিয়া ঝুড়ি ঝুড়ি প্রশ্ন করিতেও সঙ্কোচ হইতেছে—চম্পা ঠাট্টাও করিতে পারে—কর্মের মধ্যে এই নূতন রূপে সে যেন একটু রহস্য-প্রবণও হইয়া উঠিয়াছে, টুলু গিয়া সুযোগই সৃষ্টি করিবে তো।

বই পড়িতে পড়িতে একবার কয়েকটি পায়ের শব্দে রাস্তার দিকে ফিরিয়া চাহিল, দেখে, চম্পা ছেলেমেয়ে দুইটিকে লইয়া স্কুলের দিকে যাইতেছে। একটু আগাইয়া গিয়া জানালা দিয়া দেখিল, গতিতে নূতন উৎসাহ ছেলেমেয়ে দুইটিরও—পিছন হইতে দেখা হইলেও বেশ বুঝা যায়, তাহারা এর মধ্যেই অনেকটা বদলাইয়া গেছে, যেন কাহার যাদুস্পর্শেই। উহারা স্কুলের ভিতর চলিয়া গেলে টুলু আবার ফিরিয়া বইয়ে মন দিল। তাহার পর তাহার মনে পড়িয়া গেল—এই সুযোগে বুড়িকে লক্ষণ সব জিজ্ঞাসা করিয়া আসা যাক্ না।

গিয়া দেখিল, জায়গাটিতেও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে ইতিমধ্যে। দুইটি ঘর-বারান্দা বেশ পরিষ্কার করিয়া ঝাঁট দেওয়া, নিচে খানিকটা দূর পর্যন্ত আগাছাগুলা কাটিয়া জমিটা পরিষ্কার করা। একটি মাদুরের ওপর কম্বল পাতা বিছানায় বুড়ি শুইয়া আছে, এক দিকে খুরি ঢাকা একটি কলসীতে জল।

আরামে বুড়ি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, এক ডাকে উত্তর পাওয়া গেল না। টুলু চলিয়া যাইতেছিল, আবার ফিরিল, বোধ হয় ভাবিল এমন সুযোগ পাওয়া না যাইতেও পারে। একটু জোরে ডাক দিতে বুড়ি জাগিয়া উঠিল। অনেকগুলি প্রশ্ন, তার বেশির ভাগই জটিল,—ডান দিকে ফিরিয়া শুইতে ভালো লাগে, কি বাঁ দিকে ফিরিয়া,—এই রকম সব প্রশ্নের উত্তর সুস্থ মানুষেরই পক্ষে দেওয়া

শক্ত তো একটা অথর্ব বুড়ি, গায়ে বোধ হয় একশো তিন ডিগ্রী জ্বর। তবুও খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞসা করিয়া চলিয়া গেল।

একটা রাস্তা হওয়ায় ঔষধ-নির্বাচনে এবারে বেশ মন বসিল। ধরিয়া ছাড়িয়া, ধরিয়া ছাড়িয়া, শেষ পর্যন্ত একটা দাঁড় করাইল, অবশ্য অনেকটা সময় গেল। ঔষধটা লইয়া দিতে যাইবে, দেখে, চম্পা খিড়কি দিয়া আসিতেছে, প্রশ্ন করিল—"পারলেন না একটা কিছু ঠিক করতে?"

সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ কি ভাবিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"না পেরে থাকেন, একোনাইট দেবেন—সব রোগেতেই লাগে দেখেছি।"

টুলু বলিল—"না, ঠিক করেছি একটা, চল।"

"আমাকেই দিন, খাইয়ে দিচ্ছি।"

টুলু একটু ভাবিয়া বলিল—"আমিই দিয়ে আসি চল। বুড়ি ভাববে ডেকে নিয়ে এল, তারপর দেখা নেই; ভাববে না? মানে, অসুখ-শরীরে মনটা যত ভালো থাকে ততই ভালো, নয় কি?"

"এইটুকু খাতিরের অভাবে মন খারাপ হবে না ওর, অত উঁচুদরের কেউ নয়।"

চম্পার মুখটা হঠাৎ বেশ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে, একটু কঠিনও, টুলু বিস্মিতভাবে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"তোমার যেন রাগের ভাব চম্পা, হঠাৎ কি হ'ল?

চম্পা সেইভাবে বলিল—"রাগের কথাই হয়েছে একটু—আপনি যত রাজ্যের জঞ্জাল ও-রকম ক'রে এনে জড়ো করবেন না, আর করলেও ঘাঁটাঘাটি করবেন না। ঐ একটা রোগা বুড়ি, কি রোগ তার ঠিক নেই···তখন ঐ মেয়েটাকে একেবারে প্রায় বুকে জড়িয়ে আপনি ভুলুচ্ছিলেন, কত রোগের বীজ যে ওর শরীরে আছে···সেবার বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?"

টুলু একটু চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া বলিল—"চম্পা, আমি প্রথমে যাঁদের সেবা করতাম তাঁরা নিত্য স্নান করেন, নিত্য কাচা কাপড় পরেন, নিত্য ফুলচন্দনের মধ্যে থাকেন, মাস্টারমশাই আমায় তাদের থেকে স'রে এসে এদের সেবা করতে বলেছেন, আজ আবার তুমি এদের ছেড়ে সেই চন্দনের-সাবানের

দিকে যেতে বলছ। এর বোঝা-পড়া তিনি এলে তাঁর সঙ্গেই করো' খন। আপাতত পথ ছাড়; এ কি, পথ আগলানো তোমার একটা রোগে দাঁড়াল নাকি?"

চম্পা একবার পিছন ফিরিয়া দেখিল, সে দুয়ারের সামনেই দাঁড়াইয়া আছে বটে, একটু সরিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে অতিক্রম করিয়া কয়েক পা ওধারে গিয়া টুলু ফিরিয়া বলিল—"বাঃ, তুমিও এস, দাঁড়িয়ে রইলে যে?"

চম্পা আসিয়া কতকটা নির্লিপ্ত ভাবেই বাইরের একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল।

রোগীর ঘরে আরও একটু শ্রী ফুটিয়াছে, এবারে অন্যভাবে। মেয়েটি মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে; ছেলেটি পায়ের কাছে বসিয়া আছে, বোধ হয় পা টিপিবার কাজ পাইয়াছে, কিন্তু মন বসাইতে পারিতেছে না। সেবার এই ছবিটুকু কিন্তু আরও মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে অন্য ব্যাপারে—দুইজনেই তেল মাখিয়া স্নান করিয়া পরিষ্কার হইয়াছে আর দুইজনেরই পরিধানে একখানি করিয়া আস্ত কাপড়, কতকটা পরিষ্কার। আস্ত অবশ্য সে হিসাবে নয়, নিজের কোন পুরানো শাড়ি থেকে ওদের যোগ্য করিয়া ছিঁড়িয়া দিয়াছে চম্পা। তবে সেটা আর বোঝা যায় না; তাহার বাইরের প্রমাণ এই, ছেলেটির কাপড়ের পাড়টা চওড়া।...রোগীর গায়েও সে কাঁথাটি নাই, তাহার স্থানে একটি সুজনি; পুরাতন, জায়গায় জায়গায় সূতা আলগা হইয়া গেছে কিন্তু পরিষ্কার; এটা একেবারে ধোপদস্ত।

টুলুর মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিতেছে, তিনটিকে আশ্রয় দিয়া সে বেশ একটু দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছিল মনে মনে—বিশেষ করিয়া বুড়ির অসুখের জন্য। চম্পা যে শুধু সমস্যাটা মিটাইয়া দিয়াছে তাই নয়, ঐ অসুখকে কেন্দ্র করিয়াই একটি সৌন্দর্যের পরিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছে। বেশ বুঝিল টুলু, এ ধরনের একটা কল্পনাই ওর মাথায় আসিত না।

বুড়িকে তুলিয়া ঔষধটা খাওয়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে চম্পাকে যেন একটা কথা কহিবার জন্যই বলিল—"তুমি যে উল্টো ক'রে বললে,—সোজা ক'রে বারণ করলে আমি এ ঘরে ঢুকতাম না।"

চম্পা একটু ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিল—"বুঝলাম না।"

"তোমার বলা উচিত ছিল আমার ছোঁয়াচে বরং এদের অসুখ হবার সম্ভাবনা আছে, আমার ঘরও এদের ঘরের মতন পরিষ্কার নয়। আর, নিজেও এদের কাছে দাঁড়াতে পারি না—তুমি ধুইয়ে মুছিয়ে যা দাঁড় করিয়েছ আর কি।…থাক্ এ কথা, একবার আমার ঘরে এস।"

ঘরে আসিয়া বাক্স খুলিয়া পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া বলিল—"এই পাঁচটা টাকা রাখ আপাতত, এদের খরচ।"

চম্পা হাতটা না বাড়াইয়া বলিল—"আমরা কি খাচ্ছি না এক মুঠো!—তার সঙ্গে ঐ এক কৌটা এক কৌটা দুটো পেট, বুড়ির আপাতত দু বেলা দু পয়সার সাবু।"

টুলু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—"চম্পা, তা হ'লে কথাটা বলি—আজ সকাল থেকে, মানে এদের তিন জনের ভার নেওয়া অবধি, একটা কথা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই যে, যদি এ ধরনের কাজ আমি করতে চাই তো তোমায় কাছে পাওয়া আমার একান্ত দরকার, নইলে আমার বিড়ম্বনা তো বটেই, যাদের তুলব টেনে তাদের আরও বিড়ম্বনা।"

চম্পার মনে হইল অন্তরের মধ্যে কি একটা অপূর্ব মধুর স্বাদে চোখ দুইটি যেন বুজিয়া আসিতেছে, মুখটা একটু ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—"আমি আবার কি করলাম বুঝি না তো!

টুলু নিজের কথার জের টানিয়া বলিল—"সত্যি, কাজ আমার একলায় করতে গেলে সে কাজ অচল হয়ে পড়বে, তুমিই যদি হাত দাও তবেই ভরসা। তা তুমি তো তোমারটুকু ভালো ভাবেই করছ, আমায় একবার ডেকে বলতে হ'ল না। কিছু তো ক্ষতিও হ'ল—কাপড়ে বিছানায়, তাতেও আপাতত আমি কিছু বলব না, কিন্তু টাকার অংশটাও তোমার ওপর চাপাতে পারব না, চম্পা, আমায় ব'লোও না, কেননা তাতে আমার পৌরুষে ঘা পড়বে—বুঝতেই পার এ কথাটা।…নাও, ধর।"

চম্পা হাত বাড়াইয়া টাকাটা লইল, তারপর বলিল—"একটা কথা জিজ্ঞেস করি?"

"কর।"

"অন্যায় হবে, তবুও জিজ্ঞেস করছি—আপনি টাকা পাবেন কোথায়? উপার্জনের দিকে তো ঝোঁক নেই।"

"তুমি এই একটু আগে বুড়ির মতন যত সব জঞ্জাল টেনে আনবার কথা বলছিলে। যত জঞ্জাল সব টেনে তোলবার আমার ক্ষমতা নেই, তবে এই রকম এক-আধজনকে—আরও দু-একজনকে নিয়ে চেষ্টা করতে পারি বোধ হয়।"

চম্পা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেখিয়া বলিল—"আমি ঘর-পালানো ছেলে, তবে বাপ-মায়ের খেদানো নয়, তাঁদের মায়া-মমতা আমায় ঘিরে থাকেই সব জায়গায়; বিশেষ ক'রে মায়ের। টাকার আমার অভাব হয় না ততটা, ভগবান বাবাকে ওদিক দিয়ে সামর্থ্য দিয়েছেন, বিশ্বাস করেন ব'লে আমি একটু প্রশ্রয় পাই, বিশেষ করে মায়ের কাছ থেকে।"

চম্পা চুপ করিয়া আছে।

টুলু বলিল—"জানি এর বিরুদ্ধে বড় একটা যুক্তি আছে, বাপ-মায়ের টাকা এভাবে খরচ করা মানায় না—উপযুক্ত ছেলের।"

একটু হাসিয়া বলিল—"কিন্তু যে ছেলে অনুপযুক্ত অপদার্থ, তার যে সবই মানায়, আর সবই মাপ। কি, তর্কটাতে তবুও ভুল আছে?...এর বেশি ভাবি না চম্পা।...তুমি এবার যাও। বনমালীকে একটু পাঠিয়ে দেবে।"

॥ ছাব্বিশ ॥

নারী পুরুষকে করে পূর্ণ। চম্পাও টুলুর বিষয়েও তাহাই করিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে নিজে হইয়া উঠিতেছে পূর্ণতর।—

কয়েক দিন পরের কথা। সন্ধ্যা উতরাইয়া গিয়াছে। টুলু কর্তাপাড়ার তাহার কাকার বাসা হইতে ফিরিতেছিল। সঙ্গে পোস্ট্যাল সেভিংস ব্যাঙ্কের একটা পাস-বুক থাকে ওর সর্বদা। সাধুসঙ্গে পরলোকের পথ অনুসন্ধান করিবার সময়ও ওটা দরকার হইত। বইটা আনিতে গিয়াছিল। কাকার

সঙ্গে সাক্ষাৎকারটা এড়াইবার জন্য সন্ধ্যার অল্প একটু আগে বাহির হইয়াছিল ; ঐ সময়টায়ই বিক্রয় বেশি, তিনি দোকানেই থাকেন।

যখন সেই তেমাথার কাছটায় আসিয়াছে যেখান থেকে বস্তির রাস্তাটা নামিয়া গেছে, টুলুর মনে হইল, স্কুলে বা তাহার বাসায় হঠাৎ একটা হট্টগোল উঠিল। তাহার বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল,—এতদিন যে আশঙ্কা করিয়াছিল, শেষ পর্যন্ত ফলিলই নাকি সেটা ? বেশ উঁচু হইয়া উঠিয়াছে আওয়াজটা, যেন আট-দশ জন লোকের একটা মিশ্র কলরব। ভাল করিয়া শুনিবার জন্য টুলু দাঁড়াইয়া পড়িল একটু, ভয়ে বুকের স্পন্দনটা আরও দ্রুত হইয়া উঠিয়াছে,—ম্যানেজার শেষ পর্যন্ত ঘটাইলই কাণ্ডটা ! উপরে উপরে একটা অন্য চাল দিয়া নিজেও সরে-জমিন থেকে সরিয়া পড়িয়া—টুলু বেশ যখন অসতর্ক, নিজের সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিল !···ব্যাপাটা বুঝিবার জন্য সেকেণ্ড কয়েক দাঁড়াইয়াছে, তাহার মধ্যে সমস্তটুকু পরিষ্কার হইয়া গেল।···পা চালাইয়া দিল। তিনটি স্ত্রীলোক রহিয়াছে—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—কোলের শিশু পর্যন্ত ; কি মতিচ্ছন্ন হইল তাহার যে সবাইকে এই দুর্বিপাকের মধ্যে টানিয়া আনিল !

গোলমালের মধ্যে বনমালীর গলা একটু স্পষ্ট—"নেকালো !···তুরা বেরোক হারামজাদারা ! খুনটি করে ফিলবোক।···" উত্তরে যে আওয়াজ হইতেছে সেগুলা অস্পষ্ট,—অনেকগুলো উগ্র কণ্ঠস্বর যেন জড়াজড়ি হইয়া গিয়াছে। টুলু চড়াই ভাঙিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। চিন্তার যেন জট পাকাইয়া যাইতেছে।

স্কুলের খানিকটা কাছে আসিয়া পড়িতে গোলমালটা হঠাৎ থামিয়া গেল. টুলু ছুটিয়াই আসিতেছে, দেখে, বনমালী তাহার বাসা হইতে হনহন করিয়া এই দিকে চলিয়া আসিতেছে ; শরীরটা গতির বেগেই সামনের দিকে ঝুইয়া গিয়াছে, এক-একবার ঠেলিয়া পিছন দিকে ঘুরিয়া শাসাইতেছে—"তুরা রোস্ ক্যানে··· কেমন না যাস দিখবো···মরোদকা বাচ্চা হোস তো তুরা থাকবি আমি না আসা তক, হঁ !···

টুলু ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া পড়িল, প্রশ্ন করিল—"কি ব্যাপার বনমালী ?"

বনমালী আরও রাগিয়া উঠিল, বলিল—"হইছে ব্যাপার ; [illegible]

জিগ্যেসটি করবেন না···উর কথাটিতে কান দিবেন না, ব্যাপার হবেক নাই? যান দিখেন।···হ, বাহির হবেন না, দিখি হয় কিনা বাহির!"

নিজের ঝোঁকেই ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

চম্পা গেটের পাশেই দাঁড়াইয়াছিল, মুখটা কঠিন, একটু ভিতরে ছেলে কোলে করিয়া প্রহ্লাদের বউ।

টুলু প্রশ্ন করিল—"ব্যাপারখানা কি?"

চম্পা নির্বিকার কণ্ঠে বলিল—"বিশেষ কিছু নয়,—বস্তির সবাইকে দরদ দেখিয়ে বাসায় তুলেছেন, বাসা বস্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে; নতুন কথা কিছু নয়।"

মুখটা একটু ঘুরাইয়া লইল। প্রহ্লাদের বউয়ের দিকে চাহিতে সে কোন উত্তরই দিল না। চম্পাই আবার বলিল—"যান, দেখুন এর পরেও যদি থাকে শখ।"

অন্তরের একটা যেন তীব্র বিতৃষ্ণায় ধীরে ধীরে ভিতরের দিকে পা বাড়াইল।

ওদিকে সব চুপচাপ। টুলু বিমূঢ় ভাবে অগ্রসর হইল। গিয়া দুয়ার ঠেলিয়া দেখে ভিতর হইতে বন্ধ, এদিকে সুরার উগ্র গন্ধে সমস্ত জায়গাটা ছাইয়া গিয়াছে, হাঁকিল—"কে দোর দিয়েছে?—খোল দোর।"

ভিতর হইতে দুইটি গাঢ় জড়িত কণ্ঠে উত্তর হইল—"কে বটে?···কোন্ হায়?"

চেনা গলা, টুলু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিল—চরণদাস নেশা করিয়া আসিয়াছে। এখানে আসিয়া অবধি সে এক দিনও নেশা করে নাই। হয়তো যাপিকসই একটু করিয়া খনিতেই তাহার প্রভাবটা মিটাইয়া লইয়া বাসায় আসে। হয়তো চম্পা খুব চোখে চোখে রাখিতেছিল, কিংবা হয়তো চক্ষুলজ্জার খাতিরে পড়িয়া প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিতেছিল, আজ আর পারে নাই। টুলুও একটু ভাবিল, তাহার পর নরম গলাতেই হাঁকিয়া বলিল—"কে, চরণ? দোরটা খোল তো একবার।"

কয়েকবার হাঁকাহাঁকি করিয়াও আর উত্তর নাই। শেষে রাস্তার ধারের ঘরের জানালা পথে সাড়া পাওয়া গেল,—ঠিক উত্তর নয়, একটা গম্ভীর গলাখাঁকারি। টুলু ঘুরিয়া দেখে, জানালার গরাদে ধরিয়া অন্য একটা লোক

মাথা নিচু করিয়া অল্প অল্প টলিতেছে, খনির কাপড় পরা, সর্বাঙ্গে কয়লার ছোপ। টুলুর সেকেণ্ড কয়েক বাকস্ফূর্তি হইল না, তাহার পর বলিল—"দোরটা খুলে দাও একবার।"

লোকটা মাথাটা একটু তুলিল, চোখ চাড়া দিয়া চাহিবার চেষ্টা করিয়া বলিল —"কি দরকারটি আছেঁ?"

"এটা আমার বাসা।"

আর একজন আসিয়া উপস্থিত হইল টলিতে টলিতেই; প্রথম লোকটার হাতে একটা টান দিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"চল্ ক্যানে, সর্দার ডাকছেঁ।"

টুলু জানালার দিকে একটু সরিয়া আসিয়াছে, লোকটা তাহার দিকে একটু চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"কে, কোন হ্যায়?"

টুলু বলিল—"আমার বাসা এটা, বলছি—দোরটা খুলে দাও।"

প্রথম লোকটা ঘাড় নিচু করিয়া শুনিতেছিল, একেবারে খাপ্পা হইয়া উঠিল, দুই হাতে গরাদে চাপিয়া বিরক্ত কণ্ঠে বলিল—"আমি যা বুল্ছিঁ তার জবাব দেও ক্যানে—কি দরকারটি আছেঁ—না, আমার বাসাঁ আমার বাসাঁ!...কথাটি বুঝবেক নাই!"

বনমালী গনগন করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতে একটা লাঠি, নূতন সাজানো-গোছানোর গোলমালে বোধ হয় সেইটিই খুঁজিয়া বাহির করিতে বিলম্ব হইয়া গেছে; আসিয়াই সামনের লোকটার হাত গরাদেসুদ্ধ চাপিয়া ধরিয়া লাঠিটা উঠাইল। টুলু ক্ষিপ্রগতিতে তাহার ডান হাতটা ধরিয়া ফেলিল এবং তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিল "লাঠি রেখে এস বনমালী; দাও, বরং আমার হাতে দাও।

একরকম জোর করিয়াই কাড়িয়া লইল। লাঠি হাতে আসায় বনমালী যেন আরও ক্ষেপিয়া গিয়াছিল, কাড়িয়া লইলেও একজন যুবার মতোই লাফাইতে লাফাইতে হুঙ্কার করিতে লাগিল—"আমি খুনটি করবোক—মাস্টারমশাই আমার জিম্মায় বাসাঁটি দিয়া গেছেন—উরা সরাব আনলেক—আমি খুনটি করব বটে... উরা আমার ঠাকুর-ঘরে সরাবটি এনে তুললেক!"

ঘরের মধ্যে আরও জন-চারেক আসিয়া দাঁড়াইল, সবার পিছনে চরণদাস।

সেদিনকার মতো মুখ গুঁজড়াইয়া পড়িবার অবস্থা না হইলেও, খুব অপ্রকৃতিস্থ, টুলু শান্তভাবেই ডাকিল—"এই যে চরণদাস, একবার এদিকে এস না।"

বনমালী ওদিকে সমানে হুঙ্কার ছাড়িয়া যাইতেছে।

চরণদাস টলিতে টলিতে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। টুলু বলিল—"দোরটা খোল একটু। আজ এ কি কাণ্ড চরণ? তুমি নিজে রয়েছ, অথচ এরা করছে কি?"

চরণ স্থির দৃষ্টিতে বনমালীর উল্লম্ফন দেখিতেছিল, হাতটা উঁচাইয়া টুলুকে থামিতে ইশারা করিল, একটু পরে বলিল—"আপুনি রন ক্যানে, দোর খুলবোক; বুড়ার তড়পানিটা একটু দিখি—কত তড়পাতে পারে উ।"

দলের সবাইকে বলিল—"তুরা চুপ ক'রে দেখ্ উর তামাশাটি; কথাটি বুলিস না।"

মাতালের নানা ভঙ্গী, আগের বারে হৈ-হল্লা খুব করিলেও এবারে কি ভাবিয়া সবাই একেবারে নিশ্চুপ হইয়া নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়াইয়া টলিতেছিল, চরণদাসের হুকুমে সাধ্যমত বনমালীর দিকে দৃষ্টিটা তুলিয়া রাখিয়া গভীর অভিনিবেশের সহিত 'তামাশা' দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বনমালীকে সরাইতে পারিলে বোধ হয় একটা সুরাহা হয়, কিন্তু তাহাও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, টুলু কয়েকবার বারণ করিলেও নড়িল না; উহারা কিছুমাত্র না বলিয়া 'তামাশা' দেখিতে থাকায় যেন আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এই ভাবেই খানিকটা গেল; চরণ দোর খুলিতে রাজি হয়, কিন্তু তড়পানি দেখা বন্ধ করিয়া নিজেও অগ্রসর হয় না, কাহাকে দেয়ও না অগ্রসর হইতে।··· টুলুরও মনে হইল যেন ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিবার উপক্রম হইয়াছে।

এমন সময় প্রহ্লাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার আজ খনি হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, হৈচৈ শুনিয়া ফটকের মুখে চম্পা আর নিজের স্ত্রীর নিকট তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া পা চালাইয়া আসিয়া পড়িল এবং টুলুর হুকুমে অনেক কষ্টে বনমালীকে সরাইয়া স্কুলের দিকে লইয়া গেল।

এদিকটা শান্ত হওয়ার পর চরণ বলিল—"হুঁ, খুলবোক, আপুনির জন্তে খুলবোক নাই ক্যানে ? রন, একটু বুঝি উ এত তড়পায় ক্যানে !"

তড়পানোর রহস্য বুঝিতে বেশ আরও একটু বিলম্ব হইল, তাহার পর চরণদাস টলিতে টলিতে গিয়া তুয়ারটা খুলিয়া দিল। কিন্তু তখন আর তাহার দাঁড়াইবার মত অবস্থা নাই, হুড়কাটা টানিয়াই তালগোল পাকাইয়া চৌকাঠের গায়ে পড়িয়া গেল ; তুয়ার ঠেলিয়া টুলু তাহার ঘাড়ে পড়িতে পড়িতে কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। যাই হোক, কোন রকমে মিটিল ব্যাপারটা। এক এক করিয়া সবাই চরণদাসের মতো জমি লইল।

বনমালীকে রাজি করানো গেল না কোনমতেই। প্রহ্লাদকে লইয়া টুলু সবাইকে টানিয়া টানিয়া ওদিককার ঘরের বারান্দায় শোয়াইয়া দিল।

নিজের ঘুমাইতে বেশ বিলম্ব হইল। মেহনত হইয়াছে, অপরিসীম ক্লান্তি, কিন্তু সমস্ত ঘটনাটুকুর গ্লানি ক্লান্ত চক্ষুর নিদ্রাকে ক্রমাগতই ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিতে লাগিল।

পরদিন পোস্ট-আফিসে গিয়া কিছু টাকা বাহির করিল। ফিরিল বস্তির মধ্য দিয়াই। লোকে আরও একটু চিনিয়াছে, অনেকে আবার নূতন তুইটি পরিবারের সম্পর্কে স্কুলে যায়,—অভিবাদন কুড়াইতে, প্রশ্নের উত্তর দিতে আরও দেরি হইয়া গেল। বস্তির শ্রী সেই রকমই,—সেই নোংরা, সেই কলতলার ভিড়, তবে এবার একটা নূতন ব্যাপার এই যে টুলু যেমন অগ্রসর হইতে লাগিল ঝগড়া আর গালি-গালাজের কণ্ঠ সবার নরম হইয়া আসিতে লাগিল ; অনেক স্থানে নরম হইয়া নীরবও হইয়া গেল। এই সম্ভ্রমটুকু লাগিল বড় মিষ্ট। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কয়েকজন বয়স্থগোছের লোকের সঙ্গে একটু আলাপও করিল—নিত্যকার দরকারী কথার কিছু কিছু, আবার অদরকারী কথাও—এই নূতন জগতের পরিচয়ের আনন্দটুকু সঞ্চিত করিয়া লওয়া। একটু লজ্জায়ও পড়িয়া গেল,—ভিখারিণীকে যে আশ্রয় দিয়াছে সে সংবাদটুকু বস্তিতে চারাইয়া পড়িয়াছে। তাহারা নিজেরা বিশেষ কিছু করে নাই বোধ হয়, তবে ঐ যে উপর থেকে নামিয়া টুলু তাহাকে তুলিয়া লইয়াছে—তাহাদেরই একজনকে, তাহাতে তাহাদের সবার অন্তরই কৃতজ্ঞতায় উঠিয়াছে ভরিয়া।

কেহ প্রকাশ করিল বাক্যে, কেহ বাক্যের সমর্থনে একটু হাসি দিল, কেহ মাত্র সস্মিত একটু চাহনি। সঙ্কোচ হয়, কিন্তু আন্তরিকতায় পুষ্ট বলিয়া লাগে বড় চমৎকার।

যেন সেই দ্বিতীয় দিনে বস্তিতে আসার জের ধরিয়াই টুলু সোজা স্কুলে না গিয়া ঘুরিয়া বটতলায় আসিয়া বসিল। একটু পরিবর্তন হইয়াছে, দলটা একটু পাতলা, মেয়ে একেবারেই নাই। টুলুর মনে পড়িল দলের গুটিচারেক মেয়ে এবং নিতান্ত যাহারা ছোট এই রকম দু-তিনটি ছেলে বৈকাল হইলে স্কুলে গিয়াই জোটে আজকাল। স্কুল হইতে বাহির হইয়াই রাস্তার ধারে একটা মহুয়া গাছ আছে, বুড়ির নাতি-নাতনিকে ডাকিয়া ওদের আলাদা একটি দল হয় তাহার নিচে।···এখানকার ভাঙন ওখানে একটি সৃষ্টির সূত্রপাত করিয়াছে।

ঐটুকুকে আশ্রয় করিয়া মনটা স্কুলে গিয়া পড়িল; বেশ গুছাইয়া ভাবিবার জন্যই টুলু বেশ ঘন ছায়ায় একটা শিলাখণ্ডের উপর গিয়া বসিল।

হাঁ, এইবার যেন আরম্ভ হইয়াছে একটু কাজ। চম্পা আসিয়াছে আজ বুঝি সাত দিন হইল, বুড়ি আসে দিন দুয়েক পরে, একটা পরিবর্তন আসিয়াছে বইকি। আজ শান্ত বনচ্ছায়ায় এই নিরিবিলিতে বসিয়া বোধ হয় প্রথমবার সমস্ত ছবিটুকু একটি সুসমঞ্জস দূরত্বে দেখিতে পাইল টুলু: বুড়ি ভালো হইয়া উঠিয়াছে; চম্পা তাহার ঔষধের বাহাদুরি দেয়, হয়তো পড়িয়া গেছে ঠিক ঔষধটা, অন্তত এটা তো ঠিক যে, ঔষধ ইহাদের পেটে বড় একটা পড়ে না বলিয়া লাগে বড় শীঘ্র। ভালো হইয়াছে বুড়ি শুধু শরীরের দিক দিয়াই নয়, ওর একটি চমৎকার রূপ ফুটিয়াছে মনেরও,—শুধু ওরই নয়, ছেলেমেয়ে দুটিরও; এই সচ্ছলতায় আর মানুষের মধ্যে মানুষের মতো ব্যবহার পাইয়া এই সামান্য কয়টি দিনেই ওদের উপর থেকে সেই দীনতা, সেই গ্লানি, সেই নিজের মধ্যে গুটাইয়া থাকার ভাব নিঃশেষে মিটিয়া গিয়াছে। তিন জনেই বেশ একটি মুক্ত সহজ মনুষ্যত্বে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। বড় আশ্চর্য বোধ হয়—সেই একই মানুষ, পাঁচটি দিনের এদিক-ওদিকে কত তফাত! মাত্র একটু মানুষের মত থাকিতে পাইয়াছে বলিয়া।···পরশুকার কথা মনে পড়িল। সন্ধ্যার

সময় টুলু কাঞ্চনতলাটিতে বসিয়া ছিল, কি মনে করিয়া বনমালী আসিয়া বসিল। কোন কারণ নাই, শুধু বলিল—"মাস্টারমশাইও সন্ধ্যার সময় বসতেন এই জায়গাটিতে।" যেমন ভাবে ধীরে ধীরে আসিয়া বসিল, টুলু বুঝিল জায়গাটির মোহ ওকেও আকৃষ্ট করে। গঞ্জডিহির পুরানো গল্প হইল। খেলার পর ছেলেমেয়ে দুটিও একটু কুণ্ঠিত ভাবে আসিয়া বসিল, দুটিই টুলুর নিতান্ত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে, বিশেষ করিয়া মেয়েটি—বড় স্নিগ্ধ স্বভাব। টুলু বলিতেই তাড়াতাড়ি বুড়িকেও হাত ধরিয়া লইয়া আসিল। এই যে সমাবেশ, এটাকে যেন পূর্ণতা দিবার জন্যই টুলু কথায় কথায় মাস্টারমশাইয়ের প্রসঙ্গ আনিয়া ফেলিল। বনমালী হইয়া উঠিল মুখর, উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় তাঁহার একটি ধ্যান-রূপকে যেন সবার মাঝখানটিতে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল। তাহার পর এক সময় আসিল চম্পা। ঠাকুর-দাদাকে বলিল—"তু এখানে? আমি চারিদিক খুঁজে মরছি।" ঠাকুরদাদা বলিল—"তু বোস্ ক্যানে একটু, সারাদিন চরখি ঘুরছিঁস! দুটো ভাল কথা শোন্ ব'সে।" চম্পা উত্তর করিল—"তুর মতন বসলে যেন আমার চলে!"… তবুও বসিল খানিকক্ষণ, বেশ বোঝা যায় বসিবার জন্যই একটা ছুতা করিয়া আসা; তাহার পর একবার বাসার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—"এখনও আলো জ্বালিস নাই ঘরে? দিখো কাণ্ডটি!"—বলিয়াই তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল।

এই নূতন ব্রতে চম্পাই টুলুর হাতে আসিয়া পড়িয়াছে সর্বপ্রথম,—সেই জন্যও, আর সবার মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট বলিয়াও চম্পার প্রত্যেক গতিবিধির উপর টুলুর দৃষ্টি গিয়া পড়ে। বড় পবিত্র বোধ হয় ওকে, একটি শতদল যেন ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে,—মনে হয়, চম্পা যেন টুলুর ধারণাকেও ছাড়াইয়া যাইতেছে। এমন সামঞ্জস্যবোধ টুলু যেন আর কোথাও দেখে নাই। টুলু তার প্রথম শিষ্যার মন বোঝে,—ও চায় টুলুর সেবা করিতে, কিন্তু এই নূতন ব্যবস্থার পর সন্ধ্যার এদিকে এই প্রথম এ বাসায় পা দিল,—যেন সেবার পথ খুঁজিতেছিল, ঘরে আলো জ্বালা না হওয়ায় একটা অছিলা পাইয়া বাঁচিল।

এই চিত্রের পাশেই ফুটিয়া উঠিল কালকের চিত্র। কতদিন সংযত থাকিয়া যেন নিজের এবং আর সবার ওপর [illegible] চরণদাস মাস্টারমশাইয়ের

বাসাটা একেবারে ভাটিখানা করিয়া তুলিল। টুলুর মনটা বিষণ্ণ হইয়া উঠিল—কোন উপায়ই নাই ?

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ছেলের দল তাহাদের গরু-ছাগল লইয়া বটতলা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যা বেশ ঘনাইয়া আসিল। চিত্তের ওটুকু কালিমা মুছিয়া ফেলিবার যেন কোন উপায়ই দেখিতেছে না টুলু। অনেকক্ষণ গেল, মনে ক্রমে যেন একটা অবসাদ আসিয়া পড়িতেছে। কোন উপায়ই কি নাই ? তাহার পর একসময় চিন্তার মধ্যেই হঠাৎ শিলাসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

ঐ চম্পারই কথা মনে পড়িয়া গেছে। চম্পাই পারিবে।

তাড়াতাড়ি বাসার দিকে অগ্রসর হইল।

একবার প্রবেশ করিয়া চম্পা কায়েমী ভাবেই ঠাকুরদাদাকে বেদখল করিবার মতলব করিয়াছে। টুলুর বাসায় ঝাঁটপাট দিয়া আলো জ্বালিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল, দরজার মুখে দেখা হইল। টুলু উৎসাহের ঝোঁকে তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া আসিয়াছে, অল্প অল্প হাঁপাইতেছে, বলিল—"তোমাকেই খুঁজছিলাম চম্পা—কালকের ব্যাপার সম্বন্ধে—কাল রাত্তিরে যে…"

ওর বাপের সম্পর্কে কথাটা বলিতে গলায় যেন আটকাইয়া গেল।

চম্পা পূরণ করিয়া দিল—"নেশা ভাঙ ক'রে যা করলে সব ?"

তাহার পর বোধ হয় টুলুর বিপর্যস্ত ভাব দেখিয়া একটু হাসিয়াই বলিল—"ও তো আবার করবে—আপনার উপকারের নেশা না ভাঙা পর্যন্ত।"

টুলু বলিল—"না, ও যাবে, আমি উপায় ঠাওরেছি।"

"কি ?"

"তুমি।"

"আমি !…বুঝতে পারলাম না।"

টুলু একটু চুপ করিল, তাহার পর যেন গুছাইয়া লইয়া বলিল—"একদিন মাস্টারমশাই আমায় বলেছিলেন, পরে আমিও মিলিয়ে দেখলাম—যতদিন ওকে খনির ঐ কানা গলির মধ্যে কাজ করতে হবে ততদিন নেশা ওকে করতেই হবে চম্পা, ওই ভীষণ মেহনতের শক্তি ওর আর নেই এ বয়সে। এখন দরকার ওকে ঐখানে থেকে সরিয়ে অন্য কাজ দেওয়ানো—একটু হালকা কাজ।"

চম্পা এবার একটু চুপ করিয়া মাথা নিচু করিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল—"আমি কি কাজ দেওয়াবার মালিক?"

কোথায় যেন একটা আঘাত লাগিয়াছে তাহার। টুলুর কিন্তু সেদিকে মোটেই দৃষ্টি গেল না, নিজের ঝোঁকেই বলিয়া গেল—"তুমি ব'লে-ক'য়ে দেওয়াতে পার—ম্যানেজার নেই, তুমি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারকে দিয়ে ব্যবস্থা করাতে পার।"

"আমার কথা শুনবে কেন?"

সোজা মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

সেই প্রথমবার চম্পাকে খনির মধ্যে দেখা,—একটা গলির মাঝখানে একটা উল্টানো বেতের চুপড়ির উপর পা দিয়া চম্পা অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার পরেশের সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া লঘুভাবে গল্প করিতেছে, সেই জোরেই টুলুর মনে উদয় হইয়াছে কথাটা। এতক্ষণ চরণকে ফিরাইবার একটা উপায় আবিষ্কারের আনন্দে ছিল বিভোর, এদিকে গিয়া কিন্তু তাহার কদর্যতায় মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। সম্বিৎ ফিরিয়া আসিয়া এমনই অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে, চম্পার দৃষ্টি থেকে মুখটা কি করিয়া ফিরাইয়া লইবে যেন বুঝিতে পারিতেছে না। শেষে চম্পাই কথা কহিল, একটু হাসিয়াই বলিল—"আপনি অমন হয়ে গেলেন কেন? যাব আমি, অবশ্য দেওয়াতে পারব কি না বলতে পারি না, তবে চেষ্টা করতে দোষ কি?—যদি মনে করেন, একটু হালকা কাজ পেলে বাবার বদ অব্যেসটা যেতে পারে।... সরুন, যান ভেতরে আপনি।"

আরও একটু গা-ঢাকা-গোছের হইলে চম্পা গিয়া পরেশের সঙ্গে দেখা করিল। পরেশ রাজি হইল বেশ সহজেই, বরং বেশ আগ্রহের সহিতই! আজকাল চম্পার ভাবটা একটু অন্য রকম—আসেও কম, থাকেও অল্পক্ষণ, একটু উপকার করিতে পারিয়া যেন বাঁচিল পরেশ। আপাতত দিন-কয়েকের জন্য অন্যত্র কাজ দিবে, ম্যানেজার আসিলে পাকা ব্যবস্থা করিবে।

সকালবেলা, দশটা প্রায় হইয়াছে। টুলু একটা হোমিওপ্যাথি বই পড়িতেছিল—একটু-আধটু চর্চা করে আজকাল। চম্পা আসিয়া তাহার নিজের পদ্ধতিতে দুইটি হস্ত পিছনে দিয়া দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল; টুলু মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে

চাহিতে বলিল—"রাজি হয়ে গেল। ট্রাকে কয়লা তুলে দেবার কাজ দিয়েছে।"

টুলু বলিল—"সে তো খুব সহজ কাজ।"

"হ্যাঁ, সবচেয়ে সহজ এইটেই ; বিশেষ করে বাবার পক্ষে তো বটেই—এত শক্ত কাজের পর।

"দিলে যে একেবারে এত সহজ ?"

কথাটা বলিয়াই টুলুর হুঁশ হইল ; বেশ খানিকক্ষণই আর কিছু বলিতে পারিল না। চম্পাও চুপ করিয়া রহিল। টুলু বড়ই অস্বস্তিতে পড়িয়া গিয়াছে, কাল চম্পাকে কথাটা বলা পর্যন্ত ভীষণ অশান্তিতে কাটিতেছে ওর। চম্পাকে কিছু বলিয়া ওটুকু ক্ষালন করিয়া লইবার সুযোগ খুঁজিতেছে, কিন্তু এতক্ষণ পায় নাই। বোধ হয় ঐ ধরনেরই কিছু বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার সময়ের দিকে খেয়াল হইল, বলিল—"দশটা বাজে, এখনও খনিতে যাওনি যে ?"

চম্পা মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"না, গেলাম না ; আর যাব না ভাবছি···ঠিকই করেছি, আর যাব না।'

টুলু বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিল—"কেন ?"

চম্পা সেই ভাবে হাসিয়া বলিল—"এত বড় উপকার চেয়ে নেবার পর আর মান-সম্ভ্রম নিয়ে দাঁড়ানো যাবে ওদের সামনে ?—জানেনই তো সবাইকে আপনি।'

টুলুর বিস্ময়ের যেন শেষ নাই, তাহার উপর অনুতাপের স্বরে বলিল—"এ কি হ'ল !—তুমি কাজ ছেড়ে দিয়ে এলে—আমার কথায় ?...তোমার কষ্ট হবার কথাই চম্পা, আমি কেমন না বুঝেই তোমায় পরেশবাবুর কাছে চেষ্টা করতে বলি—ব'লে ফেলিই বলা ঠিক—তার পর সত্যিই তুমি কি ভীষণ আঘাত পেয়েছ জেনে তখুনি যাই আমি ও-বাসায়, শুনলাম, তুমি বাইরে কোথায় গেছ, তার পর থেকে সমস্ত রাত···"

চম্পার হাসিতে এবার একটু অন্য ধরনের আলো ফুটিল, বলিল—"আপনার কথায় মনে হচ্ছে ভেবে নিয়েছেন—আমি রাগে বা আক্রোশে কাজ ছেড়ে দিয়ে এলাম। তা তো নয়—অনেক দিকেই যেমন চোখ খুলে দিয়েছেন, এদিকটাও

তেমনই দিলেন খুলে। নিত্যি কী অপমান ঘাড়ে ক'রে যে আমার কাজ তা তো আমারই বোঝা উচিত ছিল। বাকি থাকে পেট চলার কথা,—তা বাবা যদি শোধরায় তো একটা মেয়ের পেট চালিয়ে নিতে আর পারবে না?...তা ভিন্ন কাজ যে ছেড়ে দিয়েই এলাম একেবারে এমনও তো নয়। যাচ্ছি না—বলেন যেতে, যাব!"

মুখের দিকে একটু চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—"কিন্তু সত্যিই কি আপনি আর বলবেন?"

॥ সাতাশ ॥

কয়েক দিন পরের কথা। বোধ হয় অতিরিক্ত তদারকের ঝোঁকেই চম্পার সন্দেহ হইয়াছে যে, ঠাণ্ডা লাগিয়া হীরকের অতিরিক্ত রকমের কিছু একটা হইয়াছে, যে কোন মুহূর্তেই বিপদ ঘটিতে পারে। বুড়ি টোট্‌কা-টুট্‌কিতে খুব দুরস্ত, তাহারই ফর্দ অনুযায়ী বনমালী বেনের দোকান হইতে গাদাখানেক শিকড়, শুকনো পাতা আর গাছের ছাল কিনিয়া আনিয়াছে। সেগুলা বাঁধা ছিল একটা আস্ত খবরের কাগজে, হাতে হাতে সেটা কি করিয়া টুলুর বারান্দায় আসিয়া পড়ে।

টুলুর নজরে পড়িতে তুলিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, এই পাণ্ডববর্জিত দেশে ও জিনিসটা দুর্লভই। বহুদিন পরে চলমান জগতের সঙ্গে একটা যোগসূত্র অনুভব করিতে করিতে টুলু অলসভাবে এক ধার হইতে পড়িয়া যাইতেছিল, একটা জায়গায় আসিয়া তাহার দৃষ্টি যেন আটকাইয়া গেল: কাতরাসগড় অঞ্চলে খনির কুলিদের বড় রকমের ধর্মঘট হইয়া গেছে—কিছু খুনজখম হইয়াছে, এবং আশঙ্কা আছে যে ব্যাপারটা শীঘ্রই ঝরিয়া আর রাণীগঞ্জ অঞ্চলের স্থানে স্থানে ছড়াইয়া পড়িবে। উপরের তারিখটা দেখিয়া টুলু বুঝিল কাগজটা টাটকা। টুলুর ভ্রূ-যুগল অল্পে অল্পে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, সংবাদস্তম্ভে এ বিষয়ে আর কিছুই নাই, তবু এই সূত্রটুকু ধরিয়াই তাহার মাস্টারমশাইয়ের কথা যেন বড় বেশি করিয়া মনে পড়িয়া যাইতে লাগিল। মাস্টারমশাইয়ের অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে এ ব্যাপারটার

কোন সম্বন্ধ থাকা সম্ভব কি? ভাবিয়া দেখিলে অসম্ভব নয়, তবু এত বড় একটা ব্যাপক কাণ্ড যে তিনি কি করিয়া ঘটাইতে পারেন যেন মাথায় আসে না। শুধু তাহাই নয়, একটা বেদনাও অনুভব করে টুলু—মাস্টারমশাই এমন একটা ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন, যাহার পরিণামে খুনজখমও আসিয়া পড়ে! সেই নিরীহ, শান্ত প্রকৃতির মানুষ, মুখে না হয় আবেগের মাথায় আসিয়াই পড়িত এখানকার রাষ্ট্র-সমাজ-ধর্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু উগ্র মন্তব্য, তাই বলিয়া হাতে-কলমে এমন একটা কাণ্ড ঘটাইয়া বসিবেন, যাহার পরিণাম নরহত্যা! টুলু নিজের মনের সঙ্গে তর্ক করে, যেন মাস্টারমশাইয়ের হইয়া ওকালতি করিতেছে,—কই, একটু-আধটু উগ্র মন্তব্য মাঝে মাঝে করিলেও এমন তো কিছু বলেন নাই যাহাতে তাঁহাকে এ মানুষ বলিয়া সাব্যস্ত করা যায়। খনির অভিজ্ঞতার সেই প্রথম দিনের কথা—টুলুই বরং ধ্বংসের কথা তুলিয়াছিল, প্রশ্ন করিয়াছিল—'ওগুলো বুজিয়ে দেওয়া যায় না মাস্টারমশাই?' উত্তরে মাস্টারমশাই বলিয়াছিলেন—'যদি সম্ভব হ'তই, তবু উচিত হ'ত না টুলু।...সভ্যতার চাকা পেছন দিকে ঘোরাতে যাওয়া অস্বাভাবিক, আর সেই জন্যে বোধ হয় পাপও!' আরও মনে পড়ে টুলুর; বলিয়াছিলেন—'এবার দুঃখ দিয়ে তোয়ের মন্দিরে দেবতা-প্রতিষ্ঠার সময় এসেছে—আনন্দ-দেবতার।'...না, ভাঙনের মন্ত্র মাস্টারমশাইয়ের মুখের মন্ত্র নিশ্চয় নয়। তাহার পর চিঠিতে টুলুকে যে কাজের নির্দেশ দিয়াছিলেন সে সবই মাত্র শান্ত নিরুপদ্রব সেবার উপদেশ। তাহাতে সংঘর্ষের কথা যে না ছিল এমন নয়, কিন্তু সে তো সম্পূর্ণ অন্য ধরনের সংঘর্ষ। এই লোক ক্ষেপাইয়া অযথা কাজ অচল করিয়া তোলা নয়—এটা পুরাপুরি জানিয়াও যে যাহাদের ক্ষেপাইয়া তুলিলাম, শেষ পর্যন্ত পরিণামটা তাহাদেরই পক্ষে হইয়া পড়িবে সবচেয়ে মারাত্মক।...টুলুর স্বভাব-কোমল মনে বেদনা জাগে—যখন যাহা বলিয়াছেন সে সব হইতে বাছিয়া বাছিয়া নিজের মনের কাছে সপ্রমাণ করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া যায়—না, মাস্টারমশাই ও-ধরনের মানুষ নয়। খুনজখম? —মাস্টারমশাই আছেন তাহার মধ্যে?—না, অসম্ভব...

সমস্ত দিন তর্ক চলিল, বাছা বাছা প্রমাণ দিয়া মনটাকে শান্তও করিল টুলু। তাহার পর খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরিয়া সন্ধ্যার একটু পরে যখন বাসায়

ফিরিল, দেখে বারান্দায় একটি লোক বসিয়া আছে। টুলুকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে প্রশ্ন করিল—"আপনার নাম টুলুবাবু?"

টুলু উত্তর করিল—"হ্যাঁ।"

"ভালো নামটা…"

"নিতাইপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

লোকটি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কি যেন মিলাইতেছিল, বলিল—"আপনার একটা চিঠি আছে।" পকেট হইতে একটা খাম বাহির করিয়া হাতে দিল। টুলু প্রশ্ন করিল—"কার চিঠি?"

উত্তর হইল—"ঘরের ভিতরে গিয়ে প'ড়ে দেখুন, আমি ততক্ষণ বসছি এখানে।"

কেমন যেন একটু খাপছাড়া কাণ্ড। মুখের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া টুলু ভিতরে চলিয়া গেল। খামটা বড়, ছিঁড়িয়া দেখিল, চিঠিটাও বড়—চিঠির কাগজের পাঁচখানা পাতা জুড়িয়া লেখা; প্রথমেই শেষের পাতাটা উল্টাইয়া দেখিল, লেখক মাস্টারমশাই। আগ্রহের সহিত পড়িতে লাগিল—

স্নেহাস্পদেষু,

আমার আচরণে আমি নিজেই অস্বস্তি বোধ করছি, কিন্তু কোন উপায় ছিল না, একবার মুখ্যুমি ক'রে আমায় অতিরিক্ত সাবধান হয়ে পড়তে হয়েছে; আমার প্রথম চিঠির কথা বলছি, নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। সেটা যে কোথায় পৌঁছেছে এবং কি অবাঞ্ছনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছে, আমি কতক কতক টের পেয়ে বাকিটা আন্দাজ ক'রে এখনও আতঙ্কিত হয়ে রয়েছি, অবশ্য তোমার জন্যে। ওর পরে আর ডাকের হেফাজতে ছেড়ে দেওয়া চলত না কোন চিঠিকে, অথচ এমন একজন নির্ভরযোগ্য লোক পাচ্ছিলাম না, যাকে এমন একটা দায়িত্ব দিয়ে এতদূর পাঠানো যায়। আরও ঠিক ক'রে বলতে গেলে বলতে হয়—লোক ছিল, তবে বাড়তি লোক ছিল না, যে কয়জন ছিল তাদের এ তল্লাট থেকে নড়বার উপায় ছিল না একটা দিন।

অথচ তোমায় বলবার কত কথা!—পেট ফুলছিল আমার। শিক্ষা, সংস্কার বা তোমার মনের স্বাভাবিক প্রবণতা—যে জন্যই হোক তুমি একটা রাস্তা ধ'রে

চলতে আরম্ভ করেছিলে। আমি তোমায় সেই রাস্তা থেকে টেনে নিয়ে এসেছি। তোমায় ধর্মান্তরিত করেছি বললেও ভুল হয় না। কি জন্যে এমন করা সেটা তোমায় ভালো ক'রে জানিয়ে দেবার সময় এসেছে। তোমায় মাঝে মাঝে যে সব কথা বলেছি, যে সব তর্কবিতর্ক হয়েছে আমার সঙ্গে, আমার পূর্বেকার চিঠিতেও যে কথা লিখেছি, সে সব থেকে তোমার একটা ধারণা দাঁড়িয়েছেই— আমি কি প্রত্যাশা করি তোমার কাছ থেকে। কিন্তু সে ধারণাটা অসম্পূর্ণ হবার সম্ভাবনা আছে, অর্থাৎ এই মনে ক'রে তুমি ব'সে থাকতে পার যে, তুমি নিরীহ, নিরুপদ্রব সেবাধর্মে পাকা হয়ে উঠলেই আমার মনের অভিলাষ পূর্ণ হবে; আমি সন্তুষ্ট হব। এই রকম একটা অসম্পূর্ণ ধারণা থাকার কারণ এই যে, আমার সম্বন্ধেই তোমার ধারণাটা অসম্পূর্ণ, সেই জন্যে আমার পরিচয়টা একটু পূর্ণতর করিয়ে দিয়ে আরম্ভ করি।

'পূর্ণতর' কথাটা আমি জেনে-শুনেই ব্যবহার করলাম, কারণ আমার সম্পূর্ণ পরিচয়টা আজও দিতে পারব না, একটু রেখে-ঢেকে দিতে হবে, কিংবা হয়তো দেওয়া নাও দরকার মনে করতে পারি, তবে তার জন্যে কিছু এসে যাবে না।

টুলু, আমি আমার নিজের চেহারাটা আর প্রকৃতিটা মনশ্চক্ষুর সামনে দাঁড় করিয়ে দেখছি। শুষ্ক শীর্ণ, বড় বড় চুলের ছায়ায় মুখটাতে একটা শান্তভাব; গায়ের রঙটা গৌর, কিন্তু তাতে উজ্জ্বলতার উগ্রতা নেই—এই হল আমার চেহারা। প্রকৃতির দিক দিয়ে আমি হাস্যপ্রবণ, কড়া কিছু বলতে গেলে সেটাকে রহস্যের সঙ্গে জড়িয়ে হাল্‌কা ক'রে ফেলি অনেক সময়। এক-একবার লোকের কাছে কিংবা নিজের মনের কাছে হঠাৎ জ্ব'লে উঠে কিছু একটা ক'রে বসি— যেমন এই রকমই একবার জ্ব'লে ওঠবার ঝোঁকে তোমায় ধর্মান্তরিত করেছিলাম; কিন্তু মোটের উপর বাহিরে বাহিরে আমি শান্ত। এমন লোক যে নিরীহ সেবার বেশি কিছু প্রত্যাশা করতে পারে সহসা এমন খেয়াল আসতেই পারে না মনে। কিন্তু আজ তোমায় বলি, আমি অন্তরের দাহতেই শুষ্ক, আর যে-আগুন আমায় দাহ করে, বাইরে তার প্রকাশ ঐ রকম ক্ষণিক আর আকস্মিক হ'লেও ভিতরে সেটা অনির্বাণই রয়েছে। কিন্তু যেন ভুল বুঝো না, এ আগুন আমার বৈরী নয়, পরন্তু প্রাণের প্রাণ; অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের নিষ্ঠা নিয়েই আমি

একে জীইয়ে রেখেছি আমার অন্তরে। এই আগুনের দীক্ষা আমার সেই যুগে, যে যুগটাকে নাম দেওয়া হয়েছে...বাংলার অগ্নিযুগ। যেমন গালভরা নাম সে অনুপাতে কাজ হয়ে ওঠেনি। তার অনেক কারণ, আর সে দুঃখের গান গাইবার এটা অবসরও নয়, তবে এটা খাঁটি সত্য যে বাংলার যুব-চৈতন্য সেদিন অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে কঠিন সংকল্প নিয়েই দাঁড়িয়েছিল। সেদিন তার লক্ষ্য ছিল এক হিসেবে সঙ্কীর্ণ—বঙ্গভঙ্গ রোধ করা; কিন্তু বদ্ধপরিকর হয়ে উঠে দাঁড়াতেই তার দৃষ্টি হয়ে উঠল ব্যাপক, সে দেখলে মূল অন্যায় অন্যত্র, অর্থাৎ পরাধীনতার মধ্যে। বাঙালী ভারতের আর সবাইকে ডাক দিলে, আগুন পড়ল ছড়িয়ে।

এ ইতিহাসের এই পর্যন্ত থাক্ টুলু। তুমি এ রসের রসিক না হ'লেও কতক কতক জান। এর পরের যা ইতিহাস তা আমাদের পক্ষে বেদনাদায়ক। স্বাধীনতার সাধনা চলল, কিন্তু ধর্মকে আমরা বরাবর ভয় করতাম, তাই ঢুকে সাধনার ধারা দিলে বদলে। আমাদের ছিল গীতার ধর্ম—অন্যায়কারীকে করতে হবে হনন; তার জায়গায় যা এসে উপস্থিত হ'ল তা সেই একই মহাপুরুষকে কেন্দ্র ক'রে থাকলেও একেবারে উল্টো প্রকৃতির—হনন বা হিংসার সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই। আমরা চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এই "অতিশীতল-মলয়ানিলে"র দেশে তারই হ'ল জয়, আসর ছেড়ে স'রে দাঁড়াতে হ'ল। অস্বীকার করব না, মনের আক্রোশেই আমি ভক্ত-কবির রচনা থেকে এই উদ্ধৃতিটুকু করলাম, তুমি রাগ ক'রো না কিন্তু, আমি তো অহিংসায় বিশ্বাসী নই; আমরা যে আগুন জেলেছিলাম সে তো বুভুক্ষুই র'য়ে গেল ঐ দিক দিয়ে, মনের দুঃখে এটুকু আক্রোশ বা রাগ না প্রকাশ করলে আমি যে আমার ধর্মের কাছে পতিত হই।

যাক্, এটুকু অবান্তর। আমাদের অনেকেই গেল ধ্বংস হয়ে। অনেকের বুকের আগুন গেল চন্দনশীতল হয়ে, অনেকে আবার নিজের বুকের আগুনে দগ্ধ হয়ে নিঃশেষ হয়ে গেল। কিছু রইল বেঁচে, তার মধ্যে আছি আমি। আমিও দগ্ধ, তবে নিঃশেষ হয়নি, বুকের আগুন ছড়িয়ে বেড়াবার নেশা নিয়ে আছি বেঁচে।

কিন্তু লক্ষ্য গেছে বদলে। বদলে যাওয়া কথাটাও ঠিক নয়, এক লক্ষ্য ছিল, এখন হয়েছে অগণিত ; মূলের সে এক তো আছেই। এক-একবার যখন ভাবি, মনে হয় এই ঠিক হয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধেই আগুন জ্বালানো, কিন্তু অন্যায় তো ঐ বিদেশীর অত্যাচারের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় নি টুলু। ওটা আমাদের দুঃখের মূল, জাতি হিসেবে একটা সুসঙ্গত পরিণতির অন্তরায়—এটা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করি, কিন্তু অন্যায় তো ঐখানেই শেষ হয়ে গেল না! স্বার্থের আকারে, লালসার আকারে, সে তো জীবনকে প্রতিনিয়তই নিষ্পিষ্ট ক'রে চলেছে—হেথায়, হোথায়, সর্বত্রই। অন্যায়ের তো স্বাধীনতা-পরাধীনতা নেই। সমাজে অন্যায়—নিচে থেকে যারা তোমার জীবনকে সুন্দর, সহনীয় ক'রে তুলছে, ওপর থেকে তুমি তাদের পশুর চেয়েও নিচু ক'রে রাখছ, ধর্মে অন্যায়, উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রবল অন্যায়—বেশি দূর না গিয়ে গঞ্জডিহির কর্তাপাড়া আর বস্তির তারতম্যটা মিলিয়ে দেখো, হীরকের জন্মের দৃশ্যটা মনে ক'রো, গর্ভের বোঝার ওপর কয়লার বোঝার চাপে ওর মাকে পুত্রমুখ দেখবার আগেই চোখ বুজতে হ'ল। রাজনীতির ক্ষেত্রে অন্যায়—সেখানে সাম্যের নামে যে কত বড় বৈষম্য মাথা উঁচু ক'রে চলেছে তার হিসেব হয় না। এ সব শুধু আমাদের দেশের ব্যাপার নয়, স্বাধীন পরাধীন সব দেশেরই। মানুষের দুটো বড় বিভাগ স্বাধীন আর পরাধীন নয়—অত্যাচারী প্রবঞ্চক, আর অত্যাচারিত প্রবঞ্চিত। এখানে আবার তুমি আমায় ভুল বুঝতে পার, মনে করতে পার যে স্বাধীনতা-সংগ্রামে জায়গা না পেয়ে আমরা বাজে কাজের বড়াই ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করছি। মোটেই নয়। আমরা জানি স্বাধীনতা অর্জন করব আমরাই, ও রত্ন কেউ হাতে তুলে দেয় না—ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ। সব চেয়ে বড় অন্যায় একদিন আমরাই সব চেয়ে বড় আগুন জ্বেলে দগ্ধ করব, ইতিমধ্যে আমাদের হুতাশনে ছোট ছোট আহুতি চলতে থাকবে। অগ্নিহোত্রী ছোট ছোট ইন্ধন দিয়ে প্রতি দিনের আগুন রাখে জ্বালিয়ে—তার পর একদিন বিশেষ ইন্ধনে করে বড় যজ্ঞের অনুষ্ঠান।

তোমাদের মাস্টারমশাইয়ের একটা পূর্ণতর পরিচয় পেলে টুলু। এবার তোমার কাছে আমার প্রত্যাশা যে কি, তার বোধ হয় কতকটা আন্দাজ পেয়েছ। ব্যাপারটা আরও একটু স্পষ্ট করি।

আমি এই রকম একটা আহুতির আয়োজন করেছি সম্প্রতি ; খনি-অঞ্চলে আমি অশান্তির আগুন জ্বাললাম। নানা কারণেই ভেবেছিলাম, একেবারে বাড়াবাড়ি না ক'রে ধীরে সুস্থেই এগুব—সেবার মধ্যে দিয়ে, শিক্ষার মধ্যে দিয়ে, যেমন তোমায় দিয়েছিলাম নির্দেশ ; কিন্তু হীরকের জন্মের দৃশ্যটা আমার বুকের আগুন দাউদাউ ক'রে জ্বালিয়ে দিয়ে আমায় ঘরছাড়া ক'রে নিয়ে এল এখানে। আমি এখন ঝরিয়া অঞ্চলের একটা জায়গায়। দিন-চারেক আগে ছিলাম কাতরাসগড়ের দিকে, সেখানে কয়েকটা খনিতেই জ্বালিয়ে দিয়েছি বিদ্রোহের আগুন। কিছু লোককে পুড়তে হ'ল, তা পুড়ুক, না হয় আরও কিছু পুড়বে, তারা কিন্তু আর সবাইয়ের জন্যে মানুষের অধিকার অর্জন ক'রে দিয়ে যাবে। এখানে এসেছি, দু-পাঁচ দিনের মধ্যে জ্বলবে আগুন, তার পর অন্য প্রান্তে, তার পর আবার অন্যত্র—বাংলা-বিহারের বিরাট খনি-চক্রে আমি আগুনের মালা জ্বালব,—বড় দামী মালা টুলু, অগ্নিমূল্যের অগ্নিমাল্য বলতে পার। ক্ষমা করতে পারি যদি কথা পাই যে, মানুষকে ওরা মানুষের মর্যাদা দেবে—ওদের এলাকায় হীরকের মায়ের মতো মৃত্যু, চরণদাসের মত ধ্বংস, আর চম্পার মত অধোগতি আর সম্ভব হবে না। কি ক'রে করছি কাজ ? বহুদিন থেকেই আমি আছি এ কাজে—অবশ্য মূল কাজের সঙ্গে সঙ্গে—অনেক জায়গায়ই তোমার মত ঘাঁটিদার বসিয়ে রেখেছি, অনেক দিন থেকে, যখন কাজ আরম্ভ করা দরকার বুঝলাম তখন আর বিশেষ বিলম্ব হ'ল না।

এবার তোমার কথায় আসা যাক্। কোন এক সময় তর্কসূত্রে তুমি আমায় জিজ্ঞেস করেছিলে, আমি শক্তিপূজায় বিশ্বাসী কি না। তখন অন্য রকম উত্তর দিয়েছিলাম, কিন্তু আজ তোমায় বলি আমার মত শক্তিসাধক আছে কে ? আমার খড়্গের তুচ্ছ বলিতে পিপাসা মেটে না, তার চাই নরবলি। আজ আমি খনি নিয়ে পড়েছি, কিন্তু এর আগে অনেক জায়গাতেই আসন পেতেছি আমার। অনেক বলি পায়ে দিয়েছি মায়ের—বাছা বাছা। তোমাকেও সেই রকম একটি বলি ক'রে তোয়ের করব, তার পর করব উৎসর্গ, এই আমার অভিলাষ। তোমাদের মত বলি দিলেই তো আমার সিদ্ধি হবে বিরাট, অমোঘ।

তোমায় তিনটি কাজ দিয়েছি—সেবা আর শিক্ষাঅঙ্গের ; তার কতদূর কি

হয়েছে আমি অল্প অল্প খোঁজ পাই টুলু, কেমন ক'রে সে রহস্য এখন ভাঙব না। অবসর পেলেই তোমার ওখানকার চিত্রটা মনে মনে এঁকে নিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি, কি সে অপরূপ ছবি! এর আগে তোমায় লিখেছি, তোমায় আমি ধর্মান্তরিত করেছি, কিন্তু কই, তুমি তো সেই সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাসীই আছ, শুধু এক নূতন রূপের সন্ন্যাস। তুমি গৃহহীন হয়েও গৃহী—নির্বিকার চিত্তে চম্পাকে দিয়েছ পাশে ঠাঁই, সন্তানহীন হয়েও তুমি যেন জনকের প্রতীকমূর্তি হয়েই হীরককে নিয়েছ নিজের বুকে তুলে। তোমরা সর্বান্তঃকরণে পিতা-জননী-পুত্র, অথচ সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত। দেহাতীত শুদ্ধ সম্বন্ধের সূত্রে বাঁধা তোমরা তিন জনে। এমন অপরূপ জিনিস আমি কল্পনায় আনতে পারতাম না—নিজের দরকারে কে যেন ঘটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, এই জিনিসের ব্যাপক পূর্ণতর রূপের কথা ভাবতে গেলে আমি আত্মহারা হয়ে যাই একেবারে।

কিন্তু হয়তো সেরূপ ফোটবারই অবসর পাবে না, সেই কথাই বলছি :

আমার আর আর শিষ্যের সঙ্গে তোমার মনের প্রভেদ আছে ব'লেই এ জিনিসটি তোমার জীবনে সম্ভব হয়েছে। তুমি আরও শিশুকে বুকের কাছে টেনে নাও, আরও নারীর জীবনকে কলুষমুক্ত কর, চরণদাসের মত আরও যারা আছে তাদের এক এক ক'রে তুলে ধর। এই তোমার ব্রত হোক, কেননা এই তোমার জীবনের সত্য।

তবু যে এর মধ্যে একটা 'কিন্তু' আছে—তোমার জীবনের সত্যের পাশে পাশে যে আছে ওদের জীবনের সত্য। ওরা তোমায় দেবে না সুশৃঙ্খলায় কাজ করতে। তাই সর্বক্ষণই তোমায় জেনে রাখতে হবে যে, যা কিছুই করতে যাও, যত শান্ত ভাবেই করতে যাও, পরিণাম সংঘর্ষই। ভালো ভাবে লোককে ভালো হতে দেওয়া ওদের স্বার্থের বিরুদ্ধে, তাই, যদি কাজ ক'রে যাও তো সংঘর্ষ এক দিন আসবেই, প্রস্তুত তোমায় অষ্টপ্রহরই থাকতে হবে। অনেক সময় আবার দেখবে যে সংঘর্ষটা যদি প্রয়োজন বুঝে তুমিই আরম্ভ করতে পার তো সেইটেই শ্রেয়। সংঘর্ষটা হবে ওদের সঙ্গে, কিন্তু কাদের নিয়ে সেটা নিশ্চয় বুঝতে পারছ।

খনির লোকেদের সঙ্গে মনপ্রাণ দিয়ে মেশো ধীরে ধীরে। দেখবে কি ওদের প্রাণ, কত মেশবার ঝুগ্যি ওরা, কত অল্পে সাড়া দেয়! ওদের কানে মনুষ্যত্বের

মন্ত্র দাও, নিজের অধিকার সম্বন্ধে ওদের সচেতন ক'রে তোল, দেখবে যখন সংঘর্ষ হবে তখন, যারা ওদের মানুষ ব'লে মানলে না, এক কথাতেই তাদের বিরুদ্ধে মাথা খাড়া ক'রে উঠবে। কিন্তু এই সংঘর্ষে তোমার আত্মিক বা নৈতিক বিজয় সুনিশ্চিত হ'লেও যে দৈহিক ক্ষেত্রেও তুমি জয়ী হতে পারবে এমন তো বলা যায় না। কাতরাসগড় অঞ্চলে আমার একজন বিশিষ্ট শিষ্যকে হারালাম একদিন, বলি তুলে দিলাম আর কি, তোমাকেও তো ঐ পরিণামের জন্যে তোয়ের থাকতে হবে।

এই সঙ্গে আর একটা কথা ব'লে রাখি, কাকে আগে যেতে হবে কে জানে, হয়তো আমিই আর বলবার সময় পাব না। আমার টেবিলে অনেকগুলি মোটা মোটা ইংরেজী বই আছে, বহু নব নব 'ইজ্‌মে'র অর্থাৎ মতবাদের বই। আমার সব পড়া, তুমিও হয়তো পড়েছ কিছু, তাই থেকে মনে একটা ধারণা জ'ন্মে যেতে পারে, আমিও কোন একটা মতবাদের দাস। না, মোটেই নয়, ঐখানে আমি একেবারে মুক্ত রেখেছি নিজেকে, আর তুমিও চিরদিন রেখো। দেখলাম মতবাদে জড়িয়ে থাকলে তার মধ্যেকার গলদগুলোকেও জড়িয়ে থাকতে হয়। আজ আমি খনি নিয়ে পড়েছি, কয়েকটা কারণে আমি খনি-গত অন্যায়ের সামনে এসে পড়েছি ব'লে, কোন 'ইজ্‌মে'র দাসত্ব করছি না। এর আগে অন্যত্র করেছি কাজ, আজ এখানে, আবার কোথায় সুযোগ পাব অন্যায়ের কোন্ অভিনব রূপের সামনা-সামনি হতে কে জানে? তখন ধ্বংস করবার জন্যে শক্তি-সাধনা করব নব ভাবে। এই আমার ব্রত।

এই শক্তি-সাধনার মধ্যে দিয়ে, শক্তিমত্তার জন্যই, ভ্রান্তি অন্যায় তো আমার নিজের মধ্যেও এসে বাসা বাঁধতে পারে, তখন ছিন্নমস্তার মত নিজেকেই বলি দেবার শক্তি যেন অবশেষে আসে একটু।

তুমি আমার প্রত্যাশার কথা জানলে এবার। কি তোমার উত্তর—ইঙ্গিতে অল্প কথায় এই লোক মারফৎ জানিও। যদি সাধ্যাতীত মনে কর, তোমায় রেহাই দোব।

আমি আরও কিছু দিন থাকব অনুপস্থিত। আশীর্বাদ নিও।

ইতি—মাস্টারমশাই

॥ আঠাশ ॥

নিতান্ত অস্বস্তিকর একটা পত্র—পড়িয়া বুঝা যায় না অনুভূতিটা ভয়, বিস্ময়, আনন্দ বা নিরাশার। হাতে করিয়া টুলু অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, একটা চিঠি পড়ার পক্ষে এত বিলম্ব হইয়া গেল যে লোকটি উঠিয়া আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল, এবং তাহাতেও টুলুর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে না পারায় প্রশ্ন করিল—"হয়ে গেছে পড়া চিঠিটা ?"

টুলু ফিরিয়া চাহিল, উত্তর করিল—"হ্যাঁ, হয়ে গেছে।"

"কি বলব তাঁকে ? লিখে দেবেন কিছু ?"

টুলু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর করিল—"ব'লো যেমন লিখেছেন, সেই রকমই হবে।"

চিঠিটাতে আবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল ; পড়িতেছে না কিছু, ভাবিতেছে। একটু পরে যখন চোখ তুলিয়া তাকাইল, দেখে, লোকটি নাই। ডাক দিতেও যখন উত্তর পাওয়া গেল না, তখন টুলুর ভালো করিয়া সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল।

লোকটা চলিয়া গেল নাকি ? আহার না করিয়াই ? আর সামনে রাত্রি ! এতক্ষণে আর একটা কথা মনে পড়িল, বেশভূষায় লোকটা কুলি-কারকুন বলিতে যাহা বুঝায় অনেকটা সেই রকম, বারান্দার পাতলা অন্ধকারে মনেও হইয়াছিল সেই রকম টুলুর ; এখন কিন্তু হঠাৎ মনে হইল, দরজায় আসিয়া সে যখন দাঁড়াইল, ঘরের আলোয় টুলু যেন তাহার মুখে ভদ্রশ্রেণীর কমনীয়তা লক্ষ্য করিয়াছিল। বড় অন্যমনস্ক ছিল, তখন ভাবিয়া দেখে নাই এতটা। এখন মিলাইয়া মনে হইতেছে—হ্যাঁ, ঠিকই তো তাই।

আর ভদ্রই হোক, কুলি-কারকুনই হোক, এইভাবে অনাহারে গেল ! মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। তখনই বাহিরে গিয়া খানিকটা ডাকাডাকি করিল ; একবার গঞ্জের দিকে, একবার বালিয়াড়ির পথে খানিকটা আগাইয়াও গেল, কোনরকম সাড়া না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

এই লইয়া মনের খুঁতখুঁতানিটা কিন্তু অল্প সময়েই কাটিয়া গেল। একটু মনস্থির করিয়া ভাবিতেই বুঝিতে পারিল—নিশ্চয় মাস্টারমশাইয়ের এই রকমই নির্দেশ ছিল—তা না হইলে এমন বেখাপ্পা কাজ কেন করিবে লোকটা? চিঠিটা পাঠাইতে মাস্টারমশাই অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন, একটা ফালতো লোক বাসায় থাকিয়া কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে এটা নিশ্চয় চান না তিনি। অনুরোধ করিলেও নিশ্চয় থাকিত না; চতুর লোক, সুযোগ বুঝিয়া অনুরোধ করিবার অবসরই দিল না। টুলু আর এদিকটায় মন দিল না, শুধু মাস্টারমশাইয়ের পার্শ্বচরদের চারিদিকেও কতটা রহস্য, সেটা উপলব্ধি করিয়া তাহার চিন্তাটা আবার তাঁহাকে গিয়াই আশ্রয় করিল। মাস্টারমশাই তাহা হইলে একজন বিপ্লবী! টুলুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই, তবে শোনা আছে বাংলার অগ্নিযুগের কথা—আলিপুর বোমার মামলা, অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উল্লাসকর; খুদিরামের ফাঁসি, গীতা হাতে করিয়া নাকি ফাঁসিকাঠে ওদের সবাই উঠিত; কে একজন—নাম মনে পড়িতেছে না—ফাঁসির হুকুম থেকে ফাঁসিকাঠে উঠার কয়টা দিনের মধ্যে নাকি ওজন বাড়িয়া গিয়াছিল। টুলু যখন স্কুলের নিচের ক্লাসে তখন এ যুগ অস্তমিত, তখনও কিন্তু গানের জের রহিয়াছে আকাশে বাতাসে,—মেঠো সুরের দুটো লাইন এখনও কানে লাগিয়া আছে টুলুর— "একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি; ভাই কানাইয়ের দ্বীপ চালান মা, ক্ষুদিরামের ফাঁসি।" যতীন দাসও ঐ পন্থীই ছিল না? চৌষট্টি দিনের দিন জেলে অনশনব্রতে প্রাণ দিয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিষ্ফল আক্রোশ মিটাইয়া গেল।

যত সবার নাম মনে আছে তাহাদের একটা বিরাট মিছিল টুলুর চোখের সামনে দিয়া ধীরে ধীরে অন্তরের পানে মিলাইয়া গেল। গৌরবে কজ্জার বুক গেছে ভরিয়া, আজও যায়।

কিন্তু তবুও অস্বস্তি বোধ হইতেছে মাস্টারমশাইয়ের এই নূতন রূপের সামনাসামনি আসিয়া। যাহাদের লইয়া একদিন বাঙালী হইয়া জন্মানোর আসিত গৌরব—আজও আসে, তাহাদের একজনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়া মনটা যাইতেছে যেন সঙ্কুচিত হইয়া, ভয়ে নয়, অশ্রদ্ধাতে তো নয়ই; তবে কিসে?

এর উত্তর টুলু খুঁজিয়া পাইল না, তবে এটা বুঝিল যে যাহাদের বুকে এত জ্বালা তাহাদের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলায় মন তাহার সায় দিতেছে না। আগে কতবারই যেমন মাস্টারমশাইকে পরিহার করিতে চাহিয়াছে—শ্রদ্ধা সত্ত্বেও, আজও সেই রকম একটি দিন আসিয়াছে—আজ এই চিঠি পাওয়ার পর শ্রদ্ধা যখন আরও কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, মাস্টারমশাইয়ের নির্দেশের অমর্যাদা করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া যাওয়া যখন নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতোই অসম্ভব।

মনে তো পড়ে না এত বড় অশান্তিতে টুলু আর কখনও পড়িয়াছে কি না! সমস্ত রাতটা এই ভাবেই কতকটা অনিদ্রার মধ্যেই গেল কাটিয়া।

সকাল থেকে আবার কাজের মধ্যে চিন্তার উগ্রতাটা অনেকটা মিলাইয়া আসিল। আজকাল কিছু কিছু কাজ থাকে হাতে; নিতান্ত দরকারী যে কাজই এমন নয়, তবে এটা ওটা সেটা দিয়া একটা রুটিন গড়িয়া লইয়াছে; সময়টা কাটে এক রকম করিয়া। সকালে বুড়ির ঘরে, গিয়া ছেলে আর মেয়েটিকে তোলে, বুড়ি যদি উঠিয়া পড়ে একটু-আধটু গল্প হয়, বুড়ির জীবনের যদি সে রকম কিছু আসিয়া পড়িল তো অনেকখানি; তাহার পর দুটিকে সঙ্গে করিয়া যায় বনমালীর বাসায়। বেশ বড় একটা জটলা হয়, এদিকে এরা তিন জন, ওদিকে বনমালী, চম্পা, প্রহ্লাদের বউ। জটলাটা হয় হীরক আর প্রহ্লাদের শিশুটিকে কেন্দ্র করিয়া—দুটিতেই ধীরে ধীরে চাঙ্গা হইয়া উঠিতেছে, বিশেষ করিয়া প্রহ্লাদের শিশুটি আরও যত্নে আরও হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে, বেশি লোকের সাহচর্যে আরও বেশ চনমনে, ঘাঁটিয়া-ঘুঁটিয়া লুফিয়া দোলাইয়া বেশ সাড়া পাওয়া যায়। এ বাসার আসল টান অবশ্য হীরক। কয়দিনেরই বা! কিন্তু অপূর্বসুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। আর একে লইয়াই তো জীবনের এদিকে পা বাড়ানো টুলুর, তায় এমন দেবশিশুর মতো হইয়াও ওর জীবনের ঐ সুগভীর ট্রাজেডি, সব মিলাইয়া একটা অদ্ভুত মায়াজাল বিস্তার করিতেছে ছেলেটা। এই মায়ার জন্য এখনও ওকে লইয়া বেশি নাড়াচাড়া করিতে সঙ্কোচ হয় টুলুর, স্নেহটা প্রকাশ করিতে এক ধরনের লজ্জা করে। চম্পা অনুযোগ করে—"আপনি আমার ছেলেকে একটু কম আদর করেন—

বেশই একটু, তা মিতিনের সামনেই বলছি, যদি মনে করে হিংসে করছি ওর ছেলের তো নাচার। সত্যি কথাটা বলতে ছাড়ব নাকি?" যেটুকু করিতে চায় টুলু, সেটুকুতেও বাধা পড়ে, একটু কুণ্ঠিতভাবে হাসিয়া বলে—"আদর বোঝবার মতন হোক একটু, এখন তো কাদার ডেলা একটা তোমার ছেলে।" ······মুক্ত ব্যবহারের মধ্যে প্রহ্লাদের বউ আজকাল আর কথায় এড়ে না, হাসিয়া বলে—"ততদিন তো ওর মা হিংসায় ফেটে ম'রে যাবেক গো।" কথাটা শুনিয়া একদিন বনমালী মুখটা ভার করিয়া বলিল—"তুর ছাওয়াল! তুর ছাওয়াল কেমন ক'রে হ'ল আমার বুঝায়েঁ দে ক্যানে; উর মা বিয়াঁলো, তার ছাওয়ালটি হোলোক নাই; ছোটবাবু নিলেক, উর ছাওয়াল হোলোক নাই; পেল্লাদের বউ মাই দিছেঁ, উটির ছাওয়াল হোলোক নাই,—তুর ছাওয়াল! কুন্ আইনের কুন্ ধারায় আমায় বুঝায়েঁ দে ক্যানে!"

বেশ হাসি পড়িয়া গেল, তাহারই মধ্যে গাম্ভীর্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া চম্পা বলিল—"তা তুই যা না বুড়া, জলদি ক'রে উর মাকে সগ্‌গে থেকে পাঠায়ে দিগে; আমি দিয়াঁ দিব তার ছাওয়ালটিকে।"

বনমালী রাগিয়াই গেল, হাত নাড়িয়া বলিল—"তা সিটি নাই, তু ছোটবাবুকে দিঁয়া দে ক্যানে, উনি নিবেন, ওঁর ছাওয়াল! দিখ্‌খো না, পরের ছাওয়াল নিয়া চোখ রাঙায় গো! তুর ছাওয়াল তো বিয়া হ'লে তু নিয়াঁ যাস তুর শ্বশুরবাড়িতে; হুঁ, আমি দিখ্‌ব।..."

ছেলে লইয়া নাতনি-ঠাকুরদাদার বাক্‌বিতণ্ডা একরকম নিত্যকার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকালবেলায় এই সময়টুকু লঘু রহস্যের মধ্য দিয়া কাটে এই ভাবে।

এর পরে বেশ একটু শক্ত কাজ হাতে লইয়াছে। মাস্টারমশাইয়ের বাসার সঙ্গে দেয়াল দিয়া ঘেরা বেশ খানিকটা জমি, সেটা শাকসব্‌জির বাগান করিবে। বনমালীকে লইয়া মেহনতে লাগিয়া যায়, কোদাল চালানো, ঢেলা ভাঙা, আল বাঁধা, ভাগাভাগি করিয়া সবই করে; ছেলে আর মেয়েটি সাহায্য করে। বর্ষা আসিতেছে, তাহার আগেই তৈয়ার করিয়া ফেলিবে বাগানটা, রৌদ্র যতক্ষণ না নিতান্ত কড়া হইয়া উঠে ততক্ষণ লাগিয়াই থাকে, মাঝে একটা

বৃষ্টি হইয়া গেছে, জমিটা নরম থাকিতে থাকিতে যতটা অগ্রসর হওয়া যায়।

ক্লান্তিটুকু অপনোদিত হইয়া গেলে স্নান করিয়া ঘরে ঢোকে। আজকাল হোমিওপ্যাথির দিকে একটু ঝোঁক গেছে; বুড়ির আরোগ্যের ব্যাপারটা চম্পা এক গুণকে সাত গুণ করিয়া বস্তিতে রটাইয়াছে, দু-চার জন করিয়া জুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, এই সময়টা বই দেখিয়া তাহাদের ঔষধ বিলি করে। তাহারা চলিয়া যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুড়ির নাতনি হীরককে আনিয়া হাজির করে।

টুলু কখনও এ ফরমাসটা করে নাই, এতে দুটি শিশুর মধ্যে যে পক্ষপাতিত্বের ভাবটুকু ফোটে তাহাতে তাহাকে সঙ্কুচিতই করে একটু; কিন্তু তবুও ব্যাপারটুকু নিয়মিত ভাবেই হইয়া আসিতেছে। টুলুর মনে হয় চম্পা যেন ওৎ পাতিয়া থাকে, ঘরটা খালি হইতে দেরি, হীরককে দেয় পাঠাইয়া। বুড়ির নাতনিকে বারণ করে না, তবে চম্পাকে একদিন এই সময় একলা পাইয়া বলিল। চম্পা একটু বিস্মিতভাবে চাহিয়া থাকিয়াই হাসিয়া উত্তর করিল—"বেশ যাহোক। আমায় আপনি এতই বেয়াক্কেলে ভাবেন? সত্যি আমি এতই হিংসুটি নাকি?···মিতিন দেয় পাঠিয়ে; আমি বরং বারণই করেছি ক'দিন—উনি এখন একটু বই-টই নিয়ে থাকেন এ সময়, কাজ নেই পাঠিয়ে।"

বুড়ির কাছে কি একটা কাজে যাইতেছিল, চলিয়া গেল। ফিরিবার সময় আর একবার আসিল—"না হয় যাব নিয়ে হীরককে?" বলিয়া খুব অল্প একটু হাসির সহিত টুলুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

পরীক্ষার সূক্ষ্মতায় টুলু মনে মনে একটু হাসিল, ঠোঁটেও তাহার একটু আভাস আসিয়া পড়িল, কিঞ্চিৎ অবহেলার ভাব দেখাইয়া বলিল···"থা—ক, কি আর ক্ষতি করছে!"

"না হয় বারণ ক'রে দোব মিতিনকেই।"

এবার টুলু হাসিয়াই ফেলিল, কথায় কিন্তু পরাভবটা স্বীকার করিল না, বলিল—"তোমারও যেন হঠাৎ জিদ বেড়ে গেল চম্পা, প্রহ্লাদের বউয়ের কষ্ট হবে না মনে?—পাঠিয়ে দেয় বেচারি···"

স্বীকার করিতে চায় না; চম্পা, যে সব চেয়ে বেশি জানে কথাটা, তাহার কাছেও নয়, তবে সত্যই হীরক যেন মায়ার নূতন নূতন তন্তু বুনিয়া চলিয়াছে তাহার চারিদিকে। বেশ মোটা মোটা ফুলতোলা গোটা দুই কাঁথার উপর শোয়াইয়া দেয় মেয়েটি, নিজে প্রায় থাকে না, ভাইয়ের সঙ্গে খেলা করিতে চলিয়া যায়। টুলু পড়েই এই সময়টা—হোমিওপ্যাথিই হোক বা অন্য কোন বই-ই হোক, মাঝে মাঝে ফিরিয়া ফিরিয়া চায় হীরকের পানে; হাত-পা নাড়িয়া, হাতের দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া নিজের খেয়ালে একটা একটানা শব্দ করিয়া যাইতেছে—এক-একবার হঠাৎ উৎসাহের জোয়ার নামে, হাত-পা ছোঁড়ায় অতিরিক্ত ক্ষিপ্রতা আসিয়া যায়, একটানা শব্দটা টুকরা টুকরা হইয়া কাকলিতে ভাঙিয়া পড়ে। এক-এক সময় চাহিতে গিয়া টুলু আর দৃষ্টি সরাইতে পারে না—কত নিশ্চিন্ত, অথচ কত অসহায় ও! এত অসহায়তার মধ্যে এত নিশ্চিন্ততা বড় বিস্ময়কর, বড়ই করুণ মনে হয় টুলুর —আজ ওকে লইয়া কাড়াকাড়ি; কিন্তু কে জানে, যেমন বিক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছিল আবার তেমনি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে কি না! তিনটি আশ্রয়ের মধ্যে একটি প্রহ্লাদের বউ, বাকি চম্পা আর টুলু। কি স্থিরতা চম্পার জীবনে? টুলুর জীবন তো আরও অনিশ্চয়—কোথাকার একটা কুটা স্রোতের মুখে কোথায় আসিয়া লাগিয়াছে, আবার ভাসিয়া যাইতে কতক্ষণ?···সে আবার একটা কুটার সহায়!

আবার কখনও কখনও মনটা সংকল্পে হইয়া উঠে দৃঢ়। না, যত যা-ই হোক, হীরককে ছাড়িবে না ও; যেমন বুকে করিয়া তুলিয়া লইয়াছিল, তেমনি করিয়াই বুকে জড়াইয়া রাখিবে, আর সব ব্রত যাক, ঐ একটি ব্রত সার করিয়া জীবনটা দিবে কাটাইয়া।···আবেগের মাথায় টুলু উঠিয়া গিয়া শিশুর উপর দৃষ্টি নত করিয়া দাঁড়ায়—মনে হয়, ঐ নিশ্চিন্ততার অন্তরালে রহিয়াছে একটা বিশ্বাস—অবুঝ, কিন্তু অটল বিশ্বাস। টুলুর হাতটা কখন যেন আপনা হইতেই গিয়া ওর ললাট স্পর্শ করে, আশীর্বাদের মতো একটি প্রতিজ্ঞা নামিয়া সঞ্চারিত হয় ললাটে—না, তুই নিশ্চিন্তই থাক্, এ বিশ্বাস আমি দোব না ভাঙতে···

আহারাদি করিয়া একটু ঘুমাইয়া পড়ে, দেশের চেয়ে এখানকার গরমটা ঢের বেশি, আলস্যটা কোন মতেই কাটাইয়া উঠিতে পারে না। উঠিয়া ছেলে আর মেয়েটিকে লইয়া পড়াইতে বসে। এই সময়টা কাটে বেশ ভালো। শুধু বসিয়া পড়া-মুখস্থ করানো নয়, অবশ্য তাহাও একটু করাইতে হয়, কেননা দুইটিই একেবারে অক্ষরজ্ঞানহীন, তবে বেশির ভাগ গল্প বলা; গল্পের মধ্য দিয়া ভূপরিচয়, দেশবিদেশের মানুষের পরিচয়, ইতিহাস, বিশেষ করিয়া নিজের দেশের ইতিহাস, পুরাণ—যতটুকু নিজের জানা আছে। যেটুকু বলে সেটুকু ওদের কাছ থেকে আবার শুনিয়া লয়। বড় চমৎকার লাগে, দুটি স্ফুটনোন্মুখ মনের পরিধি কেমন ধীরে ধীরে যাইতেছে বাড়িয়া!—সেই রকম একটি দুইটি করিয়া যেন পাপড়ি খোলা। ফুলের মতই যেন মনের একটা সৌরভও পড়িতেছে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া। এই সময়টা টুলুর সব চেয়ে ভালো কাটে; শুধু একটা অভাব বোধ করিয়া কষ্ট হয় যে; মোটে দুইজন এরা,—ফুল দৃষ্টির নিচে আরও গোটাকতক ফুটিলে বড় ভালো হইত। পড়ার দিক দিয়া দুটিকেই সেই "অ-আ" হইতে আরম্ভ করিতে হইয়াছে। তবে এদিকে টুলু একটু বৈচিত্র্য আনিবে—একটি ক্লাসকে দুইটিতে ভাঙিয়া ফেলিবার জন্য ছেলেটিকে ছুটি দেওয়ার পরও মেয়েটিকে বসাইয়া রাখে। রাত্রেও তাহাকে একটু খাটায়, ফলে এই অল্প দিনের মধ্যেই প্রথম ভাগটা শেষ করিয়া সে প্রায় দ্বিতীয় ভাগের ক্লাসে আসিয়া পড়িল বলিয়া। বলে, তাড়াতাড়ি পড়িয়া ফেলিল তাই, নহিলে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে এক বই পড়া—মুখ দেখাইবার জো থাকিত?

ভদ্র জীবনের উপর একটু এই শিক্ষার স্পর্শে বেশ একটু মর্যাদাজ্ঞান হইয়াছে।

টুলু কিন্তু এ-জ্ঞানটা একটি সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করে। বিকালবেলা ওদের একেবারেই দেয় ছাড়িয়া।

আগেকার সঙ্গী-সঙ্গিনীরা আসে, সেই রকম জোর খেলা জমে, তবে ভিক্কে-ভিক্কে জাতীয় নয়। এরা দুটিতে পরিচ্ছন্ন, ওরা প্রায় সেইরূপই, এদের দেখিয়া যদি সামান্য একটু ইতরবিশেষ হইয়া থাকে; কিন্তু পাছে পরিচ্ছন্নতার

এক্ষেত্রেও মর্যাদাজ্ঞান ওঠে জাগিয়া, সেজন্য টুলু প্রায় সর্বক্ষণ থাকে কাছে কাছে, যদি বাহিরে যায়, চম্পাকে বলিয়া যায়—"একটু লক্ষ্য রেখো, কাপড় একটু ফরসা ব'লে ওদের মনে ময়লার না ছোপ ধরে।"

সন্ধ্যার সময় সকলে কাঞ্চনতলাটিতে জড়ো হয়।

এই এখন সমস্ত দিনের রুটিন, খুব বেশি কিছু না হোক, তবুও খানিকটা কাজ আছে। সেই প্রথম সপ্তাহের বন্দীজীবনের জড়তা গিয়া উদ্যমের খানিকটা পথ তো অন্তত পরিষ্কার হইয়াছে। সর্বোপরি আছে একটা আশা, নূতন যে জীবনকে অবলম্বন করিল তাহার একটা ভবিষ্যতের স্পষ্টতর ছবি।

মনে বেশ একটি তৃপ্তি জাগিয়া উঠিতেছিল—মাস্টারমশাইয়ের চিঠি এই তৃপ্তিটুকুকে যেন গ্রাস করিতে বসিল।

॥ ঊনত্রিংশ ॥

কাজের মধ্যে চিন্তার উগ্রতাটুকু মিলাইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু চিন্তাটা একেবারে যায় নাই। বাগান কোপানোই হোক, পড়াই হোক বা পড়ানোই হোক—সব কাজের মধ্যেই এক-একবার উঁকি মারিয়া অন্যমনস্ক করিয়া ফেলিতেছিল, টুলু আবার চাপা দিয়া অগ্রসর হইতেছিল, বৈকাল পর্যন্ত আসিয়া তাহাকে কিন্তু হার মানিতেই হইল। মনে হইল, একটু ঘুরিয়া আসিলে মনটা হয়তো সুস্থির হইতে পারে। রোদটা নরম হইলে বাহির হইয়া পড়িল।

এলোমেলো ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে একবার বস্তির মধ্যে প্রবেশ করিল। মাঝে আরও বার-দুয়েক আসিয়াছিল, পরিচয়টা বাড়িয়াছে,—আরও বাড়িয়াছে ঔষধ দেওয়া আরম্ভ করা থেকে, কথাবার্তায় খানিকটা সময় গেল, যাহারা ঔষধ সেবন করিতেছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের খবর লইল। খানিকটা অন্যমনস্ক হইয়া কাটিল মন্দ নয়, তাহার পর বাসায় ফিরিবার জন্য বটতলার পথটা ধরিল।

খেলাটা এখন ওর ওখানেই জমে, বটতলাটা প্রায় খালি। একটা শিলাখণ্ডের উপর গিয়া বসিল। গোরু ছাগল লইয়া দুই-চারজন যে ছেলে ছিল তাহাদের সহিত একটু গল্পগুজব করিল—মাস্টারমশাইয়ের চিঠি হইতে যেন পলাইয়া বেড়াইতেছে। বেলা বেশ পড়িয়া আসিলে তাহারাও যখন চলিয়া গেল, আবার মাস্টারমশাইয়ের চিঠি আসিয়া মনটা দখল করিল।...মাস্টারমশাই তাহা হইলে বিপ্লবী !...স্থানে স্থানে আগুন জ্বালাইয়া বেড়াইতেছেন !

টুলুর যেন ভয় করিতেছে—তাহার মনেও জ্বলিয়াছে নাকি আগুন ? এ তবে কি ?...আতঙ্কের মধ্যেই মনে হইল, যখন সিদ্ধবাবার আশ্রমের দিক থেকে তাহাকে ফেরান, সে সময়ে ঠিক এই রকম একটা অশান্তির জ্বালা ছিল নাকি ওর মনে জাগিয়া ? সে না ফিরিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ফিরিল তো শেষ পর্যন্ত। ভালো হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে সে কথা তো এখন আসে না, আসল কথা, ও চেষ্টা করিয়াছিল, চেষ্টা করিয়া হারিয়াছিল, হার মানিয়া ফিরিয়াছিল। মাস্টারমশাই একটা অমোঘ শক্তি। আতঙ্কের মধ্যেই টুলুর হঠাৎ আর একটা কথা মনে হইয়া সমস্ত শরীরটা শিহরিয়া উঠিল—এ-ই মাস্টারমশাইয়ের প্ল্যান নয় তো ?—প্রথম ধাপ থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিরীহ সেবাকার্য, যখন সেটা বেশ সহিয়া আসিল তখন এই দ্বিতীয় ধাপ—বিপ্লব !...মাস্টারমশাই ঘোর শাক্ত, বলি চান—তার আগে বলিকে তাঁর আরাধ্যার উপযোগী করিয়া লন।

সম্মোহিত পাখী সাপের অমোঘ, স্থির দৃষ্টিতে সামনে যেমন ভাবে চাহিয়া থাকে, টুলু মাস্টারমশাইয়ের কাল্পনিক দৃষ্টির সামনে সেই ভাবে রহিল চাহিয়া। তাহার পর এক সময় সম্মোহিত পাখীর মতই মাথা নত করিয়া হইল অগ্রসর।

তর্কের ধারা গেল বদলাইয়া। দূরে স্কুল আর বাসা লইয়া টিলাটার উপর সূর্যের শেষ রশ্মির ম্লান আলো আসিয়া পড়িয়াছে, ঐ দিকে চাহিয়া চাহিয়া ওখানকার জীবনের চিত্রটা ফুটিয়া উঠিতে চাহিল চোখের সামনে—অন্ধ ভিখারিণী, চম্পা, হীরক, ঐ একটা বিকৃতমস্তিষ্ক জীব বনমালী ; খুব সুবোধ সুশীল স্বামী আর খুব গোছালো স্ত্রী লইয়া চম্পার মিতিনের সংসার, একটা যেন নিয়মবদ্ধ, যন্ত্রচালিত ব্যাপার ; ঐ চরণদাস—নেশা ছাড়িয়া ভালো হইয়া আসার

সঙ্গে যেন নির্জীব হইয়া আসিতেছে—এই এদের লইয়া সারা জীবনটা কাটাইয়া দিতে হইবে তাহাকে?— না হয় এদেরই মতো আরও দুইজন আসিল।...' সিদ্ধবাবা ভুল, কিন্তু ওঁকে লক্ষ্য করিয়া যে-জীবনের সন্ধানে নামিয়াছিল টুলু সেটা তো ছিল বিরাট। তাহার পরিবর্তে কি এই অকিঞ্চনবৃত্তি?

টুলু মনের চাঞ্চল্যে শিলাতল ছাড়িয়া জায়গাটাতে পায়চারি করিতে লাগিল। চিন্তা একেবারে দিক পরিবর্তন করিয়াছে—না, সেই বিরাটের জায়গায় যদি অন্য কিছুকে আনিয়া বসাইতে হয় তো সে বিপ্লবেরই মতো বিরাট একটা কিছু আর; কিছুই মানায় না, আর কিছু আনিতে গেলেই জীবনে যেন একটা শূন্যতা, একটা হাহাকার থাকিয়া যায়। সহ্য হইবে না। বিপ্লবই চাই, মাস্টারমশাইয়ের উদ্দেশ্যই ঠিক। কিন্তু উদ্দেশ্য ঠিক হইলেও পরিকল্পনায় খুঁত আছে—অত অল্প অল্প করিয়া ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া নয়, বিপ্লবীর আকস্মিকতায়ই বিপ্লবের মশাল লইয়া মাথা তুলিতে হইবে। বিপ্লব বজ্র—বজ্রের মতোই সে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত স্থানে হানিবে আঘাত।...আমি আসছি মাস্টারমশাই, আপনার ওপর দিয়েই আমার বিদ্রোহ হবে আরম্ভ, আপনার অবাধ্য হয়ে, আপনারই রচা ঐ শেকল ভেঙে দিয়ে আমি আসছি। আপনার আত্মগোপনের চেষ্টা খাটবে না, ঝরিয়া-কাতরাসগড় তন্ন তন্ন ক'রে আপনাকে খুঁজে বের করব—করবই বের, তার পর আপনার মশালের পাশে আমারও মশালটা ধরব তুলে।

উত্তেজিত চরণে টুলু স্কুলের দিকে চলিল—চিন্তার স্রোত হইয়া উঠিতেছে ফেনিল, আবর্তময়।

যখন স্কুলের কাছাকাছি পৌছিল, সন্ধ্যা বেশ গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। দেখে ফটকের কাছে জটলা করিয়া বনমালী, প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের স্ত্রী, বুড়ির নাতনি দূরে কোথায় দৃষ্টি ফেলিয়া কি দেখিতেছে। ও যেদিক হইতে আসিতেছে সেই দিকেই। একবার ঘুরিয়া দেখিয়া লইয়া কিছু বুঝিতে পারিল না, আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—"কি যেন দেখছ তোমরা?"

বনমালী বলিল—"আগুন লেগেছে বটে।"

"আগুন! কোথায়?" বলিয়া গঞ্জের দিকে চাহিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল,

কিছু দেখিতে না পাইয়া আবার ঘুরিয়া বলিল, "কোথায়? দেখছি না তো।"

বনমালী, প্রহ্লাদ, মেয়েটি একসঙ্গে আঙুল দেখাইয়া জড়াজড়ি করিয়া বলিল —"হুই যে পাহাড়ে—পাঁচকোটেতে...

পাহাড়ে আগুন! সমতলের মানুষ, টুলুর কানে নূতন ঠেকিল। তাহার পর মনে পড়িল দাবাগ্নির কথা। দৃষ্টিটা ততক্ষণে পঞ্চকোটের উপর গিয়া পড়িয়াছে, দেখিল—সত্যই এক জায়গায় মন্থর খানিকটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী; ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে মনে হইল নিচে থাবলা-থাবলা আলো চিকচিক করিতেছে। আর একটু দৃষ্টি ঘুরাইয়া দেখিল—খানিকটা দূরে আর একটা ঐ রকম, এত দূর থেকে মনে হয় পঁচিশ হাত তফাতে, কিন্তু বুঝিল দুটার মধ্যে অন্তত মাইল তিন-চারের কম ব্যবধান নয়। একেবারে নূতন অভিজ্ঞতা, টুলু স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর মনের বিহ্বলতায় অবোধের মতোই প্রশ্ন করিয়া বসিল—"পাহাড়েও আগুন লাগে নাকি এ রকম ক'রে? আপনি লাগে?"

বনমালী বলিল—"হ লাগে, আপুনি লাগে, আপুনি যায়, ঠাকুরের যখন পরিতুষ্ট হয়!"

কথাটার নূতনত্বে টুলু একবার বনমালীর মুখের পানে চাহিল, তাহার পর বিস্ময়ের ঝোঁকেই দৃষ্টি ফিরাইয়া আবার দূরলগ্ন করিল। সেই চিকমিকি— অস্বস্তিকর অথচ চোখ ফিরানো যায় না। এতদিন থাকিতে আজই এই যোগাযোগ কেন? মাস্টারমশাইয়ের প্রথম চিঠিতে এক অদৃশ্য শক্তির কথা ছিল, তাঁহারই বিধানে নাকি সে হীরককে ওভাবে পায়। আজ তিনিই কি এই বহ্নিসঙ্কেতে আবার নূতন পথের নির্দেশ করিতেছেন?...মনে বিক্ষোভ ভরিয়া কতক্ষণ যে একভাবে দাঁড়াইয়া ছিল হুঁশ নাই, একবার যখন ফিরিয়া দেখিল, দেখে, বনমালী প্রভৃতি সকলেই চলিয়া গেছে। সেই সময়ই আবার সামনে অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিয়া ফিরিয়া চাহিল, দেখে, অল্প দূরেই চম্পা বুড়ির নাতির সহিত গল্প করিতে করিতে টিলার রাস্তা বাহিয়া উঠিয়া আসিতেছে। কাছে আসিয়া একটু বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিল, "আপনি এখানে—এখন!"

টুলু বলিল—"পঞ্চকোট পাহাড়ে আগুন লেগেছে।"

চম্পা ফিরিয়া চাহিল, বলিল—"তাই তো দেখছি। ক'দিন থেকে শুকনো হাওয়া বইছে কিনা।"

ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া একটু চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"চমৎকার দেখতে কিন্তু!"

চম্পার কথাতে টুলু একবার ঘুরিয়া দেখিয়া লইল—নিকষ-কালো অন্ধকারের বুকে আগুনের মালা—শিখায় ঝলমল, চমৎকার বইকি! কিন্তু মন তার আজ অতিরিক্ত চঞ্চল, একেবার অন্য সুরে বাঁধা, দৃষ্টিটা ওতে আবদ্ধ হইতে পারিল না। হঠাৎ মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া চম্পার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"অন্ধসংস্কার ব'লে একটা কথা আছে—শুনেছ চম্পা?"

প্রশ্নটার অপ্রাসঙ্গিকতায় চম্পা মুহূর্তের জন্য একটু বিস্মিত হইল, তাহার পর একটু হাসিয়াই বলিল—"অত ভালো ক'রে জানা আর কোন কথাই নেই আমার। আপনি বোধ হয় জানেন না, আমি দিনকতক একটা মিশনরি স্কুলে পড়তাম, আমাদের জাতের মধ্যে ঐ জিনিসটি ছাড়া যে আর কিছুই নেই—বছর দুয়েক ধ'রে শুধু এইটুকু শিখিয়েছিল তারা।"

উত্তরটায় টুলুর কৌতুক বোধ হইল, যে কথাটা বলিতে যাইতেছিল সেটা ছাড়িয়া একটু হাসিয়া কহিল—"যাক্, তোমার ঘাড় থেকে তা হ'লে ওসব ভূত নামিয়ে ছেড়েছে।"

চম্পা আবার একটু বেশি করিয়া হাসিল, বলিল—"মোটেই নয়, আরও একরাশ চাপিয়েছে বরং, এত যে আছে জানতামও না; যেটার নাম করেছে সেইটেই এসে নতুন ক'রে ঘাড়ে চেপেছে, তার মধ্যে আবার কতগুলো বিলিতি ভূত আছে, এখন তেরো নম্বর দেখলেও আঁৎকে উঠি।"

গম্ভীর আলোচনার পক্ষে বাতাসটা হালকা হইয়া গেছে, ওর মনে যে ঝড় বহিতেছে তাহার প্রসঙ্গটা আবার কি করিয়া আনিবে টুলু ভাবিতেছিল, চম্পা বলিল—"বেশি দূরে যাওয়ার কি দরকার? এই এখনই তো একটা অন্ধসংস্কার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, পাহাড়ে আগুন লাগা বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে নাকি দেখতে নেই, এতখানি দেখে ফেলে ভয়ে কাঁটা হয়ে উঠেছি..."

টুলু বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিতে বলিল—"হ্যাঁ, তাই, দেবতার খিদে পেয়েছে

খাচ্ছেন, ওতে নজর দেওয়া নাকি উচিত নয়—তাতে, যে দেয় তার ওপর নাকি তাঁর নজর পড়ে।

যে ধরনের একটু হাসিল তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় এসব যুক্তিহীন বিশ্বাস কাটাইয়াই উঠিয়াছে। টুলু সেটা বুঝিয়াই ওর হাসির উপর একটু হাসিল, বলিল—"তাই ঘুরে দেখি, বনমালী প্রহ্লাদের বউ, তারা সব কেউ নেই।"

সঙ্গে সঙ্গেই প্রসঙ্গটা আনিয়া ফেলিল, বলিল—"কাকে দুষব? এই আগুন লাগা নিয়ে আমিই তো একটা ধোঁকায় প'ড়ে গেছি।"

কথাটা হালকা ভাবে বলে কি না লক্ষ্য করিবার জন্য চম্পা মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিল। টুলুর মুখের ভাবটা এইটুকুতেই গেছে বদলাইয়া, মনটা যেন কোথা থেকে কোথায় গেছে চলিয়া, কতকটা আত্মগত ভাবেই আরম্ভ করিল—"চম্পা, কাল আমি মাস্টারমশাইয়ের—"

এই পর্যন্ত বলিয়া সাড় হইল, চুপ হইয়া গেল। চম্পার মুখের পানে একবার চাহিল, এই রকম সব মুহূর্তে চম্পার মুখ একটা দেখিবার জিনিসই—বুঝিয়াছে কোন একটা গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়া ফেলিবার মুখে টুলু হঠাৎ থামিয়া গেল, এতটুকু কিন্তু কৌতূহল নাই, একটি আগ্রহের রেখা পর্যন্ত ফোটে নাই কোথাও মুখে। গোপন করিতে হইল বলিয়া টুলু নিজেই যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। তাহার পর সে-ভাবটা সামলাইয়া লইয়া বলিল—"আমি ভাবছিলাম চম্পা, মাস্টারমশাই কি আমায় এই সবের জন্যেই এখানে বসিয়ে দিয়ে গেছেন?"

চম্পার মুখটা একেবারে শুকাইয়া গেল, তাহার এদিককার এই নূতন জীবনে সবচেয়ে বড় আশঙ্কা যেন ফলিতে চলিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—"কেন? ও কথা বললেন যে?"

এই ক'টা কথা বলিতেই তাহাকে একবার ঢোঁক গিলিতে হইল।

টুলু বলিল—"তোমায় ব'লে কি হবে তাও তো বুঝি না, তোমার মনে খানিকটা অশান্তি ঢেলে দেওয়া; আবার এও ভাবছি শোনা তোমার দরকার, কেননা যে ক'রেই হোক আমার জীবনের মধ্যে তোমার জীবন খানিকটা এসেই পড়েছে, আমার ঘাড়ের বোঝা তুমি ইচ্ছে ক'রেই বেশ খানিকটা নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছ। কিন্তু এই যে বোঝা, কি হবে বলো দিকিন এসব ব'য়ে? তুমি

ম্যানেজারের ওখানে মাস্টারমশাইয়ের চিঠিটা শুনেছিলে, তাইতে তিনি আমায় কতকগুলো কাজের কথা লিখেছিলেন—আপাতত তিনটে, তোমার মনে আছে বোধ হয়। কিন্তু এও নিশ্চয় মনে আছে যে, 'মাস্টারমশাইয়ের চিঠির গোড়ায় কথা ছিল এদের অত্যাচার—শুধু এদেরই কেন? এরা চোখের সামনে একটা উদাহরণ, চারদিকেই তো এই অত্যাচার—এক দল পিষছে, এক দল পিষ্ট হচ্ছে; মজার কথা এই যে, যারা পিষ্ট হচ্ছে তারাই পেষবার ক্ষমতাটা যাচ্ছে যুগিয়ে। একেবারে রাজা-প্রজার সম্বন্ধের কথা থেকেই ধর না; যখন নিজের রাজা ছিল, একটা কথা ছিল; কিন্তু এরা তো বলতে পারবে না—আমরা সূর্যবংশ, বা চন্দ্রবংশ, আকাশ থেকে নেমে এসেছি তোমাদের শাসনের জন্য,—কিসের জোরে ওরা জেঁকে বসেছে আমাদের ওপর?—ওদের প্রবঞ্চনা আর আমাদের দুর্বলতার জোরেই তো? তারপর ক্রমাগতই পিষে যাচ্ছে। খনির কথাতেই আসা যাক—হীরকের মা অমন ভাবে মরবে কেন? বরাবর তো ওই কোম্পানির আয়ের ঘরে জমার আঁক বসিয়ে এসেছে নিজের সুখ সচ্ছলতা বলি দিয়ে—স্বামীর জীবন পর্যন্ত দিয়ে। একটা মাস কোম্পানি তার কথাটা একটু ভাবতে পারত না?"

উত্তেজনায় গলা কাঁপিয়া যাইতেছে; কথাগুলা মাস্টারমশাইয়ের কালকের চিঠি থেকে টাট্‌কা তোলা, কিন্তু সুসঙ্গতি রক্ষা করিতে পারিতেছে না; উত্তেজনার মাথায় এলোমেলো হইয়া যাইতেছে। শেষে যেন খেই হারাইয়াই হঠাৎ থামিয়া গেল।

চম্পা নতমস্তকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

টুলু মনটাকে একটু গুছাইয়া লইয়া আবার আরম্ভ করিল—"অথচ কাজ আমি কি নিয়েছি, না, হীরককে মানুষ ক'রে তোলবার; তার সঙ্গে দুটো শিশুকে শিক্ষা দিচ্ছি,—কবে তারা বড় হবে, মানুষের মতো নিজের কড়া-গণ্ডা বুঝে নিতে পারবে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে। ততক্ষণ কত চরণদাস, কত হীরকের মা যে নিঃশেষ হয়ে যাবে সেটা তো একবার ভেবে দেখছি না। না, এ চলবে না। এত ধৈর্য আমার নেই চম্পা। আগে অত্যাচারের পথ বন্ধ করতে হবে, তারপর গড়ার কাজ। আজ দু'দিন থেকে

আমি এই কথাই ভাবছি। তুমি জান কিনা বলতে পারি না। চারিদিকে খনিতে ধর্মঘট আরম্ভ হয়ে গেছে, খুনজখমও হয়েছে—তা হোক,অমন হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এতেই ভালো হবে, এই একমাত্র উপায়। আমিও এখানে এ-ই আরম্ভ করব—লোক ক্ষেপিয়ে দোব, নেহাত না পারি এখানে, যেখানে আগুন জ্বলেছে সেখানে যাব। আমি আজকে তার নির্দেশ পেয়েছি, তাইতেই অন্ধসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাসের কথাটা তুলেছিলাম তোমার কাছে।"

চম্পা তেমনই স্তব্ধ ভাবে মাথা নিচু করিয়া নিজের আশঙ্কা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার জানা কথা, এই রকমটি হইবে; একটু সেবা, সামান্য একটা শিশুর দুটি কচি হাতের বাঁধন দিয়া এ মানুষকে ধরিয়া রাখা যাইবে না; অথচ নিজের সব খোয়াইয়া তো সে এরই পাশে আসিয়া দাঁড়াইল—কত উচ্চ আশা, কত বড় একটা নূতন জগতের কল্পনা লইয়া! স্তব্ধ ভাবে শুনিয়া যাইতেছিল, শেষের কথায় মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল—"বুঝলাম না, অন্ধবিশ্বাসের কি আছে এর মধ্যে?"

"—পঞ্চকোট-পাহাড়ের ঐ আগুন। তোমার মনে আছে কি না জানি না, মাস্টারমশাইয়ের সেই চিঠিটাতে এক জায়গায় কোন অদৃশ্য শক্তির কথা লেখা ছিল। অবশ্য কার্যকারণ কোন সম্বন্ধ নেই, তবুও আমার যেন মনে হচ্ছে সেই শক্তি ঐ আগুন জ্বালিয়ে আমায়ও আগুন জ্বালাবার ইশারা দিলেন। বুঝছি, দুটোর কোন সম্বন্ধ নেই—তবু যেন মনে হচ্ছে, সময় হয়ে এসেছে, এভাবে এই বাড়িটুকু আঁকড়ে ব'সে থাকা অন্যায় হবে।"

একটু থামিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল—"তুমি কি করবে?"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না পাইয়া এই প্রশ্নেরই জের ধরিয়া বলিল—"তোমায় আমি কতকটা জড়িয়ে ফেলেছি এই সব কাজে; তুমি ওদিককার পাট চুকিয়ে দিয়ে এসেছ, তাই তোমার কথাও মনে উঠছে বড্ড বেশি ক'রে।"

চম্পার উত্তর ততক্ষণে ঠিক হয়েছে, ম্লান হাসিয়া বলিল—"ভগবান আমায় মেয়েছেলে ক'রে গড়েছেন, বাড়ি আঁকড়ে প'ড়ে থাকাই আমার কপালের লেখন।"

কথাগুলিতে অভিমান যেন উপচিয়া পড়িতেছে, টুনু মুখের পানে চাহিল। চম্পা একটু হাসিয়া বলিল—"কিন্তু আমার একটা কথা শুনবেন কি?"

"বল।"

"কথাটা একেবারেই আমার মনের কথা, ধর্ম সাক্ষী ক'রে বলছি—আপনি না মনে ভাবেন, আপনাকে ফেরবার জন্যে আমি বাজে তর্ক করছি একটা। কথাটা হচ্ছে, আপনি বলছেন, আপনার হাত দিয়ে আগুন জ্বালাবার জন্যে ভগবান ঐ একটা নিশানা দিয়েছেন আজ। কিন্তু এমনও কি হতে পারে না, আপনার মনে যে কথাটা উঠেছে বলছেন কাল থেকে, তাই থেকে আপনাকে ফেরাবারই এ একটা উপায় তাঁর?—মনে একটা খটকা লাগিয়ে দিয়ে···"

"কি রকম?"

চম্পা একটু ভাবিল, তাহার পরে বলিল—"আসলে সে সব কিছুই নয়, এটা আপনিও বুঝছেন—মনের মধ্যে যখন যে খেয়ালটা ওঠে সেটাকে মানুষে বাইরের ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে দেখে; আগুন যেখানে লাগবার লেগেছে, তার সঙ্গে আপনার কি করা উচিত অনুচিত তার কি-ই বা সম্বন্ধ থাকতে পারে বলুন? তবু একবার ভেবে দেখুন—কি সর্বনাশটা না হচ্ছে আজ ঐ পাহাড়ের গায়ে—কি অপঘাত—কত হাজারে হাজারে মরছে সব!—পুড়ছে, আধপোড়া হয়ে বাঁচবার জন্যে মিছে ছুটে আবার সেই আগুনে পড়ছে বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে, কিংবা হয়তো নিজের প্রাণ বাঁচাতে তাদের আগুনের মধ্যেই ফেলে—যেগুলো হয়তো পারলে পালাতে, প্রাণের ভয়েই এমন দুশো চারশো হতে নিচে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে শেষ হয়ে গেল।···আপনার আগুন জ্বালা কি ধরনের ঠিক বুঝতে পারছি না,. তবে সব আগুনই তো আগুন, কমবেশি ক'রে ফল তো এই। ভগবান মানুষকে কি জেনেশুনে এই রকম একটা কাজের দিকে ঠেলে দেবেন? —তবে আর কার কাছেই বা ভরসা মানুষের?..."

বুড়ির নাতিটি পাশেই একটু পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল, আঁচলের খুঁটটা ধরিয়া একটু টান দিতে চম্পার হুঁশ হইল, ঘুরিয়া বলিল—"তুই এখনও দাঁড়িয়ে এখানে?···তা যা, আমি আসছি।"

ছেলেটি প্রশ্ন করিল—"কাপড়গুলো কাকে দিব্‌বো?"

হাতে খানকতক বাণ্ডিল একটা কি দিয়া বাঁধা, মনে হয় যেন রঙচঙে ছিটের

কাপড়। টুলু বলিল—"হীরার জন্যে নাকি? এত কাপড় একটা কচি ছেলের জন্যে?"

চম্পা একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলিল—"ওর নিজের গায়ের জন্যে নয়, তবে···"

কথাটা শেষ করিতে দিবার জন্য একটু অপেক্ষা করিয়া টুলু প্রশ্ন করিল—"তবে···কি?"

"রাগ করবেন না, আপনি তো সবই দিচ্ছেন, বাবার ওদিক থেকেও বাঁচে আজকাল, তবে হীরার খরচের জন্যে···"

টুলু অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া শুনিতেছিল, বলিল—"বুঝলাম না।"

"কিছু ছিট বাজার থেকে কিনে নিয়ে এলাম, জামা পিরান সেলাই ক'রে দোব, বিক্রির জন্যে; একটা দোকানও ঠিক করেছি···"

"হীরার খরচ জোগাবার জন্যে?···কিন্তু তার তো ভাতা পাচ্ছ পনের টাকা ক'রে..."

একটু বিরক্ত কণ্ঠেই বলিল—"চম্পা, হীরা গরীবের ছেলে, গরীবের মতোই তাকে মানুষ করতে হবে। তার খরচের জন্যে এত···"

"গরীবের ছেলের মতোই করছি মানুষ তাকে, শুধু ভাতার টাকার বদলে··· মানে, ও-টাকাটা পুষিয়ে নিতে···"

"বদলে মানে! তোমায় ওরা আর দিচ্ছে না ও-টাকাটা? কেন, কাজ ছেড়ে দিয়েছ ব'লে?"

চম্পা অল্প একটু হাসিয়া বলিল—"কাজের সঙ্গে ও-টাকাটার কোন সম্বন্ধ যে নেই জানেনই তো; কিসের সঙ্গে সম্বন্ধ তাও জানেন আপনি। কতদিন আর এ সব অপমান সইব? তাও···আর হীরা আগে যার ছেলেই থাক্, এখন আপনার, এই পাপের টাকায় ওর শরীর গ'ড়ে উঠলে সে পাপ কি এ জন্মে মিটবে কখনও?"

সঙ্গে সঙ্গেই এই বড় কথাটাকে চাপা দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি আরম্ভ করিল—"হ্যাঁ, আমাদের যা কথা হচ্ছিল—পাঁচকোটের আগুন নিয়ে কথাগুলো বললাম বটে আপনাকে, কিন্তু এতটুকুর জন্যেও ভাববেন না যে—"

এইখানে বাধা পড়িয়া গেল। দেবতার খাওয়ায় নজর পড়ায় ভয়ে বনমালী

এতক্ষণ দম বন্ধ করিয়া ভিতরে বসিয়া ছিল, আর পারিল না, বুড়ির নাতনিকে সঙ্গে করিয়া ফটকের বাহিরে আসিয়া বলিল—হঁ, খাইছেঁ এখনও; উ থাবেক—উর পরিতুষ্ট না হ'লে···"

তাহার পরই সামনে টুলু, চম্পা আর ছেলেটির উপর নজর পড়িল, টুলুকেই উদ্দেশ করিয়া বলিল—"এখনও তক্ দিথছেঁন আপনি? নজরটি দিতে নাই গো।"

টুলু হাসিয়া বলিল—"এত ঢাক পিটিয়ে খেলে মানুষে নজর লুকোয় কোথায় সেটা বল। যাক্, আমার পেটেও ঢুকেছেন; একটু ঠাণ্ডা করবার ব্যবস্থা করগে চম্পা।"

নিজে বাসার দিকে পা বাড়াইল।

॥ ত্রিশ ॥

টুলুর মনটা অনেকখানি হালকা হইল।

চম্পার যুক্তির কাছে ঠিক যে পরাজয় মানিল এমন নয়, তবে যুক্তির কথাগুলা শুনিয়া যেন বাঁচিল। আসল কথা, অনেক সময় মন যেটা একেবারেই চায় না সেইটা লইয়াই সবচেয়ে বেশি লম্ফঝম্ফ শুরু করিয়া দেয়। টুলুর মন বিপ্লবী নয়, অন্তত এখন পর্যন্ত হইয়া ওঠে নাই; তাহার জন্য জীবনের সঙ্গে আরও প্রত্যক্ষ যোগ দরকার, আরও তিক্ত অভিজ্ঞতার দরকার; তাই—বিপ্লবী নয় বলিয়াই, বিপ্লবের স্বরে অমন করিয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল।

টুলু যেন বাঁচিল। সত্যই তো—বিপ্লবের আগুন পঞ্চকোটের ঐ দাবাগ্নির মতো অযথাই ভয়ঙ্কর তো! ওটা অদৃশ্য শক্তির নিষেধ না হইয়া যদি নির্দেশই হয় তো সত্যই আর কাহার কাছে ভরসা মানুষের?

অনেক রাত পর্যন্ত রহিল জাগিয়া, তবে স্থিরভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা লইয়া। মাস্টারমশাই কি সত্যই তাঁহাকে বিপ্লবের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে বলিয়াছেন? তাঁহার একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয় এই যে—জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হইলে টুলুকে কতটার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু আপাতত টুলুকে কি করিতে হইবে তাহার নির্দেশ তো দিয়াছেন শেষের দিকে—"আরও শিশুকে

তুমি বুকের কাছে টেনে নাও, আরও নারীর জীবনকে তুমি গ্লানিমুক্ত কর, চরণদাসের মতো আরও যারা তাদের এক এক ক'রে নাও তুমি তুলে।"

এই গড়া জিনিস ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া?—উচিত? পঞ্চকোটের আগুনের কথার চম্পার কথাই তো ফলে তাহা হইলে। প্রথমে তো ইহারাই হইবে বিনষ্ট—ঐ শিশু, কি হইবে ওর পরিণতি? ভিখারিণী, তাহার নাতি-নাতনি দুটি—এই কয়টা দিনেই কত নিচু থেকে কত উঁচুতে আসিয়া উঠিয়াছে, আবার কোথায় তলাইয়া যাইবে? চরণদাসের জীবনের দিক্‌চক্রবাল পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে, সেই সঙ্গে ওর সঙ্গী আরও অনেকের। আর চম্পা, ভাবিতেও আশ্চর্য লাগে, কী অন্ধকারের মধ্যে যাইতেছিল ডুবিয়া!—প্রথম দিনের সেই দেখা—দুয়ারের চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে সজ্জায় ভঙ্গিমায় নরকের অভিসন্ধি লইয়া—তাহার পর বালিয়াড়ির পথের সেই অভিসার। সেই চম্পা আজ, কলুষের ছায়া আছে বলিয়া হীরকের জন্য অত করিয়া চাহিয়া লওয়া টাকাটার এক কথাতেই মায়া কাটাইয়া বসিল। মাস্টারমশাই লিখিয়াছিলেন—"একটা নারী শুধরাইয়া গেলে একটা জাতি শুধরাইয়া যাইতে পারে।"…চম্পা সেই ধরনের নারী। শুধু তাহাকে বাঁচাইয়া তোলাই তো একটা জীবনের সাধনা হইতে পারে।…টুলু আজ গঞ্জডিহি ছাড়িয়া যাক্—চম্পা তাহার ঐ রূপ, এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি লইয়া কোথায় নামিয়া যাইবে—গভীর নিরাশায় হয়তো কত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে, তাহার কি কোনও হিসাব আছে?

অবশ্য এক কথাতেই সমাধান হইল না, মনটা বিপ্লবের বিরাট প্রসার থেকে ফিরিয়া আসিয়া এই ছোট গণ্ডির মধ্যে যেন আরও হাঁপাইয়া উঠিল। তাহার পর একদিন হঠাৎ একটা সামান্য ব্যাপারে টুলু খানিকটা নূতন কাজের সন্ধান পাইয়া গেল; কাজটুকু বেশ মনের মতো, তা ভিন্ন বিস্তারেরও বেশ চমৎকার সম্ভাবনা আছে।

দিনকয়েক পরের কথা। আজকাল বস্তিতে নিয়মিত ভাবেই যায় একবার করিয়া। ওর হোমিওপ্যাথির যশ বাড়িয়াছে, অনেকগুলি রোগী হাতে,—শখের চিকিৎসায় শখের রোগীও আছে, আবার প্রকৃত রোগীও আছে, একবার দেখিয়া শুনিয়া খবর লইয়া, খানিক বেড়াইয়া সন্ধ্যার সময় চলিয়া আসে।

ঔষধের সঙ্গে পথ্যেরও ব্যবস্থা করিতে হয় এক-আধ জনের। গরীব হোক, কিন্তু প্রায় সবারই এদিক দিয়া একটা সঙ্কোচ থাকায় খুব যে বেশি খরচ হয় এমন নয়; অনেক সময় নিজেই জোর করিয়া হাতে দু'আনা এক আনা যাহা দরকার গুঁজিয়া দেয়। সেদিন এই ভাবেই একবার ব্যাগটা বাহির করিতে গিয়া দেখে সেটা নাই। একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল, তাহা ভিন্ন মনটা গেল খারাপ হইয়া। অনেক সময় একটু ভালোরকম রোগী দেখার সময় দশ-বারো জন ভিড় করিয়া দাঁড়ায় চারি দিকে, বেশির ভাগই ছেলেমেয়ের দল। শুচিবাই নাই বলিয়া কিছু বলে না টুলু।

আজও এই রকম একটি দল ঘিরিয়া আছে। কেহ বাহির করিয়া লইল নাকি ব্যাগটা? রোগী একজন বৃদ্ধ, পাঁচ ছয় দিনের জ্বরে বিছানায় পড়িয়া আছে, মুখের ভাব দেখিয়া প্রশ্ন করিল—"কি হইছেঁ বাবুমশয়?"

সঙ্গে সঙ্গেই বিছানায় উঠিয়া বসিয়া রাগে চীৎকার করিয়া উঠিল—"বুঝেছিঁ, পকেট মারলেক! তুরা দাঁড়া, আমি দিখব তুদের কাপড়, যত সব অর্থদ্যৈ ভিড় ক'রে দাঁড়াবে পকেট মারবার জন্যে!..."

এরা পলাইলেও গোলমাল শুনিয়া অন্য লোক জুটিল। বৃদ্ধ উঠিয়া তাড়া করিতে যাইতে টুলু তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, বলিল—"হয়েছে গো কর্তা, মনে পড়েছে, আমি বেরই করি নি ব্যাগটা; আনিই নি—ভুলে গেছলাম কথাটা!"

অনেক বলায় ঠাণ্ডা হইল। মনটা কিন্তু বড় অপ্রসন্ন হইয়া রহিল টুলুর। বেশ স্মরণ আছে বাহির করিয়াছিল ব্যাগটা; এই ভাবে গেল?—এদেরই উপকার করিতে আসিয়া?

পাছে চাপা দিতেছে বলিয়া কেহ সন্দেহ করে, সেইজন্য রোজদিনের মতোই জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ফিরিল একটু; তাহার পর কিন্তু বেড়াইতে গেল না, সোজা বাসায় চলিয়া গেল।

রাস্তার ধারের জানালা দিয়া ভিতরে নজর পড়িতে দেখিল, ব্যাগটা বিছানার উপর পড়িয়া আছে। বাড়িতে কিন্তু হট্টগোল, বুড়ির ওদিকটায়। চরণদাসের মাতলামির হট্টগোল নয়, বুড়ির নাতি-নাতনিদের যাহা পড়ায় তাহারই টুকরা-টাকরা আট-দশটি ছেলেমেয়ের মুক্তকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ব্যাগটা তুলিয়া

লইয়া খিড়কি গিয়া দেখে বুড়ির নাতনি একটি ছড়ি লইয়া একটা চেয়ারে গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছে, বাকি সবাই—ছেলেমেয়ে যত খেলুড়ে সার বাঁধিয়া শানের উপর বসিয়া পড়ায় মত্ত—সবার সামনে এক-একখানি করিয়া মোটা বই খোলা, মাস্টারমশাইয়ের শিক্ষা, রাষ্ট্রতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের বই, তাহার ঘর হইতে সংগ্রহ করা। তাহাকে দেখিয়া সবাই একেবারে নিশ্চুপ হইয়া গেল। বস্তি হইতে যে মেজাজ লইয়া আসিয়াছিল, সেটা থাকিলে বোধ হয় ধমক দিত, কিন্তু ব্যাগটা পাওয়ায় দৃশ্যটির কৌতুকের দিকটাই মনে লাগিল বেশি করিয়া, তা ভিন্ন মাথায় একটা আইডিয়াও আসিতেছে ধীরে ধীরে, মনটা হয়তো ভালো থাকার

বুড়ির নাতি কতকটা বোধ হয় অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতাটুকু কাটাইবার জন্য দিদির দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—"উ বুললেক বই আনতে।…বুললিক নাই তুই?"

টুলু অনন্যমনস্কভাবে আর একটু দাঁড়াইয়া রহিল, কথাটা বোধ হয় কানেও গেল না তাহার। একটু পরে মেয়েটিকেই প্রশ্ন করিল—"চম্পা বাসায় আছে?"

নাই যে সেটা পাঠশালার ঘটা দেখিয়াই বোঝা উচিত ছিল, সাজার ব্যবস্থা মনে করিয়া মেয়েটি সঙ্কুচিতভাবে মাত্র একটু চোখ তুলিয়া চাহিল, ছেলেটি বলিল —"উ তো দাদুটির সাথেঁ কুথায় গেল বটে।"

অন্যমনস্কভাবেই কিছু না বলিয়া টুলু ধীরে ধীরে ফিরিয়া গেল।

সন্ধ্যার একটু আগে চম্পা আসিয়া উপস্থিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি—সেই ডাকিয়া আনিয়াছে, এই করিয়া টুলুর যতটা মন পাওয়া যায়। চম্পা একটু রাগতভাবেই প্রশ্ন করিল—"এরা নাকি আপনার বই টেবিল থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল?"

টুলু হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"সাজা দেবে নাকি?"

"দোষ প্রমাণ হ'লে পাবে বইকি সাজা।"

"দোষের কাজ করেছে, কিন্তু সেটা দাঁড়াতে পারে নি দোষে।…যাক্ ওকথা। চম্পা, আমি স্কুল খুলব ঠিক করেছি।"

"স্কুল খুলবেন! কোথায়?"

"ঐ স্কুলেই। এখন তো ছুটিই রয়েছে।"

চম্পা চুপ করিয়া মুখের পানে একটু চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—"হঠাৎ এ খেয়াল হ'ল যে?"

"কথাটা বরং একটু ঘুরিয়ে জিগ্যেস কর, অর্থাৎ এতদিন এ খেয়াল হয় নি কেন? আমিও সেই কথাই শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম,—এইটিই আমার সবচেয়ে মনের মতন কাজ, এত সুবিধেও, অথচ এতদিন হয় নি কেন মনে? কিছুদিন আগেকার কথা—স্কুলের দুটি ছেলেকে বড় ভালো লেগেছিল আমার—বাসায় ডেকে এনে গল্পস্বল্প করতাম। হঠাৎ একদিন টের পেলাম, তাদের এখানে আসা মানা। সেই থেকে সেকেণ্ড মাস্টারের ভয়েই হোক বা তার ওপর ঘেন্নাতেই হোক, মনটা এমন গুটিয়ে গেল যে সেই জন্যেই হয়তো স্কুলের কথা মনে হয় নি।"

শেষের দিকটায় একটু হাসিল।

শেষের দিকটাতেই চম্পার ঠোঁটের এক প্রান্ত বিরক্তিতে একটু কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, মন্তব্য করিল—"এ নষ্টামি কি সেকেণ্ড মাস্টারের মনে করেছেন?"

"না, ম্যানেজারের।...সেইজন্যেই তো ঘেন্নায় কথা বললাম, ধার করা নষ্টামির ওপর নিজের মনুষ্যত্ব বিক্রি ক'রে দেওয়ার শিলমোহর থাকে কিনা। এই লোকটাই মাস্টারমশাইয়ের চেয়ারের অমর্যাদা করছে আজকাল।...যাক্, কি কথায় কি কথা এসে গেল! মোটের ওপর, স্কুলের কথা ভাবি নি, আজ ওদের স্কুলের ঘটা দেখে হঠাৎই মনে হ'ল—তবে আমি নিজেই বা একটা না বসাই কেন?"

ভিতরে ভিতরে একটি আনন্দের জোয়ার যেন কূল ছাপাইয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল চম্পার মনে। পঞ্চকোটের সেই আগুন লইয়া যে সেদিন কথা হইল তাহার পর হইতে একটা চাপা আশঙ্কায় তাহার মনটা ছিল ভরিয়া। টুলু যায় নাই কোথাও, আগুন লাগাইবার মতো করে নাই কিছু, দিনগত কাজগুলি আগেকার মতোই করিয়া যাইতেছে, তবে ভাবটা থমথমে, ভয় হয় যে-কোন মুহূর্তেই হয়তো বাঁধন ছিঁড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে। যায় নাই, তবে চম্পার যুক্তি যে মনে বসিয়াছে এমন কোন প্রমাণও পায় নাই চম্পা। প্রসঙ্গটা নূতন

করিয়া তুলিতে সাহসও হইতেছিল না, মুখ বুজিয়া শঙ্কিত দৃষ্টিতে গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিল।

এ সব উল্লাস প্রকাশ করিতেও সাহস হয় না, বরং ভয় হয় পাছে আপনা হইতে প্রকাশ হইয়া পড়ে। চম্পা নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া টেবিলে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল, প্রশ্ন করিল—"তা আমায় ডেকেছেন যে ?"

"ছেলে জোগাড় করতে হবে, আড়কাঠি চাই না ?"—একটু হাসিল।

বড় মিষ্ট লাগিতেছে চম্পার, এমনই এই সেবার আহ্বানগুলা লাগে মিষ্ট, আজ আশঙ্কার অবসানে আরও মিষ্ট লাগিতেছে, একটু ঘাঁটাইয়া কথা বাড়াইতে ইচ্ছা করিতেছে। বলিল—"আমার দ্বারা হবে মনে করেন ?"

"সে কি কথা! তুমি আবার কেড়ে আনতে পার যে ছেলে!"

বেশ জোরেই হাসিয়া উঠিল, চম্পাও হাসিয়া মুখটা ঘুরাইয়া লইল, বলিল—"হীরের বদনাম আমার যাবে না জীবন থেকে দেখছি। বেশ, দেখব আমি চেষ্টা, আমার কেড়ে-আনা ছেলের যখন পয় আছেও দেখছি। কিন্তু একটা কথা, ওরা ও-স্কুলে জায়গা দেবে কেন ?"

"সেইটেই তো আমার উদ্দেশ্য।"

"বুঝলাম না।"

"জোর ক'রে নোব জায়গা, আমার যা কাজ তাতে ও বোঝাপড়াটা তো এক সময় না এক সময় করতেই হবে এদের সঙ্গে চম্পা।

চম্পার মুখের দীপ্তিটা যেন নিবিয়া গেল, সেই বিদ্রোহ, সেই পঞ্চকোটের আগুন মনে মনে ধিকি-ধিকি জ্বলিতেছে; পড়ানো একটা অছিলা মাত্র।

সমস্ত আশঙ্কার কথাটা না বুঝিলেও টুলু আবার একটু নরম হইয়া গেল হয়তো এই ভাবিয়া যে, চম্পা এতটার জন্য প্রস্তুত নয়, সহায়তা দিয়া উঠিতে পারিবে না। বলিল—"কিন্তু এখন সে ভয় নেই, স্কুল বন্ধ, আমি নিজে পড়াচ্ছি, এতে আর কার কি আপত্তি থাকতে পারে, বিশেষ ক'রে ম্যানেজার নেই যখন।"

চম্পার প্রশ্ন করিল—"এর পরে—স্কুল খুললে—

"আমার স্কুলটা হবে সকালে, কারুর স্কুলের ঘাড়ের ওপর তো স্কুল বসাতে যাচ্ছি না।"

কথাটা এমন একটু চাপা উষ্মার সহিত বলিল, যেন চম্পা ও-পক্ষের উকিল, তাহার মারফৎ ও-পক্ষকেই শুনাইয়া দিতেছে কথাটা।

চম্পা হাসিয়া ফেলিল, বলিল—"আমার ওপর রাগের কিছু নেই, আমি তো ঘাড়ের ওপর স্কুল বসাতে চাইলেও ছেলেমেয়ে এনে দোব আপনাকে, অন্তত চেষ্টা করব। বলছিলাম, চারদিক দিয়ে কথাগুলো একবার ভেবে দেখা ঠিক নয় কি গোড়াতেই ?

টুলু আবার নরম হইল, বোধ হয় একটু অপ্রতিভও, বলিল—"না, আমি যে ওদের ঘাড়ে প'ড়ে ঝগড়াই করতে চাইছি এমন নয়। তাতেও আপত্তি হয় ওদের, তখন এইখানেই সরিয়ে আনব আমার স্কুল। বেঞ্চ-ডেস্কগুলো যে এতই দরকারী এমন তো নয়..."

চম্পা একটু মাথা নিচু করিয়া রহিল, তাহার পর একটু সঙ্কুচিতভাবেই বলিল—"এইখানেও ঐ ভয় আছে না কি ?

টুলু এবার বেশ ভাল ভাবেই রাগিয়া গেল, বিছানার উপর গুটাইয়া বসিয়া বলিল—"না চম্পা, এখানে আমি কারুর অধিকার মেনে নোব না। আমি যে তার জন্যে কতদুর পর্যন্ত তোয়ের আছি, আর কেউ না জানুক, তুমি তো জান সে কথা। এ মাস্টারমশাইয়ের বাসা, আমার চোখে তাঁর মন্দির; তাঁর জীবনের যা ব্রত—তার যতটুকু আমার হাতে তুলে দিয়েছেন তা সাধ্যমত আমি পালন করবই—সে সাধ্যমতর মানে কি তুমি তা জানও। তোমার সাহায্য আমি চেয়েছি এই বিশ্বাসে যে, খানিকটা পর্যন্ত আমার সঙ্গে এগুতে তুমি তোয়ের আছ, তা যদি তুমি না থাক তো..."

চম্পা ধীরে ধীরে মুখটা তুলিল, একটু অপ্রতিভ ভাবেই বলিল—"খানিকটা কেন ? যতদুর আপনি নিয়ে যাবেন দয়া ক'রে। বললাম তো ভয়ের জন্যে নয়, কাজ যাতে আপনার ভালো ক'রেই হয় তাই জন্যেই চারিদিক শুধু একটু ভেবেচিন্তে দেখা; সেও কি আপনার চেয়ে আমি ভালো ক'রে দেখতে পারি ?"

॥ একত্রিশ ॥

স্কুল আরম্ভ হইল।

চম্পার যুক্তির উপর শ্রদ্ধাটা আরও বাড়িয়াছে টুলুর, সেই জন্য গোড়া থেকেই বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়াই আরম্ভ করিল। সত্যিই তো, নিবারণের চেষ্টা সত্ত্বেও সংঘর্ষ যদি নিজে হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়, উচিতমত তাহার ব্যবস্থা করার মানে হয়; সংঘর্ষকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাহার সামনে বুক ফুলাইয়া দাঁড়ানো বাহাদুরির একটা বিলাস মাত্র নয় কি?

গোড়া থেকেই স্কুলটা মাস্টারমশাইয়ের বাসাতেই বসাইল। সংঘর্ষের দ্বিতীয় সম্ভাবনাও এড়াইয়া গেল। দুপুরটা বাদ ছিল; সকালে দুই ঘণ্টা বিকালে দুই ঘণ্টা—গুরুমশায়ের পাঠশালার মতো। এর আরও সুবিধা এই যে, বিকালের পড়াটা থাকিবে খেলার সঙ্গে গায়ে গায়ে লাগানো, ক্লাস থেকেই ছেলেরা খেলার প্রাঙ্গণে নামিবে; খেলাটাও হইবে টুলুর দৃষ্টির নিচে, তাহারই বিধানমতো। শেষ করিয়া যে যাহার বাড়ি চলিয়া যাইবে।

আরও একটু বিবেচনা করিয়া দেখিল—হুড়হুড় করিয়া একেবারে একপাল ছেলেমেয়ে আনিয়া ফেলা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। বিকালে খেলার জন্য যে কয়টি ছেলেমেয়ে আসে, তাহাদের লইয়া আরম্ভ করিল, তাও খেলাচ্ছলেই, স্কুল আরম্ভ হইল বলিয়া কোন রকম আড়ম্বর না করিয়াই। ঐ কেন্দ্র থেকেই ধীরে ধীরে আপনার প্রেরণা আর প্রয়োজনে যেমন বাড়িবার বাড়িয়া চলিবে তাহার স্কুল।...টুলুর মনটা বড় বেশি করিয়া সাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল এ পরিকল্পনায়, তাহার স্কুলের ছেলেরাই এক সময় হইয়া উঠিবে নিজের অধিকার, নিজের কল্যাণ সম্বন্ধে সচেতন, তাহার স্কুলের মেয়েরাই গ্লানিমুক্ত হইয়া ধীরে ধীরে নারীর গৌরবে বিকশিত হইয়া উঠিবে। মাস্টারমশাই বিপ্লব দিয়া যে নূতন জগতের সৃষ্টি করিতেছেন, তাহার জন্য মানুষ চাই না?—এরাই হইবে সে জগতের নূতন মানুষ।

অনাড়ম্বর ভাবে আরম্ভ করার আর একটা সুবিধা এই যে, তাহাতে বৈরিতার সম্ভাবনা আরও গেল কমিয়া। মনটা কয়েক দিন অতিমাত্র উগ্র হইয়া উঠিয়া এই নূতন স্বপ্নে এত স্নিগ্ধ হইয়া গেছে যে, এমন কিছুই খুঁত রাখিতে ইচ্ছা করিতেছে না যাহাতে সংঘর্ষ দূরের কথা, সামান্য একটু উত্তাপেরও সৃষ্টি হয়। চম্পাকে নিজের মনের কথাটা বলিল। চম্পা আরও যেন বাঁচিল, এমন লোকের এত সুমতি হইবে এ তাহার কল্পনারও অতীত। তাহা ভিন্ন আর একটা কথা ছিল, তখন কথাপ্রসঙ্গে উৎসাহ দেখাইল বটে, কিন্তু টুলুর স্কুলের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়া ছেলেমেয়ে যোগাড় করা তাহার পক্ষে কতটা ঠিক হইবে চম্পা পরে ভাবিয়া দেখিয়া বেশ ভালরকম বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। বস্তিতে বা অন্য যেখানে তাহার যাওয়া-আসা আছে, সবাই জানে তাহার ঠাকুরদাদা বুড়া হইয়াছে, অল্পতেই অসুস্থ হইয়া পড়ে, তাই তাহার তদারকের জন্য সে এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। টুলুর সম্বন্ধে যদি কোন আলোচনা হয়—আজকাল ক্রমেই বেশি করিয়া হইতেছে, সে এমন ভাবটা দেখায় যেন মানুষটার সম্বন্ধে তাহারও কিছু কিছু জানা আছে—বনমালীর মারফৎই হোক, চরণদাসের মারফৎই হোক, বা ঐদিকেই অন্য কোথাও গল্প শুনিয়াই হোক। সেই টুলুর কাজে যদি এমন করিয়া বুক দিয়া পড়িতে যায়, বস্তির ওরা কি সেটা সুনজরে দেখিবে?

স্কুল ধীরে ধীরে জমিয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমে এক-আধটি করিয়া বস্তির ছেলেমেয়েই বাড়িল, তাহার পর আস্তে আস্তে খবরটা চারাইয়া পড়িয়া আশেপাশের ছেলেমেয়েও জুটিতে লাগিল। বস্তির পড়ুয়ারা বই পায়, স্লেট পায়; বাহির হইতেও যাহারা পড়িতে আসে তাহাদের মধ্যেও যাহাদের তেমন অবস্থা নয়, চাহিলেই পায়। মাহিনা কাহারও লাগে না। অভিভাবকদের দিক থেকে এই সুবিধা, পড়ুয়াদের সুবিধা চারদিক দিয়াই। লেখাপড়াটা যে এক ধরনের খেলাই—এ অভিজ্ঞতাটুকু তাহাদের মাথা হইতে মস্ত বড় একটা দুশ্চিন্তা নামাইয়া দেহমন একেবারে হালকা করিয়া দিল। এদিকেও হালকা,—একখানি করিয়া বই, একটি স্লেট; যাহারা প্রাথমিক দুই-তিনখানি বই শেষ করিয়া বাড়ি হইতে আসিয়াছে, পড়ুয়া হিসাবে মাতব্বর, তাহাদেরও দুইখানির বেশি বই নয়। সাতটি লইয়া আরম্ভ করিয়াছিল। দিনটা ছিল

বুধবার, পরের বুধবার পর্যন্ত ছেলেমেয়েতে দাঁড়াইল পনেরটি। চম্পা বলিল—"এক কাজ করেন তো আরও হু-হু ক'রে বেড়ে যায়। মেয়েদের যদি বাদ দেন। আপনার স্কুলের যশ হয়েছে—শুনতে পাই তো; তবে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে—ঐখানে একটু খুঁতখুঁতুনি আছে অনেকের।"

টুলু বলে—"যশের আসল দিকটাই তুমি বাদ দিতে বলছ—অবশ্য আমার নিজের ধারণার দিক দিয়ে বলছি; বরং ছেলেদের বাদ দিয়ে মেয়ে যদি বাড়ে তো রাজি আছি;—এদেরই দরকার বেশি।"

স্কুলই এখন টুলুর সমস্ত চিন্তা, সমস্ত সত্তাটিকে দখল করিয়া লইয়াছে। দুপুরের কয়েক ঘণ্টা বাদ দিয়া সমস্ত দিনই জায়গাটি এখন কচি মুখের কলকাকলিতে থাকে ভরিয়া। আনন্দের মধ্য দিয়া কচি মনের ধীরে ধীরে উদ্বোধন একটা আনন্দমিশ্রিত বিস্ময় জাগায়। কি করিয়া আরও ভালোভাবে, আরও মাধুর্যের মধ্য দিয়া এদের ফুটাইয়া তোলা যায়? পড়ার চেয়ে দেহমনের স্ফূর্তির দিকেই দিয়াছে বেশি ঝোঁক। দেয়াল দিয়া ঘেরা জমিটার অনেকখানি লইয়াছে কোপাইয়া। বনমালী, চরণ, প্রহ্লাদ তিন জনেই সাহায্য করে। তাহাদের মধ্যেও একটা উন্মাদনা আসিয়া গেছে; স্কুলের জন্য যাচিয়া কাজ চাহে। এখন বাগানটা হইয়াছে আরও অনেক বড়। পনেরটি ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ভাগ করা, অঙ্কুরের হালকা সবুজে গেছে ঢাকিয়া—ওদের সঙ্গেই, ওদের স্কুলের সঙ্গেই সমস্তটার কেমন একটা মিল আছে। টুলু বলিয়াছে, ফসল যাহা হয় ওরা সবাই ভাগ করিয়া লইবে; কাহাদের বাগান কত পরিচ্ছন্ন, কাহারা কত ফসল তুলিবে তাহা লইয়া একটা রেষারেষির খেলা পড়িয়া গেছে।

ওর স্কুলের একটা বিশিষ্টতা ছেলেমেয়েদের নিজেদের পরিচ্ছন্নতা। নিজের দেহ থেকে আরম্ভ করিয়া কাপড়, পিরান—যাহার পিরান আছে—নিজেকেই পরিষ্কার রাখিতে হয়। টুলু বলে—"এইটি বাপু আমার স্কুলের এক নম্বর নিয়ম। ছেঁড়া পরায় লজ্জা নেই, বরং যখন বাপ-মা জোটাতে পাচ্ছে না, হাসিমুখে ছেঁড়া পরাতেই বেশি বাহবা; নোংরামি কিন্তু একটা ভূত, তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে রাখতেই হবে সবাই মিলে।"

সুস্থ দেহমনের সমস্ত শক্তি দিয়াই উহারা সবাই ঠেলিয়া রাখে। টুলুর মুখের

একটা কথা খুব চলতি হইয়া গিয়াছে, সবাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নোংরামি অনুসন্ধান করে। কাহারও দেহ বা বস্ত্রে সামান্য একটু দেখিলে মাস্টারমশাইয়ের কথা লইয়া চাপা হাসি, ফিসফিসানি পড়িয়া যায়—"ভূতকে ঘাড়ে ক'রে এনেছে ঐ।" অবরোধের মধ্যে শিশুরা হাসি খোঁজেও বেশি, হাসেও বেশি। কথাটা ওঝার মন্ত্রের কাজ করে। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করিল টুলু, ছিন্ন বস্ত্র—অর্থাৎ একেবারে জীর্ণ, তালি দেওয়া—লোপই পাইয়াছে; সবাই আজকাল প্রায় একখানি করিয়া নূতনই পরে, একটি করিয়া পিরানও সবারই আছে। প্রথম দিনের সেই "ভিক্ষে ভিক্ষে" খেলায় রত একটি মেয়েকে প্রশ্নটা করিল। উত্তর হইল—"বাবা ই হপ্তায় তিন দিন দারুটি খেলেক নাই—কাপুড় কিনে দিলেক; উ হপ্তা থে ছেড়ে দিবেক।"

একেবারে অতটা হয়তো আশা করিল না টুলু, তবু এই ভাবিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল যে, তাহার স্কুলের আলোর এতটুকুও বস্তির অন্ধকারের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে।

সংখ্যাটা পনেরয় আসিয়া কয়েক দিন হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, আবার গতিশীল হইল, আঠার—বিশ—বাইশ; টুলু চম্পাকে বলিল—"ছেলেমেয়েকে একসঙ্গে পড়তে দেওয়ার ভয়টাও ওরা কাটিয়ে উঠল এবার।"

আরও স্বপ্ন দেখে, নিজের পরিকল্পনায় আরও রঙ ফলায়। এত অল্পতে মন উঠিতেছে না, তবে আশার কথা এই যে, অল্প ক্রমেই পূর্ণতার দিকে আগাইয়া চলিতেছে, নিজের অন্তরের ঐশ্বর্যেই। নিজের এক খণ্ড জমি লইবে —ছোট ছোট কুটীর তুলিয়া আশ্রম-বিদ্যালয় রচনা করিবে; আর, করিতেই তো হইবে—মাস্টারমশাইয়ের সম্বন্ধ এই স্কুলের সঙ্গে যে বেশিদিন নয় এটা তো বোঝাই যায়। তখন ঐখানে গিয়া উঠিবে দুজনেই। মাস্টারমশাইকে টুলু আর ওসব কাজে দিবে নাকি যাইতে? এই বন্ধনে উঁহাকেও বাঁধিবে।

স্রোত শুধু উল্টাইল না, উল্টা দিকে প্রবল বেগেই বহিতে লাগিল।

এই সময় দিন-চারেকের মধ্যে হঠাৎ কয়েকটি ঘটনা টপটপ করিয়া ঘটিয়া গেল।

বস্তিতে টুলুর হাতে একটা রোগী ছিল। বেশ জোয়ান মরদ, বছর সাতাশ-আটাশ বয়স। এখানকার লোক নয়। যাহার বাসায় ছিল, সে কুলিদের সর্দারগোছের। বৃদ্ধ, কিন্তু খুব সবল—সমস্ত শরীর সুপুষ্ট শিরা-উপশিরায় ভরা। লোকটা আগে অন্য কোথায় কাজ করিত, এখানে মাস-কয়েক আসিয়াছে, তাহার পর কাজকর্মে দক্ষতার জন্য একটা বিশিষ্ট জায়গা পাইয়াছে। একটু গম্ভীর, কথাও কয় অল্প। মনে হইল যেন বস্তিতে বেশ একটু খাতির আছে। চরণদাসের মারফৎ খবর দিয়াছিল। টুলু চিকিৎসার জন্য উপস্থিত হইতে রোগীর পরিচয় দিল—"আমার কেউ নয়, এক স্যাঙাতের পোলা, এসে পড়েছে ঘাড়ে, কি করি? পেটের নিচে একটা ব্যথা বলছে।"

টুলুর মনে হইল, যেন ওদের ওদিককার লোক—নমশূদ্র কি ঐ রকম কোন শ্রেণীর। পরীক্ষা করিতে ভিতরে যাইতেছিল, লোকটা বলিল—"কিন্তু একটা কথা বাবু, ওষুধের দামটা ল'তে হবে, বিজিট নাই লেন।"

টুলু একটু হাসিয়া বলিল—"আমি নিই না দাম।"

"ল'তে হবে বাবু।"

মিনতির সঙ্গে বেশ একটা দৃঢ়তা আছে, যেন না লইলে অন্য লোক ডাকিবে। নূতন ঠেকিল টুলুর, আবার হাসিয়া বলিল—"তা দিও—খোরাক পিছু দু' পয়সা ক'রে; হোমিওপ্যাথিই তো।"

যুবাটি হঠাৎ মারা গেল। আজকাল স্কুল-পর্ব শেষ করিয়া একেবারে সন্ধ্যার সময় টুলু একবার বস্তিতে যায়, পথেই খবরটা শুনিল। গিয়া দেখে হৈ হৈ কাণ্ড। বাসার সামনে প্রাঙ্গণে খাটটা নামানো, তাহারই উপর মৃতের শিয়রের কাছে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ বক্তৃতা দেওয়ার মতোই বলিয়া যাইতেছে—"নোবই আমরা—আমি আমার এই মরা পুতের শিয়রে দাঁড়িয়ে শপথ করছি আমরা ছাড়ব না—আমাদের সব লুটে ওরা আমাদের শুকনো হাড়ের রাস্তা বানিয়ে তার ওপর দিয়ে ওদের মোটর হাঁকাবে—আমরা সইব না আর···আমরা খেতে চাই, পরতে চাই, মানুষের মতন থাকতে চাই—আমার ছেলে এই চাইতে গিয়ে মরেছে—একটা জান দিয়েছে; কিন্তু দুটো জান নিয়ে তবে দিয়েছে—আমার বাহাদুর ছেলের শিয়রে দাঁড়িয়ে শপথ করছি—

তোমরাও যারা বাঁচতে চাও মানুষের মতন এই বাহাদুরের গা ছুঁয়ে শপথ কর...”

টুলু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল ; সেই গম্ভীর শান্ত মূর্তি একেবারে উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, মুখে খানিকটা বিদ্যুতের আলো আসিয়া পড়ায় আরও দেখাইতেছে ভয়ঙ্কর। যতটুকু শুনিল তাহাতে মনে হইল, এ ধরনের বক্তৃতা লোকটার শোনা আছে, নিজেরও রপ্ত আছে কিছু কিছু। শ্রোতাদের মধ্যে নানা রকম প্রশ্ন-মন্তব্যে একটা মিশ্র কলরব হইতেছে। মনে হয়, অনেকক্ষণই শুরু হইয়াছে লোকটার বক্তৃতা, বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছে ; শপথের কথায় খাটটা স্পর্শ করিবার জন্য শ্রোতাদের মধ্যে একটা কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল।

সবার এই সামনে নিচু হইয়া অগ্রসর হওয়ায় লোকটার দৃষ্টি হঠাৎ টুলুর উপর পড়িয়া গেল। উৎকট ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল—“তুমি কে ? ঐ পোশাকে এখানে ?...নেকালো !”

দলটা সোজা হইয়া ফিরিয়া চাহিল। টুলু বেশ খানিকটা দূরে ছিল, দলের মধ্য দিয়া খানিকটা ভিতরে গিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—“আমিও তো তোমাদেরই মধ্যে।”

আগাইয়া একেবারে খাটের মাথায় গিয়া দাঁড়াইল। কতকটা আলো-আঁধারির জন্য, কতকটা বোধ হয় মানসিক অবস্থার জন্য চিনিতে সামান্য একটু সময় গেল, তাহার পরই লোকটা এক রকম উপর থেকেই টুলুর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—“ও ডাক্তারবাবু, রইল না, থাকল না, জোয়ান পোলা আমার !”

গোলমালটা একেবারে থামিয়া গেছে। টুলু বৃদ্ধের পিঠে হাত চাপিয়া চাপিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর কাছের কায়েক জনকে শব উঠাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়া, তাহাকে লইয়া ফাঁকার দিকে চলিয়া গেল।

শব উঠিলে ফিরিবার সময় দেখে চম্পা কাছেই একটা বাসার বারান্দার খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহাকেই দেখিতেছিল, চোখে তীব্র উৎকণ্ঠা ও ভয়।

তাহার পরদিন কি মনে হইল, বস্তিতে আর গেল না টুলু। চরণ আর

প্রহ্লাদের মুখে শুনিল, বৃদ্ধ আবার আজও বিকালে উত্তেজিত করিয়াছে সবাইকে। তাহার পরদিনও এই ব্যাপার চলিল ; প্রহ্লাদ গেল কাজে ; চরণদাস গেল না, তবে অন্য একটা ছুতা করিয়া বসিয়া রহিল—কি জানি, টুলু কি ভাবে লইবে! ভদ্রলোক ভদ্রলোক—একই তো সব।

ঘটনাটির তৃতীয় দিন চম্পা খবর দিল, ম্যানেজার আসিয়াছে। বাজারে একটা কাজ ছিল বলিয়া টুলু বৈকালে আর স্কুল করে নাই। কাজ সারিয়া ফিরিতেছিল, বাজারের শেষের দিকের একটা চালাঘর হইতে একজন লোক বাহির হইতে গিয়াই তাহাকে দেখিয়া একটু থতমত খাইয়া গেল। তাহার পর আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়াই ভিতরে চলিয়া গেল। এর আগে এর চেয়েও অল্প দেখা, তবু টুলু চিনিল—ম্যানেজারের সেই হাতসাফাইয়ের লোকটি, অর্থাৎ নিবারণ।

পরদিন বস্তির সবাই উঠিয়া দেখিল, বৃদ্ধের বাসায় তালা লাগানো, যেন রাতারাতি কোথায় চলিয়া গিয়াছে। বৈকালে চম্পাই খবরটা দিল টুলুকে। তাহার পর নির্বাক হইয়া দুইজনে পরস্পরের মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল···হাওয়াটা যেমন হঠাৎ ঝঞ্ঝাময় হইয়া উঠিয়াছিল, বৃদ্ধের অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

এর পরেই আরও একটু ব্যাপার হইল। বৈকালেই ম্যানেজারের একজন চর আসিয়া খবর দিল, পরদিন সকালে চম্পাকে গিয়া ম্যানেজারের সহিত একবার দেখা করিতে হইবে, বিশেষ জরুরী কাজ। টুলু স্কুলের ক্লাস শেষ করিয়া ছেলেমেয়েদের লইয়া বাগানের দিকে যাইতেছিল, চম্পা গিয়া বলিল—"একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে—ম্যানেজার আমায় ডেকে পাঠিয়েছে।"

কথাটা বলিয়া একেবারে যেন মর্মস্থলে দৃষ্টি প্রবেশ করাইয়া স্থির ভাবে চাহিয়া রহিল। টুলু বেশ থতমত খাইয়া গেল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল—"ডেকে পাঠিয়েছে?···তা যাবে···তার মানে, এবার তাহ'লে এখান থেকেই ছেড়ে যাবার কথা তোমায় ব'লে আসতে হবে তো?—যেমন এক এক ক'রে ওদের সঙ্গে সম্বন্ধ কাটালে···"

"চান না তো আপনি?"

"চাওয়া না-চাওয়ার কথা নয়। এ ভিন্ন তো উপায় নেই আর।"

তাহার পর নিজের মনের দুর্বলতা-সঙ্কোচ কাটাইয়া যেন একটু সোজা হইয়া বলিল—"চম্পা, তুমি নিজেকে—নিজের চরিত্রকে আস্তে আস্তে গ'ড়ে তুলছ; আমার স্বার্থের কাছে তাকে বলিদান দিতে বলব ?"

একবার ছেলেমেয়েগুলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটু মন্থর স্বরে বলিল—"অনেক কাজ হাতে নিয়ে বসেছি এই যা···"

পরদিন যথাসময়ে চম্পা গিয়া ম্যানেজারের বাসায় উপস্থিত হইল। রাত্রে বোধ হয় বাড়াবাড়ি হইয়াছিল, ম্যানেজারের চোখ দুইটা এবারে একটু বেশি লাল, একটু ঝিম ধরিয়া আছে এখনও। দৃষ্টি নিচু করিয়া কি একটা মোটা বই পড়িতেছিল, চম্পা ধীরে ধীরে থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল—"আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন ?"

ম্যানেজার দৃষ্টি তুলিতে তুলিতে বলিল—"কে, চম্পাবতী ? প্রাতঃপ্রণাম। তোমার ওপর কিন্তু অত্যন্ত চটেছি এবার···অত্যন্ত···ছুটির মধ্যেই তাই আমায় আসতে হ'ল দুদিনের জন্যে।"

"রাগও আপনার দয়া ; কিন্তু কি অপরাধ আমার ?"

"অপরাধ ?···একটা অপরাধ ?···আসলে তুই ছোঁড়াটার দিকে ঢলেছিস···"

চেষ্টা সত্ত্বেও চম্পার মুখটা একটু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, যেন নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই একটা তিক্ত ঔষধ গলার নিচে নামাইয়া দিল।···তাহার পর আজ এই রকম কদর্য কথার বাড়াবাড়ি হইবে জানিয়াই নিজে হইতে শুরু করিয়া দিল—"অপরাধ—কাজ ছেড়েছি, হীরার ভাতা ছেড়েছি—এই তো ? তা, আজ থেকেই যাব কাজে, টাকাটাও আসব নিয়ে ; কিন্তু স্কুল থেকে আমায় চ'লে আসতে হবে, অন্তত থেকে কোন ফল হবে না আর।"

ম্যানেজার রক্তচক্ষু দুইটা তুলিয়া একটু তির্যকভাবেই খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল ; তাহার পর বলিল—"টীকা না ক'রে দিলে তোর ভাষার মধ্যে মাথা গলিয়ে ভাবে পৌঁছানো রতিকান্তের বাবার সাধ্য নয় চম্পা ; একটু ভেঙে বল্।

চম্পা একটু চুপ করিয়া রহিল, যাহা বলিতে যাইতেছে তাহার ভাবটাই যেন মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিতেছে না ; তাহার পর বলিল—"আমায়

কাজ দিয়েছেন মানুষটাকে হাতে রাখা কোন রকমে; সব মানুষেরই একটা পছন্দ-অপছন্দ আছে—ওর আবার ভড়ং একটু বেশি এদিকে—চায় না আর খনিতে কাজ করি, কিংবা ছেলেটার জন্যে আপনাদের কাছে হাত পাতি।… ছেলেটা তো ওরই—এটা তো মানতেই হবে ?”

ম্যানেজার মাথা নিচু করিয়া শুনিতেছিল, আবার একটু দৃষ্টি তুলিয়া প্রশ্ন করিল—“তা তুই রেখেছিস হাতে ?”

“মনে তো হয়। না—কি ক’রে বলুন।

“হুঁ—ল্যাজে খেলছিস চম্পা ? আমার স্কুলের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে স্কুল খুলেছে ও। এই তোর হাতে রাখা ?”

“কোথায় আপনার স্কুল আর কোথায় ওর মন-ভোলানো দুটো ছেলে নিয়ে একটা পাঠশালা। তাও যে করেছে, আমারই মতলবে।”

“মতলবটা কি এ গরিব একটু শুনতে পায় না ?”

“পাগলামি নিয়ে ভুলে থাকবে; আপনার কুলিমজুরদের ক্ষেপাতে যাবে না।”

ম্যানেজার যেন মোক্ষম অস্ত্র হাতে লইয়া সোজা হইয়া বসিল, বলিল—“চম্পা, পাগল তুই আমাকে ঠাউরেছিস, নইলে এমন ক’রে ভুলোতে চাইতিস না। …‘ক্ষেপাবে না’—না ? তবে আমার কাছেই শোন্—তরসুদিন বিকেলে রমণী ঘোষের ছেলেটা মারা যেতে ঘোষ যখন কড়া কড়া বক্তিমে ঝাড়ছিল, ও নিজের মুখে সবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলেছে—আমি তোমাদেরই সঙ্গে। কত ভাঁওতা দিবি বল্ ?”

চম্পা একটু হকচকিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ম্যানেজারের দীর্ঘ বক্তব্যে সময় পাইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে; উত্তরও ঠিক হইয়া গিয়াছে তাহার। প্রশ্ন করিল—“সেই জন্যেই কি আর ওকে সামলে রাখা উচিত মনে করেন না ?”

“অর্থাৎ ?”

“অর্থাৎ—স্বভাব কারও এক দিনে যায় না। আমিও ছিলাম সেখানে, ত্রিশ নম্বর বাসায়; আপনি বলবেন কি, নিজের কানে সব শুনেছি আমি। আপনাকে যে লোক খবর দিয়েছে সে আমাকেও দেখেছে নিশ্চয়।…ব্যাপারটা নিয়ে আমার সঙ্গে একচোট হয়ে গেছে ওর।”

ম্যানেজার একটু সরস হাসিয়া বলিল—"প্রণয় কলহ ?"

"যাই নাম দিন, গেছে হয়ে। এসবের মধ্যে আর থাকবে না, মানে, আমায় যদি ওখানে থাকতে বলেন ওর জিদ বরদাস্ত ক'রেও। আর হবে না, ও একটা ভুল ক'রে বসেছিল রমণী ঘোষের কথার তোড়ের মধ্যে প'ড়ে।…আর রমণী ঘোষও তো নেই যে আর…"

ম্যানেজার চকিত হইয়া মুখটা তুলিল, প্রশ্ন করিল—"কোথায় গেছে ?"

মন-বোঝাবুঝির যেন লড়াই চলিল একটু। চম্পা ইচ্ছা করিয়াই মাথাটা একটু নত করিল, তাহার পর একটু টানিয়া টানিয়াই বলিল—"গেছে—মানে, ভয়ে পালিয়েছে হয়তো—আপনি চটলে যে পালায়, সে তো ফেরে না আর।"

চোখ তুলিয়া দেখিল, ম্যানেজার স্থিরদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া আছে; শুধু একটু টানিয়া বলিল—"হুঁ, খোঁজ রাখিস তো!…"

তাহার পর ইঙ্গিতেই যেন আর একটা নূতন গোপন রহস্যের মধ্যে চম্পাকে টানিয়া লইল এইভাবে ও-কথাটার উপর আর কোন মন্তব্য না করিয়া বলিল—"তা হ'লে দাগাবাজি করছিস না তো চম্পা? যেমন বললি তাতে তো মনে হয় খাঁটি আছিস। তবে কথা হচ্ছে—দেবতাতেও তোদের চরিত্রের হদিশ পায় না!…বেশ, যা তা হ'লে।"

চম্পা সিঁড়ি দিয়া নামিলে বলিল—"তবে কি জানিস?—আমি গোয়েন্দার ওপর গোয়েন্দা বসাই।"

চম্পা ঘুরিয়া বলিল—"আপনি গোয়েন্দা দিয়ে ঘিরে রাখুন না আমায়। তাতেও নিশ্চিন্দি না হন, রেহাই দিন না,—বড় সুখের কাজ দিয়েছেন।"

ম্যানেজার অল্প হাসিয়া আঙুল কয়টা হেলাইয়া বলিল—"আচ্ছা, আচ্ছা, যা।"

ফিরিয়া আসিয়া চম্পা টুলুকে বলিল—"থেকেই যেতে হ'ল, কোনমতেই ছাড়লে না, আরও দিনকতক জোগাই মন ওর, স্কুলটা তত দিন আপনারও জ'মে উঠুক আর একটু।"

টুলু একটু বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল—"তোমার কাজ…হীরকের টাকা?…"

"ও নিয়ে জোর করলে অবিশ্যি ছেড়েই আসতাম।"

॥ বত্রিশ ॥

চরিত্রের যে মর্যাদায় চম্পা নিজেকে টানিয়া তুলিয়াছিল—খনির চাকরি ছাড়িয়া, হীরকের খোরপোষের টাকাটা ছাড়িয়া সেখান থেকে আবার একটু নামিয়া পড়িল। তাহা না হইলে ম্যানেজারের কাছে যে অভিনয়টা করিয়া আসিল তাহা পারিত না। ম্যানেজার যদি তাহাকে কাজ করিতে বাধ্য করিত, টাকাটাও আবার লইবার জন্য জোর করিত, চম্পার রাজি না হইয়া উপায় ছিল না, তাহার জন্যই তৈয়ার হইয়াই গিয়াছিল। টুলুকে যে বলিল—"ও নিয়ে জোর করলে ছেড়েই আসতাম।"—সেটা একেবারে মিথ্যা কথা।

আসল কথা টুলুকে কেন্দ্র করিয়াই এখন ওর যা কিছু সব। যতক্ষণ এইখানে নিশ্চিন্ত ছিল ততক্ষণ ও নির্বিবাদে নিজেকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে—পরেশের ছায়া এড়াইয়া গেছে, কাজ ছাড়িয়াছে, হীরকের ভাতা ছাড়িয়াছে—এক কথায় খনির সঙ্গে কোন সম্পর্কেরই বালাই সে রাখে নাই আর। এখন কিন্তু চম্পার সেইখানেই হইয়াছে ভয়, অর্থাৎ টুলুকে হারাইবার। ভয়টা প্রথম পায় যেদিন পঞ্চকোট-পাহাড়ে আগুন লাগে। তাহার পর আবার টুলু ধীরে ধীরে স্কুলের কাজে মাতিয়া উঠিল, চম্পা আবার নিশ্চিন্ত হইয়া হীরককে লইয়া পড়িল, দোকানে জামা-পিরান যোগাইয়া উপার্জনে মন দিল। তাহার পর আসিল রমণী ঘোষের ছেলের মৃত্যুর সেই দৃশ্য—চম্পা অন্তরাল হইতে সবটা দেখিয়া গেল। বুঝিল, সব দুরাশা মাত্র, অন্তর দিয়া কোন বন্ধনকেই স্বীকার করিবার মানুষ নয় ও।

তীব্র আতঙ্কে চম্পার মনটা গেল ভরিয়া, আর তাহা হইলে উপায় কি? এ প্রশ্নের উত্তর চম্পা একদিনেই পাইল না। শুধু তাহাই নয়—একেবারে চরম উত্তরটিতে পৌছিতে অনেক প্রশ্ন, অনেক উত্তরের রাশি ঠেলিয়া আসিতে হইল তাহাকে, সময় লাগিল। কিন্তু পাইল উত্তরটা; চম্পা একটুখানি নামিয়াছিল, আরও নামিল, আবার একেবারে প্রায় নিচুতে।

উদাসীনের সংসর্গে চম্পা উদাসীন হইয়া গিয়াছিল, আবার নিজের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। সন্ধ্যার সঙ্গে রঙ মিলাইয়া যে শাড়িটি পরিত সেটি আবার পরিল। খুব হালকা আর মিহি করিয়া আলতার টান দিল। তাম্বুলরাগে হাসিটিকে রাঙাইয়া আরও করিয়া তুলিল মদির। ভ্রূমূলে খয়েরের টিপ দিয়া ছোট কপালটি করিয়া দিল আরও সঙ্কীর্ণ।...এক দিনেই সব নয়, অল্পে অল্পে, দৃষ্টি সহাইয়া অথচ অনিবার্যভাবেই দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়া—কৈশোর থেকে যৌবনের সাধনায় যে সূক্ষ্ম ক্ষমতাটি অধিগত হইয়াছে ওর।...তাহার পর এই অঙ্গকে ঘিরিয়া উঠিল খুব হালকা একটি সুবাস—একটি অস্পষ্ট স্বপ্নের মত বেড়িয়া রহিল। এত হালকা যেন সবার নাকেও যায় না। এ যেন যাহাকে মুগ্ধ করিতে হইবে কিংবা মুগ্ধ হইবার লালসাতেই যে যাচিয়া কাছে আসিবে তাহারই জন্য।...বেশি করিয়া নজর গেল মিতিনের। বনমালীকে হাসিয়া বলিল—"উর বর দিখো গো বুড়া; তু সবার লজোরটি কুথায় থাকে? বয়েস হইছে না নাতনির? আলতার ঘটা কোঁপার ঘটা দিখেও বুঝবেক না তো উ মুখ ফুটে বুলবেক নাকি গো?—দিখো!..."

বনমালী মাথা চুলকাইয়া বলিল—"দিখছি সব, দিখব নাই ক্যানে?...যে মানুষটি কথা ক'য়ে গেলোক, আর আসে নাই ক্যানে, বুঝি না। তা নিচ্চি তল্লাস, তুর মিতিনকে ধৈরষ ধরতে বল, বয়েস যাবার আগেই আমি গিঁথে দিবো বটে।"

চম্পা আবার মোহজাল বিস্তার করিতেছে। কি করে সে? নিরুপায়ের এই যে শেষ সম্বল।

কাঞ্চনতলায় আর বসে না সন্ধ্যায়, কাজের অছিলা দেখায়। টুলুর ঘর পরিষ্কার করিতে কিন্তু এমন সময়টিতে আসে যাহাতে নামিবার পর টুলুর সঙ্গে খানিকটা কথাবার্তা হয়। আজকাল যত কথাবার্তা সবই প্রায় স্কুল লইয়া, যদি অন্য কথাই পাড়ে টুলু, চম্পা স্কুলের প্রসঙ্গ আনিয়া ফেলে, তাহাতে সময় পায়। সময়ই দরকার এখন, আস্তে আস্তে নিজের সান্নিধ্য দিয়া ছোট ঘরটি পূর্ণ করিয়া তোলা, তাহার পর মনের দুর্গে আঘাত, সূক্ষ্ম কৌশলের সঙ্গে ধৈর্যের দরকার, সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সময়ের।

এতটুকু কি সচেতন হইয়াছে টুলু? শাড়ি, কবরী তো খুবই চোখে পড়িবার কথা, পড়ে নাই? যেগুলা সূক্ষ্ম—কপালের টিপ, মুখের হাসি?···বোঝা যায় না, শুধুই স্কুল আর স্কুল—স্বপ্নময় দৃষ্টি কাছে থাকিয়াও যেন থাকে কোন্ সুদূরে, কি তাহার লক্ষ্য ঠিক তাহা বোঝা যায় না। একদিন হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"ঘরটাতে চমৎকার একটা মিষ্টি গন্ধ পাই চম্পা—মাঝে মাঝে, কখনও...কিসের বল তো?"

চম্পা রাঙিয়া উঠিল, যদিও হ্যারিকেনের আলোয় টুলুর সেটা নজরে পড়িল না—হয়তো বিদ্যুতের আলোয়ও পড়িত না; বলিল—"গন্ধ?—ও, বোধ হয় হীরাকে যেটা মাখাই মাঝে মাঝে, সেইটে বিছানায় লেগে গিয়ে থাকবে।"

কই, হীরকের গায়ে ছিল নাকি কোন গন্ধ? তাহাকে লইয়া তো অত নাড়াচাড়া করে টুলু, পাইয়াছে নাকি কখনও?···কিন্তু গন্ধের সূত্র লইয়া মাথা ঘামাইবে—এত সময় নাই টুলুর।

স্কুল বাড়িয়া চলিয়াছে। আটাশ জন ছেলেমেয়ে এখন, টুলু যেন সামলাইতে পারে না। কাজ করিয়া না সামলাইতে পারার মধ্যে এক ধরনের উন্মাদনা আছে, যখন কাজটা হয় আনন্দের,—এ যেন আনন্দকেই বুকে ভরিয়া কুলাইতে না পারা। তবুও চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে বইকি। এটা তো ঠিক যে, এ বাসায় কুলাইবে না বেশি দিন। টুলু তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া জায়গা দেখিয়া ফেলিয়াছে অনেক, শেষ পর্যন্ত একটা ঠিকও করিয়াছে। সেই বটতলাটা সুদ্ধ প্রায় বিঘা-দুয়েক জায়গা, একটা দিক অল্পে অল্পে খোয়াইয়ের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে, সামনে প্রায় পোয়াটাক দূরে বস্তি। এই স্কুলের সৌন্দর্য যেমন সব চেয়ে উঁচু জায়গায় বলিয়া, ওর স্কুলের সৌন্দর্য হইবে তেমনি সব চেয়ে নিচু জমিতে হওয়ার জন্য—দক্ষিণ পশ্চিম আর পূর্ব দিকে থাকে থাকে উঠিয়া গেছে—বস্তি, তাহার পরই গঞ্জডিহির বাজার, তাহার পর কর্তাপাড়ার রঙচঙে পরিচ্ছন্ন বাড়িগুলা, রাত্রে বিজলী বাতিতে ঝলকাইতে থাকে। পূর্ব দিকে বালিয়াড়ির ঢেউ-খেলানো রাস্তা ক্রমোচ্চ, তাহার শীর্ষে স্কুল, বাসা। ঠিক উল্টা দিকে চড়াইটা দুলিয়া দুলিয়া একটা বন্ধুর রেখায় গিয়া শেষ হইয়াছে—অনেক দূরে—নামটা জলতরঙ্গের পাহাড়—কবি-দৃষ্টি ছিল এমন কেহ নামটা দিয়াছে কোন সময়।

জায়গাটার মালিকের সঙ্গে দরদস্তুর ঠিক হইয়া গেছে। টাকার জন্য মায়ের কাছে লিখিয়াছে, জানে পাইবে, সংসার না করুক, সংসারের চৌহদ্দির মধ্যে আটকাইয়া রাখিবার জন্য মায়ের কাছে এ প্রশ্রয় পায়ই।

প্রবল উৎসাহে লাগিয়া গেছে।

এই সময় হঠাৎ একটা ব্যাপার হইল যাহাতে উৎসাহের জোয়ারটা আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

এবারে গরমটা পড়িয়াছে খুব বেশি, এতটা যে খোলার মুখে স্কুলের আরও পনের দিনের ছুটি বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। দুই দিন থেকে আবার গুমট হইয়া এত বেশি গরম পড়িয়াছে যে, টুলু বিকালের ক্লাসটা ঠেলিয়া সন্ধ্যার কাছাকাছি লইয়া গেছে। পড়াইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা এলোমেলো হাওয়া ঘরে, উঠানে ঢুকিয়া পড়িয়া একটু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া বাহির হইয়া গেল। টুলু ঘুরিয়া পশ্চিম আকাশের পানে চাহিয়া দেখে, ধূলায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মেঘ ডাকিয়া উঠিল। ক্লাস হয় বাহিরের দুইটি বারান্দায়, ঝড়বৃষ্টি আসিতেছে দেখিয়া টুলু ছেলেমেয়েদের দুইটি ঘরের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়া জানালাগুলা বন্ধ করিতেছে, ততক্ষণে ঝড়টা আসিয়া পড়িল, তাহার একটুখানি পরে বৃষ্টিও। বাড়ির বাহিরের দিকে বুড়ির ঘর, সেটারও জানালা বন্ধ করিয়া, ঘরের মধ্যে বুড়ির নাতনিকে খিল আঁটিয়া দিতে বলিয়া নিজের ঘরে যখন আসিল, তখন ঝড়বৃষ্টি তুমুল বেগে আরম্ভ হইয়া গেছে। উঠানটুকু পার হইতে বেশ একটু ভিজিয়া গেল। ঘরটার সব এলোমেলো হইয়া গেছে, রাস্তার দিকে জানালা দিয়া বৃষ্টি ঢুকিয়া বিছানাটা ভিজাইয়া দিয়াছে। তাড়াতাড়ি সেটা বন্ধ করিতে গিয়া কিন্তু টুলুকে থামিয়া যাইতে হইল—বালিয়াড়ির দিক থেকে একটা ছই-দেওয়া গোরুর গাড়ি এই দিকে আসিতেছে! পথটা ঢালু, কিন্তু হাওয়া আর বৃষ্টির এত জোর যে বলদ দুইটা যেন আগাইতে পারিতেছে না। শুধু তাহাই নয়, বলদগুলা ভড়কাইয়া ঢালু দিয়া নামিয়া পড়িতেও পারে, গাড়োয়ান যেন সামলাইতে পারিতেছে না। টুলু মুহূর্তখানেক ভাবিয়াই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল এবং ঢালুর দিকের বলদটাকে আটকাইয়া ফেলিল। গাড়োয়ানও নামিয়া পড়িল

এবং দুই জনে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া গাড়িটাকে বাসার সামনে আনিয়া ফেলিল।

এতক্ষণ গাড়ি সামলাইবার দিকেই সমস্ত মনটা ছিল, টুলু ছিলও ছইয়ের পাশটাতে, লক্ষ্য করিতে পারে নাই—গাড়ি থেকে আরোহীরা যখন নামিল তখন বেশ আশ্চর্য হইয়া গেল—সাঁকরেলের সেই ছেলে দুটি আর তাহাদের সঙ্গে একটি আন্দাজ আঠারো-উনিশ বৎসরের মেয়ে।

টুলু একবার দেখিয়া লইয়া বড় ছেলেটিকে বলিল—"তোমরা আমার ঘরে চ'লে যাও—যাও তাড়াতাড়ি, ভিজে যাচ্ছ, আমি আসছি বলদ দুটোকে স্কুলে তুলে দিয়ে, একলা সামলাতে পারবে না ও।"

যখন ফিরিল, দেখে তিন জনে ঘরের দরজার বাইরেটিতে দাঁড়াইয়া আছে; এইটুকু আসিতে দেয়ালের আড়াল সত্ত্বেও বেশ ভিজিয়া গেছে—বোধ হয় সেইজন্যেই। ঝড় খুব প্রবল, টুলু মেয়েটিকেই বলিল—"ভেতরে চলুন।" তাহার পর কারণটা বুঝিতে পারিয়া বলিল—"ভিজে গেছেন তো কি হয়েছে? ঘর মুছে নিলেই হবে। আসুন।"

নিজে আপাদমস্তক ভিজিয়া একশা হইয়া গেছে, পথ দেখাইবার জন্যই তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গিয়া বলিল—"আসুন, আর তো ঘর শুকনো রইল না যে, সঙ্কোচ দরকার।"

তিন জনে ভিতরে গিয়া দাঁড়াইল। টুলু একটু যেন বিপর্যস্ত হইয়া কি ভাবিল, তাহার পর বলিল—"আপনারা ঐ কোণটায় গিয়ে দাঁড়ান। কি দুর্যোগ! এল তো একেবারে..."

কোণের দিকে বাক্স, টেবিল, বই; বড় ছেলেটি বলিল—"তার চেয়ে দোরটা বন্ধ ক'রে দিই।" ঘুরিয়া দরজাটার হুড়কা লাগাইয়া দিল।

টুলু এইবার খুবই ব্যস্ত হইয়া পড়িল, ছেলে দুইটার পানে চাহিয়া বলিল—"এবার কি উপায় করি? ভিজে গেছ তোমরা, অথচ আমার বাসায় তো সব দশ হাতের কাপড়।...আর শাড়ি তো একেবারেই নেই।" বলিয়া মেয়েটির পানে চাহিল।

মেয়েটি বলিল—"আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমরা আর কি এমন ভিজেছি? —ভিজেছেন তো আসলে আপনি।"

আর কোন কথা হইল না, বাহিরের দুর্যোগের দিকে কান পাতিয়া চার জনেই নিজের নিজের চিন্তা লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ঝড়বৃষ্টি যেমন হঠাৎ আসিয়াছিল তেমনি হঠাৎ থামিয়া গেল, এবং প্রায় তেমনি হঠাৎ ওদিককার দুই ঘরের দুয়ার খুলিয়া ছেলেমেয়েরা একেবারে হৈ-হৈ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তিন জনেই চকিতভাবে ঘাড় উঠাইয়া টুলুর পানে চাহিল, টুলু একটু হাসিয়া মেয়েটিকেই বলিল—"আমার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সব। চলুন, দেখবেন?"

বাহিরে আসিতে সবার অস্বচ্ছন্দতাটুকু একেবারেই কাটিয়া গেল। শুধু তাহাই নয়, মেয়েটির মুখে চোখে যেন একটা নূতন আলো আসিয়া পড়িল। কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টিতে টুলুর মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশ্ন করিল—আপনার স্কুল আছে নাকি? কই, রতন তো আমায় বলে নি!"

বড় ছেলেটির মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"বলনি তো তুমি আমায় রতন!

রতন টুলুর পানে চাহিয়া বলিল—"আগে ছিল না তো।"

তাহার পর এতক্ষণ যেন কথাটা বলিবার জন্য পেট ফুলিতেছিল এই রকম অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বলিল—"আমার দিদি! আপনাকে বলেছিলাম মা—এঁরই কথা?"

মেয়েটি অল্প হাসিয়া বলিল—"আপনার কথাও বলেছে আমায় এরা দুজনেই। স্কুল তখনও তা হ'লে করেন নি, কিন্তু এর মধ্যে···থাক্, আপনি আগে কাপড় ছেড়ে আসুন, অসুখে প'ড়ে যাবেন নইলে।"

বলিয়া সমস্ত প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া এমন চুপ করিয়া দাঁড়াইল—যেন কথাটা না শুনিলে আর একটি শব্দ মুখ দিয়া বাহির করিবে না। অনুরোধ, অথচ তাহার সঙ্গে জিদ আর আদেশ এমন অদ্ভুতভাবে জড়ানো যে, টুলু কোনমতেই এড়াইতে পারিল না। ঘরের চৌকাঠ পার হইয়া শুধু একবার বলিল—"আপনারা কিন্তু ভিজে কাপড়েই রইলেন।" গা হাত মুছিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে যেটুকু বিলম্ব হইল, তাহার মধ্যে এরা সবাই বাগানের দিকে চলিয়া গেছে। টুলু

উপস্থিত হইলে মেয়েটি বলিল—"এরা বলছে, এ বাগান এরাই করেছে। সত্যি নাকি ?"

টুলু হাসিয়া বলিল—"আর আমাকে একেবারে বাদ দিয়েছে ?"

মেয়েটি হাসিয়া উত্তর করিল—"বাদ দিলেও, আপনি যে আছেনই এটা ধরে নিতাম আমি।···বড় চমৎকার লাগছে আমার স্কুলের সঙ্গে বাগান—ছেলেরা নিজেই করে আবার!···ছেলেমেয়েরাও সব চমৎকার দেখছি···কিন্তু বলছে, মাইনে নেন না আপনি। কি ক'রে চলে ?"

আসল উত্তরটা এড়াইয়া যাইবার জন্য টুলু হাসিয়া বলিল—"মাইনে নিলেও তো অনেক স্কুল চলে না···"

মেয়েটি মুখের পানে চাহিয়া কি যেন একটু ভাবিল, বোধ হয় কথাটার অর্থ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর হঠাৎ সচকিত হইয়া বলিল—"ভুলেই গেছলাম। রতন আর কানন—এই যে আমার ছোট ভাই দুটি, দুজনেই আমায় ওদের স্কুলের কথাটা বলেছিল···"

মুখটা হঠাৎ গম্ভীর আর বিষণ্ণ হইয়া উঠিল, টুলু প্রশ্ন করিল—"কি কথা ?"

রতন একটু সরিয়া গিয়া কতকগুলা গাছের চারা লক্ষ্য করিতে লাগিল, মেয়েটি বলিল—"সেই যে ওরা এদের দুজনকে আপনার কাছে আসতে বারণ করেছিল।··· এ রকম স্কুল থাকার চেয়ে না থাকা ভালো তো। কি করব আমরা, আর স্কুলও নেই এ তল্লাটে। আপনার স্কুলে নিন না এদের দুজনকে।"

রতনের এই দিকেই কান ছিল নিশ্চয়, একবার ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিয়া লইয়া তখনই আবার চারাগাছে মনোনিবেশ করিল।

টুলু বলিল—"বোধ হয় ঠিক হবে না, ভাববে, ছেলে ভাঙাচ্ছে !"

রতন উঠিয়া আসিল, দিদির দিকেই চাহিয়া বলিল—"এ স্কুল কিন্তু রোজ এই রকম বিকেলবেলাতে হয় দিদি, এরা বলছিল।"

মেয়েটি একবার টুলুর দিকে চাহিয়া লইয়া ভাইদের দিকে একটু হাসিয়া বলিল—"কিন্তু আমার হাতে তো নয় ভর্তি করা তোমাদের।"

আবার টুলুর মুখের পানে চাহিল। টুলুর মনের মধ্যে লোভে-সংযমে ছোট-খাটো একটু দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, খানিকক্ষণ একটু চিন্তিত রহিল, তাহার পর বলিল—

"আমি নোব ওদের; কিন্তু দিনকতক যাক। মানে, এ বাড়িটার ওপর তো আমাদের কোন অধিকার নেই।"

"নিজের বাড়ি করবেন?"

খুব উৎসুক দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"এখনও আকাশ-কুসুম বলতে পারেন, তবে ইচ্ছে আছে।"

তাহার পর নিজের কল্পনাটা আস্তে আস্তে শোনাইয়া গেল। স্কুল লইয়া এই প্রথম মনের দোসর পাইয়াছে, বড় আনন্দ বোধ হইতে লাগিল এই ভাবে নিজের আশার কথা শুনাইয়া যাইতে। গাড়োয়ান গাড়ি লইয়া আসিয়াছে, বাহিরে গিয়া টুলু বটবৃক্ষসংলগ্ন জায়গাটাও দেখাইয়া দিল, দরদস্তুর যে হইয়া গেছে সে কথাও বলিল।

মেয়েটি আর কোন কথাই বলিল না, শুধু অন্তরে কিসের পূর্ণতায় যেন সমস্ত মুখটা রাঙা হইয়া গেছে। ছইয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—"গঞ্জডির বাজারে আমাদের একটু কাজ ছিল তাই এসেছিলাম, ঝড় দেখে আবার ফিরতে হ'ল।"

হাত তুলিয়া নমস্কার করিল, ছেলে দুটিও করিল।

ফিরিয়া আসিয়া বাগানে হাত দিয়াছে, রতন হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল—"একবার উঠবেন?"

টুলু তাহাকে লইয়া উঠানে আসিলে বলিল—"দিদি জিগ্যেস করলেন, আপনার স্কুলে তাঁকে পড়াতে দেবেন, স্কুল হ'লে? আপনার স্কুলে তো মেয়েও আছে!"

টুলু বিস্মিতভাবে বলিল—"তোমার দিদি পড়াবেন?"

দিদি ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছেন···বাবা পড়াতেন। পরীক্ষাও দেবেন···আরও পড়বেন।"

"তোমার মা এখানে এসে পড়াতে দেবেন?"

"মা তো দিদিকে কিছুতে বারণ করেন না, বাবা মারা যাবার সময় মানা ক'রে গিয়েছিলেন কিনা, তা ভিন্ন···"

"ছেলেটি থামিয়া গেল। টুলু প্রশ্ন করিল—"তা ভিন্ন?···"

ছেলেটি একটু সঙ্কোচের সঙ্গে উত্তর দিল—"তা ভিন্ন দিদি তো পড়াবেনই, নিজে আরও প'ড়ে। বিয়ে করবেন না কিনা।"

"কেন ?"

"দুটি ভাই আমরা ছেলেমানুষ, আর মা—তাঁর শরীরও ভালো থাকে না, কে দেখবে ?"

টুলু স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল একটু, তাহার পর হঠাৎ উৎফুল্ল হইয়া বলিল—"সত্যি তোমার দিদি পড়াবেন ? চল, আমি নিজে যাই তাঁর কাছে, কোথায় তিনি ?"

"চড়াইয়ের মাথায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে রয়েছেন।"

দুয়ার পর্যন্ত আসিল টুলু, তাহার পর কি ভাবিয়া বলিল—"আচ্ছা, এখন থাক্, এর পর একদিন পারি তো সাঁকরেলেই যাব। তোমার দিদিকে ব'লো, তিনি যদি আমার স্কুলে পড়ান, সে তো আমার স্কুলের মস্ত বড় ভাগ্য। যত তাড়াতাড়ি হয় আমি চেষ্টা করছি এদিকে। যাও, জলটা দেখছি তোমাদের গায়ে শুকিয়ে গেল।"

॥ তেত্রিশ ॥

বড় অদ্ভুত লাগিল মেয়েটিকে। প্রথমটা মনে হইয়াছিল, গম্ভীর, ব্রীড়াময়ী ; তাহার পর মনে হইল, চপল যদি নাও বলা যায় তো মুক্ত-প্রকৃতির তো বটেই। প্রথম হয়তো একটা আকস্মিক বিপদের মধ্যে নূতন পরিচয়ে, তাহার পর যে অবস্থায় কাটাইতে হইল প্রথমটা তাহার সঙ্কোচে ওরকম করিয়া দিয়াছিল, তাহার পর মুক্ত জায়গায় আসিয়া একেবারেই মনের মত জিনিস সামনে পাইয়া প্রকৃত স্বরূপটি ফুটিয়া বাহির হইল।

যাই হোক, যেন জোয়ারের সঙ্গে বান ডাকিল,—এই রকম শিক্ষয়িত্রী পাওয়ার সম্ভাবনায় টুলু যেন উদ্দাম হইয়া স্কুলের নেশায় মাতিয়া উঠিল। এমন যে, ওর প্রকৃতিটাও হঠাৎ যেন বড় লঘু হইয়া পড়িল—ঠিকমত মন বসাইতে পারিতেছে না কোন জিনিসে, কেমন একটা চঞ্চল 'হ'ল না হ'ল না' ভাব।

মায়ের টাকাটা আসিতে দেরি হইতেছে; আসিবেই দুই-এক দিনে, কিন্তু তর সহিতেছে না।

দুই দিন পরের কথা। কি হইয়াছে স্থিরভাবে বসিয়া পড়াইতে পারে না। ছেলেমেয়েরা পড়িতেছে, টুলু বুকে হাত দুইটা জড়াইয়া পায়চারি করিতেছে, হঠাৎ বুড়ির নাতনিকে বলিল—"চম্পাকে একবার ডেকে আন্ তো বিন্দু।"

মেয়েটি ডাকিয়া আনিলে উঠানে নামিয়া আসিল, বলিল—"চম্পা জায়গাটা বোধ হয় হাতছাড়া হয়ে যায়।"

চম্পা একটু বিস্মিত হইয়াই বলিল—"কোন নতুন জমি দেখলেন নাকি আবার?"

"না, ঐ বটতলারটার কথাই বলছি।"

চম্পা একটু হাসিয়াই বলিল—"আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন, হাজার বছরেও বোধ হয় ও জমি হাতফের হয় নি। এখানে ভেতরে কয়লা থাকলে দাম, ও জমিকে কে পোঁছে?"

"তা বটে, তা ঠিক বলেছ…" বলিয়া টুলু একটু অপ্রতিভ ভাবেই চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু এ ভাবটা টিকিল না। বোধ হয় মনে মনে তর্কের পথ খুঁজিতে ছিল, একটা পাইয়া বলিল—"তুমি বলেছ ঠিক, তবে কি জান—একটা জমি প'ড়ে আছে তো প'ড়েই আছে, যেই একজনের নেবার কথা উঠল, অমনি পাঁচ জনের নজর গিয়ে তার উপর পড়ে! হয়তো ভেবেই বসবে ওর মধ্যে কয়লার সন্ধান পেয়েছি আমি…"

"এখানকার সব জমি ভালরকম জরিপ হয়ে গেছে, কাছাকাছি আর কোথাও কয়লা নেই।"

টুলু যেন একটু বিরক্ত হইল, কতকটা নির্লিপ্তভাবে বলিল—"তা যদি হয় তো থাক্…"

চম্পা একটু কি ভাবিয়া বলিল—"নইলে করতেই বা কি পারেন আপনি? মার টাকা তো আসে নি!"

টুলু বলিল—"সেই তো ভাবনা, কবে আসবে কিছু ঠিক আছে? জমি বিকিয়ে না যাক, সময় তো চ'লে যাচ্ছে। তাই মনে করছিলাম, জমিটা কিনে

নই, কিন্তু টাকা তো অত নেই। শ আড়াইয়েক চাইছে, কুড়িয়ে বাড়িয়ে আমার কাছে দুশো হতে পারে, বাকি পঞ্চাশ টাকা···অথচ ঐ যে বললাম—দেরি হয়ে যাচ্ছে···"

যেন তর্কের ভয়ে গড়গড় করিয়া সবটা বলিয়া চুপ করিল। চম্পাও একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—"আমি যোগাড় ক'রে দিলে যদি হয় তো দেখতে পারি না হয়।"

"তুমি চেষ্টা করবে?"

এই আশাতেই ডাকাইয়া আনিলেও টুলু প্রশ্নটা করিল বেশ একটু বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়াই। এটা ইচ্ছা করিয়াই করিল, কিন্তু এর পরের প্রশ্নটা কেমন যেন আপনা হইতেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—"ম্যানেজার কিংবা পরেশের কাছে হাত পাতবে না তো?"

চম্পার মুখটা রাঙা হইয়া উঠিল, বিষণ্ণকণ্ঠে বলিল—"ম্যানেজার অবশ্য নেই এখানে, তবুও বিশ্বাস করেন যে, ওদের কাছে টাকা চেয়ে স্কুলের কাজে লাগাতে দেব?"

সঙ্গে সঙ্গে আবার বলিল—"তা নয়, মার খানকতক গয়না আছে রুপোর, আমায়ও খানকতক দিয়েছিলেন ঠাকুরদাদা আর বাবায় মিলে—চিরকালটা তো আর এ রকম ছিলেন না বাবা—তাই থেকে কিছু কারও কাছে রেখে এনে দিতে পারি টাকা, বোধ হয় আপনার সবগুলো নাও বের করতে হতে পারে; কাজ কি হাত একেবারে খালি ক'রে?"

চাপা উন্মাদনায় টুলুর ভিতরটা চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। তবুও ঠাট বজায় রাখিবার জন্য বলিল—"নেহাৎ গয়না বন্ধক দিয়ে আনবে টাকা?···তা বেশ, ভাল কাজে···কিন্তু একটা শর্তে রাজি হতে হবে—সুদ নিতে হবে···"

চম্পা হাসিয়া বলিল—"তা তো নেবই, সে যখন আমায় ছাড়বে না···"

"সেটা তো নিতেই হবে, তা ভিন্ন যে আমায় দিচ্ছ তার জন্যও সুদ নেবে।"

চম্পা এবার বেশ ভালোভাবেই হাসিয়া ফেলিল, বলিল—"বেশ, কিন্তু আপনি টাকা এলেই তো দিয়ে দিচ্ছেন—দু-চার দিনের মধ্যেই জমতে আর পারছে কোথায় আমার এত ঘটার সুদ?"

টুলু তাড়াতাড়ি খুব গম্ভীরভাবে বলিল—"তা সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দোব, তুমি নিশ্চিন্দি থেকো, টাকা তোমার আটকে রাখব না—সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে যাবে।"

পরদিনই চম্পা টাকাটা আনিয়া হাতে দিল। টুলু বুঝিল, অন্যায় হইল, তা যতই সুদ দেওয়ার ঘটা দেখাইয়া ব্যাপারটাকে মহাজনী লেনদেনের আকার দিক না কেন। কিন্তু এ সব চিন্তা স্থায়ী হইতে পারিতেছে না, ঐ একটা সর্বগ্রাসী চিন্তা—স্কুল বসাইতে হইবে, আর সময় নাই। আর সব মুছিয়া গিয়া একটি মাত্র নেশা জীবনে ওকে এর আগে এমন করিয়া পাইয়া বসে নাই। পরদিন রৌদ্র মাথায় করিয়া পাঁচ মাইল দূরে রেজেস্টারি অফিসে গিয়া রেজেস্টারি করিয়া আসিল।

ফিরিবার সময় মনে হইল, একবার কাকার বাসাটা হইয়া যায়। অনেক দিন আসে নাই এদিকে, দিন তিনেক আগে কাকিমার বাপের বাড়ি থেকে আসিবার কথা ছিল। ওদিকে কাকার সঙ্গে দেখা করিতে খানিকটা সঙ্কোচও হইত, ম্যানেজারের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া তাঁহার ব্যবসায় কতকটা বিপন্ন করিতেছে বলিয়া। আর তো সে ভাবটা যাইতে বসিয়াছে; জমি কিনিয়াছে, নিজের ঘর বাঁধিয়া স্কুল গড়িবে, যত শীঘ্র পারে ছাড়িয়া দিবে ও বাসা, ম্যানেজারের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই থাকিবে না। ওর জীবনটা যে এই ভাবেরই সেটা ওঁরা জানেনই, ওদিক দিয়া ওঁদের মন ভালো করিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে—বাড়ির সবারই; আজ জানাইয়া দিবে, তাহারই পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করিয়া আসিল।...বেশ প্রফুল্ল ভাবেই বাসায় প্রবেশ করিল।

কাকিমা আসিয়াছেন। একটি বোন, বড় হইয়াছে, তাহার নিচে একটি ভাই। টুলু কাকিমার আসার খবরটা বাহিরেই চাকরের কাছে পাইয়া বেশ হৈ-চৈ করিয়া প্রবেশ করিল—"এই দেখো, তোমরা এসে গেছ কাকিমা, অথচ আমায় ব'লে পাঠাও নি। বলবে—কেন, তোর তো জানা উচিত ছিল।...উচিত ছিল আর জানতামও, কিন্তু কি হাঙ্গাম নিয়ে যে পড়েছি!...লিলি, তুই বেধড়ক মোটা হয়ে গেছিস মামার বাড়ির ভাত আর আদর খেয়ে···বলবি—দাদা এসেই খুঁড়লে। তা স্বীকার করছি, কিন্তু খুঁড়ে খুঁড়ে তোকে সাবেক চেহারায় আনতে অনেক দিন লাগবে, কি বল কাকিমা?···ও কি, মুখ ভার করলে যে গো!—তুমি

স্কুলে-পড়া মেয়ে হয়েও এসব খোঁড়া, নজর-দেওয়া এখনও মান না কি কাকিমা ?”

কাকিমা মেয়ের চুল বাঁধিতেছিলেন ; মুখটা যেন কাঠ হইয়া আছে। একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন—“কই রে, কে আছিস, টুলুকে একটা আসন দে। ঐ মোড়াটা না হয় টেনে নিয়ে ব’স্ টুলু।”

কন্যা দাঁতে ফিতা কামড়াইয়া আছে, কথা কহিবার বালাই নাই ; ফিরিয়া চাহিয়াই শুনিল, তাহার পর বিনুনিতে টান ধরাইবার জন্য মাথাটা নিচু করিয়া রহিল। টুলু মোড়ায় বসিলে কাকিমা প্রশ্ন করিলেন—“তারপর আছিস কেমন বল্।”

ধাক্কা খাইয়াও টুলু প্রসন্নতাটুকু ফিরাইয়া আনিবার আর একবার চেষ্টা করিল, হাসিয়া বলিল—“এই আধ মিনিট আগে পর্যন্ত তো বেশ ভালোই ছিলাম, কি ব্যাপার বল দিকিন, এ কি ভাব ! লিলিরই বা এ কি অভ্যর্থনা !”

লিলি ফিতার খুঁট দুইটা হাতে লইয়া হাসিয়া বলিল—“অভ্যর্থনায় ঘাটতি পাবে না। মামার বাড়ি থেকে কি সব মেওয়া জিনিস এনেছি দেখ, সন্তোষের নজর থেকে বাঁচিয়েও রেখেছি এখনও, তুমি মাড়াবেই না এদিক তো...”

“তাই রাগ ? তা যা নিয়ে আয় শীগ্‌গির ; আগে ওঠ্, খিদেও লেগেছে খুব—পাঁচ মাইল পাঁচ মাইল দশ মাইল পথের হিসেব নিয়ে আসছি।...যা ওঠ, তোর বেণী দেখলে আমার পেট ভরবে না ; ছেড়ে দাও কাকিমা ওকে।”

লিলি হাসিতে হাসিতে উঠিয়া গেল। কাকিমা একটু চুপ করিয়া রহিলেন, এদিক ওদিক চাহিয়া অস্বস্তিটা মিটাইবার চেষ্টা করিয়া শুষ্ক কণ্ঠে বলিলেন—“তুই বাড়ি চ’লে যা টুলু।”

এবার টুলুর কণ্ঠস্বরে একটু পরিবর্তন হইল, প্রশ্ন করিল—“কেন ?”

কাকিমা আবার একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—“কেন আবার ?...অনেক দিন বাইরে আছিস। চিরকালটা এইভাবে কাটাতে হবে ?”

টানিয়া টানিয়া এমন ভাবে বলিলেন কথাগুলা যে, স্পষ্ট বোঝা গেল, আসল কথাটা এর অতিরিক্ত আরও কিছু। টুলুও গম্ভীর হইয়া গেছে, মাথাটা

নিচু করিয়া প্রশ্ন করিল—"কেন আমি বলব কাকিমা?" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বলিল—"কারণ আমি ছোটলোকদের ছেলেমেয়ে নিয়ে রয়েছি। বল তা নয়? তাদের পড়াচ্ছি, তাদের মানুষ করবার চেষ্টা করছি..."

কাকিমা খানিকক্ষণ নিরুত্তরই রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে কহিলেন—"ধর্ যদি সেইটুকুই, তার জন্যেই বা এত মাথাব্যথা কেন তোর?"

'সেইটুকুই' কথাটার উপর বেশ একটু জোর দিলেন। কিন্তু এই সময় লিলি খাবার লইয়া আসিয়া পড়ার জন্যই হোক বা যে জন্যই হোক, টুলুর সেটা কানে লাগিল না; অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা যেন চাপা দেওয়ার জন্যই বলিল—"থাক্, ও রোগ যখন আমার ঘুচবেই না; নিয়ে আয় লিলি, কি এনেছিস।"

আহারের সময় যে একটু আধটু কথা হইল সে নিতান্ত নিস্তব্ধতাটা ঘুচাইবার জন্য। আহার শেষ করিয়া টুলু প্রশ্ন করিল—"কাকা কোথায়?"

কাকিমা একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর আবার বলিলেন—"ঘুমুচ্ছিলেন ওপরে, খোকাকে নিয়ে...বোধ হয় ওঠেন নি এখনও।"

বলিবার ভঙ্গিতেই টুলু বেশ স্পষ্টভাবে বুঝিল, একটা অপ্রীতিকর সাক্ষাৎকার নিবারণ করিবার জন্যই একটা মিথ্যা ভাষণ করিলেন।

"তা হ'লে যাই, আর ওঠাব না।"

লিলির হাত হইতে পান লইয়া দুয়ারের দিকে পা বাড়াইতে কাকিমা বলিলেন—"যা বললাম মনে রাখবি। আর, আসবি মাঝে মাঝে টুলু।"

এই অভিজ্ঞতার আস্বাদটুকু কিন্তু মনে বেশিক্ষণ লাগিয়া রহিল না। মনে পড়িয়া গেল মেয়েটির কথা,—তাহার স্কুলে পড়াইতে আসিবে বলিয়াছে, নিজে হইতে বলিয়া পাঠাইয়াছে। তাহার নিজের স্কুল, তাহার জন্য জমি কিনিয়া ফিরিতেছে। জমিটা একবার দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল—ছেলেমানুষের মতই ইচ্ছা একটা—নিজের জমি, একবার ঘুরিয়া ফিরিয়া বেশ ভালো করিয়া মাড়াইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে। বস্তির মধ্য দিয়া যাওয়াই স্থির করিল, আজ আর সন্ধ্যার সময় আসিতে পারিবে না।...বস্তিতে গিয়া আজ পর্যন্ত যাহা করে নাই তাহাই আরম্ভ করিয়া দিল—ক্যানভাসিং—"তোমার এ মেয়েটিকে তো কই দেখি না আমার স্কুলে! পাঠিয়ে দেবে—নিশ্চয় দেবে।...এটি তোমার নাতি? স্কুলে

পাঠাও বাপু; তোমাদের জন্যে স্কুল খুললাম অথচ···আর স্কুল তোমাদের তো ঘরের কাছেই এনে ফেলেছি, মাহতোর কাছ থেকে বটতলার জমিটা কিনে নিলাম···ওগো বাছা, তোমার ছেলেটিকে স্কুলে দাও—আমার স্কুলে। তোমার মতন তোমার ছেলেও বস্তিতে মুখ গুঁজড়ে প'ড়ে থাকে এইটিই চাও···একটা ছেলের মধ্যে কত কি হবার সম্ভাবনা রয়েছে তা জান?—কালে এই ছেলে হয়তো জেলার জজ হয়ে আসতে পারে···"

একটা নবতর উন্মাদনার মধ্যে শরীর-মন যেন পালকের মত হালকা বোধ হইতেছে, এক পাল ছেলেমেয়ে পরিবৃত হইয়াই বাসায় ফিরিল, সমস্ত স্বপ্নটাই যেন সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ছেলেমেয়ে হু-হু করিয়া এক ঝোঁকে বাড়িয়া গেছে, এখন বিয়াল্লিশটি। সামলানো যায় না, তবুও সুবিধা পাইলেও ক্যান্‌ভাসিং করে টুলু। সামলাইতে না পারার কথাটা মনে থাকে না। জায়গা হইয়াছে এই আনন্দেই সবাইকে ডাকিয়া আনে। তাহা ভিন্ন আরও একটা ব্যাপার আছে। কাকিমার কথাটা প্রায় মনে পড়ে—সেই খোঁটাটুকুর প্রতিক্রিয়া-স্বরূপই আরও বেশি করিয়া, আরও নিবিড় করিয়া এদের কাছে টানিতে ইচ্ছা করে।···কেন, নগ্ন পিষ্ট বুভুক্ষিত বলিয়া ওরা আর মানুষ নয় যেন?

এইজন্যই আজকাল হীরক আর প্রহ্লাদের ছেলেটিকে বেশি করিয়া আনাইয়া লয়—কখনও একটিকে, কখনও বা এক সঙ্গে দুইটিকেই। চমৎকার হইয়াছেও হীরক; খুব হাসে—এক এক সময় হাসাইয়া ঘাঁটিয়া খেলাই করে টুলু। এক এক সময় ওর হাসিটা বড় করুণ বলিয়া মনে হয়—হীরকের মুখেও হাসি!—বোঝে না তাই তো—এক ধরনের মূঢ় আত্মপ্রবঞ্চনা; বোঝার সঙ্গে সঙ্গে কি মিলাইয়া যাইবে না ও হাসিটুকু?

তৃতীয় দিনের কথা—পঁয়তাল্লিশটি ছেলেমেয়ের হট্টগোলের মধ্যে একটু চিন্তান্বিত হইয়া বসিয়া আছে। কাজ আরও অগ্রসর হইয়াছে, বনমালী বাঁশখড়ের ব্যবস্থা করিতে গিয়াছে পাহাড়ের নিচে। কিন্তু এদিকে সত্যই সামলাইতে পারা যাইতেছে না। আর একজনের দরকার। বেশ ছিমছাম হইয়া কাজ করা অভ্যাস, এ হট্টগোলটা মাঝে মাঝে কানে বড্ড বাজে। পড়াও ঠিক হইতেছে না।

একটু অন্যমনস্ক হইবার জন্য বুড়ির নাতনিকে বলিল—"হীরাকে নিয়ে আয় তো বিন্দু।"

চিন্তার ধারাটা মনে মনে বহিয়া চলিয়াছে—সাঁকরেলের মেয়েটি পড়াইতে আসিবে। কিন্তু সে তো এখনও দেরি আছে। টুলুর ভ্রূ দুইটি হঠাৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—একটা নূতন দিকে চিন্তার মোড় ফিরিয়াছে—

তাহাকেই ডাকিয়া পাঠাইলে কেমন হয়?—পড়ানোর সম্বন্ধ ছেলেমেয়ের সঙ্গে—ছেলেমেয়ে বাড়িয়াছে—ওই স্কুলেই পড়াইবে এমন শপথ করে নাই তো··· চিন্তা হঠাৎ আর একটা মোড় ফিরিল—কেন, চম্পা—সে তো স্কুলে পড়িয়াছে—সে-ই পড়াক না তত দিন। তত দিন কেন? বরাবরই তো পড়াইতে পারে।

এত বড় আবিষ্কার টুলু জীবনে করে নাই—বিস্মিত হইয়া উঠিল এই ভাবিয়া যে, এত সহজ কথাটা এতদিন একেবারে মনে পড়ে নাই। আর, চম্পার জীবনের উপরেও যে এর একটা মস্ত বড় প্রভাব আছে।

একটি ছেলেকে বলিল—"যা চম্পাকেও ডেকে আনবি—তাকেই নিয়ে আসতে বলবি হীরাকে।"

পাঠাইবার প্রয়োজন ছিল না। আজকাল চম্পা চায়ই একটা ছুতানাতা করিয়া কাছে আসিতে—উহারই মধ্যে সাজগোজের একটু তারতম্য করিয়া লইয়া হীরককে কোলে করিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল—"একে ডেকেছেন?"

গাল দুইটা টিপিয়া বলিল—"হীরাবাবুকে?"

নূতন আবিষ্কারের আনন্দে টুলুর শরীরটা যেন ভিতরে ভিতরে কাঁপিতেছে। মুখটা দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, বলিল—"ডেকেছি আসলে তোমায়।"

"আমায়? কেন?"

প্রশ্নটা করিয়া বিস্মিত ভাবে মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"তোমায় একটু স্কুলের কাজে নামতে হবে।"

চম্পার মুখের সব রক্ত যেন নামিয়া গেল, কতকটা ভীত এবং বিরক্ত ভাবেই অনুরোধের সুরে বলিল—"না, আমায় মাপ করুন, আমি পারব না—ও বাড়ি বাড়ি ঘুরে···সে আমার দ্বারা হবে না—"

টুলু একটু হাসিয়া বলিল—"তোমায় ক্যান্‌ভাসিঙে পাঠাচ্ছি না, ভয় নেই,

আমার একলার ক্যান্‌ভাসিঙেই এত হয়েছে যে সামলাতে পারছি না—সেইজন্যেই ডাকা। তোমায় পড়াতে হবে।"

চম্পার ভয়ের ভাবটা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, তাহার জায়গায় আসিয়া পড়িল গভীর চিন্তার ভাব, মস্ত বড় একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়িয়া গেছে যেন—কি করিবে বুঝিতে পারিতেছে না। একটু পরে মুখ তুলিয়া অল্প হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"খুব মাস্টারনি ধরেছেন তো!"

"কেন, তুমি তো মিশন স্কুলে পড়েছিলে দু বছর!"

আবার একটু ভাবিল চম্পা, তাহার পর সেই ভাবেই দৃষ্টি তুলিয়া একটু হাসিয়া বলিল—মস্ত বড় বিদুষী ক'রে ছেড়ে দিয়েছে ওরা! তা বেশ, যদি মনে করেন পারব পড়াতে, পড়ানো যাবে।"

॥ চৌত্রিশ ॥

পরদিন সকাল হইতেই আরম্ভ করিয়া দিল।

মিশনারিদের পদ্ধতিটা কতক কতক জানা আছে, তাহার উপর যেটা করে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়াই করে; বেশ চমৎকার করিয়াই পড়াইল। স্কুল ভাঙিয়া গেলে টুলু বলিল—"আমার ইচ্ছে, নিজে তুমি আরও পড় চম্পা।"

চম্পা ভয়ের ভান করিয়া বলিল—"কেন, পারলাম না বুঝি পড়াতে?"

"এত ভালো পেরেছ যে আমার ইচ্ছে তুমি এই নিয়ে থাক। আজ তোমার একটা নতুন দিক আমার চোখে পড়ল,—নতুন একটা সম্ভাবনার দিক।"

রহস্যের হাসিটুকু চম্পার মিলাইয়া গেল, যেন গভীর একটা বেদনার উপর স্পর্শ দিয়েছে টুলু, ব্যথার আর্তিতেই মুখ দিয়া আপনি যেন বাহির হইয়া গেল—"কিন্তু কে পড়বে আমার কাছে?"

টুলু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"তার মানে?"

"দেখতেই পাবেন…"

সঙ্গে সঙ্গেই এ ভাবটা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া আবার হাসিয়া বলিল—

"বাঃ, মাস্টারি করবার লোভ দেখিয়ে ডেকে এনে আপনি আমায় স্কুলে পোড়ো ক'রে নিতে চান, মতলব ভালো নয় তো।"

কথাটা এখন বাড়াইতে গেলেই চম্পা এই ভাবে হালকা করিয়া ফেলিবে বুঝিয়া টুলুও আপাতত হাসিয়া চুপ করিয়া গেল, তবে সংকল্পটা তাহার ভিতরে ভিতরে ঠিকই রহিল। চম্পার ভবিষ্যতে একটা নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছে আজিকার এই আবিষ্কার; সেই আলোকে ওর জীবনের একটি পরিপূর্ণ চিত্র আঁকিয়া ফেলিল টুলু। শুধু চরিত্রে নয়···সেদিক দিয়া চম্পা তো নিখুঁত হইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে—জ্ঞানবিদ্যার দিক দিয়াও টুলু নিজের শিষ্যাকে অনবদ্য করিয়া তুলিবে। পাঁকের চম্পা শতদলে বিকশিত একটি পদ্মের মতই হইয়া উঠিবে সবার বিস্ময়, তবে তো!

সাঁকরেলের মেয়েটি দূরে পড়িয়া গেল। টুলু দু-একবার ওর কথা তুলিতে গিয়াছিল, কিন্তু প্রত্যেকবারেই অন্য একটা কথা আসিয়া বাধা পড়িয়া গিয়াছে, ঠিক করিল আর তুলিবেই না তাহার কথা। প্রথমত, গোড়ায় উৎসাহিত হইয়া উঠিলেও ভাবিয়া দেখিল, অত দূর থেকে আসিয়া পড়ানোর অসুবিধা, বাধা দুই-ই আছে বিস্তর। দ্বিতীয়ত, ব্যবস্থাটা শোভনও হইবে কি না ঠিক বুঝা যাইতেছে না। এ অবস্থায়, যখন চম্পাকেই হাতের কাছে পাওয়া যাইতেছে তখন ও সংকল্প ত্যাগ করাই যেন ভালো। তা ভিন্ন, সুবিধাজনক আর শোভন হইলেও অনিশ্চিত তো বটেই, তাহার চেয়ে সুনিশ্চিতকে ধরিয়া থাকিয়া গোড়া থেকেই একটা পাকা ব্যবস্থা করিয়া যাওয়া সুবিবেচনার কাজ। তুলিল না প্রসঙ্গটা। তবে চম্পাই তুলিল। স্কুলের ইতিহাসে মস্ত বড় একটা ঘটনা, বিন্দু আর তাহার ভাই জীবনের কাছে সবিস্তারে শুনিয়াছে, প্রশ্ন করিয়া করিয়া মেয়েটির চেহারার পর্যন্ত একটা চিত্র তুলিয়া লইয়াছে মনে; বিকালে পড়াইতে আসিয়া প্রশ্ন করিল—"পরশু কে একটি মেয়ে নাকি এসে পড়েছিল ঝড়বৃষ্টির সময়?"

টুলু বলিল—"হ্যাঁ, সাঁকরেলে বাড়ি। তার দুটি ভাই স্কুলে পড়ে এখানে।"

চম্পা অনাসক্তভাবে বলিল—"ও!···বিন্দু তাই বলছিল।"

একটু চুপ থাকিয়া হঠাৎ দৃষ্টি তুলিয়া বলিল—"আর আসবে নাকি?"

টুলু হাসিয়া বলিল…"কি ক'রে বলব?…এমন যদি হয় আবার কখনও সে এই স্কুলের সামনে এসেই ঝড়বৃষ্টির মাঝে প'ড়ে যায়, নামতেও পারে।"

চম্পা যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, বলিল—"না, সেজন্যে নয়, বলছিলাম, এবার যদি আসে আমায় ডেকে পাঠাবেন কাউকে দিয়ে, পরিচয় ক'রে নোব।"

টুলু আবার হাসিয়া বলিল—"তা দোব, কিন্তু ঐ যে বললাম—অত ঝড়ের হিসেব ক'রে সে বাড়ি থেকে বেরোয় তবে তো?"

এক-একটি দিন যেন সফলতার ডালি সাজাইয়া আনে। বনমালীর দেরি হইতেছিল, সন্ধ্যার সময় বাঁশ, খড় প্রভৃতি গৃহনির্মাণের সরঞ্জাম লইয়া উপস্থিত হইল। পাহাড়তলী হইতে নিজের বাড়ি গিয়াছিল, সেখানে নিজের বাগান থেকেও এক গাড়ি বাঁশ কাটিয়া আনিয়াছে, তাই বিলম্ব হইয়া গেল। বনমালীর মধ্যেও উৎসাহের ছোঁয়াচ লাগিয়া গিয়াছে, বলিল—"আমারও এক গাড়ি বাঁশ রইল ছোটবাবু, সাগর বান্‌তে কাঠবেড়ালির পিঠে ক'রে একটু ধূলা ঝেড়ে আসা আর কি।"

পরদিন খানিকক্ষণ স্কুল করিয়া টুলু বটতলা চলিয়া গিয়াছিল—কি রকম কুলি খাটিতেছে দেখিবার জন্য; কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"চম্পা, একবার দেখবে চল ব্যাপারটা।"

চম্পা একটু হাসিয়া সহজ কণ্ঠেই বলিল—"এখন দেখবার মতন এমন কি হয়েছে? মোটে তো বাঁশ খড় এসে পড়ল।"

"বস্তির লোক একেবারে ভেঙে পড়েছে, যে যেমন জানে কাজে হাত লাগিয়ে দিয়েছে—জমি খোঁড়া, বাঁশ কাটা, বাতা চেরা, খড়ের আঁটি বাঁধা, দড়ি পাকানো—যে যেমনটি পারে। শুধু যে কুলি-খরচের দিক দিয়ে সুসার তাই নয়—সেটা তো সামান্য কথা, ম্যানেজারের ওপর আমার জিতটা স্বচক্ষে দেখবে চল চম্পা, এ যেন প্রত্যেকটি লোক নিজের নিজের কাজ ব'লে ধ'রে নিয়েছে; চল দেখবে, ওঠ।"

"এদের পড়া রয়েছে যে, আপনিও নেই…"

"থাক্ না একটু…আর ঠিক তো, মনে প'ড়ে গেছে—স্কুলের বুনেদ দেওয়া হচ্ছে, আজ ছুটি থাকবে না ওদের?"

চম্পা হাসিয়া বলিল—"স্কুলের বুনেদ গড়বার দিনই পড়া বন্ধ?"

টুলু যেন একটু উত্যক্ত হইয়াই হাসিয়া বলিল—"আবার সেই কথা কাটা-কাটি!···না চম্পা, আমি যে অমন একটা প্যাঁচোয়া লোককে কি ভাবে হারিয়ে চলেছি, দেখতে ইচ্ছে হয় না তোমার? জানই তো গোড়া থেকে সব কথা।"

চম্পা একবার একটু বিষণ্ণ ভাবে হাসিয়া বলিল—"হারটা বজায় থাকতে দেওয়াই ভালো নয়?"

সঙ্গে সঙ্গে টুলু আবার বিরক্ত হইয়া উঠিবার পূর্বেই উঠিয়া পড়িয়া বলিল—"বেশ, চলুন।"

ছেলেমেয়েদের বলিল—"আজ তোদের ছুটি, নতুন স্কুল হচ্ছে তোদের।"

বাহিরে রাস্তার উপর আসিয়া যেন একবার শেষ চেষ্টা করিল। খুঁটিনাটিগুলা বুঝা না গেলেও বহু লোকের চঞ্চল কর্মব্যস্ততার একটা অস্পষ্ট ছবি চোখে পড়ে, চম্পা একটুখানি দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল—"হ্যাঁ, তাই তো দেখছি; দু-পাঁচ দিনের মধ্যে ঘরগুলো দাঁড় করিয়ে দেবে।"

টুলু ততক্ষণে ঢালু দিয়া নামিয়া পড়িয়াছে। ঘাড় ফিরাইয়া বলিল—"নেমে এস, থামলে যে আবার?"

"এই যে, চলুন না।"—বলিয়া চম্পা নামিয়া পড়িল।

সত্যই সবার উৎসাহটা দেখিবার জিনিসই বটে। কিছু রোজে-খাটা মজুরও আছে, তবে বেশির ভাগই বস্তির লোক। কাজের সময় প্রায় সকলেরই জানা চম্পার, দেখিল, সকালের দিকে যাহার যাহার ছুটি সবাই আসিয়াছে, কয়েকজন কামাই করিয়াও যোগদান করিয়াছে। বনমালী যেন মাতিয়া উঠিয়াছে, চারি দিকে ঘুরিয়া, তদারক করিয়া, উৎসাহ দিয়া কর্মমধুর জায়গাটাকে যেন আরও সরগরম করিয়া তুলিয়াছে। মাঝে মাঝে কি যে বলিতে হইবে বা করিতে হইবে যেন হঠাৎ ভুলিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেছে, মাথা চুলকাইতেছে, আবার নূতন একটা কিছু ঠিক করিয়া এক দিকে আগাইয়া যাইতেছে। ওর দুর্বল মস্তিষ্ক এত প্রবল উৎসাহের সঙ্গে যেন পাল্লা দিতে পারিতেছে না।

চম্পা টুলুর পিছনে পিছনে আসিয়া এক জায়গায় দাঁড়াইল—যতটা সম্ভব দূরত্ব রক্ষা করিয়া। কেহ লক্ষ্য করিলে দেখিত, দৃষ্টিতে একটা অভিনবত্ব আছে।

চম্পার বাহিরটা প্রশান্ত, কিন্তু অন্তরে যে কি বিক্ষোভ তাহার সন্ধান কে রাখিবে? নিজেই কি সে বিক্ষোভের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেছে?···টুলু জানে কিছুদিন পর্যন্ত আগেকার চম্পাকে, নিশ্চিন্ত আছে—চরিত্রের দিক দিয়া চম্পা নিখুঁত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু চরিত্র কি এতই সোজা? মন কি ছাঁচে-ঢালা লোহার মত একটা নির্দিষ্ট আকার লইয়া থাকিবার জিনিস?...এর মধ্যে চম্পার জীবনে যে অনেক কিছুই ঘটিয়া গিয়াছে, পঞ্চকোটের আগুনের আগের দিন পর্যন্ত ছিল এক চম্পা, আজকের যে চম্পা সে সম্পূর্ণ পৃথক।···হয়তো টুলু পারিত পরিবর্তনটুকু ধরিতে—বেশ-ভূষায়, হাসিতে, চাহনিতে চম্পা এর অনেকখানি পরিচয় দিয়া গিয়াছে এ কয়টা দিন; কিন্তু নিতান্তই উন্মাদের মত এক লক্ষ্যে দৃষ্টি রাখিয়া ছুটিয়াছে বলিয়া টুলুর নজর পড়ে নাই এদিকে; সে জানে চম্পা নিখুঁত হইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে, নিখুঁতই আছে।

তবুও, আজকের যে চম্পা সে তো সেই প্রথম দিনে দেখা বস্তির চম্পাও নয়; তাই ভালোয়-মন্দয় অন্তর তাহার বিক্ষুব্ধ। তাহার স্কুলে আসার পরিণাম সে জানে। সবার দৃষ্টির অন্তরালে বলিয়া তবুও একটু ভরসা করিয়া রাজি হইয়াছিল, কিন্তু আজ টুলুর সঙ্গে এখানে আসার যে কি পরিণাম সে বিষয়ে সে একেবারে নিঃসন্দেহ। তবুও বার কয়েক এড়াইবার চেষ্টা করিয়া শেষ পর্যন্ত আসিল—টুলুর বিরক্তিকে আজকাল ওর বড় ভয় হয়।

টুলু নিজের মনের উল্লাসে প্রবল উৎসাহে বকিয়া যাইতেছে, চম্পা মুখে একটা নির্বিকার হাসি টানিয়া রাখিয়াছে—টুলুকে প্রবঞ্চিত করিবার জন্য, কিন্তু মন তাহার অন্যদিকে—দেখিতেছে—একজন দুইজন করিয়া সবার দৃষ্টি তাহাদের দিকে আসিয়া পড়িতেছে—পাশাপাশি সে আর টুলু···দুই-এক জন ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিল—দূরে কাছে—ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, দৃষ্টিতে বিস্ময়। টুলু বকিয়া যাইতেছে—বেশির ভাগই চম্পার দিকে চাহিয়া—নিজের নিষ্কলুষ মনের আনন্দে এসবের দিকে দৃষ্টি নাই, এসবের অর্থ বুঝিবারও ক্ষমতা নাই।

চম্পার মনের ভিতরটা মাঝে মাঝে অসহ্য মোচড় দিয়া উঠিতেছে। আবার তাহার মাঝে মাঝে আছে একটা দুরন্ত উল্লাস—স্ত্রীলোক যখন নামে তখন নিজের কলঙ্কেই পায় আনন্দ—বেশ তো, দেখুক না সবাই—একসঙ্গে সে আর টুলু—সবাই

তো চায় বিজয়ই—ম্যানেজার চায়, টুলু চায়, চম্পা চাহিলেই কেন দোষ হইবে?... পরিণাম?—তাহার তো একটি মাত্র পরিণাম—টুলুকে পাওয়া; আর সবই তো এর পরের কথা।

তবুও অসহ্য বেদনা, একেবারেই অসহ্য...কত উঁচুতেই না উঠিয়াছিল চম্পা! হয় না দুই দিক রক্ষা কোন রকমে? টুলুকেও পায় আর টুলুর ব্রতও থাকে অটুট?

পরদিন টুলু সকালবেলাই বাহির হইয়া গেল, চম্পার হাতে স্কুল ছাড়িয়া। যখন ফিরিল, চম্পা যেন মুখাইয়া ছিল, প্রশ্ন করিল—"কত লোক এসেছিল আজ?"

টুলু উৎসাহের মাথায় বলিল—"অত লক্ষ্য করি নি, তবে এসেছিল বইকি। হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করলে যে?"

চম্পা একটু ম্লান হাসিয়া বলিল—"বড্ড অন্যমনস্ক আছেন আপনি, যাকে বলে মেতে আছেন,—সবাই আসে নি। কাল যাদের দেখেছিলাম, তাদের অনেকেই নেই আজ।"

—দশ-বারো জনের নাম করিয়া গেল।

টুলু প্রশ্ন করিল—"এল না কেন?"

চম্পা তিনটি ছেলেকে একত্রে লইয়া পড়াইতেছিল, উঠিয়া পড়িল, বলিল—"এদিকে আসুন।"

উঠানের সদর দিকের যে দরজা, দুই জনে সেই দিকে চলিয়া গেল, চম্পা চৌকাঠে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া একবার স্কুলের দিকে চাহিয়া লইয়া বলিল—"সত্যিই আপনি মেতে রয়েছেন, স্কুলের অবস্থা দেখেও বুঝছেন না?"

টুলু এতক্ষণে যেন অন্য দৃষ্টিতে দেখিল, একটু বিস্মিতভাবে বলিল—"তাই তো, প্রায় আদ্দেক ছেলেমেয়ে আসে নি! কেন, আজ দিনটা তো বেশ ঠাণ্ডা, কাল রাত্তিরে ঝড়বৃষ্টিটা হয়ে..."

"দিন ঠাণ্ডা থাকলেই যে মানুষের মেজাজ গরম হবে না, তার কি মানে আছে?"

"বুঝলাম না।"

"মনে আছে আপনার?—যেদিন প্রথম এখানে এসে থাকবার কথা ওঠে আমার, রাজি হই নি; কালও আপনি যখন আমায় আপনার সঙ্গে বটতলায় যেতে বললেন ম্যানেজারের হারটা দেখবার জন্যে, আমি বলেছিলাম—বজায় থাকতেই দিন হারটা। আপনি শুনলেন না। হার বজায় রইল না, ওই শেষ পর্যন্ত জিতল, ওর কূট চালটাই ফলল শেষ পর্যন্ত—আমায় যে উদ্দেশ্যে ওর পাঠানো এখানে…"

টুলু শূন্যে একদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চুপ করিয়া ভাবিতেছিল, দৃষ্টিটা ফিরাইয়া আনিয়া বলিল—"বলছ ফলল,—এতদিন ফলে নি কেন?"

"এই দু-চার দিনের মধ্যে যে ভুলটা হ'ল তা এতদিন হয় নি ব'লে। আমি এখানে আছি বটে, কিন্তু বাইরের সবাই জানত আমাদের মধ্যে পরিচয় নেই তেমন, এত মাখামাখি তো দূরের কথা। এর ওপর আপনিই আর একটা বড় চাল দিয়ে রেখেছিলেন মিতিনকে আনিয়ে—লোকে জানত দুজন মেয়েছেলে এখানে রয়েছি আমরা, আমি রয়েছি বুড়ো ঠাকুরদাদার হেফাজতে, মিতিন রয়েছে হীরার হেফাজতে।…প্রথম ভুলটা হ'ল আমায় স্কুলে পড়াতে ডেকে এনে। আপনি লক্ষ্য ক'রে থাকবেন আমি খুশি-মনে রাজি হই নি; তবুও একটা আশা ছিল যে সবার চোখের আড়ালে, ততটা ক্ষতি হবে না; কাল কিন্তু আমায় সঙ্গে ক'রে বটতলায় নিয়ে যাওয়ায় মস্ত বড় ভুল হয়ে গেল। আমি টের পেয়েছিলাম—আমি স্কুলে আসতেই ছেলেমেয়েদের মুখে কথাটা শুনে, বস্তিতে একটা কানাঘুষা উঠেছিল, বটতলায় আপনার পাশে আমায় দেখে কারুর আর সন্দেহ রইল না যে…"

টুলু প্রশ্ন করিল—"ম্যানেজার এসেছে?"

"না, শুনছি চারদিকে যে হাঙ্গামা চলছে তা নিয়ে কলকাতায় নাকি বড় বড় কোম্পানির মাতব্বরদের মিটিং হচ্ছে ক'দিন ধরে। হয়তো দু-একদিনের মধ্যেই ফিরবে, তবে আমাদের ম্যানেজার তো অনেকটা নিশ্চিন্তই আছে ব'লে মনে হয়, জানে, একদিন ওর কূট চাল সফল হবেই। আমি এই জন্যেই আসতে চাই নি, বড় সূক্ষ্ম চাল ওর, কখনও বাতিল হতে দেখি নি। জানে, একটু এদিক ওদিক হ'লেই বাজি মাৎ হবে, আর একসঙ্গে থাকতে থাকতে একটু এদিক

ওদিক হয়েই পড়বে কোন-না-কোন সময়—কত সাবধানে থাকতে পারে মানুষ ?”

টুলু চিন্তায় যেন ডুবিয়া যাইতেছে, চম্পা থামিলে বলিল—“সবটা যেন ধ'রে নেওয়া হচ্ছে ; বস্তিতে গিয়ে একবার বল না সবাইকে কত বড় কাজটা হচ্ছে আমাদের।”

এত বড় একটা অবিবেচকের মত কথা বলিবে, চম্পা যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না, বিস্মিতভাবে মুখের পানে চাহিয়া বলিল—“এর ওপর আবার এতটা ভুল করবেন ?”

টুলুর মুখটা ধীরে ধীরে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, খুবই অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছে, দুশ্চিন্তাটা চম্পার উপর বিরক্তি দিয়া চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াই ঝাঁকিয়া বলিল—“তোমাদের মেয়েছেলেদের একটা স্বভাব দেখেছি চম্পা, খারাপ দিকটা দেখতেই ভালবাস ; বেশ, তুমি না যাও, আমি নিজেই যাব—আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখলে যদি ওদের সবার মন উল্টে যায়, বুঝিয়ে বলতে হবে, উপায় কি ?”

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

দ্বিতীয় দিনের কথা। অনেকখানি রাত্রি হইয়াছে, বটতলায় খোয়াইয়ের ধারে একটা শিলাখণ্ডের উপর টুলু বসিয়া ছিল। কৃষ্ণা সপ্তমীর চাঁদ উঠিবে, পূর্বাকাশ অনেকটা স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে। ঈষত্তরল অন্ধকারে যতদূর পর্যন্ত দেখা যায়, দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিয়াছে টুলু। বাঁশ বাতা চারিদিকে ছড়ানো, কতকগুলা খুঁটি এখানে-ওখানে আধ-হেলা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আজ বৈকালে একটা দমকা হাওয়া উঠিয়াছিল, খড়ের আঁটিগুলা লইয়া যেন লোফালুফি করিয়া গিয়াছে ; গোটা তিন বড় আঁটি গড়াইয়া খোয়াইয়ের গর্তে পড়িয়াছে।

কাল বিকালে আরও কম লোক আসিয়াছিল, আজ সকালে আসিয়াছিল মাত্র রোজে-খাটা মজুররা ; বিকালে কে আসিয়াছিল, না-আসিয়াছিল টুলু জানে না, সে নিজে আসে নাই এদিকে।

বনমালী এক প্রস্থ যোগান দিয়া আবার সরঞ্জাম আনিতে গিয়াছে; কবে যে ফিরিবে সেই জানে, অথবা হয়তো বিধাতা-পুরুষও জানেন না। কাজের উত্তেজনায় সময়ের গোলমাল হইয়া যাইতেছে; পাঁচ দিন পরে ফিরিয়া তিন দিনের হিসাব দিল, বাকি দুই দিন হজম করিয়া ফেলিয়াছে।

বিকালে টুলু যখন বাহির হয়, চম্পা বিন্দু জীবন আর গুটি চারেক অন্য ছেলে লইয়া বসিয়া ছিল—বস্তির নয়, বাজারের ওদিকের; টুলুর দিকে একবার বিমূঢ় দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল, কিছু প্রশ্ন করিবার সাহস যোগাইল না।

চম্পার কথাগুলা টুলু প্রথমটা অগ্রাহ্য করিতেই চাহিয়াছিল, তাহার পর যেমন সময় গেছে, অল্প অল্প শক্তি সঞ্চয় করিয়া সেগুলা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। সত্যই সে পরাজিত, বিকালে স্কুল, বটতলা—দুই জায়গায়ই এই রূঢ় দারুণ সত্যটুকু স্পষ্ট হইয়া উঠিল, আজ সকালে আরও বেশি করিয়া; তাহার স্বপ্ন শ্মশানে পরিণত হইয়া গেছে, কাল থেকে আজ পর্যন্ত দুইটা দিন যেন একটা ঘূর্ণির মধ্যে কাটাইয়া ক্লান্ত শরীরে, অবসন্ন মনে টুলু সেই শ্মশানের মাঝখানে আসিয়া বসিয়াছে। তাহারই হার, খুব সূক্ষ্ম তুলি দিয়া ম্যানেজার রতিকান্ত তাহার ললাটে কলঙ্করেখা অঙ্কিত করিয়া দিল, এত সূক্ষ্ম যে টুলুকে একবার টের পাইতেও দিল না।

কাল থেকে টুলুর আহার নাই, নিদ্রা নাই, কোথায় কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে কি কি করিয়া, ভালভাবে মনে পড়ে না। শুধু একটা জ্বালা,—আক্রোশে ঘৃণায় মনটা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, যতই সময় গিয়াছে দাহ গিয়াছে বাড়িয়া।...একবার ম্যানেজারের বাড়ির দিকে পা বাড়াইয়াছিল, গিয়া কিছু একটা করা দরকার, না হইলে বাঁচা যায় না; বাড়ির বাহির হইবার আগেই মনে পড়িল ম্যানেজার নাই; ব্যর্থ আক্রোশটা নিজেকেই দ্বিগুণ করিয়া দগ্ধ করিতে লাগিল।...তাহার পর যত আক্রোশ, যত ঘৃণা একসঙ্গে গিয়া পড়িল বস্তির উপর—এই ইহাদেরই জন্য সে প্রাণপাত করিতে বসিয়াছিল!—একবার ভাবিয়া দেখিল না, খোঁজ লইয়া দেখিল না, চম্পা শুধু তাহার পাশে আছে বলিয়া এমন একটা কুৎসিত সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া তাহাকে এক কথাতেই পরিহার করিয়া বসিল—দুই দিন আগে যেমন না খোঁজ লইয়াই তাহাকে

দেবলোকে তুলিয়া ধরিয়াছিল! টুলু চম্পাকে বলিয়াছিল, সে নিজেই বস্তিতে যাইয়া সবাইকে বুঝাইবে। প্রস্তাবটা যে কতটা হেয়, কতটা লজ্জাকর সেটা নিজের কাছেই প্রতীয়মান হইতে দেরি হইল না। যাওয়া দূরের কথা, বস্তির পানে চাহিতেও যেন গা ঘিনঘিন করিতেছে।

দুইটা দিন এইভাবেই গিয়াছে—ঘৃণা, আক্রোশ, লজ্জা, অভিমান, সবার উপর দারুণ আশা-ভঙ্গ, তাও আশা-উন্মাদনা যখন একেবারে চরমে আসিয়া ঠেকিয়াছিল,—সব মিলিয়া একটা ঘূর্ণির সৃষ্টি করিয়া শুষ্ক পত্রের মতই উড়াইয়া লইয়া ফিরিয়াছে টুলুকে।…তাহার পর, এই একটু আগে এইখানে আসিয়া বসিল।

এই প্রথম এক জায়গায় বসিয়া সমস্ত ব্যাপারটা একটু স্থির মনে ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। প্রথমে কলঙ্কের বিভীষিকাটাই গেল হঠাৎ বাড়িয়া, শুধু তো বস্তি পর্যন্ত নয়, আরও ঢের কাছে, লজ্জাকে আরও গভীরতর করিয়া কলঙ্ক পড়িয়াছে ছড়াইয়া,—সেদিনে কাকিমার কথাগুলা, তাঁহার ব্যবহার নূতন অর্থ-যুক্ত হইয়া উঠিল। শুষ্ক বিরস কণ্ঠস্বর, এতটুকু হৃদ্যতা নাই কথার মধ্যে।… "তুই বাড়ি চ'লে যা টুলু"…"কেন?"…"কেন আবার, চিরকালটা এই ভাবে কাটাতে হবে?"…নির্দোষ মনের নির্বিকারত্বে টুলু বলিতেছে—"কেন, বলব খুড়িমা? কারণ, আমি ছোটলোকদের ছেলেমেয়ে নিয়ে রয়েছি, তাদের পড়াচ্ছি, তাদের মানুষ করবার চেষ্টা করছি।"…"ধর্ যদি সেইটুকুই, তার জন্যেই বা তোর এত মাথাব্যথা কেন?"

কত লজ্জাই না জমা হইয়াছিল কথাগুলার মধ্যে! ভগবানকে ধন্যবাদ যে নিজের মনের শুদ্ধতায় গ্লানির কষাঘাত সত্য সত্য লাগে নাই তাহার মনে; কিন্তু এবার তো কাকার বাড়ি চিরতরেই তাহার নিকট বন্ধ হইয়া গেল। শুধু তাহাই কেন? সমস্ত ব্যাপারটা এই মসীতেই লিপ্ত হইয়া কি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাইয়া যায় নাই? আর এ জন্মে কি বাড়িতেই মুখ দেখাইবার অবস্থা রহিল টুলুর?

পূর্বাকাশে চাঁদ স্পষ্ট হইয়া উঠিল! একটা ঝিরঝিরে হাওয়াও উঠিল। শ্মশানটাও যেন একটু স্নিগ্ধ রূপ ধারণ করিল। টুলু আর একবার শেষ চেষ্টা

করিল, মনটাকে যথাসম্ভব শান্ত করিয়া লইয়া, একটু গুছাইয়া ভাবিতে লাগিল কি দোষ বস্তির এদের?—নিজেরা এত নিচে পড়িয়া থাকিলেও চরিত্রকে সবার উপর এতটা মর্যাদা দেওয়াটাই একটা মস্ত বড় আশার কথা নয় কি এদের পক্ষে? যতক্ষণ ঐ বিশ্বাসটুকু ছিল, টুলুকে দেবতার আসন দিয়াছে, যেই সেটা গেছে, সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে—বিশ্বাসটা যে গেল সেটা তো ওদের দোষ নয়। ওদের ত্যাগ করিবে কেন টুলু? ওরা খোঁজ লয় নাই, তাহার কারণ সব ব্যাপারকেই একটু স্থূলদৃষ্টিতে দেখা অভ্যাস ওদের—পাইবেই বা কোথায় দৃষ্টির অত সূক্ষ্মতা? তা, ত্যাগ করা চলে না ওদের, এত অল্পে নিরাশ হওয়া চলে না; একটা ব্রত-উদ্‌যাপনের মুখে যদি এত অল্পে ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে এ পথে নামিয়াছিলই বা কেন?...ওদের মনের মত হইয়া ওদের সামনে আবার দাঁড়ানো যায় না?

অনেকক্ষণ ভাবিল টুলু, কিন্তু একটা উত্তরই পাওয়া গেল—বোধ হয় যায় না দাঁড়ানো আর। সেই এক কারণ—ওরা স্থূল দৃষ্টিতে দেখে, এর পর যেভাবেই টুলু ওদের সামনে দাঁড়াক, যাচাই করার মানদণ্ডটি ওদের বদলাইবে না, ওরা ভুলিবে না, চম্পা একদিন ওর পাশে বসিয়া ওর স্কুলে পড়াইয়াছিল, একদিন ওর পাশে দাঁড়াইয়া ওদের কাজ তদারক করিয়াছিল। কেন?—এই প্রশ্নটা আর তাহার অতি সহজ উত্তরটা ওদের মন থেকে কখনই দূর হইবে না।

তবু একবার চেষ্টা করিয়া দেখা চলে, কিন্তু তাহার মানে তো চম্পাকে ত্যাগ করা? কেন ত্যাগ করিবে? বস্তির ওরা, সে নিজে আর চম্পা—এই তিনের মধ্যে সব চেয়ে নিরপরাধ তো চম্পাই। টুলু বরং এত বড় একটা ভুল করিয়া বসিয়াছে—ভুল এক ধরনের অপরাধই; চম্পা তো এদিক দিয়াও মুক্ত, স্থিরভাবে একটা কথা ভাবিয়া দেখিবার ক্ষমতা রাখে, এ মূঢ়তার পরিণাম আন্দাজ করিয়াছিল, নামিতে চাহে নাই এসব ব্যাপারে।

তর্কের জের ধরিয়া আরও একটা কথা মনে হইল,—যদি করেই ত্যাগ চম্পাকে, এখান থেকে দেয়ই সরাইয়া, ওদের সন্দেহই ভাল করিয়া পুষ্ট করা হইবে না কি?

স্থিরভাবে ভাবিতে গিয়া নিরাশার অন্ধকার যেন আরও নিবিড় হইয়া

উঠিল। এই সময় সাঁকরেলের কথা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পিছনে কাঁকরের উপর কাহার পায়ের শব্দ শুনা গেল ; টুলু ফিরিয়া দেখিল চম্পা।

চম্পা বিস্মিত হইল না, আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল—"জানি শেষ পর্যন্ত এইখানেই পাব আপনাকে, তিন বার খুঁজে গেছি এর আগে। এ কি ছেলেমানুষি হচ্ছে? বাসায় যাবেন না? রাত কত হ'ল কিছু আন্দাজ আছে?"

টুলু সামনের দিকে হাতটা সঞ্চারিত করিয়া বলিল—"নিজের চোখেই দেখ চম্পা—কার জন্যে করছিলাম এসব? আজ একটি লোক আসে নি, অথচ হৈ-চৈ করে এসে আমার জিনিসপত্রগুলো তচনচ ক'রে দিয়ে গেল!"

চম্পা একবার দৃষ্টিটা বুলাইয়া আনিয়া বলিল—"এ আক্কেলটা আপনার হওয়া দরকার ছিল,—কাদের জন্যে করছিলেন ভালো ক'রে বুঝুন এবার।"

চম্পা সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে, কবরীতে একটা জুঁইয়ের মালা পর্যন্ত,—একদিন যে-মালাকে এই খোয়াইয়ের মধ্যে দুই পায়ে মাড়াইয়া দিয়াছিল ফেলিয়া, আবার শেষ পরীক্ষার জন্য তুলিয়া লইয়াছে. জুঁইয়ের গন্ধের সঙ্গে সেই হালকা এসেন্সের গন্ধটা আছে, পরনের শাড়িটা রঙ করা, রাত্রিতে একটু মলিন মনে হওয়ায় ওর গায়ের মাজা-মাজা রঙটাকে আরও উজ্জ্বল বোধ হইতেছে।...পাশে দাঁড়াইয়াছিল, কথাটা বলিয়া একটু লীলায়িত ভঙ্গিতে সামনে একটা বড় খড়ের গাদায় গিয়া বসিতে যাইতেছিল, টুলু বারণ করিল, বলিল—"গরমকাল যেখানে সেখানে ব'স না।"

চম্পা একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর একটা চূড়ান্ত সাহসের কাজ করিয়া বসিল, কাছাকাছি চারিদিকটা একবার দেখিয়া লইয়া অল্প একটু হাসিয়া ফস করিয়া বলিয়া বসিল—"এখানে বসবার জায়গা তো তা হ'লে দেখছি একটি—যে পাথরটার ওপর আপনি ব'সে আছেন।"

বেশ লম্বা সমতল গোছের পাথরটা, জনতিনেক বেশ বসিতে পারে। তখনই কিন্তু দাঁড়াইয়া উঠিয়া কথাটা ঘুরাইয়া লইল, বলিল—"নিন, বাজে কথা রেখে উঠুন তো; দয়া ক'রে যদি একখানা ঘর বেঁধে দিয়েও ছাড়ত ওরা তো তাইতে না হয় রাত কাটাতেন।"

একটু আড়চোখে চাহিয়া দেখিল, অতি সাহসের কথাটা টুলুর কানে পৌছিয়া থাকিলেও মনে পৌছায় নাই মোটেই—সেটা বহু দূরে কোথাও পড়িয়া আছে। দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"বেশ চল।"

পথে কথা হইল খুব অল্প। টুলু একবার প্রশ্ন করিল—"কোথাও গিয়েছিলে তুমি ?"

"না, কেন বলুন তো ?"

"না, এমনি, হীরার গায়ের গন্ধটা পাচ্ছি, ভাবলাম নিয়ে খেলা করছিলে বুঝি।"

আবার নিজের চিন্তায় রহিল ডুবিয়া।

বাসার প্রায় কাছাকাছি আসিয়া হঠাৎ ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল—"আমি সহ্য করতে পারছি না চম্পা, এই গঞ্জডিহিতে এসে আমার মনের উপর দিয়ে অনেক ঝড় গেছে, স'য়ে গেছি, শুধু স'য়ে যাওয়া নয়—দেখেছি শেষ পর্যন্ত বরেই দাঁড়িয়েছে সেগুলো। আমার মনে কিন্তু কেমন একটা ভয় হচ্ছে এটা একটা অভিশাপ; আমি এমনভাবে ভেঙে পড়ি নি কখনও। ঠিক ধরতে পারছি না, কিন্তু সত্যিই আমার মনে কোথায় যেন মস্ত বড় একটা ধস নেমে গেছে, একটা যেন সর্বনাশের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি আমি। আর সবই গিয়ে এরাই শেষ পর্যন্ত আমার জীবন এমনভাবে ব্যর্থ করলে !"

চম্পা মাথা নিচু করিয়া শুনিতেছিল, উত্তর দিল কয়েক পা যাওয়ার পর; মাথা নিচু করিয়াই বলিল—"ব্যর্থ যে হয়েছেই এমন ভাবছেন কেন ? সার্থক করা তো নিজের হাতে।"

"কি ক'রে ?"

"অনেক রকম পথ আছে; যেটা ধরে নিয়েছিলেন সেইটেই কি সার্থক করবার পথ জীবনকে ? বরং ঠিক উল্টা নয় কি ? ভেবে দেখুন না ভালো ক'রে।"

যে ভাবনার অন্তঃশীলা প্রবাহ চলিয়াছে তাহারই জের ধরিয়া টুলু বলিল—"কিন্তু আমি তো ওদের জন্যে নিজের ব'লে কিছু রাখি নি চম্পা, সবই দিয়েছি বিলিয়ে—দিচ্ছিলামও…"

চম্পা দাঁড়াইয়া পড়িল, চোখ দুইটা দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, ক্রোধে নয়, টুলুর

পরিচিত কোন কিছুতেই নয় যেন, বলিল—"কিন্তু এইভাবে বিলিয়ে দেওয়া, নিজেকে এইভাবে বঞ্চিত করাই কি সার্থক করা জীবনকে? জীবনের নিজের দাবি নেই মনে করছেন নাকি? আপনি আপনার খেয়াল নিয়ে রয়েছেন মত্ত, যারা চাইছে না আপনাকে, যারা উপকারের বদলে করছে অপমান, তাদের পেছনেই পাগলের মতন ছুটে চলেছেন আপনি—নিজের সর্বনাশের সঙ্গে আরও কারুর সর্বনাশ করেছেন কি না একবার চোখ ফিরিয়ে দেখবার ফুরসত নেই আপনার; কিন্তু একদিন জীবন কি এর জবাবদিহি চাইবে না ভেবেছেন? নিজে ফাঁকি পড়ার সঙ্গে—এই রকম ক'রে ফাঁকি দিয়ে যাবার···"

টুলু আতঙ্কে একেবারে স্থাণুর মত নিশ্চল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, চোখ দুইটা চম্পার চোখের উপর, ফিরাইতে পারিতেছে না; পুষ্পশীর্ষ একটা লতা যেন হঠাৎ সর্প হইয়া চক্র ধরিয়া সামনে দাঁড়াইয়া আছে। কোথা দিয়া কি হইল, শেষের কথাগুলা বলিতে বলিতে দুই হাতের অঞ্জলিতে মুখটা ঢাকিয়া চম্পা একেবারে হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

টুলুর তখনও সম্বিৎ ফিরিয়া আসে নাই; চম্পা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সামনে দাঁড়াইয়া, কান্না রুদ্ধ করিবার চেষ্টায় শরীরটা দুলিয়া উঠিতেছে। শাড়ির আঁচলের খানিকটা মাটিতে লুটাইতেছে, মাথাটা নিচু করা, চাঁদের আলো পড়িয়া খোঁপার মালাটা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

সম্বিৎ হওয়ার পরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; সমস্ত দৃশ্যটার—আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটারই ট্রাজেডি ওর মনটাকে মথিত করিয়া দিয়াছে। স্থিরভাবে বেশ অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর এক পা আগাইয়া গিয়া স্নেহভরে পিঠে হাত দিয়া বলিল—"আমি কাউকে ফাঁকি পড়তে দেব না; কথা দিচ্ছি তোমায়, আমার ভুল ভেঙেছে। তুমি বাসায় যাও, আমি এক জায়গায় যাচ্ছি এখন,—কোথায় তা জিগ্যেস ক'রো না, সঙ্গও নিও না আমার, লক্ষ্মীটি। কাল সকালেই ফিরে এসে নিজেই তোমায় ডেকে পাঠাব। বঞ্চিত হতে হবে না কাউকে চম্পা, আমি কথা দিচ্ছি।"

॥ ছত্রিশ ॥

সাঁকরেলের কথাটা চম্পা হঠাৎ আসিয়া পড়ায় চাপা পড়িয়া গিয়াছিল আবার মনে পড়িয়া গেল। টুলু হনহন করিয়া চড়াইয়ের পথ ধরিয়া চলিল। চম্পা হাত দুইটা সরাইয়া খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহার,পর ধীরে ধীরে বাসার দিকে চলিয়া গেল।

সাঁকরেল টুলুর আরও অপরিহার্য ভাবে দরকার হইয়া পড়িয়াছে। চম্পাকে ত্যাগ করিতে হইল না, চম্পা নিজেই গেল। এ যে কত বড় নৈরাশ্য, টুলু যেন হিসাব করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, এ নৈরাশ্যের অতলতার মধ্যে দৃষ্টির যেন পথ হারাইয়া যায়। স্কুলের সবে এই আরম্ভ ছিল। আশাই ছিল না হয় প্রচুর! কিন্তু তবু তো অনিশ্চিতই; কিন্তু চম্পা যে ছিল তাহার সমস্যার সিদ্ধিমূর্তি একেবারে; শুধু তাহাই নয়, নিজের তপশ্চর্যায় চম্পা যে টুলুর ধারণাকেও গিয়াছিল ছাড়াইয়া, তাহার চারিদিকের শুচিতা নিয়া টুলুকেও পরিশুদ্ধ করিয়া লইতেছিল বলিয়া মনে করিতেছিল টুলু।...সব ভুয়া; তিল তিল করিয়া এই লালসাই সঞ্চিত হইতেছিল এতদিন—ব্যর্থ যৌবনের হা-হুতাশ?

টুলু যেন জোর করিয়াই মনটাকে এই চিন্তা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল।... সাঁকরেলের সেই মেয়েটিকে গিয়া বলিবে, কতদূর অগ্রসর হইয়াছে জানাইবে, তাহার মাকে অনুরোধ করিয়া তাঁহারও সম্মতি লইবে।...বেশ একটি আনন্দ ছাইয়া আসিতেছে মনে—সমস্ত ব্যাপারটি ভদ্র, পরিচ্ছন্ন, দিবালোকের মত মুক্ত। না রাজি হন ওর মা টুলু সাঁকরেলে গিয়াই নিজের স্কুল বসাইবে। পর পর দুইটা আঘাতে মনটা একেবারে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, আবার যেন জোর পাইতেছে। শুধু এইটুকুই নয়, মনের উপর হইতে যেন মস্ত বড় একটা বোঝা নামিয়া গিয়াছে। ঠিক তো, একটা বোঝাই তো ছিল চম্পা, নিত্য খোঁজ রাখো, নিত্য সতর্ক থাকো,—যদি ম্যানেজারের ওখানে গেল তো চোখে কি দৃষ্টি লইয়া

ফিরিল—যে-পথ ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়াছে, আবার সেই পথে নামিয়া যাইতেছে না তো ?

শুধু চম্পা নয়, আরও যত কিছু সমস্যা লইয়া সারা গঞ্জডিহিটাই-সুদূর হইয়া যাইতেছে প্রতি পদক্ষেপেই ;—নক্ষত্রলোকের নিচে স্তব্ধ রজনীর এই আত্মসমাহিত মুক্ত রূপটি ধীরে ধীরে টুলুর মনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। যাক্, গঞ্জডিহি যাক্, ও নূতন জায়গায় নূতন করিয়া সব গড়িবে ; গড়া কিন্তু চাই-ই ওর।

টুলু পা চালাইয়া দিল। রূঢ় যুগ্ম আঘাতের পরেই এই নূতন আলোকের সন্ধান পাইয়া দেহে মনে উৎসাহের জোয়ার আসিয়াছে, এই নূতন আলোর সামনাসামনি হইয়া দাঁড়াইতেই যেন বিলম্ব সহিতেছে না ; মনটা হইয়া উঠিয়াছে একেবারে উদগ্র।

এর পরেই একটা ব্যাপার হইল যাহাতে জীবনের সমস্ত ধারাটাই একেবারে বদলাইয়া গেল।

সামনে, প্রায় গজ পঞ্চাশেক দূরে একটা ছইওলা বলদের গাড়ি যাইতেছে, চড়াই-উৎরাইয়ের মুখে কয়েকবার চোখে পড়িয়াছে, নির্জন পথে একটা সঙ্গী হিসাবে মন্দ লাগিতেছিল না, তবে মানুষের অতিসান্নিধ্য এতক্ষণ ভালো লাগিতেছিল না বলিয়া এই ব্যবধানটুকু কমাইবার কোন চেষ্টা করে নাই টুলু ; মন থেকে মেঘটা কাটিয়া যাইতে এই জনহীন জায়গায় ঐ একটি মানুষকে (হয়তো একাধিকই) কেমন যেন বড় আত্মীয় বলিয়া মনে হইল। গতিবেগ বাড়াইয়া দিয়া গাড়ির পিছনে আসিয়া প্রশ্ন করিল—"কোথায় যাবে গো কর্তা ?"

একা গাড়োয়ানই, চকিত হইয়া হঠাৎ বলদ দুইটার রাশ টানিয়া দিল, ছইয়ের পাশ দিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিয়া একটু ভীত কণ্ঠেই সাহস আনিয়া প্রশ্ন করিল···"কে বটে ?"

"চল, ভয় নেই, আমি রাহী একজন। কোথায় যাওয়া হবে ?"

"চাঁপাডাঙ্গা।...মশয় ?"

"সাঁকরেল।"

"সাঁকরেল যাবেন ?—তা বসেন ক্যানে ছইয়ের ভেতরকে, আমিও উর কাছ দিয়েই যাব বটে, শিবতলার তেমাথা থেকে ডাইনে ঘুরব, আপুনি বাঁয়ে যাবেন।"

মন্দ নয়, পা দুটি ভারিয়া আসিয়াছে, গাড়ি দেখিয়া বোধ হয় আরও। টুলু পকেটে হাত দিল, একটা মনিব্যাগ থাকে সর্বদা, ঠিক আছে। বলিল—"তা আপত্তি নেই, তবে কিছু পয়সা নিতে হবে বাপু; নয়ত হেঁটেই যাই গল্প করতে করতে। তোমার নামটি কি?"

পয়সা কাড়ার জায়গায় দেওয়ার কথায় আরও একটু ভরসা হইল বোধ হয়, গাড়োয়ান বলিল—"নামটি আমার নটবর আজ্ঞে নটাই দাস ব'লে ডাকে সবাই, তা পয়সা ক্যানে গো?—গাড়ি তো আমার উই পথেই যাবেক।"

"তা হোক, পয়সা নিতে হবে; তোমার বলদের একটু মেহনৎ হবে তো?"

"হুঁ, ভারী মেহনৎ বলদের! আপুনি উঠেন।"

পিছন দিক দিয়া উঠিতে উঠিতে টুলু বলিল—"উঠছি, পয়সা কিন্তু নিতে হবে।"

"তা দিবেন গো, দিলে ফেলে দিবোক নাকি?"

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া লইল, টুলু উঠিয়া বসিলে একটা বলদের লেজ মলিয়া অপরটার পিঠে চাপড় দিয়া বলিল—"চল্, বাবুমশয়কে পৌঁছিয়ে দিবি ঘরে।... পয়সা দিবেন তো ঘরেই নামায়ে দিয়ে আসি গো, চলেন। কার বাড়ি যাবেন?"

টুলু একটু সমস্যায় পড়িল, একটা প্রশ্ন করিয়া উত্তরটা এড়াইয়া গেল—"তুমি সাঁকরেলের সবাইকে চেন?"

"সবাইকে কি ক'রে চিনবোক মশয়?—আমার ঘর কুথায়, আর কুথায় সাঁকরেল!—মাঝখানে দু কোশ পথ। তবে চিনি বইকি, হাজরাদের চিনি, বিনোদ হাজরা মশয়, রাণীগঞ্জ কয়লা-আপিসে বড় চাকুরি করতোক তিনি। আমি তাঁর বাড়িতে চাকর থাকলাম কিনা; চিনি, তা তিনি তো নাই এখন, মারা গেলোক, সেই নাগাদ আমিও এই বলদ দুটো লইয়ে কাটাচ্ছি মশয়। ...হ্যাট্‌রে হ্যাট্!...আপুনি না চললে, লেজটি ম'লে ম'লে কথনও চালান যায় মশয়? কত মলবেন আপুনি—হাথে ব্যাথাটি ধ'রে যাবেক নাই? হ্যাট্!..."

লেজে হাত দিয়া বলদ দুইটাকে আর এক চোট তাড়া দিল।

টুলু উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, প্রশ্ন করিল—"তা হ'লে চেন তাদের তুমি?"

"হুঁ, চিনি না তাঁর? পরিবারটি আছেন—গিন্নিমা, বড় অসুখ হইছে, কাল

দেখাটি করবোক এসে দুইটি ছাওয়াল, একটি মাইয়া ; তা আপুনি নাই তো পরিবারই কি, ছাওয়ালই কি, মাইয়া কি ?”

“আমি ওদের বাড়িতেই যাব।”

“কে বটে আপুনি উদের ?”—ছইয়ের মধ্যে ঘুরিয়া দেখিল।

নিজের পরিচয়টা দিতে যাইতেছিল, হঠাৎ কি ভাবিয়া একটু থামিয়া গেল, বলিল—“এমনি জানাশোনা আছে। তুমি তা হ'লে এখন এই কাজ কর ? বাড়ি চাঁপাডাঙ্গা বললে না ?—সেখানেই থাক ?”

“উখানে কি রোজগার হবেক মশয় ? থাকি গঞ্জডিহির বাজারে, ই গাড়িটি খাটাই…”

টুলুর বুকটা ধক করিয়া উঠিল, আপনা হইতেই ছইয়ের গা ঘেঁষিয়া একটু গুটাইয়া বসিল। গাড়োয়ান নিজের মনেই কাহিনী বলিয়া যাইতেছে,—ঘরে তিনটি ছাওয়াল আছে—পরিবার আছে—দুইটি মাইয়া—কত শক্ত যে সবার মুখে একমুঠা অন্ন দেওয়া…টুলুর কিন্তু কান নাই সেদিকে বিশেষ, মনে নূতন চিন্তার ঢেউ উঠিয়াছে, ভ্রূ দুইটা কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। মুখটা বাহিরের দিকে একটু ঘুরাইয়া বলিল—“তিনটি ছেলে, দুটি মেয়ে বললে না ? বেশ—তা এদের লেখাপড়া শেখাবার কি ব্যবস্থা করছ ?—অন্তত ছেলে তিনটির তো দরকার ?—গঞ্জডিহিতে তো সুবিধেও আছে বেশ—”

মুখটা ফিরাইয়াই রহিল উল্টা দিকে, কি উত্তর দেয় শুনিবার জন্য কান দুইটি খাড়া করিয়া।

নটাই দাস একটু তেরছা হইয়া বসিল—“‘নেকাপড়া ? হ, বুলছেন বটে !—বিড়ি দিবেন একটা ? আছেঁ ?”

“আমি খাই না বিড়ি।”

“সিকরেঁট ?”

“না, ও পাটই নেই।”

“একটু রন্ ক্যানে, তামুকটা ধরায়েঁ নি।…নেকাপড়া ! হুঁ !…”

গাড়িটা থামাইয়া ছইয়ের গায়ে ঝোলানো একটা হুঁকা থেকে কলিকাটা নামাইয়া লইয়া তামাক সাজিতে লাগিল। টুলু হঠাৎ এই ভাব-পরিবর্তনে একটু

বাস্মিত হইল, তবে সাজার মুধ্যে আপন মনেই বার ছুয়েক—"নেকাপড়া-হুঁ !… নেকাপড়া—হুঁ !" বলায় বুঝিল, প্রশ্নটা ওর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে। ব্যাপারটা কিভাবে বিস্তারলাভ করে, চুপ করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল।

তামাক সাজা হইলে নিজেই গোটাকতক টান দিয়া নটাই দাস গাড়িতে উঠিয়া বসিল। বাঁ হাতে হুঁকাটা মুখে সংলগ্ন করিয়া বলদ ছুইটাকে চালু করিয়া বেশ একটু উত্তেজনার সঙ্গেই বলিল—"নেকাপড়া! হুঁ!…নেকাপড়ার কথা আর বুলবেন না বাবু মশয়।"

"কেন গো? আজকাল সবাই তো পড়াচ্ছে ছেলেমেয়েদের—মেয়েদেরও—" উত্তরটা যেন জানাই শুধু কিসের সম্মোহনে 'ওর মুখ দিয়া যেন বাহির করিয়া লইতেছে টুলু; বুকটা টিপটিপ করিতেছে, কণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে শুষ্ক।

নটাই দাস তিন-চারটা খুব ঘন ঘন টান দিয়া লইয়া বলিল—"হুঁ, পড়াইছে। আমিও তো দিতাম শিখতে—কুড়ানের মায়েরে বুললাম—পয়সা কুথায় পাব ইস্কুলের—পেট চলাটিই ভার, তা মাস্টারমশইর বাসায় এক বাবুটি ইস্কুল খুললেক, পয়সা লাগে নাই, সিলেট দিইঁছে, বই দিইঁছে, তুর কুড়ানকে আর হারানকে দে, জিম্মা ক'রে দিইঁ তেনাকে, উদের বাপের মতন বলদ ঠেলতে হবেক নাই। উদের মা বুলবেক—তা নিয়ে যাও ক্যানে, পেটে ছুটো কেতাবের হরফ ঢুকুক, ছুটো ইনৃজিরী গাল শিখলেও মানুষ ব'নে যাবে।…এই-ই খেপে নিয়ে আসব মশয়, ভেতরের কেচ্ছা বেইরে এলোক আজ্ঞে—পাপ তো ঢাকা থাকে নাই মশয়—আগুনটি তো চাপা থাকবেক নাই!…"

টুলুর কপালে ঘাম জমিয়া উঠিয়াছে, সমস্ত শরীরটা যেন অসাড় হইয়া আসিতেছে, নিজের মৃত্যুর রায় শুনিতেছে টুলু। তবু শোনার একটা আগ্রহ—আরও স্পষ্ট করিয়া শোনার; বলিল—"ঠিক বুঝলাম না—কেচ্ছাটা কিসের?"

"সে আপুনি বুঝবেন নাই; আপুনি কুলবধূ ভদ্দর লোক, উসব কেচ্ছা আপনি বুঝবেন কেমনটি ক'রে মশয়?"

ইহার পর চম্পা-ঘটিত সমস্ত ব্যাপারটা শাখাপ্রশাখায়, সালঙ্কারে এবং 'কুলবধূ ভদ্দর লোক'-এর বুঝিতে বেগ পাইতে না হয় এই রকম উপযোগী ভাষায় বর্ণনা করিয়া গেল—চম্পার পূর্বকাহিনী সম্বন্ধে যথোপযুক্ত টীকাটিপ্পনী সমেত।

টুলুর এতক্ষণে আর একটা সন্দেহ হইল, আগেই হওয়া উচিত ছিল, মনটা নিতান্তই উদ্‌ভ্রান্ত বলিয়া হয় নাই, ছইয়ের ভিতরকার অন্ধকারেই যতটা পারিল দেখিল ছইটা, বাহিরে বলদ দুইটিকে এবং গাড়োয়ানকেও বেশ ঠাহর করিয়া দেখিল, সন্দেহের ভাবটা কাটিয়া গিয়া যাহা আন্দাজ করিয়াছিল সেটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল, তবু সব স্পষ্ট করিয়া শোনার মোহেই প্রশ্ন করিল—"তুমি দেখেছ বাবুটিকে নটাই? ধর, যদি বুড়ো মানুষই হয়, মিথ্যে হওয়াই সম্ভব এসব অপবাদ—বল না গো?"

নটাই দাস হুঁকায় টান দিতে দিতে একটু ঘাড় বাঁকাইয়া শুনিতেছিল, মুখটা ছিনাইয়া লইয়া আবার খানিকটা তেরছা হইয়া বসিয়া বলিল—"দেখি নাই!—কি বুলছেন আপুনি মশয়? হাজরা মশর ছেলে মাইয়ার আনতে সিদিন ঝড়-বিহারে উই ইস্কুলে গিয়া উঠলাম নাই গাড়িসুদ্ধ্যু?—উ গাড়িটা ইস্কুলে তুলে দিলেক নাই? হাজরা মশর ছেলে মাইয়া উর বাঁসাটিতে গিয়া উঠলোক নাই? ...বুড়া মানুষ আছে!—আপুনির চেয়েও লোতুন জোয়ান—দিখি নাই আমি! বুড়া মানুষ—হুঁ..."

উত্তেজনায় ঘুরিয়া খুব কষিয়া বলদ দুইটার লেজ মলিয়া এক ঝোঁকে দৌড় করাইয়া দিল, তাহার পর ঘুরিয়া বসিয়াই আবার হুঁকায় মনোনিবেশ করিল।

যে-কোন কারণেই হোক টুলুকে চিনিতে পারে নাই; সে দিন প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে দেখা, আজ দুর্বল জ্যোৎস্নায়—হয়তো সেইজন্যই। টুলু নিজেকে আরও যতটা সম্ভব প্রচ্ছন্ন করিয়া বসিল। প্রশ্ন করিল—"হাজরাদের বাড়িতেও জানে নাকি?"

"জানে না?—বুলেন কি মশয়! সাতখানা গেরামে টি-টি প'ড়ে গোলোক; ঘটা ক'রে বাড়ি করছিলোক, এখন ছাখেন গিয়া শুকুনি পড়ছেঁক।...জানে না কি গো।...কি বুঝছেন আপুনি?...কোথাকে থাকেন আপুনি মশয়?"

এর পর আর কোন প্রশ্ন করিল না টুলু। মনটা এমন অবশ হইয়া গেছে, বেশ ভালো করিয়া কিছু ভাবিতে পারিতেছে না। নটাই দাস বকিয়া যাইতেছে, কখনও একটু স্তিমিত, কখনও উত্তেজিত, এক-একটা কথা কানে আসিয়া বাজিতেছে। বাকিগুলা হাওয়ায় ভাসিয়া যাইতেছে। এক সময় গাড়িটা একটা

তেমাথার মুখে আসিয়া পড়াতে টুলুর চমক ভাঙিল, সিধা হইয়া প্রশ্ন করিল—"শিবতলার মোড়া ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

টুলু অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া উঠিল, মাথায় কোন বুদ্ধি আসিতেছে না।··· গাড়িটা বাঁ দিকের রাস্তায় ঢুকিয়া পড়িয়া গড়িল। টুলু একটু হামাগুড়ি দিয়া ছইয়ের পিছন দিকে হঠাৎ খানিকটা আগাইয়া গেল—একটা বিপদ হইতে যেন ছুটিয়া পলাইতে 'চায়। তাহার পর প্রাণপণে নিজের মনটাকে গুছাইয়া লইয়া একটু ভাবিয়া বলিল—"নটাই দাস নাম বললে না ?—একটু থাম তো—"

গাড়ি থামাইয়া নটাই ঘুরিয়া চাহিল। টুলু বলিল—"ইয়ে, মাথাটা একটু ধরেছে ছইয়ের গরমে—ভাবছি হেঁটে যাব—তুমি নিয়ে যাও গাড়ি—"

"মাথা ধরল তো একটু শুয়ে পড়েন ক্যান, এখনও তিন পোয়া রাস্তা বটে।"

টুলু যেন তর্কের ভয়েই তাড়াতাড়ি গাড়ির পিছন দিয়া নামিয়া পড়িল, বলিল—"না খানিকটা হেঁটে গেলেই ঠিক হয়ে যাবে—মাথায় হাওয়া লেগে; আমি নামলাম।"

"তা সঙ্গে চলি, ঠিক হয়ে গেলেই আবার উঠবেন গো—তিন পোয়া রাস্তা—"

"না, তুমি যাও; তিন পো আবার রাস্তা, আমি হেঁটেই যাব—ঘুরিয়ে নাও গাড়িটা।"

মাথা ধরুক, না ধরুক, মাথায় গোলমাল আছে, নটাই দাস ছইয়ের মধ্য দিয়াই একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া থাকিয়া ডান দিকের বলদের রাশ টানিয়া গাড়িটা ঘুরাইয়া লইল। খানিকটা গেছে, টুলুর মনে হইল, পয়সাটা দেওয়া হয় নাই, একবার পকেটে হাত দিল, তাহার পর কি ভাবিয়া আর ডাকিল না।

টুলুর মনে আর এতটুকুও মাধুর্য অবশিষ্ট নাই, উদারতা তো দূরে থাক্।

সাঁকিরেলের দিকে অগ্রসর হইল—কয়েক পদ মাত্র। তাহার পর একটা ঝোপের আড়াল পাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অপসৃয়মান গাড়িটার দিকে চাহিয়া রহিল—চোরের মত; গাড়িটা অদৃশ্য হওয়ার পরও অনেকক্ষণ রহিল দাঁড়াইয়া, তাহার পর বাহির হইয়া ধীরে ধীরে গঞ্জডিহির পানে অগ্রসর হইল।

গা ঘিনঘিন করিতেছে, সারা অঙ্গে কলঙ্কের মসীঘন প্রলেপটাকে যেন অনুভব করা যায়—যেন গড়াইয়া পড়িয়া পথটুকু পর্যন্ত চিহ্নিত করিয়া দিতেছে। —ভাগ্যে দৈব্যযোগে ঠিক সেই গাড়োয়ানটার সহিত দেখা হইয়া গেল, ভাগ্যে ওর তিনটি ছেলে আছে—পড়ার কথাটা উঠিল, নয়তো এই কলঙ্কলিপ্ত শরীরেই তো সাঁকরেলে গিয়ে উঠিত। সেই দুইটি ছেলের সামনে—সেই মেয়েটির—সব শুনিয়াছে তাহারা—বাহিরের ভদ্রতা তাহাদের অন্তরের ঘৃণাকে কি চাপা দিতে পারিত? পা চালাইয়া দিল; সাঁকরেল যেন বড় কাছে, দূর দূর—আরও দূর হইয়া যাওয়া দরকার, যত শীঘ্র হয়।···কিন্তু নিজের কাছ থেকে নিজেকে কি করিয়া লুকায়? নিজের থেকে নিজেকে কি করিয়া করে সুদূর? এই কলঙ্কিত দেহকে বহন করিয়াই তো জীবনের সমস্ত পথটা অতিক্রম করিতে হইবে?

অথচ তাহার অপরাধ? অপরাধ—ভালো হইতে চাহিয়াছে, কল্যাণকে আশ্রয় করিয়াছে, বিশ্বাস করিয়াছে। কিন্তু কোথায় ভালো? কোথায় কল্যাণ কোথায়ই বা রহিল বিশ্বাস?—ম্যানেজারেরই হইল জয়—কিন্তু মাস্টারমশাই তাহাকে তাহার নিজের জীবন হইতে ছিনাইয়া লইতে গেলেন কেন?—গোড়ায় তো ম্যানেজারই নয়—মনটা সবার উপর বিষাইয়া উঠিয়াছে—মাস্টারমশাই, ম্যানেজার, চম্পা, ভিখারিণী বুড়ি, বিন্দু, জীবন, ভন্না স্কুলের যত ছেলেমেয়ে আজকের এই রাত্রিটি আনিয়া ফেলিবার জন্য একটা চক্রান্ত করিয়াই ওরা সবাই যেন আসিয়া জুটিয়াছে টুলুর জীবনে—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া—কেহ প্রকাশ্যে, কেহ ছদ্মরূপে, কিন্তু ঐ একটি মাত্র উদ্দেশ্য লইয়া!

একটা পরিবর্তন অনুভব করিতেছে টুলু—এ একটা নূতন অনুভূতি—সামান্য হইলেও যেন এক ধরনের স্বস্তি অনুভব করিতেছে—নির্বিচারে আক্রোশটা এক ধার থেকে সবার উপর গিয়া পড়ায় মনটা যেন হালকা বোধ হইতেছে; দ্বন্দ্ব হইতে একটা যেন মুক্তি।···কেউ ভালো, কেউ মন্দ; কেউ আপন, কেউ পর—তাহাতে মনটা যেন আরও বিক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে।

ভালমন্দ জিনিসটা আলো-আঁধারি,—দৃষ্টিকে দেয় ধাঁধাইয়া, মনকে করে বিভ্রান্ত; তার চেয়ে একেবারে অন্ধকার, অর্থাৎ পরিপূর্ণ মন্দটা ভালো—

মনকে একটা বিশ্রাম দেয়।···দুর্যোধনের মৃত্যু বিষাদে হয় নাই, হইয়াছিল হরিষে-বিষাদে।

মাস্টারমশাইসুদ্ধ সমস্ত জগৎটা মলিন হইয়া গিয়া টুলু যেন বাঁচিল একটু; গতি একটু দ্রুত হইল। সে একলা, কাহারও কাছে তাহার আশা নাই; কলঙ্কিত, কিন্তু নিঃসম্পর্কিত—এই বেশ হইয়াছে।···স্নিগ্ধ হাওয়া উঠিয়াছে, হয়তো বরাবরই ছিল, শুধু তাহার পক্ষে ছিল না। জ্যোৎস্নাটাও অনুভব করিল টুলু। এতক্ষণ এটাকে ভয় করিতেছিল, ছইয়ের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া বুঝি নটাই দাসের কাছে ধরাইয়া দিবে টুলুকে!···এখন বেশ লাগিতেছে—হাওয়া, জ্যোৎস্না, স্তব্ধ রাত্রি, নির্জন পথ···এই রকমই যাওয়া যায় না—সমস্ত জীবন ধরিয়া?···

কিন্তু কোথায় যাইতেছে সে?···টুলু হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেল, এ চিন্তাটা এখনও ওঠে নাই মাথায়, সত্যই তো কোথায় যাইতেছে?—গঞ্জডিহিতে আর কে আছে?···কি আছে?—শুধুই তো কলঙ্ক, এক কোণে একটু নয়, সমস্ত গঞ্জডিহি ব্যাপিয়া—তাহার যে গঞ্জডিহি—বন্যার মত ফেলিয়াছে ছাইয়া, ঢেউয়ের উপর ঢেউ উঠিয়া তাহাকে বিপর্যস্ত করিয়া তাড়াইয়াছে—কিন্তু শুধু গঞ্জডিহি কেন? সাঁকরেলেও তো সেই ঢেউ···আবার সেই বিভীষিকা—মুক্তি নাই—মুক্তি নাই।

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—আলোর আভাস দেখা দিয়াছে আবার—অন্ধকারই, তবে আলোর মোহন রূপে—ঢেউ থেকে পরিত্রাণেরও তো আছে একটা উপায়—আছে—আছে—ঢেউয়ে গা ভাসাইয়া দেওয়া!—সমুদ্র-স্নানের একটা অভিজ্ঞতা—দিক না সেও গা ভাসাইয়া—!

বিরাট আবিষ্কার একটা—সমস্ত জীবনের গতি এক মুহূর্তে পরিবর্তিত করিয়া দিল।

সারা দেহমন পূর্ণ করিয়া একটা আনন্দের জোয়ারে—প্রমত্ত উল্লাসে—শৃঙ্খলে শৃঙ্খলে যে দানবকে এতদিন রাখিয়াছিল বাঁধিয়া, সে মুক্তির আনন্দে সব ছিন্নভিন্ন করিয়া মত্ত উল্লাসে জাগিয়া উঠিয়াছে। এই ঠিক—টুলু চম্পার কাছে কথা দিয়া আসিয়াছে—"কাউকে ফাঁকি পড়তে দোব না।" এক অর্থে

দিয়াছিল কথাটা—চম্পাকে মুক্তি দিবে, এবার টুলু অন্য অর্থে কথাটাকে করিবে সার্থক—চম্পাকেও ফাঁকি দিবে না, নিজেকেও নয়। গঞ্জডিহির পানে চলিল—অদ্ভুত লঘু গতি—মাটির স্পর্শ যেন অনুভব করিতেছে না, মনে শুধু একটি মাত্র অনুভূতির উল্লাস—চম্পাকে চাই···খুব পরিচিত একটা জায়গা—সামনে একটা খাড়া টিলা—এই পথ, এই জ্যোৎস্না, এই হাওয়া—মনে পড়িয়াছে—এর সঙ্গে সেদিন ছিল পুষ্পসারের ব্যাকুল গন্ধ—চম্পার সেই অভিসারের রাত্রিটা হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছে—ক্রমে মনটা পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে চম্পা—

আশ্চর্য—এত জনের কাছে এত তত্ত্বকথা শুনিল জীবনে—কিন্তু চম্পার কথাই যেন সবার উপরে—"যেটা ধরেছিলেন সেইটাই কি সার্থক করবার পথ জীবনকে—ঠিক উল্টো নয় কি?" এত বড় তত্ত্বকথা তো শোনে নাই, জীবনের সঙ্গে এমন করিয়া কোন সত্য তো মিশিয়া যায় নাই—বেশ চমৎকার ব্যাপার—একটি যেন বৃত্ত পূর্ণ হইল—একদিন এইখান থেকে চম্পাকে লইয়া গিয়াছিল ফিরাইয়া—সেই দিনও চম্পা ছিল একমাত্র সাথী, আজও তাই—সেই অভিসারিকা চম্পা—সে দিন ছিল বাহিরে আজ অন্তরে—কোন্ দিনেরটা বেশি সত্য টুলুর জীবনে?

স্কুলে যখন পৌঁছিল, চাঁদ মলিন হইয়াছে, পূর্বাকাশে ঊষার ক্ষীণ আভা দেখা দিয়াছে। টুলু একেবারে স্কুলে গিয়া চম্পার ঘরের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল; ডাকিবে, স্কুলের দিক থেকে প্রহ্লাদ হাঁকিল—"কে বটে?"

আগাইয়া আসিয়া বলিল—"ও, ছোটবাবু?"

টুলু বেশ সপ্রতিভ, নির্লজ্জ অকুণ্ঠ স্বরে বলিল—"চম্পাকে ডাকতে হবে একটু।"

বনমালীর বাসায় দুই মিতিনেই শোয়—এরা বেটাছেলে তিন জনে শোয় স্কুলে। দরজায় ধাক্কা দিতে প্রহ্লাদের স্ত্রী আসিয়া খুলিয়া দিল। টুলুকে দেখিয়া হকচকিয়া যাইতে প্রহ্লাদ বলিল—"তুর মিতিনকে ডেকে দিতে হবেক।"

প্রহ্লাদের স্ত্রী চলিয়া গেল, একটু পরে আসিয়া বেশ খানিকটা বিস্মিতভাবে বলিল—"মিতিন তো নাই, হীরাটিও নাই বটে।"

"সে কি!"—বলিয়া টুলু ভিতরে প্রবেশ করিল, পিছনে প্রহ্লাদ আর তাহার বউ।

সত্যই চম্পা আর হীরক নাই। আরও বিশেষ ভাবে যাহা লক্ষণীয়, চম্পার টিনের বাক্সটা, তাহার শাড়ি, নিত্য-ব্যবহার্য দু-একটা টুকিটাকি আর হীরকের কাঁথা বালিস আর পরিধেয় যা-কিছু ছিল সেগুলা পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

তিন জনেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, প্রথমে কথা কহিল প্রহ্লাদের বউ, একটু মুখঝামটা দিয়া স্বামীকে বলিল—"উর বাপকে, ঠাকুরদাকে ডাকো গিয়া; হাঁ ক'রে দাঁড়ায়েঁ রইল!"

বনমালী আর চরণ আসিল, ঘুম হইতে উঠিয়াই এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে একেবারে বিমূঢ় হইয়া গেল। বনমালী যে রকম ঘন ঘন মাথা চুলকাইতেছে, মনে হইতেছে, আবার বাস্তবে স্বপ্ন-ভ্রান্তি হইবার মত অবস্থা বুঝি আসিয়া পড়িল ওর।

টুলু চরণদাসকে বলিল—"কুলি-ধাওড়ায় গিয়ে না হয় দেখ একবার?"

এমন ভাবে বলিল যেন তাহার জানাই যে যাওয়াটা বৃথা হইবে। তাহার পর কিছু না বলিয়া মন্থরগতিতে বাসার দিকে ফিরিল।

বাসার দরজা ভিতর হইতে অর্গলিত, ডাকাডাকি করিতে বিন্দু আসিয়া খুলিয়া দিল। ঘরে তখনও অন্ধকার। রাস্তার দিকের জানালাটা বন্ধ ছিল, খুলিতেই এক টুকরা কাগজ উড়িয়া আসিয়া পায়ের কাছে পড়িল। একটু খটকা লাগায় টুলু সেটা কুড়াইয়া লইয়া আলো জ্বালিল। যাহা সন্দেহ করিতেছে তাহাই—চম্পার একটা চিঠি; লেখা আছে—

শ্রীচরণেষু,

মাথায় লজ্জার বোঝা নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু বিশ্বাস করুন—শেষ পরিচয় যা দিয়ে গেলুম আপনাকে আমি তা নয়। ইচ্ছে ছিল, থেকেই বরং সেটা দেখিয়ে দিই, কিন্তু নিজেকে আর বিশ্বাস করতে পারলুম না। কি থেকে কি হয়ে পড়ল বেশ ভাল ক'রে বুঝতে পারছি না, তবে মাস্টারমশাইয়ের চিঠি পেয়ে আপনি এত চঞ্চল হয়ে উঠলেন, ভয় হ'ল আপনাকে বুঝি হারালুম। সত্যি

ভয় পেয়ে গেলুম, আমার সমস্ত জীবনটাই যে আপনার হাতে গড়া, আপনাকে হারালে কি ক'রে চলবে? এখন বুঝছি এই ভয়ই আমার বুদ্ধিনাশ করেছিল—আঁচল দিয়ে আগুনকে বেঁধে রাখব ভেবেছিলুম।

সত্যিই আগুন আপনি। পাঁচকোট পাহাড়ের আগুনের কথা নিয়ে আপনাকে যে উপদেশ দিতে গিয়েছিলুম, তার লজ্জাও আমার যাওয়ার নয়; সেই সময় থেকেই তো ভয়ের পাপও ঢুকল আমার মনে। আপনি আগুনই, কখন্ শান্ত হয়ে আলো দেবেন, কখন্ জ্বলে উঠে ছাই ক'রে ফেলবার দরকার হবে, সে তো আগুনই বুঝবে, ডোবার জলের তা নিয়ে উপদেশ দেওয়া চলে কি? এজন্যেই যাচ্ছি, বুঝছিলাম পায়ের শেকল হয়ে উঠছিলাম আপনার, অদৃষ্টের দোষেই, তারপর এদিকে নিজের দোষেও।

আমার কথা আপনি ভাববেন না, আপনার আশীর্বাদ আমার সঙ্গে থাকবেই। হীরাও আপনার হীরা হয়েই তোয়ের হবে—এই কথা দিয়ে যাচ্ছি।

আমার শত কোটি প্রণাম নেবেন। ইতি স্নেহের চম্পা।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

কিছুক্ষণ পরে বনমালী ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, চম্পা বস্তিতে নাই। কোন সাড়া না পাইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বার দুয়েক আড় চোখে চাহিয়া সংবাদটা আবার জানাইয়া দিল। টুলু অনাসক্তভাবে বলিল—"শুনলাম।"

বনমালী একটু ঝাঁঝের সহিতই বলিল—"তা তো শুনলেন, শুনবেক নাই ক্যানে? আরও যা খবর সিটি শুনেছেন? বস্তির উরা আজ সকালে কাজে যাবেক নাই।"

টুলু দৃষ্টি তুলিয়া প্রশ্ন করিল—"কেন?"

"ক্যানে তা আমায় বুলবেক উরা? মানুষটি ভাবে আমায়? আমার নিজের নাতনি আমায় মানুষটি ভাবে বটে? উর বিয়ার যোগাড় তো কুরছিঁলাম, বুঝলেক সে কথা?…তা আমি জানলুম,—উরা না বলুক, জানলুম

আমি—রমণী ঘোষ ভাগে নাই, ম্যানেজার উকে খুনটি করালে—উঁরা সব টের পেইছে—উরা মানবেক নাই···কে খুন করলে উরা খবর পেইছে...”

একটা বড় বিরতির মুখে জীবনের গতিটা হঠাৎ উগ্র হইয়া ওঠে ; ঘটনাগুলার মধ্যে যেন একটা তাড়াহুড়া পড়িয়া যায়, একটার জের মিটিতে না মিটিতে আর একটা পড়ে আসিয়া।

সেই দিন গভীর রাত্রে সদর-দরজায় মৃদু মৃদু করাঘাত হইল। টুলু জাগিয়া ছিল, খুলিয়া দিতে দেখে—মাস্টারমশাইয়ের সেই চর, এর আগে যে চিঠি দিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল।

বলিল—“আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।”

“কোথায় ?”

“আমার সঙ্গে চলুন।···কাপড় জামা একটু বদলে নিতে হবে ; ঐটুকুরই সময়।”

সঙ্গে একটা ছোট্ট পুঁটুলি ছিল, হাতে তুলিয়া দিল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে টুলু খনির কুলির পিরান-কাপড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। হাতে একটি তালা ছিল, সেটা দরজায় লাগাইয়া বলিল—“চলুন।”

এক-একটা জায়গার সঙ্গে মানুষের জীবনের কেমন একটু গূঢ় সংযোগ থাকে ; ঠিক যুক্তিতর্কে বাঁধা যায় না, তবু অদ্ভুত মনে হয় বটে। সেই টিলার নিচেটি, যেখানে চম্পাকে তাহার অভিসার থেকে একদিন ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছিল, কাল যেখান থেকে তার নিজের অভিসার হইয়াছিল শুরু—ঠিক এই সময়।···মাস্টারমশাই সাঁকোটার উপর বসিয়া ছিলেন, পাশে হাত দিয়া স্বভাবসিদ্ধ অনুচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন—“ব’স টুলু, অনেক দিন পরে দেখলাম তোমায়।”

টুলু পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে গিয়া হঠাৎ হাতটা টানিয়া লইল, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া মাস্টারমশাইয়ের মুখের দিকে চাহিতেই তাহার দুই গণ্ড দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু নামিল।

মাস্টারমশাই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, পিঠে হাত দিয়া একটু নিজের দিকে টানিয়া প্রশ্ন করিলেন—“কি হ’ল ?”

"আমি আর আপনাকে প্রণাম করবার যুগ্যি নেই সার।"

"বেশ তো, আমি যেমন ভক্তিপুষ্প দিয়ে প্রণামের অর্ঘ্য চাই না টুলু, ঠিক তেমনি চোখের জলের পাদ্যও তো চাই না!"—একটু হাসিয়া পিঠে স্নেহভরে আর একটু চাপ দিয়া বলিলেন—"না, একদিন তোমায় মানা করেছিলাম প্রণাম করতে টুলু, আজ তোমায় আদেশ করছি—তোমার প্রণামে আজ আমার লোভ হচ্ছে।"

একটু সিধা হইয়া দাঁড়াইলেন, টুলু প্রণাম করিলে তাহাকে পাশে লইয়া আবার সাঁকোর উপর উপবেশন করিলেন।

ডান দিকের রাস্তাটা সোজা চলিয়া গিয়াছে, অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়; বাঁ দিকে কয়েক হাত পরেই টিলাটা, রাস্তাটা তাহার কোল দিয়া ঘুরিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, বাঁকটা প্রায় শ'খানেক হাত তফাতে। টিলাটা ছোটখাট পাহাড়, একেবারে খাড়া পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু পাথরের একটা চাঁই, গায়ে মাথায় কিছু ঝোপঝাপ। লোকটি টুলুকে পৌছাইয়া দিয়া রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

দুই জনেই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর মাস্টারমশাই কথা কহিলেন, বলিলেন—"আমি তোমার আত্মগ্লানির ভেতরকার কথা বোধ হয় আন্দাজ করেছি টুলু। ব্রতসিদ্ধিটা খুবই ভালো—যাকে বলা যায় চরম ভালো; কিন্তু যদি না-ই হয় পূর্ণ সিদ্ধি, তবু ব্রতটাকে, চেষ্টাটুকুকেও তো খানিকটা মর্যাদা দিতে হবে। অন্তত আমি তো দিই।"

একটু থামিয়া বলিলেন—"ব্রতটা ছিল দুরূহ, এ ব্রতে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করেছেন পুরাণ-ইতিহাস মিলিয়েও এমন লোক খুব বেশি পাই না। সে দিক দিয়ে আমার তেমন ক্ষোভ নেই; একটা অভিজ্ঞতা তো হ'ল, অন্য জায়গায় কাজ হবে। ক্ষোভ শুধু এই যে চম্পা মেয়েটা সম্বন্ধে আমার বড় একটা আশা ছিল,—ও যে-স্তরে সেখানে ওর মতন একটা মেয়ে শুধরে উঠলে সেই উদাহরণেই মস্ত একটা কাজ হ'ত।"

টুলু মাথাটা একটু নিচু করিয়াই বলিল—"আশা তো আপনার সে নষ্ট করেনি সার্।"

"বুঝলাম না।"—মাস্টারমশাই একটু বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিলেন।

"তাই; আপনার আশা সে এত বেশি ক'রে সফল করেছে যে ততটা বোধ হয় ভাবেননিও আপনি…"

মাস্টারমশাই আবেগভরেই টুলুর হাতটা চাপিয়া বলিলেন—"আমায় সমস্তটা বল টুলু, কিছুমাত্র সঙ্কোচ করবার দরকার নেই, আমার সময় অল্প, কেন তা বুঝতেই পারবে—তবু সবটা বল, আমি শুনব।"

বলায় টুলুর আনন্দ আছে। বাদ দিল শুধু বস্তিতে চম্পাকে প্রথম দিন দেখার কথাটা—মাস্টারমশাই সেটা জানেন—তাহার পর বালিয়াড়ির পথের কাহিনী হইতে একটু একটু করিয়া সবটা বলিয়া গেল—ম্যানেজারের সঙ্গে কথাবার্তায় ওর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয়, বস্তি ছাড়িয়া স্কুলে আসার ইতিহাস, ধীরে ধীরে ওর মর্যাদাজ্ঞানের উন্মেষ, খনির কাজ ছাড়া, পরেশের সাহচর্য ছাড়া, তাহার পর হীরার খোরপোশের টাকাটা পর্যন্ত ছাড়িয়া দেওয়া… এর পরে ওর হঠাৎ পরিবর্তনের কথাটাও বলিল—আগের রাত্রেই বটতলার রূঢ় অভিজ্ঞতাটা—টুলুর জীবনে যা সবচেয়ে বড় আশাভঙ্গের কথা; তাহার পর সাঁকরেলের পথের সমস্ত কাহিনীটুকু—পরাজয়ের গ্লানি লইয়া ফেরা, সবশেষে চম্পার চিঠি।

শেষ হইলে মাস্টারমশাই আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, যেন সমস্ত কাহিনীটাকে সাজাইয়া-গুছাইয়া তাহার মধ্যে থেকে কি একটা উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এক সময় টুলুর পিঠে সস্নেহ স্পর্শ দিয়া বলিলেন—"টুলু, আমাদের শাস্ত্রে ছ'টা রিপুর কথা বলেছে; কিন্তু আমি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখছি অন্তত আর দুটো তো আছেই, বেশির কথা বলতে পারি না—সে দুটো হচ্ছে ভয় আর নিরাশা; দেখেছি ষড়-রিপুর যে কোনটার মতনই এ দুটোতেও আমাদের জীবনের ধারা বদলে জীবনকে একেবারে বিষময় ক'রে দিতে পারে।…তোমার শিষ্যাকে আমি তারিফ করি, সে নিজের মনের গতিটা ঠিক বুঝেছে, তাই ওর দুর্বলতাটুকু যে ভয়ের বিকার ভিন্ন আর কিছু নয়—সেটা বুঝে নিয়ে ও সামলে উঠেছে; কিন্তু আমার শিষ্যকে আমি সেই পরিমাণ তারিফ করতে পারলাম না; তুমি বুঝতে পার নি যে

তুমিও যে নামতে যাচ্ছিলে সেটা তীব্র নিরাশারই বিকার একটা; ক'দিনের মধ্যে একটার পর একটা কতগুলো ধাক্কা খেলে দেখো না; জীবনের একটা গতি চাই তো?—চারদিকেই নিরাশার দেয়াল দেখে তোমার মন এই খোলা পথটায় জীবনের ইঙ্গিত পেয়েছিল, অর্থাৎ এই সোজাসুজি কলঙ্কের পথ। সে পথটা যে কত কদর্য তা ভেবে দেখবার ধৈর্য তার হ'ল না। চিন্তার কিছু নেই টুলু; আমার শুধু এইটুকু আপসোস র'য়ে গেল যে আমার শিষ্য তার শিষ্যার কাছে বুদ্ধির দৌড়ে হার মানলে।—আমারই হার তো!—তা এমন আপসোসই বা কিসের? শাস্ত্রকারেরা 'পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়'টা গৌরবের ব'লে গেছেন, তা হ'লে লজিক্যালি প্রশিষ্যা থেকে পরাজয়টা আরও কাম্যই হওয়া উচিত তো!"...নিজের পদ্ধতি মতো বেশ জোরেই হাসিয়া উঠিলেন, যেন একেবারে হালকা করিয়া দিলেন ওদিককার সমস্ত ব্যাপারটা; তাহার পর পিঠে হাতের একটা মৃদু টান দিয়া বললেন—"এবার আমার এ দিকটা শোন, জীবনে আর বলবার সুযোগ হবে কি না জানি না।"

টুলু বিস্মিতভাবে মুখের দিকে চাহিতে বলিলেন—"হ্যাঁ, তাই; গঞ্জডিহিতে ফেরার কথা আর আসে না আমার টুলু, এটুকু খুব স্পষ্ট, বাকিটা একেবারেই অস্পষ্ট। ওরা আমার পিছু নিয়েছে, ওরা মানে—গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা ...না, ঝরিয়া-কাতরাসগড় অঞ্চলে যে কাজ করছিলাম তার জন্যে নয়, তার মধ্যে তো তেমন কিছু লুকোচুরি ছিল না, অনেকটা খোলাখুলি কুলি ক্ষেপাচ্ছিলাম—ঝগড়াটা কুলি আর মালিকদের সঙ্গে; গবর্মেণ্ট কুলিদের দাবি অস্বীকার করতে পারে না, তাদের হয়ে কেউ স্পষ্টভাবে ওকালতি করতে গেলে গবর্মেণ্ট অন্তত স্পষ্টভাবে বলতে পারে না কিছু।...এ যা পিছু নিয়েছে—ওদের এক পলাতক শত্রু ভেবে করেছে সন্দেহ। সন্দেহটা যে ঠিক সেটা নিশ্চয় ওদের কাছে স্বীকার করব না; কিন্তু তোমার কাছে তো দোষ নেই। আমার দ্বিতীয় চিঠি তোমায় সে-সম্বন্ধে খানিকটা আঁচ দিয়েছে টুলু। উনিশ-শ' কুড়ি থেকে উনিশ-শ' বত্রিশ পর্যন্ত যে সমস্ত বড় বড় পলিটিক্যাল ডাকাতি আর ষড়যন্ত্র হয়ে গেছে তার গোটাচারেকের মধ্যে আমি ছিলাম। চোখে ধুলো দিয়ে দিয়ে আজ পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছি; শুধু চোখে ধুলো নয়, বুকে গুলি বসানো পর্যন্ত আছে

তার মধ্যে। শুধু যে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে পালিয়েই বেড়িয়েছি তা নয়, যখন যে রকম সুযোগ হয়েছে একটু আধটু কাজ পর্যন্ত ক'রে গেছি—যেমন ধর, গণ্ডিহিতে তোমাকে দিয়ে করাবার প্ল্যান করেছিলাম, তারপর আর একটু সুযোগ পেয়ে ঝরিয়া-কাতরাসগড়ের দিকে তাড়াতাড়ি একটু ভালভাবেই ক'রে ফেললাম। কিন্তু ঐ হয়, বেশি দিন কোন এক জায়গায় উপায় থাকে না টেঁকবার, নজর প'ড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই কর্মপদ্ধতি বদলে না ফেললে চলে না। আজ পর্যন্ত পারলে না গায়ে হাত দিতে, তার কারণ আমাদের চোখও জাগ্রত আছে, ঠিক ওদের চোখের পাশেই—আপিসের একেবারে গুপ্ত কামরা থেকে, বড় সাহেবের একেবারে পাশ থেকে সে চোখের ইশারা পাই আমরা। অবশ্য পাইও না যে এমন হয়, না হ'লে ধরা পড়ছে কি ক'রে?—কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত জেলের বাইরেই আছি; কতকটা চান্সও বলতে পার।

"এই রকম একটি সঙ্কেত পেয়েছি সম্প্রতি, ভুল হয়েছিল, নিজেকে বড্ড বেশি প্রকাশ করে ফেলেছিলাম; তবে মনে হচ্ছে সঙ্কেতটা পেয়েছি সময়েই, এবারেও সামলে যেতে পারি। তবে সবচেয়ে মুশকিল কি হয়েছে জান?—আমাদের লোক-বল দিন দিনই যাচ্ছে ক'মে, কেন, সে দুঃখের কথা আগের চিঠিতে লিখেছি তোমায় টুলু। এক দিন কংগ্রেস আবেদন-নিবেদন ক'রে স্বাধীনতা নিতে চায় ব'লে আমরা ঠাট্টা করতাম। তাই থেকেই আমাদের উদ্ভবও। আজ ক্রীড্ হয়েছে—পড়ে মার খেয়ে ওদের দয়ার উদ্রেক কর বলো—তাইতেই পাবে। আমরা নতুন লোক তো পাচ্ছিই না এক রকম, পুরনোরাও ঐদিকেই চলছে,—জাতির ধমনীতে কি ধরনের রক্ত তা তো জানই, সে রক্ত দিন দিন বয়সেও তো নিস্তেজ হয়ে আসছে।

"যাক্, দুঃখ ক'রে আর হবে কি? যত দিন বেঁচে আছি, যে ক'জন বেঁচে আছি, চেষ্টা করব বেঁচে থেকে এবং বাইরে থেকে কাজ করবার। হ্যাঁ, বাইরে থেকে; জেল ভর্তি করা আমাদের ক্রীড্ নয় টুলু, দেখছি ওটা ক্রমে ক্রমে একটা বিলাসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। জ্যান্ত আমাদের জেলে পুরবে, পারতপক্ষে আমরা তা ঘটতে দিই না। হয়তো তোমায়-আমায় এই শেষ সাক্ষাৎ, লক্ষ্য রেখো যদি খবর কখনও পাও আমার, তো এমন

খবর পাবে না যে আমি গলায় মালা দিয়ে শান্তশিষ্ট হয়ে পুলিশের পেছনে পেছনে জেলে ঢুকলাম।”

মাস্টারমশাই চুপ করিলেন, তাহার পর একটু হাসিয়া টুলুর পানে চাহিয়া বলিলেন—“কথাগুলোয় আক্রোশের ভাব বেরিয়ে পড়ছে, এতটা ঠিক নয়, না?—বুঝি, কিন্তু কি করব! ভুলতে পারছি না বাংলার ক্ষাত্রশক্তিকে কি ভাবে এরা নষ্ট ক'রে দিলে।

“বাজে কথা যাচ্ছে বেড়ে। আমার ভবিষ্যতের কথা বলতে এসেছি তোমায় টুলু। সেই সঙ্গে তোমার ভবিষ্যতেরও। আমি ঠিক একটা সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছি—আমার পেছনে একটা ভীষণ দুর্যোগ তাড়া ক'রে নিয়ে চলেছে আমায়; আমার সামনে একটা বিরাট সুযোগ হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকছে। কথাটা এই যে, যত দূর বুঝতে পারা যাচ্ছে, পৃথিবীর আন্তর্জাতিক অবস্থা এমন দাঁড়াচ্ছে, শীগগির আবার একটা লড়াই বাধবে, এবারে আরও ব্যাপকভাবে। এই সুযোগে আর একবার যদি দেশকে জাগিয়ে তুলতে পারি—অগ্নিমন্ত্রে, তো সিদ্ধি বোধ হয় আমাদের মুঠোর মধ্যে। যদি এদের চোখে ধুলো দিতে পারি, একবার চেষ্টা করব—কোথায়, কি ভাবে, তোমায় বলতে পারলাম না, আর যদি আমারই চোখ বুজতে হয় তো সেইখানেই এ জীবন-নাট্যের যবনিকা।”

টুলু খানিকটা ব্যাকুলতার সঙ্গে বলিল—“আমায় সঙ্গে নিন।”

“সেই সম্পর্কেই বলতে এসেছি তোমায়। এক সময় হয়তো তোমায় নেব সঙ্গে, কিন্তু তার এখন দেরি আছে। এখন যা অবস্থা যাচ্ছে তাতে তোমায় সঙ্গে নেওয়া চলে না, নিলে ওদের অসুবিধে ক'রে দেওয়া হবে। এখন আমার সঙ্গে যে ক'জন আছে তারা এসব ব্যাপারে ঝানু লোক, প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার খেলায় পাকা, দরকার হ'লে হাওয়ার সঙ্গে মিশে গিয়ে আত্মগোপন করতে পারে। এদের এত দিন বাংলা-বিহারের খনিচক্রে রেখেছিলাম ছড়িয়ে, হাতে ছিল যোগসূত্র, এই স্কুলেও সেই ব্যবস্থা থেকে আমার অনেকখানি জোর ছিল, ম্যানেজার যে তোমায় খুব বেশি ঘাঁটাতে পারেনি তার কারণ সে সেক্রেটারি হ'লেও প্রেসিডেন্ট জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান আমার লোক। এখন অন্য

জায়গায় চলেছি, আস্তে আস্তে সুতো নেব গুটিয়ে, তারপর স্থিতু হয়ে ব'সে তোমায় নেব ডেকে, অবশ্য পাকা কথা দিচ্ছি না, যদি দরকার মনে করি। আপাতত তোমায় রাজসাহীতেই চ'লে যেতে হবে।"

"রাজসাহী!"—প্রশ্নটা করিয়া টুলু বিস্মিতভাবে মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"রাজসাহীতে। বুঝতে পারছ না?—আমার সঙ্গে যোগ থাকায় তোমার ওপর পুলিশের নজর পড়বে, হয়তো পড়েছে; তোমায় এখন তোমার বাবার নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে থাকতে হবে। বিপদ সেখানেও ধাওয়া করবে, তবে তিনি বিচক্ষণ উকিল, কাটান্‌মন্ত্র জানেন অনেক। কাল পর্যন্ত তোমার সম্বন্ধে যা রিপোর্ট তা এই যে, তুমি একজন অনভিজ্ঞ ভাবপ্রবণ যুবক, আমার প্রভাবে এসে ক্ষতিকর কিছু করবার আগেই স্ত্রীলোকের মোহে প'ড়ে নষ্ট হয়ে গেছ—A sentimental inexperienced youth who succumbed to a woman's charm before he was ripe for any mischief। ঠিক এই সময় সব ছেড়ে-ছুড়ে বাড়িতে গিয়ে বসলে ওদের এই ধারণাটা পাকা হয়ে যাবে। এর সঙ্গে আর একটা চাল দিয়ে রাখব আমি, তার ব্যবস্থা করছি। চম্পার খোঁজ নেওয়াচ্ছি, তাকে রাজসাহীর কাছাকাছি কোন জায়গায় বসিয়ে আসব ভালোভাবে, স্বাধীন ভাবে সে যাতে কাজ ক'রে যেতে পারে। তুমি খবর পাবে; তার সঙ্গে গোপনে যোগ রেখো, পুলিশ নিশ্চিন্ত থাকবে, খুশি থাকবে। একটু সেন্টিমেন্টে লাগছে, না? তা কি করবে? যে-পথের যে পাথেয়। তোমরা দু'জনে থাকবে ঠিক—এ আমার পূর্ণ বিশ্বাস আর অন্তরের আশীর্বাদ।

"গঞ্জডিহিতে ফিরে গিয়ে স্কুল খোলা পর্যন্ত তোমায় থাকতে হবে। খুলতে আর তিন দিন আছে, না?···বুঝতে পারছ না?—আমি স্কুল খোলার পরও যখন এলাম না তখন কমিটি আমায় ডিসমিস করবে, আর তখনই, যেন নিরুপায় হয়ে বাসা ছেড়ে যাচ্ছ এই ভাবে তোমায় বেরিয়ে আসতে হবে। এর আগে ছাড়লেই আমার গোপন খবর জান মনে ক'রে পুলিশ তোমার সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে উঠবে।···তারপর বুড়ির একটা ব্যবস্থা ক'রে দিও—পার তো চরণদাস আর বনমালীরও···জমি আর বাড়ি করার মালপত্র না হয়

ওদেরই দিয়ে যেয়ো—এর পর আমার জিনিসপত্রের খানিকটা ম্যানেজারের কাছে জমা দিয়ে...”

“ম্যানেজারের কাছে!”—এবার একটু উগ্রভাবেই ফিরিয়া টুলু মাস্টার-মশাইয়ের পানে চাহিল।

মাস্টারমশাই আবার পিঠে হাত দিয়া প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—“বুঝেছি, এও বাধছে এক ধরণের সেন্টিমেণ্টে, না?—বড় হেরেছ তার কাছে। কিন্তু ঐ পুলিশের সঙ্গে বাজি খেলায় এটুকু দরকার টুলু। ম্যানেজারের ওপর তোমার আক্রোশ আমি কি বুঝি না? গঞ্জডিহিতে সে জিতে রইল, আক্রোশ মেটাবার অবসর পেলে না, উল্টে আমার জিনিস সব পৌঁছে দেওয়া! কি করবে?—জীবনে এ রকম হয়, মুছে ফেলতে হয় দু হাত দিয়ে। ভেবে দেখো, ম্যানেজার তো আসল শত্রু নয়—কর্মের পথে এরকম ছোটবড় শত্রু অনেক এসে পড়ে—সাময়িক ভাবে, আক্রোশে প্রতিহিংসায় তাদের নিয়ে প’ড়ে থাকলে আসল শত্রু থেকে দৃষ্টি স’রে যায় টুলু, এসব একটু ক্ষমা-ঘেন্না ক’রে আসল জায়গায় নজর রাখতে হবে। আরও একটা কথা—যা থেকে তুমি সান্ত্বনা পেতে পার—আমি যে আগুন জ্বেলে গেলাম, তা সহজে নিববে না, সুতরাং ম্যানেজার আর তার স্বগোত্রীয়েরা তার মধ্যে পড়বেই এক সময়। আমি সে ধরণের ধ্বংস চাই না টুলু, সে কথা তো তোমায় এক সময় বলেছিই; এখন লোভে-স্বার্থপরতায় ওরা পশু, অভাবে অশিক্ষায় এরা পশু; মূল কারণ ওরা,—এইটুকু ওরা বুঝলেই আমার মিশন সফল হবে, দুই পক্ষই মনুষ্যত্বের স্তরে এসে দাঁড়াবে। তখন, গঞ্জডিহিতে তুমি যে কাজের গোড়াপত্তন ক’রে গেলে সেটাও হবে সফল। কাজই তো আসল, যেভাবেই তা হোক।...আরও একটা কথা আছে টুলু এ সবের ওপরে।”

“কি?”

“চম্পার মতন একটা মেয়ে যদি তোয়ের হয়ে থাকে—তোমার সম্পর্কে এসে আর ম্যানেজারের অত কূট-চক্রান্ত সত্ত্বেও, তো সেই বিজয়ের কাছে ওর জয়টা কি ম্লান হয়ে যায় না?”

টুলুর মুখটা একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, অবশ্য কোন উত্তর দিল না।

মাস্টারমশাই বলিলেন—"এবার যে কথা বলছিলাম। ধর, তোমায় আমি আমাদের কাজে টানতে পারলাম না, কিংবা অসময়েই যবনিকাটা নেমে পড়ল আমার জীবন-নাট্যে। তুমি যে কাজ আরম্ভ করেছিলে তাই ক'রে যেও। আমার মনের কথাটা আরও খুলে বলি—আমার অন্তরের ইচ্ছে তুমি এই কাজই নিয়ে থাক; আমি তোমায় যতটুকু জানি তাতে আমার বিশ্বাস, গঠনের দিক দিয়ে তোমার মনটা বিপ্লবী নয়; তুমি আমার চিঠি পাওয়ার পর যে অশান্তিটা ভোগ করেছ মনে মনে, তা বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগ্রহে নয়; বিপ্লবে মনটা তোমার যে সাড়া দিতে চাইছিল না তারই একটা অভিব্যক্তি, তা না হ'লে তুমি চম্পার একটা সামান্য তর্কেই এমন ক'রে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে না। এতে দুঃখ করবার কিছু নেই, এই পথেই তোমার কাজ; এরও তো দরকার আছে,—বোধ হয় বেশি দরকার। আর এও তো বিপ্লব—প্রতিদিনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তুমি দাঁড়াবে, তাতে যে তুমি নিজের প্রাণকে দু হাতে আগলে থাকবে না, এ বিশ্বাস আমার ষোল আনাই আছে টুলু।...এবার ওঠ, আর সময় নেই আমার।"

টুলু বলিল—"গঞ্জডিহিতে আমায় ফিরতে বলছেন, সেখানে তো সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশের ভয়...অবশ্য ভয়েই বলছি না আমি।"

মাস্টারমশাই আবার সস্নেহে পিঠে হাত দিলেন, হাসিয়া বলিলেন—"না, কেন বলছ আমি বুঝেছি টুলু—আমার সঙ্গ না ছাড়বার একটা লাগসই ছুতো বের করেছ—এই তো?...না, যাও, ওরা এখন গঞ্জডিহির বাসায় আসবে না। আমি যে ওদের খবর টের পেয়েছি জানে না তো। আমি ঐখানেই ফিরব —এই আশায় দূরে দূরেই ওৎ পেতে থাকবে, তোমাদের ডিসটার্ব করবে না। এত বড় ভুল ওরা করলে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কোন্ দিন দেউলিয়া হয়ে যেত টুলু।"

উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর একটু গলা উঁচাইয়া বলিলেন—"এস গো... আর তুমিও নেমে এস।"

টুলুর সাথীটি রাস্তার বাঁকের দিক হইতে চলিয়া আসিল।

টুলু বিস্মিত হইয়া দেখিল, টিলার বাঁ দিক দিয়াও একটি লোক উপর হইতে নামিয়া আসিতেছে, দুইজনেই কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

মাস্টারমশাই টুলুর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—"একটু নাটুকে হয়ে গেল, না—যেন স্টেজের একটা সীন্?"

ওদের বলিলেন—"তোমরা তা হলে আর একটু আত্মপ্রকাশ কর।"

দুই জনের দক্ষিণ হস্ত পকেটেই ছিল, দুইটি পিস্তল বাহির করিল, মাস্টার-মশাই নিজের পকেট থেকেও একটি বাহির করিলেন, বলিলেন—"এই কথাই তোমায় বলছিলাম, টুলু, দাঁড়িয়ে মার খাওয়ায় আমাদের শ্রদ্ধা নেই, প্রত্যেকটিতে ছটি ক'রে গুলি আছে।...বালাসোরের দিকে পুলিসের সঙ্গে জনকতক বিপ্লবীর সেই খণ্ডযুদ্ধটার কথা মনে আছে তো তোমার?"

টুলু অভিভূত হইয়া একটু দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর ব্যাকুল মিনতির সহিত চাহিয়া রহিল—"সঙ্গে যদি না-ই নেবেন, যাবার আগে আমায় এই দিয়ে অভিষেক ক'রে যান।"

মাস্টারমশাই সত্যই শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"সর্বনাশ! পিস্তল?... তা কি হয়?"

"কেন হবে না?"

"নানা কারণেই; একটা কারণ বলি—তোমার ওপর এখন পুলিশের নজর থাকবে।"

টুলু স্থির ভাবে একটু মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর দৃষ্টি তুলিয়া বলিল—"আর একটা কারণ আমি বলব সার্? ভাবছেন, ম্যানেজারের ওপর প্রতিশোধ নোব, তারপর নেমে পড়ব বিপ্লবে..."

সঙ্গে সঙ্গে বসিয়া পড়িয়া মাস্টারমশাইয়ের পদ স্পর্শ করিয়া বলিল—"যদি সত্যিই নিজেকে মনে করি কখনও বিপ্লবের উপযুক্ত, তা হ'লেই নামব—আপনি বেঁচে থাকলে আপনার আদেশ নিয়েই—আত্মপ্রবঞ্চনা করব না; আর যদি কখনও নামিই তা হ'লে করব এর ব্যবহার ঐ কাজেই—এই কথা দিলাম আমি। পুলিশের কথা যে বললেন—ভোরের সঙ্গে সঙ্গে এটাকে ফেলব সরিয়ে, নিশ্চিন্দি থাকুন আপনি।"

মাস্টারমশাই অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া সামনের দিকে চাহিয়া রহিলেন; মুখটা একটু বিষণ্ণ; তাহার পর টুলুর মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—"ওঠ টুলু, ঠিক

বুঝতে পারছি না—তোমায় দেওয়াটা বেশি অন্যায় হবে, কি তোমার এই শেষ প্রার্থনাটুকু অগ্রাহ্য করা!´ মনটা একটু কি রকম হয়ে রইলই আমার। তবু নাও, শুধু মনে রেখো, তোমার প্রতিজ্ঞায় আমার অটল বিশ্বাস আছে ব'লেই দিলাম।"

টুলু যখন গঞ্জডিহিতে ফিরিল তখনও খানিকটা রাত্রি আছে। বাসার সামনে আসিয়া রাস্তায় খানিকটা নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এমন একটা শূন্যতা যে নিজের অস্তিত্বকে যেন অনুভবই করা যায় না। পা উঠিতেছে না, এ শূন্যতা লইয়া গৃহে যাইয়া কি হইবে? কি আর করিবার রহিল জীবনে?

হঠাৎ একটা তুমুল শব্দ। দুশ' তিনশ' লোক একসঙ্গে কি একটা বলিয়া হাঁকিয়া উঠিল—শেষের "জয়"টা গেল শোনা। একটু ধাঁধা লাগিবার পরেই টুলুর মনে পড়িল বনমালীর কথা। বস্তির সবাই ক্ষেপিয়াছে—টের পাইয়াছে, রমণী ঘোষ পলায় নাই, খুন হইয়াছে। খুনীর সন্ধানও পাইয়াছে ইহারা—কলিকাতার সেই লোকটা—হয়তো পাইয়াছে হাতের মধ্যে। টুলুর পায়ে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলিয়া গেল—এই সুযোগ প্রতিশোধের, মাথায় একমুহূর্তে যেন প্রলয়ের ঘূর্ণি জাগিয়া উঠিল—এই আধ ঘণ্টা আগের প্রতিজ্ঞা—গুরুর পা ছুঁইয়া—সে ঘূর্ণিতে ধূলিকণার মতই গেল অবলুপ্ত হইয়া। টুলুর মুঠাটা পিস্তলের বাঁটে চাপিয়া বসিল, আপনা আপনি দাঁতে দাঁতে চাপিয়া গিয়া সমস্ত শরীর ছাপিয়া যেন একটা উল্লাসধ্বনি উঠিল—"রতিকান্ত! এইবার!!···" আর একটা শব্দ, বস্তির আরও কাছে; ওরা ফিরিতেছে, হয়তো প্রবল বাধা পাইয়া।···ওদের ফিরাইতে হইবে—"তোরা চল্, আমি যাচ্ছি, আর এই দেখ্ আমার হাতে এ কি...সাক্ষাৎ যম ম্যানেজারের!···" যেন সত্যই প্রত্যক্ষ হইয়া কথা বলিতেছে, এই ভাবে পিস্তলটা পকেট থেকে বাহির করিয়া নিজের রক্তলুব্ধ দৃষ্টির নিচে ধরিল। ঢালু দিয়া দুই পা নামিল···আর একটা শব্দ—বস্তির আরও কাছে, টুলু নামিতে যাইতেছিল, হঠাৎ থামিয়া গেল।

সমস্ত আক্রোশ-জিঘাংসাকে ধুইয়া মুছিয়া নামিল ঘৃণার বন্যা। তরল অন্ধকারে মুখটা বিকৃত করিয়া বস্তির দিকে রহিল চাহিয়া—আবার

এদের সংস্রব! নর্দমার কীট···গঞ্জডিহির শেষ অভিশাপ কি এরাই হইয়া রহিল না?

উঠিয়া আসিল। প্রবল বিজাতীয় ঘৃণায় কয়েকবারই ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিল বস্তির দিকে, ওদের বিজয়ের ধ্বনিতে মুখ হইয়া উঠিল আরও কুঞ্চিত, তাহার পর পিস্তলটা বাঁ হাতে ধরিয়া তালায় চাবিটা দিয়া ঘুরাইয়াছে, পায়ের শব্দে ঘুরিয়া দেখিল পিছনে দুই পাশে দুই জন লোক, পুলিশেরই উর্দি গায়ে, শুধু পায়ে জুতা আর মাথায় পাগড়ি নাই। দুই জনে দুইটি হাতে চাপিয়া ধরিল। ঘরের দেয়ালের পাশ থেকে আরও তিন জন আসিয়া দাঁড়াইল। একজন সাব-ইনস্পেক্টার গোছের। প্রশ্ন হইল—"এত রাত্রে ঘরে তালা দিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন?"

প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজনও ছিল না। বাঁ হাতের পিস্তল জ্যোৎস্নার আলোয় চিক্‌চিক্ করিতেছে, সাক্ষী জবানবন্দিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে যেন।

তর সঙ্গে যুক্ত হইল—নগরে দাঙ্গা হইয়াছে, এই রাত্রেই একটু আগে দাঙ্গাকারীরা একজনকে খুন করিয়াছে, তাহার পর ম্যানেজারের বাড়ির উপরও চড়াও করে। আসামীর সঙ্গে দাঙ্গাকারীদের সম্বন্ধও যে খুব ঘনিষ্ঠ—নেতা-জনতার—সেটা প্রমাণ করিতে সরকারী উকিলের একটুও বেগ পাইতে হইল না।

ম্যানেজার জিতিল কল্পনাতীত ভাবে। টুলুর কর্মজীবনে একটা বড় বিরতি নামিল।

উনিশ-শ চৌত্রিশ সালের ঘটনা সবটুকু।



মেদিনীপুর

॥ এক ॥

জেলের বৈচিত্র্যহীন জীবনের মধ্যে শেষের দিকের ক'টা দিন টুলুর মনের উপর গভীর রেখাপাত করিয়া গেল। উনিশ শ' বিয়াল্লিশের আগস্ট মাস, জেলের মধ্যে কেমন একটা চাপা ফিসফিসানি উঠিল—দুর্ভোগ আর বেশি দিনের নয়।...দু-চার দিনের মধ্যেই সেটা স্পষ্টতর আকার গ্রহণ করিল। বন্দে মাতরম্! ...ইনক্লাব জিন্দাবাদ!"...দূরে কাছে, শহরের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়।...নাকি টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়া দিয়াছে—সরকারী কাছারিতে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল—এইবার জেল ভাঙিয়া কয়েদীদের খালাস করিবে...আরও দূরের খবর—রেল উপড়াইয়া ফেলিয়াছে, রেলের বাঁধ কাটিয়াছে, পুল ভাঙিয়াছে...আরও দূরের—জাপানীরা নাকি ভারতীয় সৈন্যের সঙ্গে এক হইয়া ভারতীয় বিপ্লবীদের সহায়তা করিবে...কাটা কাটা খবর, কোনটার ল্যাজা বাদ, কোনটার মুড়ো; দিন পনেরো পরে সব আবার ঠাণ্ডা হইয়া গেল। কেবল কয়েদীর স্রোত দিন দিনই যাইতে লাগিল বাড়িয়া; খালি জায়গাগুলা তাঁবুতে তাঁবুতে গেল ভরিয়া।

একদিন মেটের সঙ্গে দল বাঁধিয়া ডিউটিতে যাইবার সময় কতকগুলা নূতন ধরনের কথা কানে গেল। টুলু ছিল সব শেষে, তাহার পিছনেই নূতন কয়েদীদের একটা ছোট দল—অন্য জেলে নাকি বদলি হইতেছে। জন দু-তিনের মধ্যে কথা হইতেছে—

"আপনি কোথা থেকে?"

"মেদিনীপুর।"

"এতদূরে ঠেললে?"

"দূর! এ তো ঘরের কাছে মশাই; নর্থপোলে পাঠাতে পারলে তবে নিশ্চিন্দি হ'ত।"

একটু হাসি; তাহার পর—

"কেমন হ'ল ?"

অপর কণ্ঠে—

"মেদিনীপুরই যখন,—সবার ওপরে যাবে।"

কথাটার গুরুত্বেই একটু স্তব্ধতা আনিয়া দিল। তাহার পর—"তা হ'লে মন্দ নয়। তবে ব্যালেন্স্ শীটে লাভের চেয়ে লোকসানই দাঁড়াল বেশি—আপাতত।"

"কি রকম ?...কি রকম ?..."

"পণ্ডিতমশাই—মানে, আমাদের যিনি লীডার আর কি, তাঁকে হারাতে হ'ল,—পাঁজরার নিচে একটা গুলি...তবে অবশ্য তিনটিকে ধরাশায়ী করবার পর..."

"আরম্‌ড্ রাইজিং ছিল আপনাদের !"

এর পরেই হঠাৎ ছাড়াছাড়ি হইল দলটার সঙ্গে, একটা লরি দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার দিকে সবাই চলিয়া গেল।

মনটা খারাপ হইয়া রহিল টুলুর, ঠিক ধাতে রাখিবার জন্য ক্রমাগতই স্তোক দিতে হইল—ও আমাদের মাস্টারমশাই নয়, নিশ্চয় নয় মাস্টারমশাই...

ঐ মাসেরই শেষের দিকে একদিন সন্ধ্যায় টুলু মুক্তি পাইয়া জেলের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সম্পূর্ণ একটা নূতন জগৎ, নিজেও সম্পূর্ণ একটা নূতন মানুষ, আটটি বৎসরের মধ্যে কি যে একটা নিঃশব্দ প্রলয় ঘটিয়া গেল—ওদিককার সঙ্গে এদিককার যেন কোন মিল নাই।...বাড়ি নাই, সমাজ নাই ; মাস্টারমশাইও নাই ! যাক, সে কিন্তু একটা বিরাট মুক্তি। জীবনের আকাশে ধূমকেতুর মতোই কোথা থেকে উদয় হইয়া সমস্ত ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া গেল লোকটা—ঘর গেল, সমাজ গেল, ধর্ম গেল।...ভালো হইয়াছে...পাঁজরার নিচে একটা গুলি...

বিদ্বেষের মধ্যেও চোখ যে কেন সজল হইয়া ওঠে !...পাঞ্জাবির খুঁট তুলিয়া টুলু উদ্গত অশ্রু মুছিল। মনটা রূঢ় বাস্তবের সামনে সজাগ হইয়া উঠিল,—অপরিচিত জগৎ, সামনে রাত্রি ; মনে পড়িল, জেলটা একটা আশ্রয়ও ছিল,—অন্ন জোগাইত, মাথার উপর একটা আচ্ছাদনের ব্যবস্থা ছিল, মুক্তি এ দুইটা

থেকেই বঞ্চিত করিয়াছে। পকেটে ব্যাগটা রহিয়াছে, গুনিয়া দেখিল—এগারো টাকা সওয়া নয় আনা সম্বল। আপাতত চলিবে, তাহার পর শূন্য জীবন, শূন্য পকেট···যাক, অত ভাবা যায় না। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শুধু একটা কথা নিশ্চয় করিয়া লইয়াছে—বাড়ি যাইবে না। আজ ছ'মাস হইতে বাড়ির কোন খবর নাই; বাবা মা অসুস্থ ছিলেন। কী যে হইয়াছে বেশ বোঝা যায়, এ তবু একটা সন্দেহের সান্ত্বনা থাকিবে; বাড়ি গেলেই তো নগ্ন সত্য। তা ভিন্ন জীবনের এই নূতন ইতিহাস লইয়া বাড়ি গিয়া কি দাঁড়াইতে পারিবে? আর বাড়ির মাটি কলঙ্কিতই বা করা কেন? হঠাৎ মুক্তিতে এ একটা হইল ভালো। সময়ে হইলে হয়তো কেহ লইয়া যাইতে আসিয়া পড়িত।

জেলের দেয়ালের পাশে পাশে আসিয়া রাস্তাটা দুই দিকে চলিয়া গেছে,—একটা আদালতের দিকে, একটা শহরের দিকে। আদালতের কাছাকাছি হোটেলে থাকা সম্ভব, টুলু তেমাথায় দাঁড়াইয়া একটু ভাবিল, তাহার পর শহরের দিকেই পা বাড়াইল, আইন-আদালতের চিন্তাও যেন বিষ হইয়া উঠিয়াছে, হয়ত জেলফেরত কাহারও সঙ্গেই দেখা হইয়া যাইবে। দেখা যাক, শহরে রাত্রিটা কাটাইবার যদি কোন ব্যবস্থা হয়—দোকানে-টোকানে; হোটেলও থাকে।

বাজারে আসিয়া পড়িল। ভদ্র কাহাকেও কোন প্রশ্ন করিতে যেন আটকাইয়া যাইতেছে গলায়—আট বৎসরের সঙ্গগুণ! একটা ফলের দোকানের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। সাদা একটা প্রশ্ন কি করিয়া করিতে হয় যেন ভুলিয়া গেছে। একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—"আচ্ছা, এদিকে কোথাও থাকবার একটু ব্যবস্থা হতে পারে—একটা রাত?"

"শহরের মধ্যে গিয়ে দেখো, বাজারে আর কে দেবে?

ভুল হইয়া গিয়াছে প্রশ্নটা, টুলু যেন একটু থতমত খাইয়া গেল।

একটি বছর আষ্টেকের ছেলে এক ঠোঙা ফল কিনিয়া রাস্তার দিকে পা বাড়াইয়াছিল, ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া এক নজরে দেখিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল—"আমাদের বাড়িতে থাকবেন?"

টুলুর কান দুইটা গরম হইয়া উঠিল, সন্তর্পণেই দৃষ্টি নামাইয়া নিজেকে

একবার দেখিয়া লইল—সত্যই সবার করুণা উদ্রেক করাইবার মতো অবস্থা দাঁড়াইয়াছে নাকি?—ও-লোকটা 'দেখুন'ও বলিল না,—'শহরের মধ্যে গিয়ে দেখো!'

উত্তর করিল—"না, আমি একটা হোটেল-ফোটেল খুঁজছি···"

ধারণাটা বদলাইয়া দিবার জন্যই দোকানীকে বলিল—"টাকা খানেকের ফল দাও তো—এই নেবু বেদানা খেজুর মিলিয়ে···"

ছেলেটি আর একবার ফিরিয়া দেখিয়া চলিয়া গেল। বেশ ফুটফুটে ছেলেটি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, হাফপ্যাণ্ট পরা, গায়ে একটা খদ্দরের হাফশার্ট। ফল কিনিয়া টুলু পা চালাইয়া ছেলেটির পাশে আসিয়া পড়িল।

প্রশ্ন করিল—"কোথায় তোমার বাড়ি খোকা?"

"জেলখানা জানেন?"

প্রশ্নটা বড় অদ্ভুত ঠেকিল কানে, টুলু একটা ঢোঁক গিলিয়া উত্তর করিল—"হ্যাঁ, জানি।"

"ওরই কাছে—ওদিকটায় যে কতকগুলো বাড়ি আছে, তারই মধ্যে।"

"অনেকটা দূর, একলা এসেছ, ভয় করে না?"

"না, ভয় করবে কেন? মা বলেছেন—ভয় করতে নেই, দাদুও বলেন।"

পদক্ষেপে বেশ একটু সাহস জাগাইয়া দিল।

"তুমি কার ছেলে?"

"বাবার আর মার।"

"কি করেন বাবা তোমার?"

"কাজ করেন, অনে—ক দূরে, এইবার আসবেন।"

"এখানে কে কে থাকেন?"

"মা আর আমি।"

"আর কেউ নয়?"

"আর যার কষ্ট হয়, অসুখ করে।···আপনি চলুন না, যাবেন? মা আমায় বলেন ডেকে নিয়ে যেতে।"

টুলু একটু কি ভাবিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল—"অসুখ-করা কেউ আছে বাড়িতে ?"

"কাল ছিলেন একজন, বুড়িদিদি ব'লে ডাকতুম, মা আজ সকালে হাসপাতালে দিয়ে এসেছেন, দেখতে গিছ্‌লুম এব্‌লা দুজনে। ভালো হয়ে আবার আসবেন।"

খানিকটা পথ নীরবেই কাটিল। টুলু কি ভাবিতেছে। এক সময় আবার প্রশ্ন করিল—"না, সে কথা জিগ্যেস করছি না, বেটাছেলে কেউ থাকে না বাড়িতে ?"

"আমি তো আছি।"—আবার একটু সিধা হইয়া ঘুরিয়া চাহিল, তাহার পর টুলুর মৃদু হাসিতে যেন একটু লজ্জিত হইয়া বলিল—"আর দাদু ছিলেন ; গেলেন কিনা তিনি···"

"কতদিন হ'ল ?"

"অনে—ক দিন।···তা ব'লে এক বছরের মতন অনেক দিন নয়।"

"তবে ?"

"এই···এই···আমরা যখন···"

"কোথায় গেলেন ?"

"বাবার কাছে—তাঁকে নিয়ে আসতে।"

"তোমার বাবাকে দেখেছ কখনও ?"

"না, অনেক দূরে কাজ করেন যে। এইবার দেখব। খুব সুন্দর দেখতে বাবা আমার। রোজ আমরা দুজনে—মা আর আমি—ঠাকুরের ছবির সামনে ব'সে বলি—বাবাকে ভালো রেখো ঠাকুর, শীগ্‌গির শীগ্‌গির পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে।...বাবাও ঠাকুর, জানেন তো ?"

"সত্যি নাকি ?"

খুব গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল—"মা বলেছেন—সবার বাবা সবার ঠাকুর। বাবাকেও প্রণাম করি আমি মনে মনে···"

"আর সবার মা ?—তিনিও তো ঠাকুর। করো প্রণাম তোমার মাকে ?"

ছেলেটি একটু বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া দেখিল, বলিল—"মা তো কখনও বলেন নি।"

"ছবির ঠাকুর তোমায় কখনও বলেছেন যে তিনি ঠাকুর ?"

"ছবির ঠাকুর তো কথা কইতে পারেন না।"

তর্কে হারিয়া টুলু হাসিয়া ফেলিল, বলিল—"তা বটে। তবে পারলেও বলতেন না, নিজেকে কেউ বড় বলে না তো, বলতে নেই। মাকেও ক'রো প্রণাম।...আর একটা কথা, তোমার মা কি—?"

বড় রাস্তা কখন্ ছাড়িয়া দিয়াছে। সামনেই একটা লম্বা পুকুর, তাহার পাশ দিয়া অল্প চওড়া একটা কাঁচা রাস্তা, ছাড়া ছাড়া বাড়ি। সামনেই একটা, ছেলেটি তাহার সিঁড়িতে উঠিয়া পড়িয়া বলিল—"আসুন না।"

টুলু একেবারে হকচকিয়া গেল। ব্যস্তভাবে বলিল—"এসে গেলে নাকি বাড়ি ?...না, না, আমি যাই...আসব বলি নি তো ; কথা বলতে বলতে এসে পড়েছি।"

ছেলেটি নামিয়া আসিয়া পাঞ্জাবির খুঁট ধরিল,—"না, চলুন, এসে তো গেছেন..."

"না, না..."

তাহার পর হঠাৎ বারান্দার মধ্যে দরজার মাথায় নজর্ পড়িয়া গেল ; যেন বাঁচিল, বলিল—"দরজাও তো বন্ধ—তালা দেওয়া।"

ছেলেটি একটু ধাঁধা খাইয়া গেল, সেই সুযোগেই টুলু "যাই আমি" বলিয়া ফিরিয়া পা বাড়াইল।

তিন-চার পা গিয়া আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল..."একটা কথা জিগ্যেস করলাম না তো,—তোমার নাম কি খোকা ?

এমন সময় পাশের বাড়ি থেকে একটি স্ত্রীলোক একটু হন্তদন্ত হইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল, প্রশ্ন করিল—"কে রে হীরা ? কার সঙ্গে..."

টুলু আগাইয়া আসিল, আট বৎসর পর চম্পার সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল। অনেক কিছুর সঙ্গে একটা বড় পরিবর্তন—চম্পার সীমন্তে সিঁদুরের রেখা।

নিঃশব্দে দুইজনে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল। সমস্ত ব্যাপারটুকুর মধ্যে যে সম্পূর্ণ একটা নূতনত্ব ছিল, সেটা হীরককেও মৌন করিয়া রাখিল।

একবার "বসুন" বলিয়া ঘরে একটা চেয়ারে বসাইয়া চম্পা নিঃশব্দে আয়োজনে লাগিয়া গেল। একটু পরে টিউবওয়েলে জল তোলার শব্দ হইল খানিকটা। তারপর একবার কাপড় তোয়ালে গেঞ্জি কলতলায় রাখিয়া আসিয়া বলিল, "এইবার মুখ হাত পা ধুয়ে নিন।" এক জোড়া চটিজুতা পায়ের সামনে রাখিয়া দিল—আট বছর আগে ছাড়া টুলুর চটি, তাহার পর গলায় অঞ্চল দিয়া প্রণাম করিয়া হতবাক হীরকের পানে চাহিয়া বলিল—"প্রণাম করো।"

হীরক প্রণাম করিয়া চম্পার কোল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল, একটু আড়ে চোখ তুলিয়া অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করিল—"কে ?"

ধোপদস্ত কাপড় গেঞ্জি তোয়ালের মতো চম্পার যেন সবই ঠিক করা আছে, বেশ সপ্রতিভ কণ্ঠে উত্তর করিল—"তোমার বাবা।"

টুলুর দৃষ্টিটা আর একবার আপনা-আপনিই সিঁথির সিঁদুরের উপর গিয়া পড়িল। চম্পা বলিল—"নিন, উঠুন।...মুখ হাত পা ধোওয়া হয়ে গেলে ব'সে ব'সে গল্প ক'রো হীরা, আমি আসছি।"

স্টোভ জ্বালার শব্দ হইল। একটু পরে চা হালুয়া, একটা রেকাবিতে কিছু ফল লইয়া উপস্থিত হইল।...চোখ দুইটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। নিশ্চয় ধোঁয়ায় নয়, স্টোভের আগুনে সে বালাই নাই; চম্পা আনন্দ আর বেদনাকে যে কি ভাবে চাপা দিয়া ফিরিতেছে বুঝিল টুলু, কথার অংশ রহিল কম, উচ্ছ্বসিত কিছুর ভয়েও, তা ভিন্ন হীরক রহিল বাধা হইয়া।

হীরক নিদ্রা যাওয়ার পর চম্পা টুলুর পায়ের কাছে মাদুরটাতে আসিয়া বসিল। টুলু বলিল—"সব একরকম বুঝলাম, পথে হীরার সঙ্গে কথাবার্তায়ই সন্দেহ হয়েছিল, হয়তো তুমিই এসে রয়েছ—কিন্তু একটা কথা বুঝছি না চম্পা, তোমার এক দিকে আমায় অভ্যর্থনা করবার আয়োজন, আর এক দিকে তাড়াবার ?"

চম্পা মাথা নিচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল একটু, তাহার পর বলিল—"সিঁদুরের কথা বলছেন আপনি ?...কি উপায় আছে বলুন এ ভিন্ন ? মাস্টার-মশাইও তো দেখে গেছেন।

দুজনে আবার একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর চম্পাই আবার কথা

কহিল, বলিল—“আমি সব ঠিক ক’রে রেখেছি, এখন আপনার মতের অপেক্ষা। মানুষের কাছে আমাদের এ প্রবঞ্চনাটুকু না করলে চলবে না, হীরার কাছে আরও বেশি দরকার, ভেবে দেখুন আপনি।···অবশ্য এর মধ্যে একটা খুব বড় প্রশ্ন আছে—মাস্টারমশাই আপনাকে যে পথ ধরিয়ে গেছেন, সেই পথেই থাকবেন কি না!”

টুলু একটু ক্লান্ত কণ্ঠে বলিল—“আমার তো এখন সবই অন্ধকার; পথ আর কোথায়?”

“এই আট বছরের মধ্যে অনেক কিছুই ঘটেছে, ক্রমে ক্রমে শুনবেন; কিন্তু পথ আপনার আরও ভালো ক’রেই তোয়ের ক’রে গেছেন মাস্টারমশাই।”

টুলুর জেলে আগস্ট আন্দোলনের কয়েদীদের কথা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, সচকিত হইয়া প্রশ্ন করিল—“তুমি জান মাস্টারমশাইয়ের এ দিককার কথা কিছু?”

“জানি, এ দিকে ক’টা মাস আমি তাঁর সঙ্গেই ছিলাম, কখনও এখানেই, কখনও মেদিনীপুর, তাঁর...”

টুলুর বিলম্ব সহিতেছে না, প্রশ্ন করিল—“মারা গেছেন, না?”

“হ্যাঁ।”

“পুলিসের গুলিতে? তিনটেকে শেষ ক’রে?”

“হ্যাঁ। সেইরকমই কানে গেছে আমার।”

টুলু চুপ করিল, ধীরে ধীরে তীব্র উৎকণ্ঠার ভাবটা মিলাইয়া গেল; শান্ত কণ্ঠে বলিল—“হ্যাঁ, কি বলছিলে, বলো।”

“মাস আষ্টেক আগে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়। তিনি আমাদের···”

টুলু বাধা দিয়া বলিল—“দেখা হয়, কোথায়? মেদিনীপুরে?”

চম্পা একটু থতমত খাইয়া গেল, বলিল—“না, অন্য এক জায়গায়।”

“কোথায়?”

চম্পা মুখে একটু অপ্রতিভ হাসি লইয়া চুপ করিয়া রহিল। টুলু চোখ অল্প ঘুরাইয়া মনে মনে একটা হিসাব করিয়া লইল, তাহার পর নিজেই বলিল—“যশোরে?”

চম্পা চুপ করিয়া রহিল। টুলু বলিল—"বেশ, বলো।···তিনি তোমাদের···"

"বাবা তখন বেঁচে, আমাদের তিনজনকে তিনি মেদিনীপুরে নিয়ে যান। শহরে নয়, শহর থেকে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মাইল দূরে, স্টেশন থেকেও দূরে একটা গ্রামে, নামটা সাগরদহ, একটা ছোট নদীর ওপরে। সেখানে প্রায় বছর দুয়েক আগে এসে মাস্টারমশাই একটা আশ্রমের পত্তন করেছেন। তাঁত, চরখা, ছেলে-মেয়েদের জন্যে একটা স্কুল, নাইট স্কুল বড়দের জন্যে; আমি যেতে মেয়েদের জন্যও একটা ব্যবস্থা ক'রে দিলেন···"

"এল পড়তে তারা?"

"অমন উৎসাহ আপনি দেখেন নি, গঞ্জডিহির সঙ্গে কোন মিল তো নেই-ই অন্য কোথাও আমি অমনটা দেখিনি, যেন মাটিতেই কি আছে, সত্যি···"

টুলু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—"অন্য আর কোন্ জায়গা দেখেছ তুমি?

"কেন?···বাঃ···কত জায়গায় তো···"

তাহার পর চুপ করিয়া দৃষ্টি নত করিল। টুলু অল্প একটু হাসিয়া বলিল—"বেশ, থাক্ ও-কথা, যা বলছ বলো।"

"কি যে বলছিলাম—হ্যাঁ, যেন মাটির গুণ। অথচ যাকে বলা হয় ভদ্দর-লোকের গ্রাম তা নয়, বেশির ভাগই চাষাভুষো—বাউরী, সদ্‌গোপ, সাঁওতালও আছে—ব্রাহ্মণ কায়েত গুনে-গেঁথে পাঁচ-সাত ঘর হবে। নাম রেখেছেন—'শান্তি আশ্রম'। এই শান্তি আশ্রমে যে আট মাস একটানা ছিলাম তা নয়, মাঝে মাঝে এখানে চলে আসতাম, মাস্টারমশাইও এসে থাকতেন। মাস্টারমশাইয়ের কিন্তু একটা লক্ষ্য করতাম—মাঝে মাঝে কোথায় চ'লে যেতেন, দু-পাঁচ-দশদিন থাকতেন, তারপর ফিরে আসতেন, এখানেই হোক বা আশ্রমেই হোক। প্রথমটা বুঝতে পারিনি, তারপর মনে সন্দেহ হ'ল, গঞ্জডিহিতে মাস্টারমশাইয়ের যা পদ্ধতি ছিল—একসঙ্গে দুটো জায়গা সামলানো, একটা নরম একটা গরম—বোধ হয় এখানেও তাই করছেন। সন্দেহটা যে সত্যি, সেটা টের পাওয়া গেল দিন কতক পরে। আগস্ট আন্দোলন শুরু হ'ল—মেদিনীপুরের আন্দোলন—ভেতরে থেকেও নিশ্চয় কতকটা আঁচ পেয়েছেন···মাস্টারমশাই মাসের গোড়াতেই চ'লে গিয়েছিলেন—সতেরো তারিখ হয়ে গেল, খবর নেই, মনটা

বড্ডই খারাপ, নরোত্তম ব'লে একজন যাত্রী সঙ্গে থাকত, সন্ধ্যের সময় এসে উপস্থিত—চুপি চুপি খবরটা দিলে—সাগরদহ থেকে প্রায় মাইল পঞ্চাশেক দূরে, জেলার একেবারে অন্যদিকে আর কি—সমস্ত তল্লাটটা গেছল খেপে, মাস্টার-মশাই পুলিসের গুলিতে মারা যান—ওদিকেও জন আষ্টেক খুন-জখম হয়, তবে মাস্টারমশাইয়ের মৃতদেহ এরা সরিয়ে ফেলে, ওঁর বিশেষ হুকুম ছিল।"

টুলু প্রশ্ন করিল—"আর, তোমাদের ওখানে, সাগরদহের আশ্রমে?"

"একেবারে ঠাণ্ডা। ওদিকেও চারিদিকে খুব হয়েছিল একচোট; কিন্তু সাগরদহ, আরও খানকতক গ্রাম, আশ্রমের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল অল্পবিস্তর, একটু টুঁ শব্দ করেনি।..."

"কেন?"

চম্পা গা ঝাড়া দিয়া সোজা হইয়া বসিল, একটু ব্যগ্রভাবে বলিল—"এই দেখুন, গল্প করতে গেলে সমস্ত রাতই কেটে যাবে। আপনি শুতে যান, অনেক রাত হয়েছে।"

নিজেও উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"কেন, তা ওখানে গেলে হয়তো টের পাবেন—যদি যান...নিন উঠুন।"

দোরের নিকট ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"হ্যাঁ, একটা কথা, কাল সকালেই আমরা চ'লে যাব। এর মধ্যে ভেবে আপনাকে ঠিক ক'রে ফেলতে হবে।"

"কি ঠিক করা?...ও! কোন্ পথে যাব? সে আমার ঠিক হয়ে গেছে।"

॥ দুই ॥

আশ্রমটা নদীর একেবারে ধারে। চারিদিকের গাঢ় সবুজের মধ্য দিয়া নদীর নীল ধারাটা বহিয়া গেছে। গঞ্জডিহি থেকে একটা মস্ত বড় পরিবর্তন গঞ্জডিহির পর সাগরদহ রুক্ষ নিদাঘের পর বর্ষা; শ্যামল, সরস, তৃপ্ত; আ বৎসরের বর্ণতৃষা রসতৃষার পর এই রকমটিই টুলুর দরকার ছিল, পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অতীতের অনেকখানি যেন মন থেকে মুছিয়া গেল।

নদীর ধারে মুখ করিয়া টানা একটা চালা, মাঝে মাঝে বেড়া দিয়া ছো

বড় কামরায় ভাগ করা। একটায় চরখা তাঁত; একটায় কাগজের কারখানা; একটায় ছুতারখানা; একটায় লোহার কাজ; একটায় স্কুল, সকালে ছেলেমেয়েরা পড়ে, দুপুরে বয়স্থা মেয়েরা, রাত্রে পুরুষেরা; এদের ব্যাচ করা আছে, একটা ব্যাচ সপ্তাহে দুইটা দিন করিয়া তালিম পায়।...

চালাটার সামনে একটা প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, তাহার পরই নদী; প্রাঙ্গণের এক পাশে, নদীর তীর ঘেঁষিয়া টুলুর বাসাটা। অনেকগুলি বিভাগ থাকিলেও কাজ খুব বেশী নাই, তাহার কারণ কাজ করার লোক আছে প্রচুর; জন তিনেক এখানেই থাকে, টুলুর মতো বাসা আছে; বাকি সবাই গ্রাম থেকে আসে। টুলুর কাজ অনেকটা অধ্যক্ষের মতো—তদারক করা, চালাইয়া লইয়া যাওয়া, মাস্টারমশাইয়ের যা কাজ ছিল। একটা কথা চম্পা টুলুকে আগেই বলিয়া দিয়াছিল—মাস্টারমশাইয়ের মৃত্যুর খবরটা জানে শুধু চম্পা আর নরোত্তম। বাকি সবাই জানে, তিনি যেমন মাঝে মাঝে যান সেই রকমই গেছেন, আবার ফিরিয়া আসিবেন।

কয়েকদিন ধরিয়া টুলু কিছুই করিল না, শুধু তৃষিত মরু যেমন করিয়া বর্ষার জলে নিজেকে অভিসিঞ্চিত করে, তেমনি করিয়া চারিদিকের শান্তি দিয়া নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া লইতে লাগিল। সকালে বিকালে বাসার সামনে একটি শান-বাঁধানো চাতালে থাকে বসিয়া। নদীর ওপার থেকেই সবুজের সমারোহ,—গাঢ়, ফিকা; আরও গাঢ়, আরও ফিকা; তাহার উপরে যতদূর চোখ যায় স্বচ্ছ আকাশের নীল আস্তরণ; এখানে ওখানে ঘনসন্নিবিষ্ট গাছের মধ্যে গোলপাতার ছাওয়া কুটির, কোথাও দুইটা, কোথাও দশটা; কোথাও আরও বেশি; কাছের-গুলাতে শান্ত জীবনের মৃদু চাঞ্চল্য; কেহ নদীতে নামিল, কেহ কলসী লইয়া দাওয়ায় উঠিতেছে, কেহ একটি নগ্ন শিশুর হাত ধরিয়া চপল গতিতে সরু আঁকা-বাঁকা পথ চলিতে চলিতে একটা কুটিরের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। মাঠে কয়েকটা গাভী ছাড়া ছাড়া হইয়া তৃপ্ত আলস্যে চরিয়া বেড়াইতেছে, একটা গুটাইয়া-গুটাইয়া রোমন্থনে নিরত।...একটা মাটির বাসনের নৌকা ওপারের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল।...কিছুই নয়, অথচ টুলুর দৃষ্টিকে যেন এক ধরনের নেশায় ফেলে আচ্ছন্ন করিয়া, যত তুচ্ছই হোক,

যেন মহিমময়···চোখ ফেরানো যায় না, মনে হয় আরও ছবি ফুটুক, আরও দেখি—

পিছনে চলে চরখার একটানা সঙ্গীত, তাঁতের খটখট শব্দ তাল দেয়। টুলুকে এক-এক সময় দেয় অন্যমনস্ক করিয়া। মাস্টারমশাই চরখাতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। মনে পড়ে একেবারে গোড়ার দিকের একদিনের কথা, খনি হইতে উঠিয়া আসিয়া টুলু প্রশ্ন করিয়াছিল—"এগুলোকে বুজিয়ে দেওয়া যায় না সার্?" উত্তরে মাস্টারমশাই বলিয়াছিলেন—"যদি সম্ভব হ'ত, তবুও উচিত হ'ত না টুলু—সভ্যতার চাকা পিছন দিকে ঘোরাতে যাওয়া অস্বাভাবিক, আর সেইজন্য বোধ হয় ভুলও।"

চরখার চাকা ঘোরানো কি সেই সভ্যতার চাকাকে পিছন দিকে ঘোরানো নয়? প্রশ্নটার বেশ মনের মতো উত্তর পাওয়া যায় না, টুলুর আলস্যের আনন্দ একটু মলিন হইয়া উঠে।

সকালে হীরক থাকে স্কুলে, বিকালে সামনের প্রাঙ্গণটায় দলবল লইয়া করে খেলা—এই দিক ঘেঁষিয়াই। টুলুর সন্দেহটা হয়তো ঠিক, ইচ্ছা করিয়াই চম্পা এই ব্যবস্থা করিয়াছে। চম্পা বুদ্ধিমতী, নিশ্চয় বুঝিয়াছে টুলুর এই যে আলস্য, ঔদাসীন্য, এটা নূতন জীবনের সামনে আসিয়া একটা দ্বিধায় পড়িয়া যাওয়ারই রূপান্তর,—হয়তো ঠিক করিতে পারিতেছে না, কোন্ পথে যাইবে। বাহিরে বাহিরে প্রশ্নটার মীমাংসা অবশ্য জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরদিনই হইয়া গিয়াছিল, সকালবেলা চম্পা যখন জিজ্ঞাসা করিল, টুলু উত্তর দিয়াছিল—"আমি যেমন জেল থেকে জেলে ঘুরেছি চম্পা, তুমি ছায়ার মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছ—তোমার অনেক দেশ দেখার ভেতরের কথাটা কি আমি বুঝতে পারি নি? এর পরেও কি আমি নূতন পথ ধরবার কথা ভাবতে পারি?"

টুলু সঙ্গে আসিয়াছে এইখানে, তবু চম্পার নিশ্চয় ভয় হয়। মুখে বলিয়াছে বলিয়াই যে অন্তরের দ্বিধা মিটিয়া গিয়াছে এমন তো নাও হইতে পারে; তাই হীরকের কাছে কাছে রাখিয়া গঞ্জডিহির জীবনের সঙ্গে টুলুকে নিবিড়ভাবে, সুনিশ্চিতভাবে বাঁধিয়া রাখিতে চায়; একটা কৌশল হীরককে কাজে লাগানো।

হীরকের খেলার একটু নূতনত্ব আছে, এক এক সময় টুনুর সৃষ্টি ওপার থেকে সংযত হইয়া তাহাতেই নিবদ্ধ হইয়া যায়। এই বয়সের ছেলেদের সাধারণ যা খেলা সে দিকে বড় একটা যায় না, কিংবা গেলেও বেশিক্ষণ মন বসাইতে পারে না। ও একটি বালখিল্য বিপ্লবী। খেলনার মধ্যে একটি ছোট কংগ্রেস-পতাকা আছে, সেটিকে কেন্দ্র করিয়া ওর মাথায় নানারকমের খেলার প্ল্যান গজায়,—কখনও সাথীদের লইয়া একটা মিছিল গড়িয়া আশ্রমের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়—শ্লোগান আওড়াইয়া, কখনও কখনও গান বা ছড়া—জানা আছে অনেক রকম, পুরাপুরি কিংবা অংশত—রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল, আরও সবার—

"বল বীর,
বল উন্নত মম শির,
শির নেহারি আমারি নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির···"

পতাকা ধরে তুলিয়া, বুক দেয় চিতাইয়া, চলে গতির ছন্দে বিদ্রোহ জাগাইয়া। কখনও কখনও দুইটা দল গড়ে,—একটা ইংরেজ, একটা ভারতীয়, একটা গাছ বা মাটিতে আঁকা একটা বৃত্ত হয় কেল্লা, পেঁপের ডাঁটার কামান সাজানো হয়, তাহার মধ্যে দিয়া মুখের আওয়াজে দুম্ দুম্ করিয়া গোলা ফাটিতে থাকে। হারে ইংরেজ, কেন-না, ভারতীয় দলে থাকে স্বয়ং হীরক—হাতে কংগ্রেসের পতাকা লইয়া।···কখনও ইতিহাস আসিয়া পড়ে—শিবাজী, তোরণ দুর্গ অবরোধ।...কখনও পুরাণ—গাভীর মধ্যে সীতাকে রাখিয়া দুই ভাইয়ে স্বর্ণ হরিণের মৃগয়ায় যায় বাহির হইয়া। রাবণ আসিয়া হয় উপস্থিত, ছল বিস্তার করে। রামায়ণের সঙ্গে এই পর্যন্তই থাকে মিল, তাহার পর আর ধৈর্য থাকে না; সীতাকে ধরিবার সঙ্গে সঙ্গেই দুই ভাই মৃগয়া ছাড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হয়, রামের হাতে কংগ্রেসের পতাকা; সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শেষ হইবার অনেক আগেই রাবণকে ধরা চুম্বন করিতে হয়।

আরও অনেক রকম খেলা, সবগুলাতেই মাস্টারমশায়ের হাত স্পষ্ট, কোন খেলাটা হয়তো সমস্তটা গড়িয়া অভ্যাস করাইয়া দিয়াছেন, কোনটার ভঙ্গি দেখাইয়া দিয়াছেন, কোনটা—যেমন সীতা-হরণেরটা—হীরক গল্প থেকে

নিজের মৌলিক প্রতিভায় গঠন করিয়া লইয়াছে। অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছে, চারিদিকেই আন্দোলনের হাওয়া, শ্লোগান, উত্তেজনা—তাই থেকেও সংগ্রহ হইয়াছে অনেক কিছু। টুলু এক-এক সময় অতিনিবিষ্ট হইয়া দেখে, এক-এক সময় অন্যমনস্ক হইয়া যায়। মাস্টারমশাই এই ছেলেটিকে একেবারে নিজের মনের মত করিয়া গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্তটা অনমনীয় দর্পে ভরা। এমনি বোঝা যায় না, কেন-না, স্বভাবটা বড় মিষ্ট মোলায়েম, কিন্তু কোথাও একটু সন্দেহ হইলে, একটু অন্যায় বাধা পাইলে এই অষ্টম বর্ষীয় শিশুটি ঘাড় বাঁকাইয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া "কেন ?" বলিয়া এমনভাবে দাঁড়াইয়া পড়ে যে, তাহার ভিতরের অনেকটাই নিজের রূপে প্রকাশ হইয়া পড়ে। ছড়াগুলো নিশ্চয় সব মাস্টারমশাইয়ের শেখানো, সব এক সুর—টুলু একটাও এমন শুনিল না যাহাতে দীনতা আছে, একটু হা-হুতাশ আছে বা একটু প্রার্থনা আছে; ঈশ্বরের সম্বন্ধেও গোটা-দুই ছড়া জানে, কিন্তু তাহাতে দয়া ভিক্ষা নাই, দীনভাবে কোন কিছুর প্রার্থনার নামগন্ধ নাই; আছে শুধু তাঁহার বিরাট মহিমার একটা আলোকোজ্জ্বল চিত্র। হীরক যেন মাস্টারমশাইয়ের মনের নব-অঙ্কুর।

টুলু বলিল—"চম্পা, ছেলে তোমার এখানে বেশ একটু বেমানান বাপু, কতকটা যেন বাল্মীকির আশ্রমে ক্ষত্রিয়কুমার লব…"

চম্পা উত্তর করিল—"আপনি অত রেখে-ঢেকে বলছেন কেন? তবে বেমানান নয়, নিশ্চয় বলতে পারি এটুকু।"

টুলু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিতে বলিল—"বাল্মীকির আশ্রমটা গোড়ায় রত্নাকর ডাকাতের আড্ডা ছিল, পরে হ'ল আশ্রম; এটা এখন আশ্রম আছে, পরে হীরক ডাকাতের আস্তানা হয়ে উঠবে।…আশ্চর্য, নামেও কি মিলে যেতে হয় গা?…আরও আস্পর্ধা বাড়িয়েছেন নিজে সঙ্গে খেলে খেলে। আপনাকে টানে নি এ পর্যন্ত ডাকাত?"

একদিন টানিল, খেলার মধ্যে হঠাৎ আসিয়া, ওর নিজস্ব পদ্ধতিতে গলা জড়াইয়া মুখটা মুখের কাছে আনিয়া বলিল…"বাবা, তুমি চিতোর রাণা হবে?…হ্যাঁ, হও; দাদু হতেন—"

টুলু হাসিয়া বলিল—"রাতারাতি এতবড় পদবীর কথা যে আলীহোসেনও ভাবতে পারত না হীরা!"

"হ্যাঁ, হও; তুমি জিতবে, আমি বলে দিচ্ছি; হ্যাঁ, চলো নক্ষী বাবা।"

টানিয়া লইয়া গেল। একটা মাটির ঢিবি, তাহার চারি কোণে আরও চারিটা ঢিবি, সব কয়টা ঘিরিয়া একটা আধ হাত উঁচু দেওয়াল। মাঝখানের ঢিবিটার চূড়ায় কংগ্রেসের পতাকাটা পোঁতা। দূর থেকেই দেখাইয়া বলিল—"ওইটে বুঁদির কেল্লা বাবা—নকলগড়। তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে এইরকম ক'রে বুকে হাত দিয়ে বলো—

'জল স্পর্শ কোরব না আর
চিতোর রাণার পণ,
বুঁদির কেল্লা মাটির 'পরে
থাকবে যতক্ষণ।' "

টুলু হাসিয়া বলিল—"বেশ, বললাম।"

"আমি হচ্ছি কুম্ভ, বাবা, কেমন তো?
হারাবংশী বীর—
হরিণ মেরে আসছে ফিরে
স্কন্ধে ধনুক তীর।' "

বীরত্বব্যঞ্জক দৃষ্টি হানিয়া বলিল—"তুমি দাঁড়াও বাবা এখানে।"

একটু পরেই তীর-ধনুকে সাজিয়া আসিয়া আবার দর্পিত ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া টুলুর পানে চাহিয়া বলিল—"কে রে,

নকল বুঁদি কেল্লা মেরে
হারাবংশী রাজপুতেরে
করবে নতশির?
নকল বুঁদি রাখব আমি
হারাবংশী বীর!

বাবা তুমি এসো, ভাঙবে এসো কেল্লা, দিব্যি করেছ, মনে নেই?...তোরাও সব আয় বাবার সঙ্গে; আমি একলা কুম্ভ।"

টুলু অবশ্য গেল না, ছেলেরা বাঁখারির তলোয়ার লইয়া আগাইয়া গেল। হীরক বলিল—"এসো বাবা তুমি, ভয় নেই, তীর আমি ওপর দিকে ছুঁড়ব। আর, তুমি তো মরবে না যুদ্ধে, মরব আমি কেল্লা বাঁচাতে বাঁচাতে।"

তাহার পর হাঁটু গাড়িয়া ধনুক তুলিয়া বলিল—

"বুঁদির নামে করবে খেলা ;
সইবে না সে অবহেলা—
নকল গড়ের মাটির ঢেলা
রাখব আমি আজ—

এইবার এসো বাবা...চিতোর-রাণাকে তোরা একটা তলোয়ার দে না রে··· ও কি, কোঁচা ধ'রে রয়েছ কেন বাবা ?"

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, মুখ হাত মুছিবার জন্য ডাকিতে আসিল চম্পা, বলিল—" 'নকলগড়' খেলা হচ্ছে ? বাবার সঙ্গে এইটে ছিল সব চেয়ে বড় খেলা ; কী নাতিই গড়ে গেছেন !···নাও, আর দয়া ক'রে গড়িয়ে প'ড়ে গিয়ে কাজ নেই বীরপুরুষের ; এমনিই ধূলো মেখে ভূত হয়ে উঠেছ।"

॥ তিন ॥

চম্পার যেন একটা নূতন রূপ ফুটিয়াছে। আট বৎসরের কঠোর কৃচ্ছ্র তাহার দেহে একটা সুস্পষ্ট ছাপ দিয়া গেছে। টুলুর জেল বদলির সঙ্গে সঙ্গে চম্পা ছয়টা জায়গায় ঘুরিয়াছে এই আট বৎসরে। গঞ্জডিহির ঘটনার প্রায় মাস চারেকের মধ্যে বনমালী হঠাৎ মারা যায়। কাজ ছাড়িয়া চরণদাস বরাবর কন্যার সহিতই ছিল, কাজ আর নেশা ছাড়ার পর থেকে তাহার শরীরটাও যায় ভাঙ্গিয়া ; অকর্মণ্য পিতা, হীরক আর নিজে—এই তিনটি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইতে তাহাকে বছর খানেক অসম্ভব রকম পরিশ্রম করিতে হয় ; ভদ্রভাবে প্রচ্ছন্নভাবে করিতে হইত বলিয়া পরিশ্রমটা ছিল আরও সুকঠোর। দ্বিতীয় বৎসর একটা কঠিন পীড়ায় পড়িয়া দিন পনরো হাসপাতালে পড়িয়া থাকিতে হয় তাহাকে ; সেই থেকেই নার্স হইবার খেয়ালটা ঢুকিল তাহার মাথায়। দিনকতক

শিক্ষানবিশি করিয়া একটা সার্টিফিকেট লইল। তাহার পর থেকে টুলু যেখানেই বদলি হইয়াছে, চম্পা গিয়া জেলের কাছাকাছি একটা বাসা ভাড়া করিয়া এক বছর দুই বছর অথবা তাহার চেয়েও কমবেশি যেমন দরকার হইয়াছে থাকিয়া নার্সগিরি করিয়া চালাইয়াছে। আগে বোধ হয় ইচ্ছা ছিল, টুলুর সঙ্গে একটা যোগসূত্র রাখিবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু তাহার জন্য যে মূল্য দিতে হইবে তাহা কল্পনাতীত হওয়ায় ও-সঙ্কল্পটা বরাবরের জন্য ছাড়িয়া দেয়; কাছে থাকার তৃপ্তি ও আশ্বাস লইয়া এই দীর্ঘ আট বৎসর কাটাইয়া দিয়াছে।

নার্সগিরি থেকে ছোট্ট সংসারটির মধ্যে স্বচ্ছলতা আসে ভালরকম, তাই থেকে ভদ্রতা, যাহার দিকে বেশি নজর ছিল চম্পার, বিশেষ করিয়া হীরকের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া। কিন্তু অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে সেজন্য—অনিয়ম রাতজাগা, ক্রমাগতই রুগ্নের নিরানন্দ সাহচর্য,—আর সমস্তটাই একটানা বিষাদের পটভূমিকায়। দৃষ্টিতে আসিয়াছে ক্লান্তি, দেহে কৃশতা কাঠিন্য। আট বৎসর পরে চম্পাকে চিনিতে অবশ্য ভুল হইল না, তবু এটা ঠিক যে, সে চম্পার সঙ্গে মিল আছে অল্পই।

তবে, আশ্চর্য রকম মিল হইয়াছে এই নূতন আবেষ্টনীর সঙ্গে, এই অভিনব কর্মজীবনের সঙ্গে। এইখানেই ওর নূতন রূপের বিকাশ, ওর সৌন্দর্য মোহনীয় থেকে বরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। স্বভাবের মধ্যে ধর্মপ্রবণতার জন্য চোখ তুলিয়া নারী-সৌন্দর্য দেখার অভ্যাস টুলুর কখনই ছিল না, আজকাল কিন্তু দেখে—মুগ্ধ দৃষ্টিতেই—চম্পা যখন থাকে কর্মব্যস্ত, যখন কর্মশ্রান্ত হইয়া ফেরে, অথবা যখন কাজের তাগিদে কোথাও বাহির হয়, দৃষ্টিতে উৎসাহ, চিন্তা স্বপ্ন। চোখাচোখিও হইয়া গেছে কয়বার, চম্পা রাঙিয়া ওঠে লজ্জায়, টুলুর চাহনিতে যে প্রশংসা সেটা কাটান্ দেওয়ার জন্যই বলে—"দেখছেন কি, আমার দ্বারা আর হচ্ছে না, এত বাড়াবাড়ি ক'রে গেছেন মাস্টারমশাই!···

ছুপুরে মেয়েদের পড়াইয়া বাহির হইয়া যায়। সব ক'টা গ্রামের সঙ্গেই ওর যোগ, প্রত্যেকটি ঘরের সঙ্গে,—কোথাও অভাবের ছিদ্র বুজাইয়া, কোথাও রোগে সেবা বিলাইয়া, কোথাও বা স্কুলের অতিরিক্ত কোন শিল্প শিক্ষা দিয়া সন্ধ্যার মুখে ফেরে। বাহিরের কর্মজীবন এক-একদিন এইখানেই শেষ হয়, এক-

একদিন বাকি থাকে। হীরুক আর টুলুকে আহার করাইয়া, নিজে আহার শেষ করিয়া, অথবা কিছু না খাইয়াই চম্পা বাহির হইয়া যায়—কোথাও হয়তো নূতন প্রসূতি, হয়তো সেবাই করিতে হইবে কোন রুগ্নের সমস্ত রাত্রি জাগিয়া। টুলু নিবারণ করে না, তবে বাড়াবাড়ি হইলে কখনও কখনও একটু মৃদু অনুযোগ করে—নিজেকে বাঁচাইয়া অপরের সেবা করিতে হইবে তো? অপরের সেবা করিবার জন্যও তো নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে? এমনভাবে করা ভালো নয় কি, যাহাতে শেষে নিজের সেবারই দরকার না হইয়া উঠে?···

একদিন এই প্রসঙ্গেই হঠাৎ একটা নূতন ধরনের খবর পাইয়া গেল টুলু। পাশের গ্রামে একটি ছেলের শুশ্রূষা লইয়া কিছুদিন হইতে খুব খাটুনি যাইতেছিল। ছেলেটি একটি বিধবার একমাত্র সম্বল। চম্পা যেন জীবনমরণ পণ করিয়া যমের সঙ্গে লড়াই শুরু করিয়া দিয়াছিল, শেষের দিন আসিল একেবারে তিন দিন পরে; সঙ্কট অবস্থা যাইতেছিল ছেলেটির, একটু ভালোর দিকে যাইতে চম্পা একবার বাসার অবস্থাটা দেখিয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে।

টুলু বাহিরে বসিয়া ছিল, আতঙ্কিত হইয়াই বলিল—"এ কি হয়েছে চেহারা তোমার চম্পা!"

চম্পা একটু হাসিয়া বলিল—"আমি আশা করেছিলাম আপনি ছেলেটার কথা আগে জিজ্ঞাসা করবেন।"

"তা হ'লেই অবস্থাটা বোঝো; তোমার মুখের চেহারা দেখে কি আগে করা উচিত সেটাও ভুলে যেতে হয় লোককে।"

চম্পা একটু হাসিল, বলিল—"একেবারে এতটা নিশ্চয় নয়, তবে কাল-পরশু সত্যি ভীষণ অবস্থা গেছে, বিধবার ঐ শিবরাত্রির সলতে তাকে সামলাতেই··· হ্যাঁ, হীরা কোথায়?"

"সে পড়ছে।"

"খেলার সময় পড়া—তার মানে রাগ হয়েছে বাবুর!"

"তা হয়েছে রাগ; কাল ভাঙাতে পেরেছিলাম, আজ দেখলাম, বেশি চেষ্টা করতে গেলে বাড়াবাড়ি হয়ে উঠবে, সামলাতে পারা যাবে না; হাল ছেড়ে ব'সে আছি;···তাই ব'সে ব'সে ভাবছিলাম। আর একজন যদি তোমার

পাশে থাকত, বেঁটে নিত তোমার কাজের খানিকটা, অন্তত হীরার দিক দিয়ে দরকার হ'য়ে পড়েছে।"

চোখ তুলিয়া চম্পা ক্ষণমাত্র কি যেন একটা ভাবিল, বলিল—"হ'লে তো খুবই ভালো হ'ত, কিন্তু হচ্ছে কোথা থেকে?...যাই, দেখিগে।"

একটু দেরি হইল, তাহার পর দুইজনে বাহির হইয়া আসিল, হীরক চম্পাকে জড়াইয়া আছে। চোখ দুইটা ভিজা, তবে মুখে একটু হাসি ফুটিয়াছে। চম্পা অল্প হাসিয়া বলিল—"হীরাবাবুকে কি ব'লে ঠাণ্ডা করলাম জানেন? শোনা দরকার আপনার; বললাম—আর একজন ভালো মায়ের ব্যবস্থা ক'রে দোব, সর্বদা আগলে..."

চম্পা হঠাৎ থামিয়া গেল, বলিল—"দেখুন। ভাগ্যিস হীরা রাগ করেছিল, নইলে ভুলেই যেতাম কথাটা। আমি নরোত্তমের মুখে শুনলাম সেদিন, তারপর এইসব গোলমালে আর আপনাকে মনে করে বলাই হয় নি। মাস্টারমশাই মারা যেতে আমি যখন চ'লে যাই হীরাকে নিয়ে, একটি ভদ্রঘরের মেয়ে আশ্রমে আসেন, বলেন—মহকুমার মেয়ে-স্কুলের মিস্ট্রেস তিনি, বাইরে আমাদের আশ্রমের সুনাম শুনে এসেছেন। বেশ খানিকক্ষণ থেকে আশ্রমের কাজ ভালো রকম দেখে-শুনে, গ্রামে বেশ খানিকটা ঘুরে চ'লে যান। ব'লে যান, মাস্টার-মশাই ফিরে এলে যেন তাঁকে খবর দেওয়া হয়, দরকারী কাজ আছে।"

দুইজনে পরস্পরের মুখের পানে একটু চাহিয়া রহিল, চম্পা জিজ্ঞাসা করিল—"কি মনে হয় আপনার?"

"আশ্রমের কাজ করবার ইচ্ছে মনে করছ?

"আশ্চর্য কি?"

"কত বয়েস বললে নরোত্তম?"

"বললে, প্রায় আমার বয়সী, এক-আধ বছরের বড় হতে পারে।"

"আর?"

"আর কি?—সংসারে কে কে আছে? তা আর ও কি ক'রে জিজ্ঞেস করবে?"

টুলু একটু অন্যমনস্ক হইয়াই প্রশ্নটা করিয়াছে, বলিল—"তা বটে।...এসে

থাকবেন—এটা বোধ হয় বেশি আশা করা হয়, উদ্দেশ্যটা কি জানতে পারলে ভালো হ'ত, কিন্তু উপায় কি? মাস্টারমশাই এলে পরে তো খবর দিতে বলেছিলেন? ওইখানেই যে পথ বন্ধ হয়ে গেল।"

দুইজনে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর চম্পা প্রশ্ন করিল—"আমি একটা কথা বলব?"

"কি বলো।"

"ধরুন আপনি যদি যেতেন একবার—"

"ফল কি? যদি উদ্দেশ্য থাকে এসে থাকবার তো সে নিশ্চয় মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে, তিনি বয়স্থ মানুষ; আমার সঙ্গে থাকবেন না নিশ্চয়, যদি একলা হন। ধরা যাক, একলা নয়, এসে রইলেন, আমাদের তরফ থেকে বিপদ হচ্ছে মাস্টারমশাইয়ের মৃত্যুর কথাটা জেনে যাবেন শেষ পর্যন্ত।"

"না-হয় গেলেন, তিনজনের জায়গায়, না-হয় চারজন জানলে; শিক্ষিতা মেয়েছেলে, গোপন রাখবার উদ্দেশ্যটাও বুঝবেন, রাখতেও পারবেন গোপন।"

আবার দুইজনে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর চম্পা হঠাৎ একটু অসহিষ্ণু হইয়া আবদারের সুরে বলিল—"না, আপনি যান একবার, আমার লোভ হচ্ছে, পড়ানোর ভারটা যদি তিনি নেন—নিজে শিক্ষিতা···আর দেখুন না, এই তিনটে দিন আটক প'ড়ে গেলাম, ক্ষতি হ'ল তো। যান আপনি, সত্যি।"

টুলু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল, ছেলেমানুষি ভাবে চম্পার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"একটু ভেবে দেখতে দাও, অত সহজে কি!"

॥ চার ॥

অন্যমনস্ক হইয়া পড়িবার একটু কারণ ছিল, টুলুর একটি ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ বৈকালের কথা মনে পড়িয়া গেছে; গঞ্জডিহিতে মাস্টারমশাইয়ের বাসা—প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে ছইওয়ালা গোরুর গাড়ি থেকে নামিল রতন, কানন আর তাহাদের ভগ্নী;—বাইরে উতলা প্রকৃতি, ঘরের মধ্যে সেই বাক্যহীন মুহূর্তগুলি—তাহার পরই দৃশ্যপটের একেবারে পরিবর্তন; বর্ষাধৌত, স্নিগ্ধ আকাশের

নিচে স্কুলের বাগানে ছেলেমেয়ের দল, উল্লাসে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, অতটা উদ্দাম না হোক, তবু এই একটু আগের ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে কোথায় যেন আছে একটা মিল, রতনের বোনের সেই বিস্মিত আনন্দবিহ্বল কথাগুলি—"বড় চমৎকার লাগছে আমার—স্কুলের সঙ্গে বাগান!—ছেলেরা নিজেই করে আবার!" তাহার পর সেই বিদায়ের দৃশ্যটুকু—সবশেষে রতনের হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসা—"একবার উঠবেন?...দিদি জিগ্যেস করলেন, আপনার স্কুলে তাঁকে পড়াতে দেবেন?..."

তিন দিনের পরে মাকে পাইয়া হীরকের উৎসাহটা সুদে আসলে আসিয়াছে ফিরিয়া, চম্পা ভিতরে চলিয়া গেল...কংগ্রেস-পতাকাটা ভুলিয়া গিয়াছিল, ভিতর থেকে আসিয়া ত্রস্ত পদে বাহির হইয়া গেল—একটা রাজ্য জয় করিতে হইবে, বিলম্ব হইয়া গেছে যেন।

টুলু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, ঐ একটি সন্ধ্যার বার্তা লইয়া গঞ্জডিহি বহু দিন পরে এক অপরূপ মোহে আসিয়া সামনে দাঁড়াইয়াছে—স্মৃতি কখনও এত মিষ্ট হইয়া দেখা দেয় নাই টুলুর জীবনে, কেন ঠিক ধরিতে পরিতেছে না... সমস্ত-টুকুর মধ্যে কোন্‌খানটা সব চেয়ে মিষ্ট?—সেই হঠাৎ ঝঞ্ঝা, কি রতন-কাননের কুণ্ঠিত সলজ্জ দৃষ্টি, কি তাদের বোনের সেই বিস্ময়, কি মুক্ত স্বচ্ছ আকাশের নিচে ছড়ানো তাহার স্কুলের সেই অংশটুকু?...মনে হয়, সবের মধ্যেই কোথায় কি যেন অনির্বচনীয় আছে একটা—সমস্তটুকুর উপর যাদুস্পর্শ বুলাইয়া দিয়াছে...টুলু চিন্তা-স্রোতকে ঘুরাইল, একবার সাঁকরেলে গিয়া উপস্থিত হইলে কেমন হয়? মহকুমার স্কুলের এই শিক্ষয়িত্রীর মতোই সেও নিজের মুখেই বলিয়াছিল, আসিয়া পড়াইবে। উৎসাহটা টুলুর এত বাড়িয়া গেল, কোনও বাধাকেই যেন বাধা বলিয়া মনে হইতেছে না; যাইবে, গিয়া অকপট চিত্তে সমস্তটা খুলিয়া বলিবে—আট বৎসরের অবকাশ বেশ একটি অন্তরাল সৃষ্টি করিয়াছে—কত পরিবর্তন হইয়াছে মানুষের মনে কে বলিতে পারে? যেখানে কোন গলদ নাই সেখানে কেন করিবে না বিশ্বাস, সত্য কেন চিরকাল এইভাবে ভীরু অবগুণ্ঠিত হইয়া থাকিবে? টুলু করিবে চেষ্টা, চম্পার মতো তাহারও লোভ হইতেছে। আর লোভ যে এত মিষ্ট—এ সংবাদ তো এর আগে জানা ছিল না।

দিন দশেক পরের কথা। সাঁকরেলে যাওয়া হয় নাই; সেদিনের উৎসাহটা

সেদিনকার সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই স্তিমিত হইয়া গেছে। সঙ্কল্পটা একেবারে ছাড়ে নাই হয়তো, তবে দ্বিধা আসিয়াছে, বাধা যে কত বেশি সেটা উপলব্ধি করিতে করিতেই দশটা দিন কাটিয়া গেছে।

সকালবেলা টুলু স্কুল থেকে ফিরিয়া জামা ছাড়িতে যাইবে, একটি ছইওয়ালা গোরুর গাড়ি আশ্রমের বাহিরে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। ভদ্রবেশে একটি স্ত্রীলোক ভিতরে বসিয়া আছে দেখিয়া টুলু পা চালাইয়া বাসায় চলিয়া গেল, চম্পাকে বলিল—"দেখো তো, বাইরে কে এলেন, ভদ্রঘরের মেয়ে..."

চম্পা রান্নাঘরে ছিল, হাত ধুইয়া কাপড়ে মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া কৌতুহলদীপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"স্কুলের সেই মিস্ট্রেস নয়তো?"

"হতে পারে, যাও শিগগির।"

একটু পরেই চম্পা মহিলাটিকে লইয়া প্রবেশ করিল। উৎসাহভরে গল্প করিতে করিতে আসিতেছে, বলিল—"তিনিই ইনি···কোথায়?···হীরা, কোথায় গেলে? এসো, প্রণাম করো'সে।

টুলু ঘরের মধ্যে জামার বোতাম খুলিতেছিল, সেখান হইতেই মহিলাটিকে উঠানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া স্তব্ধভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একটু দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর তাহার সমস্ত শরীরের রক্ত যেন নামিয়া গেল—সাঁকরেলের সেই মেয়েটি, কলঙ্কিত মুখ লইয়া সামনে দাঁড়াইতে পারা যাইবে না বলিয়া যাহার বাড়ির প্রায় দরজা থেকেই ফিরিয়া আসিয়াছিল সেদিন—আট বৎসর আগে, জীবনের সেই সবচেয়ে মোক্ষম রাত্রিটিতে। কী দুর্যোগ! যাহার জন্য কলঙ্ক, সেই চম্পাই আজ তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাহার সামনে উপস্থিত করিতেছে! ভাবিবার সময় নাই, পলাইবার পথ নাই, কয়েদখানার সেলের মধ্যেও এত নিরুপায় বোধ হয় নাই টুলুর।···চম্পা হাসিতে হাসিতে উঠিয়া আসিল, মহিলাটির ডান হাতখানি ধরিয়া আছে, আসিয়া টুলুর দিকে চাহিয়া বলিল—"তিনিই, আমাদের আন্দাজ ঠিকই।"

মহিলাটি নমস্কার করিয়া স্থিরদৃষ্টিতে একটু চাহিয়া রহিল, একটা স্মৃতিকে যেন স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার পর প্রশ্ন করিল—"আপনাকে কোথাও দেখেছি কি এর আগে?"

টুলু আত্মগোপনের শেষ চেষ্টা করিল, একটু চিন্তা করিবার ভান করিয়া উত্তর করিল—"কই, মনে পড়ছে না তো!"

মহিলাটির মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিল—হ্যাঁ, দেখেছি, আপনার মনে পড়ছে না! গঞ্জডিহিতে হেডমাস্টারমশাইয়ের বাসায় হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি এসে পড়তে আমরা গিয়ে উঠলাম…"

টুলু একবার চম্পার পানে চাহিল, হাসি তো নাই-ই তাহার মুখে! মনে হইতেছে, এ মুখে জীবনে যেন কখনই হাসি ফোটে নাই।

মহিলাটি নব আবিষ্কারের আনন্দে আপন মনেই বলিয়া চলিয়াছে—"সেই আপনার স্কুল দেখলাম, ছেলেদের সেই বাগান…এবার নিশ্চয় মনে পড়েছে আপনার—অবিশ্যি অনেক দিনের কথা হ'ল, কিন্তু আমার মনে তো ছবির মত ব'সে রয়েছে সমস্তটুকু—বড্ড ভালো লেগেছিল…পড়ছে না মনে আপনার?" চম্পা আড়চোখে একবার টুলুর পানে চাহিয়া লইয়া অন্য দিকে মুখটা ফিরাইয়া লইল।

টুলু যেন কড়া উকিলের জেরায় পড়িয়া নিরুপায়ভাবে বলিল—"হ্যাঁ, পড়ছে এবার একটু একটু।"

মুখে একটু আনন্দ টানিয়া আনিবারও চেষ্টা করিল। মহিলাটি বলিয়া চলিল—"আপনাকে কথা দিলাম—আপনার স্কুলে পড়াব, কিন্তু কপাল দেখুন, বাড়ি গিয়েই দেখি, মার অসুখের বাড়াবাড়ি,—ভুগতেনই বড্ড, হঠাৎ এত বাড়াবাড়ি হ'ল যে দিন তিনেকের মধ্যে মারা গেলেন। আমাদেরও সাঁকরেলের সঙ্গে সেই যে সম্বন্ধ ঘুচল, আজ পর্যন্ত আর যাওয়া হয় নি।"

নিশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতেছিল টুলু, বন্ধ নিশ্বাসকে ধীরে ধীরে মুক্ত করিয়া দিল; দুঃসাহসে ভর করিয়া একটা প্রশ্ন করিয়া বসিল—"গঞ্জডিহিতে যা যা ঘটেছিল—স্কুল নিয়ে—তার কিছুরই খবর রাখেন না বোধ হয়?"

"না তো, কি ঘটেছিল? রতন-কাননও তো তারপর আর যায় নি স্কুলে, জানব কোথা থেকে?"

টুলুর চৈতন্য হইল, ভয়ের মধ্যে প্রশ্নটা বড় বেখাপ্পা হইয়া গেছে। চম্পাও আর একবার আড়চোখে দেখিল। টুলু ঢোঁক গিলিয়া বলিল—"না, তেমন আর

কি !···মাস্টারমশাই কাজ ছেড়ে দিলেন—গঞ্জডিহির মতন জায়গায় সেইটেই তো বড় খবর একটা। আমিও তার পরেই চ'লে এলাম।"

হীরক ছিল না বাসায়, কে আসিয়াছে খবর পাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপস্থিত। চম্পার নির্দেশে মহিলাটিকে প্রণাম করিতে সে মুখটা তুলিয়া ধরিয়া স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে একটু চাহিয়া দেখিল, তাহার পর টুলুর মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"আপনাদের ছেলে ? চমৎকারটি তো !"

টুলু একটু হাসিয়া হীরকের পানে চাহিয়া বলিল—"হুঁ।"

'চমৎকার' সম্বন্ধেও হয়, আবার ছেলেকে স্বীকার করাও হইল চলে, তাহার পর হঠাৎ আর একটা দুঃসাহসের প্রশ্ন করিয়া বসিল—"ওর মাকে আপনি দেখেছিলেন সেখানে ?"

মহিলাটি চম্পার দিকে একবার চাহিয়া লইয়া বলিল—"না তো। কই আপনার বাসায় তো ছিলেন না তখন ; ছিলেন নাকি ?"

টুলু যেন মরিয়া হইয়া গেছে, এসপার-ওসপার একটা কিছু হইয়া যাক, প্রশ্ন করিল—"গঞ্জডিহিতে কখনও দেখেন নি ?—কোথাও ? ভালো ক'রে দেখুন তো ?"

বেশ একটা অদ্ভুত প্রশ্ন। মহিলাটি বিমূঢ়ভাবে চম্পার মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। চম্পা যেন ফাঁসির হুকুম শুনিবে এবার, মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া উঠিয়াছে। টুলুর দিকে ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফিরাইয়া মহিলাটি বলিল—"কই, মনে পড়ছে না তো ; গঞ্জডিতি আমি গেছিও তো কম—সাঁকরেলে গিয়ে পর্যন্ত বোধ হয় বার চারেকও হবে কি না সন্দেহ—একবার ভাইদের ভর্তি করতে, একবার সেই ঝড়বৃষ্টির দিন, আর বোধ হয় বার দুয়েক—বাজার থেকেই ঘুরে আসা।"

টুলুর কানে গেল তাহারই মত একটা রুদ্ধশ্বাস চম্পার নাসারন্ধ্র হইতে ধীরে ধীরে মুক্ত হইল।

ইহার পর কথাবার্তা ক্রমে বেশ সহজ হইয়া আসিল। মহিলাটি নিজের নাম বলিল—তটিনী। সাঁকরেল ছাড়িয়া মামার বাড়িতে যায়—সুবিধা হয় না। দুইটি ভাইকে লইয়া কলিকাতায় এক মেয়ে-হোস্টেলে থাকিয়া পড়াশুনা করে—ভাই

ছুহাচকে লইয়া থাকবার বিশেষ অনুমতি লইয়া, আই এ পর্যন্ত পাস দিয়া এখানে চাকরি লয়, শিক্ষকতা করিতে করিতেই বি, এ, পাস দিয়াছে। ভাই দুইটি কলিকাতায় পড়ে, রতন বি, এ, দিবে এবার, কাননের থার্ডইয়ার।

দুপুরবেলা তিনজনে আশ্রম ঘুরিয়া বেড়াইল, গ্রামেও কোথায় কি কাজ হইতেছে দেখাইল চম্পা। তাহার পর বৈকাল হইতেই তটিনী বিদায় চাহিল; দশ-বারো মাইল যাইতে হইবে—এইতেই রাত্রি হইয়া যাইবে।

খানিকটা দূর পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া বাসায় ফিরিয়া টুলু চম্পার কপালের সিঁদুরের পানে চাহিয়া একটু যেন বিষণ্ণ কণ্ঠেই বলিল—"আজ তোমার প্রবঞ্চনাটা বড্ড স্পষ্ট হয়ে উঠল।"

চম্পা সেইদিনের উত্তরটাই দিল, তবে টুলুর মুখে এই দ্বিতীয় উল্লেখ বলিয়া একটু ব্যথিত কণ্ঠেই; বলিল—"কি উপায় বলুন না আপনি?"

তাহার পর একটু থামিয়া বলিল—"আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, এ বঞ্চনায় ঈশ্বর আছেন আমার সাক্ষী।"

॥ পাঁচ ॥

অল্প অল্প করিয়া কাজে বেশ মন বসিয়াছে। সকালে ছেলেদের পড়ায়, তাহার পরে বাগান। আমাড় জমি, নিচেই নদী, ছেলেমেয়ের সংখ্যাও ঢের বেশি, গঙ্গাডিহির তুলনায় এখানকার এদের কৃষি বিষয়ে বেশ একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, খানিকটা দক্ষতাও; এখানকার তুলনায় গঙ্গাডিহির বাতাসটা খেলাঘর বলিয়া মনে হয়। আহারাদির পর তাঁতখানায় চরখাঘরে থাকে, জিনিসটাকে মনের সঙ্গে বেশ খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছে না, কেমন যেন মনে হয়, এ কোন্ সুদূর অতীতে পিছাইয়া যাওয়া—মাস্টারমশাইয়ের জীবন-দর্শনের সঙ্গে যেন মিল খুঁজিয়া পায় না। বোঝে, সাগরদহের মতো জায়গায় এর সার্থকতা আছে, তবু প্রশ্ন জাগেই মনে—আর কেউ হইলে মানাইত, মাস্টারমশাই কেন এই নিথর নিঝুম শান্তির মন্ত্র দিয়া গেলেন এখানে? আগস্ট-আন্দোলনের অত বড় বিপ্লব হইয়া গেল চারিদিকে, এরা এখানে

বসিয়া চরখা ঘুরাইয়া গেছে, একটি একটি করিয়া টানার গায়ে পোড়েনের সূতা জুড়িয়া গেছে।

তবুও জিনিসটা কৌতুহল জাগায়; দেখে প্রশ্ন করে, নিজেও কখনও কখনও বসিয়া যায়। এখান থেকে বাহির হইয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে—এইটে লাগে সবচেয়ে ভালো—কাজও থাকে, অকাজও। সবের মধ্য দিয়া কত বিচিত্র মনের সঙ্গে পরিচয় দিন দিন নিবিড় হইয়া উঠিতেছে—কাহারও কেহ নয়, অথচ কত নিবিড় আত্মীয়তা…

বেশ লাগিতেছে; গঞ্জডিহির শেষের দিনের তিক্ততা, অকারণ কলঙ্ক লইয়া আট বৎসর ব্যাপী জেল-জীবনের গ্লানি ধীরে ধীরে মন থেকে যাইবে। ধীরে ধীরে জীবন যেন আবার নূতন অর্থে সার্থক হইয়া উঠিতেছে।

বিকাল থেকে সন্ধ্যার খানিকটা পর পর্যন্ত বাহিরে নদীর ধারের চাতালটির উপর বসিয়া থাকে, এটা ওর গঞ্জডিহির অভ্যাস, কাঞ্চনতলার স্মৃতিসুরভিত; দূরে কাছে বিচিত্র জীবনের চলচ্চিত্র, সামনের প্রাঙ্গণে হীরক কোম্পানির খেলা চলিতে থাকে—খদ্দরের কংগ্রেস-পতাকা হরিৎ শ্বেত গৈরিকে করে ঝলমল—শিশু বিদ্রোহীর কল্পনাবিলাসের মধ্যে মাস্টারমশাইয়ের পরিচিত রূপটি

এই সময় কয়েকদিন হইতে নরোত্তম চাতালের এক পাশটিতে আসিয়া বসিতেছে।

নরোত্তম সব কাজেই মাস্টারমশাইয়ের পাশে থাকিত, বিশেষ করিয়া শেষ সময়টায় ছিল, সেইজন্য টুলু আসিয়া অবধি তাহাকে খুঁজিতেছিল, কিন্তু লোকটা ছিল না এখানে। মাস্টারমশাইয়ের মৃত্যুর রহস্যটা চম্পা ব্যতীত আশ্রমে শুধু এই জানে, সেইজন্য আরও খুঁজিতেছিল টুলু। এখন কিন্তু পাওয়া গেল তাহাকে, চম্পার কাছে যেটুকু শুনিয়াছে তাহার অতিরিক্ত এক বর্ণও কিছু পাওয়া গেল না। বরং টুলুর যেন মনে হইল, সে যে এটুকুও জানে সেটাও ওর তেমন মনঃপূত হইল না। মানুষ দেখিয়া দেখিয়া দৃষ্টিটা খুব সূক্ষ্ম হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই টুলুর এ সন্দেহটা হইল। নরোত্তম শুধু প্রশ্ন করিল—কথাটা চম্পা বলিয়াছে কি না, তাহার পর টুলু—"হ্যাঁ" বলিতে

কহিল, কথাটা আর কেহই জানিবে না, কর্তার বারণ। মাস্টারমশাইয়ের মৃত্যু সম্বন্ধে বলিল—ওইটুকুই জানে সে, তাহাও শোনা কথা, মৃত্যুর সময় ও কাছে ছিল না; ওর কাজ ছিল মাস্টারমশাইয়ের গৃহস্থালি দেখা, তাহাই লইয়া ছিল।

লোকটার বয়স ষাটের উপর, গৌরবর্ণ, মাথার চুল একগাছি কাঁচা নাই। হাতের পায়ের শিরা-উপশিরাগুলা রক্তপুষ্ট, শরীরটা দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, বরং ভিতরকার শক্তিতে কতকটা উগ্রই বলা চলে, চোখ দুইটা উজ্জ্বল; এইটুকু ওর যেন প্রথমার্ধ, দ্বিতীয়ার্ধ টা একেবারে অন্য রকম—নিতান্ত বৈষ্ণবোচিত কথাবার্তা, মুখে প্রায় সারাক্ষণই একটা বিনীত মৃদুহাস্য লাগিয়া আছে, সমস্ত ব্যবহারের মধ্যে একটা তৃণাদপি সুনীচভাব, নিজেকে মিটাইয়া দিতে পারিলেই যেন বাঁচে। ভিতরে বাহিরে এই গরমিলটা টুলুর কেমন যেন বোধ হয়, শুধু তাহাই নহে, ওর এই চাতালে আসিয়া মোটে বসাটাই লাগে অদ্ভুত। আসিয়া যে বেশ একটু আলাপ-আলোচনা করা তা নয়,—টুলু বকে, ও শুনিয়া যায়, টুলুর বক্তব্য শেষ হইলে আবার একটি ফিকড়ি তোলে, টুলু বকিয়া যায়, ও হাঁটু দুইটা চিবুকের নিচে জড়ো করিয়া শোনে। বিষয়—ওর এদিককার জীবন, এই আশ্রম কেমন লাগিতেছে টুলুর, কোন দিক দিয়া এর উন্নতি করা যায়? বেশ মোলায়েম করিয়া বলিবার ক্ষমতা আছে—"কর্তা গেলেন বাবাঠাকুর, কারুর সাতেও ছিলেন না, পাঁচেও ছিলেন না—এ হঠাৎ কি মতিভ্রম হ'ল—সবই গোবিন্দের ইচ্ছে—তা এই ডামাডোলের বাজার, কি ক'রে যে সামলে রাখা যায় তাঁর এই আশ্রমটুকু—সরকারের আবার দৃষ্টি না পড়ে—এই দেখুন না—সরকারের সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়া কেন বাপু?—পারবি তোরা?··· কর্তারও শেষের দিকে ভুল হয়েছিল বাবাঠাকুর, এ কথা আমি বলবই...আপনি কি বলেন?...আবার ঐ দেখুন না, হীরাটাকেও তোয়ের করছিলেন—ভালো বলতে হবে? বলুন না?"

টুলুর বেশ ভালো লাগে না, তবে বলে না তেমন কিছু, বিশেষ করিয়া যতদূর ওর কথাবার্তায় বুঝিয়াছে, মাস্টারমশাই টুলুর জীবনের পূর্ব ইতিহাস নরোত্তমকে বলেন নাই, এমনও কোন কথা শুনিল

না যাহাতে মনে হয়, নিজের ওদিককার জীবনেরও কিছু আনিয়াছেন উহার গোচরে।

তবু বিরক্ত হয় মনে মনে, কেমন যেন একটা সূক্ষ্ম গোয়েন্দাগিরির ভাব। ঠিক বুঝিতে পারে না, চারিদিকেই গোলমাল, আগস্ট-বিদ্রোহের জের টানিয়া ভিতরে ভিতরে কত কি হইতেছে, এর মধ্যে এ লোকটার এমন সন্দিগ্ধ ছমছমে ভাব কেন?......মাস্টারমশাইয়ের পাশে পাশে থাকিত, কিন্তু কি নিগূঢ় উদ্দেশ্যে—কে জানে? এখন পর্যন্ত তাঁহার মৃত্যুর কথাটা প্রকাশ করে নাই, তাহারই বা কি উদ্দেশ্য কে জানে? হয়তো চরই, যথাস্থানে ঠিক পৌঁছাইয়া দিয়াছে খবরটা, এখন আর সবাইকে বেশ ভালো করিয়া জড়াইবার চেষ্টা করিতেছে।

এক-একদিন ওকে যেন পরিহার করিবার জন্যই টুলু হীরার সঙ্গে বিদ্রোহের খেলায় মাতিয়া যায়। তাহারই মধ্যে থেকে আড়চোখে দেখে, নরোত্তম চাতালে বসিয়া খেলা দেখিতেছে, মুখে সেই মৃদু সাত্ত্বিক হাসিটি, তাহার অন্তরালে কোথায় যেন সেই সূক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসা।

কিছু বুঝিতে পারে না। চম্পাকে সব বলিয়া দেখিয়াছে, সেও যেন বিমূঢ় হইয়া থাকে, ভীত হইয়া পড়ে। নরোত্তমকে সে মাস্টারমশাইয়ের দক্ষিণহস্ত বলিয়া জানিত, অত বিশ্বাস যে চম্পাকেও করিতেন না তাহার প্রমাণ মাস্টারমশাইয়ের বিপ্লবের দিকটা একমাত্র নরোত্তমই জানিত—সেই নরোত্তমই গোয়েন্দা? নূতন করিয়া হইল নাকি?—না, পূর্ব হইতেই ছিল? মাস্টারমশাইয়ের মৃত্যুর সঙ্গে তাহা হইলে তো এর একটা যোগাযোগ থাকাও বিচিত্র নয়!

নরোত্তম একজন বড় কর্মী, তাহার জন্য উদ্বিগ্নভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিল দুইজনেই, সে আসিতে কিন্তু নূতন অশান্তির সৃষ্টি হইল। টুলুর জীবনটা যেন আরও বেশি করিয়া তিক্ত হইয়া উঠিল, এবং সেই তিক্ততার বশে একদিন হঠাৎ বড় মরিয়া হইয়া উঠিয়া একটা কাণ্ড করিয়া বসিল—

কথাটা নরোত্তম যেমন ধীরে ধীরে তোলে সেই ভাবে তুলিল—"জানেন, কি সব কাণ্ড হচ্ছে চারিদিকে—ভেতরে ভেতরে?"

হীরকের সেদিন জমাট খেলা, আগস্ট-আন্দোলনেরই একটা কল্পি নকল-গড়ের সঙ্গে জুড়িয়া একটা উগ্রতর জিনিস দাঁড় করাইয়াছে; টুলু তন্ময় হইয়া দেখিতেছিল। দক্ষিণের দিকে তমলুক অঞ্চলে কি সব হইতেছে যায় কানে কিছু কিছু, কিন্তু উত্তর দিল না প্রথমটা, তাহার পর নরোত্তম পুনরুক্তি করায় একটু বিরক্তভাবেই উত্তর করিল—"না, আমি তো বেরুই না কোথাও দেখেছ।"

নরোত্তম মোটেই অপ্রতিভ হইল না, বলিল—"হচ্ছে, এবার নাকি আগস্টের চেয়ে বড় ব্যাপার হবে।"

টুলু ফিরিয়া সোজাসুজি চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"কোথায়?"

"আমাদের এলাকায় নয়, ভয় নেই; এখানে সব মাটির মানুষ, তবু চারিদিকেই যদি জ্বলে আগুন, তেতে উঠতে কতক্ষণ? সেটা তো চাই না আমরা, না, উচিত চাওয়া? বলুন না আপনিই?"

এই পাঁচ-সাত দিনের বিরক্তিটা টুলুর মনে যেন একসঙ্গে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, বলিল—"নরোত্তম, আমার আসল মতটা কি সেটা জানলে তোমার যদি কোন কাজ হয় তো বলতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। এত আড়ে আবডালে কথা পাড়বার কি দরকার? তবে শোন, এই যে তাঁতের খটখটানি, চরখার ঘ্যানঘ্যানানি—এর উপর আমার এতটুকু ভক্তি নেই। আশ্রমে বাকি থাকে পড়ানোর দিকটা, সেটা মন্দ লাগত না, যদি না অষ্টপ্রহর এই কথাটা মনে পড়ত যে, আশেপাশে আর সবাই যখন দেশের ডাকে বুক দিয়ে পড়ছে ঝাঁপিয়ে—মেয়ে-পুরুষ—এদের বাপ মা ভাই বোন শান্তশিষ্ট হয়ে তাঁত বুনে গেছে আর চরখা ঘুরিয়ে গেছে। তবে আরও শোন—নিশ্চয় সে কথাগুলো তোমায় বলেন নি মাস্টারমশাই, আমি এর আগে কোথাও চাকরি করতাম না, যেমন তোমরা সব জানো,—আমি ছিলাম জেলে—আট বছর—তার একেবারে গোড়ার কারণটা এই যে, আমি আগস্ট-হাঙ্গামার জন্যেই তোয়ের হচ্ছিলাম—জীবনের সবচেয়ে বড় আপসোস আমার যে, জেলে গিয়ে পড়তে হ'ল বড় তাড়াতাড়ি, নইলে মাস্টারমশাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে মরতে পারতাম, চরখার ঘ্যানঘ্যানানি শুনে শুনে এ রকম দগ্ধে মরতে হ'ত না। এই গেল আমার কথা। শুনেছি, তুমি মাস্টারমশাইয়ের পাশে পাশে থাকতে, কিন্তু তাঁর সমস্ত কথা তুমি জান ব'লে

আমার মনে হয় না, তা হ'লে বুঝতে ও-ভাবে যে প্রাণ দিলেন—এইটেই তাঁর আসল জীবনের সঙ্গে মেলে; এই আশ্রম খোলা—মাটির মানুষদের জন্যে, এইটেই বরং তাঁর মতিচ্ছন্ন, যেটা বুঝতে আমি সারা হয়ে যাচ্ছি আসা পর্যন্ত। এখন বুঝেছ বোধ হয়, যারা মানুষের মতন একটু সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে পুলিসের গুলি কি সঙিনের জন্যে তোয়ের হয়ে, তোমার কথায় তাদের বারণ করতে যাওয়ার পাত্র আমি নই।"

কণ্ঠস্বরটা ক্রমেই মুক্ত, উগ্র হইয়া উঠিয়াছে; উত্তেজনায় সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে; মুখটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে; ছেলেরা খেলা ছাড়িয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। টুলু হঠাৎ থামিয়া গিয়া হনহন করিয়া বাসার দিকে পা বাড়াইল। চম্পা আসিয়া দরজার চৌকাঠে দাঁড়াইয়া ছিল, ভীত বিস্মিত দৃষ্টি। টুলু একটা কথাও না বলিয়া চঞ্চলপদে তাহার পাশ দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

রাত্রি নিষুপ্ত, আহারাদি সারিয়া টুলু এই সময়টা পড়াশুনা করে খানিকটা। উঠানের ওদিককার ঘরে চম্পা এই সময়টা একটু আধটু শখ বা ফুরসতের কাজ যা ইচ্ছা হয় করে, নিয়মিত কাজের যদি কিছু বাকি থাকে শেষ করিয়া লয়। একজন আধা-বুড়ি আগুরি স্ত্রীলোক এইখানেই শোয় রাত্রে, খায়ও, সেও থাকে জাগিয়া; কাজ থাকিলে সহায়তা করে। পড়া শেষ হইলে টুলু যায় শয়ন করিতে। আশ্রমের চালাটার পাশেই একটা বেশ বড় পাশ-ঘর আছে—গুদাম, তা ভিন্ন টাকাকড়ি যা কিছু তাও সেই ঘরে থাকে। আরও জন চারেকের সঙ্গে টুলু সেইখানে শোয়।

টুলু পড়িতেছিল, চম্পা একটু যেন বিমর্ষমুখে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—"নরোত্তম দেখা করতে চায় আপনার সঙ্গে।"

টুলু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল—"হঠাৎ এত রাত্তিরে?"

"কি জানি! আপনার সঙ্গেই দরকার।"

"একলা?"

"তাইতো মনে হচ্ছে, অন্তত সঙ্গে তো কেউ নেই।"

টুলু সেইভাবেই একটু চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—"ডেকে দাও।"

নরোত্তম প্রবেশ করিয়া একবার পিছনে চাহিল, চম্পা চৌকাঠের কাছে

আচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়াছিল, বলিল—"মা-মণি, তুমি ও-ঘরে যাও একটু"-মাস্টারমশাইয়ের কন্যা হিসাবে ওই ভাবেই ওকে ডাকে সকলে এখানে। টুলুও ঘাড় নাড়িয়া যাইতে বলিলে চম্পা যেন নিরুপায় হইয়া, বেশ খানিকটা ভয় সঙ্গে করিয়াই চলিয়া গেল।

নরোত্তম ফতুয়ার পকেটে হাত দিয়ে একটা কাগজ বাহির করিতে করিতে বলিল—"একটা চিঠি আছে আপনার।"

বুড়ো হইলেও নার্ভ খুব শক্ত, তবু হাতটা একটু একটু কাঁপিতেছে। খাম ছিঁড়িয়া টুলু চিঠিটা পড়িতে লাগিল—

"কল্যাণবরেষু,

ব্রত উদ্‌যাপন করতে এসেছি, সেই পুণ্যক্ষেত্র থেকেই এই চিঠি দিচ্ছি। আমাদের মস্তবড় বিজয়ের দিন, আশা হচ্ছে, একটার পর একটা বিজয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা সত্যই এবার পারব আমাদের ব্রত উদ্‌যাপন করতে। একটা বিজয় পূর্ণ—কংগ্রেসকে আমাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পেরেছি—সেটা রূপ নিয়েছে 'কুইট ইণ্ডিয়া'-য়। সপ্তাক্ষর মহামন্ত্র কংগ্রেস জানে, এ অহিংস মন্ত্র নয়, আবেদন নিবেদন ক'রে তো তস্করকে বলা চলবে না—তুমি এবার নিজের বাড়ি যাও; সে আদেশের পেছনে থাকে শক্তির দৃঢ়তা, উগ্র শাস্তির সম্ভাবনা। এই আমাদের প্রথম জয়; কংগ্রেসকে নবজীবন দিলাম, তাকে কঠিন বাস্তবে সচেতন ক'রে তুললাম।

এর পর আসল অভিযান। ১৮৫৭ হবে নিষ্প্রভ, আমার প্রায়-বার্ধক্যের শীর্ণ শিরার মধ্যেও যে কী আগুনের নাচন, টুলু, তোমায় কি করে বোঝাই? ন'উই আগস্ট!—যে শক্তি এত বিপদের মধ্যে আমায় বাঁচিয়ে এসেছেন তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, আমি ন'উই আগস্ট যেন দেখতে পাই। তুমি জান, প্রার্থনাকে আমি জীবনে আমল দিই নি, আমার বিশ্বাস—যুগযুগান্তরের বহু প্রার্থনার ফলেই তো তিনি আমায় এই আত্মশক্তি দিয়েছেন, এর পরেও আবার প্রার্থনা কেন? তবুও, কেন বুঝতে পারছি না, এই প্রার্থনাটুকু—এই সামান্য আয়ু ভিক্ষা করছে আজ আমার অন্তরাত্মা; জীবনে প্রথম এবং শেষ প্রার্থনা; আশা অত্যুগ্র হ'লে মনকে বোধ হয় দুর্বল করে একটু।

ন'উই আগস্টের পরে কি আছে জানি না, তবে আমি যে নেই—সেইটে ধ'রে নিয়েই এই চিঠি লিখে রাখা আজ; আমি থাকলে তো চিঠির দরকার হ'ত না, সশরীরেই তোমার মুক্তির দিনে তোমায় অভিনন্দিত ক'রে নিয়ে সব কথা বলতাম।

এবার আশ্রমের কথায় আসা যাক। আশ্রমটা তোমায় বিস্মিত করবে, তুমি ফিরবে ন'উই আগস্টের অনেক পরে, এসে শুনবে শুধু মেদিনীপুর কেন, শুধু বাংলা কেন, সারা ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যখন বিক্ষুব্ধ, মরণ তুচ্ছ ক'রে নূতনের জন্যে পথ তোয়ের করতে মেতে উঠেছে—ভেঙে ছিঁড়ে উপড়ে পুড়িয়ে, যারা বাধা হয়ে দাঁড়াল তাদের নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে ফেলবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে, তখন এই আশ্রম ডাইনে বাঁয়ে না চেয়ে শান্ত শিষ্ট হয়ে ঘুরিয়ে গেছে চরখা, বুনে গেছে তাঁত, তোমার মাস্টারমশাইয়ের আশ্রম, শান্তিমন্ত্রের আর তার চেয়ে বড় অবিশ্বাসী তোমার চোখে বোধ হয় পড়ে নি। কারণ আছে, —আজ, অর্থাৎ যে দিন তোমার হাতে এই চিঠিটা পড়বে, সেই দিন তোমায় সেই কারণটা বলতে বাধা থাকবে না। গীতার কথাই বলি—কর্ম জিনিসটা অর্থাৎ যুদ্ধটা সুনিশ্চিত, কেন-না, সেটা আমাদের হাতে, কিন্তু বিজয় তো সুনিশ্চিত নয়। আগস্ট-সংগ্রামের তোড়জোড় ভালো, কিন্তু যা লক্ষ্য ক'রে সে সংগ্রাম তা পূর্ণরূপে তো নাও পেতে পারি। তখন দরকার পড়বে এর চেয়েও একটা বড় কিছু, শান্তি-আশ্রম রইল তার জন্যে। যে সিংহটাকে সবচেয়ে বড়ো লাফ দিতে হবে, তাকে আগে থাবা গুটিয়ে, ঘাড়-মুখ গুঁজে শান্তশিষ্টটি হয়ে মাটি কামড়ে বসতে হয়, এই পশ্চারটার মধ্যে থাকে ভাঁওতা—শিকারের চোখে ধূলো দেওয়া, সেই সঙ্গে শক্তি সঞ্চয়। শান্তি-আশ্রম এই থাবা-গুটিয়ে-বসা সিংহ।

যদি সম্পূর্ণভাবে সফল আমরা নাও হতে পারি তো এটা ঠিক যে আগস্ট আমাদের কাজ অনেক এগিয়ে দেবেই, শত্রু সাময়িকভাবে জয়ী হ'লেও আহত হবে খুব বেশি, যাতে সে প্রায় অকর্মণ্য হয়ে পড়বে। এই সময় তাকে বেশ টাটকা-টাটকি চরম আঘাত দেওয়ার জন্যে খানিকটা শক্তি বাঁচিয়ে রাখা দরকার, শান্তি-আশ্রম সেই অনাদৃত শক্তি। যুদ্ধের নিয়মই এই। তোমায়

বলি, অনেক জায়গাতেই আমরা এইরকম নিরীহ আশ্রম রেখেছি গ'ড়ে, ওরা স্তম্ভিত হবে, এত বিক্ষোভের মধ্যেও এত শান্ত রূপ দেখে ওদের চোখ যাবে জুড়িয়ে, তারপর একদিন হঠাৎ আরও ঢের বেশি হবে স্তম্ভিত আসল রূপটা দেখে,—তখন কিন্তু আর ওদের উপায় থাকবে না।

তোমায় সেই দিনটার ভার দিয়ে যাচ্ছি। এতেও তুমি আশ্চর্য হবে, তোমায় একদিন সেবা নিয়ে থাকতে বলেছিলাম। আট বছর আগের শেষ সাক্ষাতে শেষ কথা তোমায় এই বলেছিলাম যে, তোমার মনের গঠনটা বিদ্রোহের নয়; পিস্তলটা তোমার হাতে তুলে দিতে হাত কেঁপেছিল আমার, আজ সেই আমি তোমায় এতবড় ভারটা দিচ্ছি কি ক'রে, কোন্ সাহসে আর কোন্ বিশ্বাসে? এ চিঠিটাও বা তুমি দেরি ক'রে পেলে কেন? এই সবের রহস্য তুমি নরোত্তমকে প্রশ্ন ক'রে জানতে পাবে। হ্যাঁ, প্রসঙ্গক্রমে ব'লে রাখি—নরোত্তম নিজেই একটা মস্তবড় রহস্য, টের পাবে তুমি।

পিস্তলটা নিশ্চয় নেই, আমার রাইফেলটা দিয়ে গেলাম—অর্থাৎ দীক্ষা অটুট রইল, বরং তার গতি হ'ল আরও দীর্ঘ।"

চিঠিটা এই পর্যন্ত তিনখানি পাতা লইয়াছে, কালো কালিতে বেশ ধরিয়া গুছাইয়া লেখা; পাতা উল্টাইতেই কিন্তু টুলুর ভ্রূ দুইটি হঠাৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, —নিতান্ত অবিন্যস্ত, গোটা গোটা আঁকাবাঁকা অক্ষরে আর মাত্র পঙ্‌ক্তি দুয়েক লেখা, তারপরেই মাস্টারমশাইয়ের দস্তখৎ—সবটা লাল কালিতে—কালির ছোপছাপ কাগজের আরও কয়েক জায়গায় লাগিয়া আছে। একটু বাধিয়া গিয়া পড়িল—"আমি চললাম। এটুকু একেবারে পীঠস্থান থেকে লিখছি। এই তোমার রক্তদীক্ষা রইল। আশীর্বাদ। মাস্টারমশাই।"

চিঠি শেষ করিয়া টুলু অবোধ দৃষ্টিতে নরোত্তমের মুখের পানে চাহিয়া রহিল, জিভ যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত, কোন কথা বাহির হইতেছে না মুখে। নরোত্তমই আগে কথা কহিল—"কিছু জিগ্যেস করবেন?"

"জিগ্যেস?...অ্যাঁ! হ্যাঁ, অনেক কথাই...শেষের এই কথা কটা..."

"রক্ত দিয়েই লেখা, তাঁর নিজের রক্ত, বাঁ পাশের নিচে দিয়ে গুলি বেরিয়ে

গেছল।...একটা পাতলা কাঠি কুড়িয়ে সেই রক্তে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে শেষ অবস্থায় লিখে যান ; চিঠিটা তাঁর পকেটেই থাকত। তারপরেই যান মারা।"

"এতদিন চিঠিটা আমায় দাও নি কেন ?"

"হুকুম ছিল আগে বুঝতে আপনার মনের ভাবটা—জেল থেকে এলে।"

"তাই এ রকম ভাবে আমায় পরীক্ষা করছিলে এতদিন ধ'রে ?"

নরোত্তম চুপ করিয়া রহিল।

"যদি দেখতে এই শান্তির মধ্যেই কাজ করতে ভালো লাগছে আমার, হাঙ্গাম চাই এড়াতে ?"

নরোত্তম এবারেও চুপ করিয়াই রহিল, মুখে খুব অল্প যেন একটু হাসি ফুটিল। টুলুর প্রশ্নটার পুনরুক্তিতে বলিল—"এর উত্তরটা আপনার ভাল লাগবে না।

তবু বলো, শুনি।"

"তা হ'লে আপনাকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে হ'ত—কোনও রকম ছুতো ক'রে।"

"তার মানে, তাড়িয়ে দিতে ?"

"তাই-ই।"

"মাস্টারমশাইয়ের স্পষ্ট হুকুম ছিল ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

এবার টুলু করিল চুপ ; ধীরে ধীরে চক্ষে কি একটা অপূর্ব দীপ্তি উঠিল ফুটিয়া ; রক্ত পঙ্‌ক্তি দুইটা নিজের ললাটে চাপিয়া বসিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর যেন জাগিয়া উঠিয়া বলিল—"ও! নরোত্তম ?...বেশ, তুমি যাও এখন, রাত হয়েছে।...হ্যাঁ, একটা কথা, আর কেউ জানে না এই চিঠির কথা, না ?"

"না।"

"চম্পাও না ?"

"না, মা-মণি শুধু মারা যাওয়ার কথাটাই জানে।"

"চম্পাকে বলা চলবে ?"

"আজ থেকে একেবারে আপনার আশ্রম। যেমন ভাল বুঝবেন।"

টুলু একটু নত-দৃষ্টি থাকিয়া বলিল—"বেশ, চম্পাকে ডেকে দিয়ে যাও।

॥ ছয় ॥

চিঠিটা শুনিয়া চম্পা মুখের পানে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

একটু পরে টুলু প্রশ্ন করিল—"কিছু বলছ না যে চম্পা?"

চম্পা হাসি দিয়া মনের কোন একটা অন্য অনুভূতিকে চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"নতুন কি আর বলব?"

"নতুন কিছু নেই চিঠিটায়?"

"আছে অনেকখানি, কিন্তু আমার বলবার মতন নতুন কি আছে?"

"তা হ'লে আরও স্পষ্ট ক'রে জিগ্যেস করতে হ'ল আমায়—এই নতুন অবস্থার মধ্যে, মানে, আমায় মাস্টারমশাই যে নতুন কাজ দিয়ে গেলেন, তার মধ্যে তোমার আর থাকা চলবে?...তাই তোমায় ডেকে পাঠালাম এখনই।"

"আমার আলাদা জায়গা আর কি আছে?···কি রেখেছি?"

"সে আলাদা কথা, আলাদা জায়গায় তোমার ব্যবস্থা স্বচ্ছন্দেই করে দিতে পারা যায়। তা ভিন্ন তুমি আর একলা নও, হীরক রয়েছে—এই বিপদের মধ্যে ঐ শিশুকে ধ'রে রাখা···"

যেন জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে—এই ধরনের একটা তর্কে হারিয়া গিয়া চম্পা ব্যাকুলভাবে মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ওর মুখটা একটু দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল—"ওকে তো বরং সরিয়ে রাখা যায়—শুধু ওকে···আর দিন কতক পরে তো করতেই হ'ত ব্যবস্থা—ওর পড়াশোনার জন্যে···"

সাফল্যের উত্তেজনায় স্বরটা একটু কাঁপিয়া গেল শেষের দিকে। টুলু প্রশ্ন করিল—"তটিনীর কথা ভাবছ?"

"হ্যাঁ। ভগবানই জুটিয়ে দিয়েছেন—ঠিক সময়টিতে। ভালো জায়গায় থাকে—নিজে শিক্ষিতা—আর অমন চমৎকার মানুষ—তায় নির্ঝঞ্ঝাট, তার ওপরে আবার দেখুন···"

বিশেষণ একত্র করিতে যেন মাতিয়া উঠিয়াছে, টুলু চোখ তুলিয়া একটু

হাসিতে অপ্রতিভভাবে চুপ করিয়া গেল, সপ্রতিভ ভাবটা বজায় রাখিবার জন্য বলিল—"মিছে বলছি? বলুন?"

টুলু বলিল—"একটাও মিছে নয়। কিন্তু তবুও তো আসল সমস্যাটা মেটে না। কথা হচ্ছে তুমি থাকবে কি ক'রে এই বিপদের মধ্যে? বুঝলাম হীরকের ব্যবস্থা হতে পারে আলাদা, তটিনীর কাছে, না হয় অন্যত্রও হ'ত।"

চম্পার মুখটা হঠাৎ দীন ভিখারিণীর মতোই আতুর হইয়া উঠিল, এমন অসহায় যেন জীবনে কখনও বোধ করে নাই নিজেকে, বলিল—"আমায় আর ঝেড়ে ফেলে দেবেন না পা থেকে।"

টুলুর মুখটাও ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল; অনেক রকমেই দেখিল চম্পাকে, বোঝে তো খানিকটা। তাহার পর আস্তে আস্তে তাহার মুখটা কঠিন হইয়া উঠিল,—রূঢ় নয়; একটা ফাঁসির হুকুম দিবার সময় বিচারকের মুখ যেমন হইয়া ওঠে—দরদ অথচ এদিকে কর্তব্য। চিঠিটা চম্পার দৃষ্টির নিচে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"চম্পা, চিঠিটা শুধু পড়বার নয়, দেখবারও, এই শেষের লাইন কটা মাস্টারমশাইয়ের বুকের রক্ত দিয়ে লেখা—আমার ভাষার চটক নয় এ, সত্যিই রক্ত—এই দেখো—কি ক'রে থাকবে তুমি এর মধ্যে?—কতদুর পর্যন্ত যে কি হতে পারে..."

কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া চম্পার দৃষ্টি রক্তমসী অক্ষরগুলার উপর নিষ্পলক ভাবে নিবদ্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর নিতান্তই নিরুপায়ভাবে টুলুর মুখের উপর চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল—"তা হ'লে?"

টুলু কোন উত্তর দিবার পুর্বেই কিন্তু তাহার মুখটা আবার হঠাৎ দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল—"হয়েছে। মাস্টারমশাই আমাকেও তো এই কাজ দিয়ে গেছেন..."

"কি ক'রে?"

"বাঃ, তা না হ'লে আমায় এখানে নিয়ে এলেন কেন? তিনি তো নিজের অভিসন্ধি সবই জানতেন। অল্পদিন নয়—আট মাস ছিলাম সঙ্গে।"

টুলু এবারে চুপ করিয়া রহিল। চিন্তায় আবর্ত উঠিয়াছে, ওর মনটাকে নিজের যুক্তির দিকেই চালিত করিবার জন্য চম্পা বলিয়া চলিল—"ঠিক আপনি মিলিয়ে দেখুন—না হ'লে কেন নিয়ে আসবেন এখানে আমায়? আমায় সরিয়ে

রাখবার তো অনেক জায়গা ছিল—চারিদিকে তাঁর গতিবিধি, চারিদিকে তাঁর প্রভাব খাতির…”

নজির দেখাইয়া চলিয়াছে। আবার গলার স্বর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। টুলু একসময় গভীর অন্যমনস্কতা থেকে জাগিয়া উঠিয়া বলিল—“তুমি ভেবে বলছ না চম্পা, দেখছ—এ একেবারে রক্ত দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার, তুমি মেয়েছেলে হয়ে…”

“মেয়েছেলে হয়ে রক্ত নেওয়াই না হয় বারণ, দিতে কি বাধা?”

উত্তরটায় থতমত খাইয়া গেল টুলু, খানিকক্ষণ চম্পার মুখ হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না; তারপর ধীরে ধীরে বলিল—“আচ্ছা, এখন তুমি যাও, পরে ভেবে দেখব—দুজনে মিলেই।”

সন্ধ্যার সময় অল্প মেঘের সূত্রপাত হয়। কাজের মধ্যে চম্পা আর আকাশের দিকে লক্ষ্য করে নাই। টুলুর ঘর থেকে উঠানে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা মন্থর গুরু-গুরুধ্বনি আকাশের গা বাহিয়া দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে গড়াইয়া গেল। চম্পা চোখ তুলিয়া দেখিল, সমস্ত আকাশটাই পুরু মেঘে ছাইয়া গেছে। একটা দমকা হাওয়া উঠিয়া গাছপালাগুলায় একটা আর্তমর্মর উচ্চকিত করিয়া ঘরের দুয়ার-জানালাগুলাতে কড়া ঝাঁকানি দিয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

পা চালাইয়া গিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই হীরক বলিয়া উঠিল—“মা, ভয় করছে।”

জাগিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে।

“এই যে আমি রয়েছি বাবা, ভয় কি?”

জানালাগুলা বন্ধ করিয়া, দুয়ার দিয়া, একেবারে বিছানায় গিয়া উঠিল। একটি সূচীশিল্প লইয়া বসিয়া ছিল বলিয়া আহার করে নাই এখনও, ভাতটা যেমন ঢাকা তেমনি ঢাকাই রহিল।

বয়স হিসাবে সাহসী ছেলে হীরক, কিন্তু মা কাছে থাকিলে ভয়ের কিছুর সামনে বড় দুর্বল হইয়া পড়ে, কোলের মধ্যে গুটাইয়া-সুটাইয়া চম্পাকে অধিকার করিয়া থাকিল একেবারে। খানিকক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িল।

আবার থাকিয়া থাকিয়া ঐরকম গোটাকতক দমকা হাওয়া উঠিল, তাহার পর আওয়াজটা হইয়া উঠিল একটানা; প্রথমে মন্থর, ক্রমেই ধীরে ধীরে বাড়িয়া চলিল। এক সময়ে বৃষ্টি নামিল; একটা রীতিমতো দুর্যোগ আরম্ভ হইয়া গেল।

সমস্ত রাত চম্পার চোখে এক রতি ঘুম নাই। বাহিরের দুর্যোগ হয়তো এক-একবার স্তিমিত হইয়াছে; কিন্তু তাহার অন্তরের দুর্যোগের এতটুকুর জন্য বিরাম নাই। অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা কাটাইয়া মনে হইয়াছিল যেন সাগরদহে শেষ পর্যন্ত বাঁধা গেল একটু নীড়; তা আজকের রাতে শত সহস্র নীড়ের মতই আবার সেটুকু ছিন্নভিন্ন হইতে চলিল। কোন্ দিকটা বাঁচায় সে? টুলুকে রাখিতে হইলে হীরককে ছাড়িতে হয়। আট বৎসর আগে গঞ্জডিহিতে এই রকম সমস্যার সম্মুখীন হইলে পথ বাছিয়া নেওয়া সহজ ছিল চম্পার, হীরকের মায়া টুলু থেকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিত না তাহাকে; কিন্তু আজ আর তত সহজ নয়। এই আট বৎসরের প্রতি মুহূর্তে নিজের বুকের উত্তাপ দিয়া মানুষ করিয়াছে মায়ের মত করিয়া—সম্ভব হয়তো মায়ের চেয়েও বেশি করিয়া—আজ তাহার সঙ্গে বিচ্ছেদের কথায় মায়ের মতই বত্রিশ নাড়িতে টান ধরে।...চম্পা সুপ্ত হীরককে বুকে চাপিয়া চাপিয়া ধরে, নিজের মনেই বিড়-বিড় করিয়া বলিয়া ওঠে—"কি ক'রে বললাম তোকে আলাদা ক'রে দেব? কি ক'রে পারলাম বলতে? অত প্রশংসার কথা কোথা থেকে এসে জুটল আমার পোড়া ঠোঁটে?...মা নয় রে হীরা, ডাইনি—সম্ভব হ'ল কি করে? যদি দেনই তোকে আলাদা ক'রে..."

এর পাশাপাশি মনে হয় টুলুর কথা, এক-এক সময় হীরকের চিন্তার সঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া,—টুলু নাই, টুলু বিপদের মধ্যে অথচ চম্পা নাই পাশে—সে আবার কি অদ্ভুত, কি অসম্ভব, অচিন্ত্যনীয় একটা অবস্থা! যে শূন্যতাটা জাগে মনে, পৃথিবীর কোন কিছু দিয়াই তো সেটাকে ভরাট করিয়া দিতে পারে না চম্পা; ওই হীরাকেই—টুলুর সন্তানকেই বুকের মধ্যে চাপিয়া দারুণ আতঙ্কে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। চিন্তাটাকে পরিণামের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে সাহস হয় না।

বাহিরে অতন্দ্র রজনীর প্রহরগুলাকে দীর্ঘায়িত করিয়া পঞ্চভূতের রণতাণ্ডব চলিয়াছে ওদিকে, অভিশপ্ত পৃথিবীকে মুছিয়া ফেলিবে নাকি?

ভোরের দিকে বাতাসটা নরম হইল, বৃষ্টিরও বেগটা কমিল; ক্লান্তির মধ্যে এই বিরামটুকুতে চম্পা কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, জাগিল একেবারে প্রলয়ের পূর্ণ রূপের মধ্যে। মাথার উপর চালের অর্ধেকটা নাই, তাহার জায়গায় একটা জামের ডাল ছেঁচা বেড়ার দেয়াল চাপিয়া ঘরের অর্ধেকটা পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে; ঝড়ের তোড়ে তোড়ে ক্রমেই আরও নামিতেছে—এই বুঝি পিষিয়া মারিল! এই সঙ্গে গর্জন—ঝড়, ডাল ভাঙিয়া পড়িতেছে, মানুষের আর্তনাদ···একটু বিমূঢ় ভাবে বসিয়া থাকিয়াই চম্পার রাত্রির কথা মনে পড়িয়া গেল—একটা দুর্যোগ উঠিয়াছিল। প্রথমেই খেয়াল হইল—হীরক নাই কোলের কাছে। ঘরটা দুলিতেছে, চম্পা আলুথালু বেশে এক রকম লাফাইয়াই দুয়ারের কাছে আসিতেই দেখে উঠানের ও-প্রান্ত থেকে টুলু, নরোত্তম, আরও তিন-চার জন ছুটিয়া আসিতেছে—ঝড়ের গর্জনের উপর আওয়াজ তুলিবার চেষ্টা করিতেছে—"বেরিয়ে এসো, শীগগির বেরিয়ে এসো ঘর ছেড়ে—বাড়ি ছেড়ে স্কুলে..." নরোত্তম একটা হুকুমের টোনে সঙ্গীদের বলিয়া উঠিল—"তোমরা বাইরে যাও—মানা করছি তখন থেকে।..."সঙ্গে সঙ্গে টুলুকে বাঁ হাতের একটা সাপটে পিছন দিকে ঠেলিয়া কয়েকটা লাফে উঠান পার হইয়া চম্পার ডান হাতটা বজ্র আঁটুনিতে ধরিয়া ফেলিল এবং মত্ত শক্তিতে তাহাকে বিরুদ্ধ ঝড়ের প্রচণ্ড চাপের মধ্য দিয়া টানিতে টানিতে একেবারে আপিস-ঘরে আনিয়া তুলিল। টুলু, আর বাকি সবাইও জড়াজড়ি করিয়া সবার শক্তি একত্র করিয়া কোনরকমে আসিয়া জড়ো হইল। চম্পার প্রথম কথা হইল—"হীরা—হীরা কোথায়—আমার কোলের কাছে ছিল যে···" আসিতে আসিতেও এই প্রশ্ন মুখে লাগিয়া ছিল, যেন পাগলের মত হইয়া গেছে। হীরক অভ্যাসমত সকালে উঠিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল, ঝড়ের তখন বিরতি; দরজার পাশেই এক জায়গায় হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ভিড়ের মধ্য দিয়া আসিয়া চম্পাকে জড়াইয়া ধরিল।

সমস্ত তল্লাটটায় এই একটি মাত্র কোঠাঘর, আর এই একটি মাত্রই ঘর যাহা দাঁড়াইয়া আছে এখনও। লোক একেবারে চাপ বাঁধিয়া উঠিয়াছে; আরও আসিতেছে, পড়িয়া উঠিয়া গড়াইয়া; জায়গা না পাইয়া দেয়ালের আড়ালে আশ্রয় লইতেছে, ঝড়-বৃষ্টির ঝঙ্কার ছাড়াইয়া উঠিতেছে সবার আর্ত কোলাহল।

ঘরটার সংলগ্ন আশ্রমের টানা চালাটা হুমড়াইয়া ভূমিসাৎ করিয়া দিয়াছে, ঝড়ের একটা তোড়ে চালার একটা কোণ মুচড়াইয়া ছিঁড়িয়া যেন লুফিতে লুফিতে দূরে নদীর ঢালুতে আছড়াইয়া ফেলিল। বড় ডালপালা লইয়াও এই রকম লোফা-লুফির খেলা—একটার ঘাড়ে একটা আসিয়া পড়িতেছে, গাছগুলা পড়িতেছে উপড়াইয়া, উৎকট নিনাদ, তীরলগ্ন একটা পুরানো অশ্বথ উত্তাল নদীগর্ভে একেবারে যেন ডিগবাজি খাইয়া বসিল, শিকড়গুলা শূন্যে উঠিল লাফাইয়া, সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র বৃষ্টির ছাটে ধুইয়া গিয়া যেন কাহার বিকশিত-দন্ত অট্টহাসের মত নদীগর্ভে রহিল জাগিয়া, কয়েকটাই গরু ছাগল হাওয়ার মুখে ছুটিতে ছুটিতে চোখের সামনে চাপা পড়িল।···দক্ষিণ থেকে উত্তরে একটানা একটা ধ্বংসের স্রোত ; দেখিতে দেখিতে সমস্ত জায়গাটা পরিষ্কার হইয়া গিয়া সেই মসীকৃষ্ণ আকাশের নিচেও একটা আলো ফুটিয়া উঠিল—স্নিগ্ধ শ্যামলিমার জায়গায় একটা রুগ্ন নীলাভ বিকৃত আলো। এমনই একটা অভিনব ব্যাপার যে এক সময় সবাই আর্তনাদ ভুলিয়া, পরিণাম ভুলিয়া, স্তব্ধভাবে শুধু সামনে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, প্রেক্ষাগৃহের মধ্য হইতে মুগ্ধচেতন হইয়া যেন একটা বিরাট ধ্বংস অভিনয় নিরীক্ষণ করিতেছে, ভীষণতার সামনে আর সব চেতনাই যেন নিষ্ক্রিয় হইয়া গেছে।

বিকাল পর্যন্ত প্রায় একই ভাবে থাকিয়া ঝঞ্ঝার বেগ ধীরে ধীরে শমিত হইয়া আসিল। ঘর ছাড়িয়া সকলে নামিয়া আসিল, হিসাবের পালা আরম্ভ হইল, সেই সঙ্গে আর্তনাদটা আবার ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিল,—কাছে দূরে—আরও দূরে—অন্য একটা ঝড়, সবহারাদের কণ্ঠ চিরিয়া শান্ত আকাশ আবার মথিত করিয়া তুলিতেছে।

॥ সাত ॥

বাংলার যত দুর্বিপাক, যত সমস্যা এক এক করিয়া মেদিনীপুরে জমা হইতেছিল। যুদ্ধের সময় ধীরে ধীরে জেলাটা দেশী বিলাতী সৈনিকে যাইতেছে ভরিয়া, গ্রাম উজাড় করিয়া ছাউনি পড়িতেছে, হাজার হাজার বিঘা শস্যক্ষেত্র সমতল করিয়া তৈয়ার হইতেছে বিমানঘাঁটি, পাকাপোক্ত, আবার এমনি শুধু ল্যাণ্ডিং। জাপান যুদ্ধে নামিল, জাপান-ভীতির পর জেলার দক্ষিণ-উপকূলটা প্রায় আগাগোড়াই একটানা একটা সামরিক বন্ধনীতে পরিণত হইল। ফলনের দিক দিয়া দুর্বৎসর চলিয়াছে; এমনই উনিশশ' একচল্লিশ একটা ঘাটতি বছর হইয়া পড়িবে বলিয়া আশঙ্কা ছিল। তাহার উপর সমর-রাক্ষস, যেটুকু হইল সেটুকুও ধীরে ধীরে নিজের উদরসাৎ করিয়া ফেলিতে লাগিল। সমস্ত জেলার উপর দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া আসিয়া পড়িল। সৈনিকদের উদরের চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর তাহাদের আবদার, ছোট বড় অত্যাচারে গৃহস্থেরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। মেদিনীপুরের গৃহস্থের বৈশিষ্ট্য আছে, একটা ট্র্যাডিশন্—অতিষ্ঠ হইলে, তাহারাও অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। ছোটছোট সংঘর্ষ বাধিতে লাগিল। এর পর আসিল গবর্নমেণ্টের ডিনায়েল পলিসি বা বঞ্চন-নীতি, কুখ্যাত স্কর্চড আর্থ বা পোড়া-মাটি নীতির সহোদর। জাপানীরা নামিলে যাহাতে যানবাহন বা রসদ-সংগ্রহের সুযোগ না পায়, সেইজন্য দক্ষিণ-মেদিনীপুরের যত নৌকা, মোটর, এমন কি সাইকেল পর্যন্ত ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট রেখার উত্তরে—পঞ্চাশ ষাট মাইল দূরে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ জারি হইল। নৌকা, মোটর বাস, সব-কিছুরই জন্য এক হুকুম—এই সমদর্শিতার মধ্যে বেশ একটা রসিকতা ছিল, মোটরের সঙ্গে নৌকার পাল্লা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং অধিকাংশ নৌকাই ভাঙিয়া বা জ্বালাইয়া দিয়া মুশকিল-আসান করা হইল।···ন্যূনাধিক ছয় শত বৎসর পূর্বে দিল্লীর সম্রাট মুহম্মদ তোগলক এই রকম কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দিল্লীর অধিবাসীদের নাকি দেবগিরিতে গিয়া আস্তানা গাড়িতে বলে। শোনা

যায়, একটি অন্ধ আর একটি চলচ্ছক্তিহীন বৃদ্ধ আদেশ পালনে অসমর্থ হওয়ায় তাহাদের পায়ে দড়ি বাঁধিয়া যথাস্থানে পৌছাইয়া দেওয়া হয়।···ছয় শত বৎসরের ব্যবধানে এই দুইটি রাজকীয় ফারমানের মধ্যে চমৎকার একটি সাদৃশ্য নাই কি ?··· মুহম্মদের ফারমান লইয়া ইংরাজ ঐতিহাসিক আজও বিদ্রূপে মাতিয়া ওঠে!

বঞ্চন-নীতিতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শত সহস্রের রুজি নষ্ট হইল। অশান্তি বাড়িল।

পাশে পাশে চলিল চাল রপ্তানি। লোকেরা আপত্তি করিল, প্রথমে কল-ওয়ালাদের নিকট, আড়ৎদারদের নিকট, তাহার পর জেলার মালিক পর্যন্ত। কোনও ফল হইল না। শত্রুনিরোধ করিবার নামে চারিদিকেই মৃত্যুর রাজপথ গড়িয়া ওঠে দেখিয়া জনতা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। আপত্তি বিরোধিতায় এবং বিরোধিতা রীতিমত সংঘর্ষে গিয়া দাঁড়াইল—কলের মালিক আর আড়ৎদারদের সঙ্গে। গবর্নমেণ্ট ইহাদের পক্ষ লইয়া দাঁড়াইল। মেদিনীপুরে জনতার উপরে গুলি চলিল। দেশের ছেলের রক্তে মেদিনীপুরের মাটি রঞ্জিত হইল। রক্তের বিনিময়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিতিল জনতাই; কলওয়ালারা মোটা জরিমানা দিয়া রেহাই পাইল। ব্যাপারটা হয়তো এমন বিরাট কিছু নয়; তবে গুরুত্বপূর্ণ,— একটা শক্তি পরীক্ষা হইয়া গেল।

এসব মেদিনীপুরের স্থানীয় ব্যাপার; স্থানীয় সমস্যা লইয়া এর পাশে পাশে চলিতেছিল একটা বিরাটতর আলোড়ন—সর্বভারতীয় বিক্ষোভ—'কুইট ইণ্ডিয়া' মন্ত্রকে সফল করিতে হইবে। দক্ষিণ-মেদিনীপুরের উপর অসম্ভব রকম সামরিক চাপ; সেইজন্য একতালে উঠিতে পারে নাই। আগস্টটা এক রকম বাদ গেছে বলিলেই চলে, অন্তত তাহাতে মেদিনীপুরের নিজস্ব শিলমোহর ছিল না। পরে মেদিনীপুরের রক্ত দিয়া কেনা বিজয়টা সবার মধ্যে একটা আত্মচেতনা জাগাইয়া দিল, গণশক্তি দিন দিনই দুর্বার হইয়া উঠিতে লাগিল। নব্য-ভারতের প্রথম শহিদ ক্ষুদিরামের জন্মভূমি আবার নিজের ইতিহাস নূতন করিয়া গড়িবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। উনত্রিশে সেপ্টেম্বর বিভিন্ন স্থানে জনতা একজোট হইয়া থানা, রেজেস্টারি অফিস, ডাকঘর, ইউনিয়ন-বোর্ড অফিস, প্রভৃতি যেখানেই গবর্নমেণ্টের কেন্দ্র বা গবর্নমেণ্টের সংস্রব সমস্ত আক্রমণ

করিল; রাস্তা কাটিয়া, পুল ভাঙিয়া সাহায্যের সম্ভাবনা নষ্ট করিল, টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের তার ছিঁড়িয়া তছনছ করিয়া দিল। সংঘর্ষের কেন্দ্র তমলুকে যাহা হইল তাহাতে সুপরিচালিত সমরের নিচে কোন আখ্যা দেওয়া যায় না। শুধু পুরুষ নয়, স্ত্রীলোকও ছিল পাশে। অনেকে মরিল, জখম হইল আরও অনেকে; সত্তর বৎসরের নারী বিদ্রোহিনী দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়বদ্ধ জাতীয়-পতাকা ধারণ করিয়া সরকারী সৈনিকের গুলিতে প্রাণ দিল।

দমননীতি আরম্ভ হইল; নির্মম, অমোঘ, অব্যর্থ; দোষী-নির্দোষীতে জেল উঠিল ভরিয়া, মামুলি জেলে কুলাইল না, ক্যাম্প জেলে সমস্ত এলাকাটা গেল ছাইয়া, দেশী বিলাতী সৈন্য গিয়া গ্রামে হানা দিল, অগ্নিকাণ্ড, লুঠ, নারীধর্ষণ—চারিদিকে শয়তানের উৎসব পড়িয়া গেল।

এর গায়ে গায়েই আসিল ১৬ই অক্টোবরের ঝড়। বাংলার ঝড়ের নাম আছে; কিন্তু এ ঝড় যেন আগের আর সব ঝড়কেই কানা করিয়া দিল। সমুদ্র ছুটিয়া ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিয়া বাঁধ ভাঙিয়া জনপদে ঢুকিয়া পড়িল—হাজারে হাজারে মানুষ মরিল, হাজারে হাজারে পশু; ঘরবাড়ি কুটুরি মরাই তৃণখণ্ডের মত গেল ভাসিয়া, লোনা জলে দীঘি পুকুর খাল বিল বিষাইয়া উঠিল।··· উত্তরে সাগরদহে এই সর্বনাশা ঝড়ের একটা ঝাপটা মাত্র আসিয়া লাগে।

শয়তানে শয়তানে মিতালি চিরদিনই আছে। কর্তৃপক্ষ সতেরো দিন এত বড় দুঃসংবাদটা চাপিয়া রাখিল, আর্তত্রাণের কোন ব্যবস্থাই করিল না, জেলার মালিক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিয়া পাঠাইল, মূর্খেরা অবাধ্যতার জন্য ভগবানের সাজা পাইয়াছে, সাহায্যের তো কথাই ওঠে না, কেহ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সাহায্য করিতে আসিলেও তাহাকে বাধা দেওয়া দরকার। তাহাই করা হইল, রিলিফ পার্টিদের প্রবেশ করিতেই দেওয়া হইল না, যাহারা এদিক ওদিক দিয়া প্রবেশ করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাদের চাল ডাল কাপড় প্রভৃতি সাহায্য-উপকরণ বাজেয়াপ্ত করিয়া ভাগাইয়া দেওয়া হইল।

শয়তানে শয়তানে এত নিবিড় মিতালীর কাহিনী আর কোন দেশের ইতিহাসে আছে বলিয়া জানা যায় না।

মাস্টারমশাইয়ের রক্ত-বিদ্রোহ, চম্পা-হীরককে নিরাপদ দূরত্বে পাঠাইয়া দেওয়া—সব রহিল চাপা। শিক্ষা, সংস্কার, এমন কি স্বাধীনতা পর্যন্ত—মাস্টার মশাই যাহার জন্য প্রাণ দিলেন—প্রত্যক্ষ মৃত্যুর সামনে, ধ্বংসের এই নগ্নমূর্তির সামনে, সবই যেন অত্যন্ত লঘু হইয়া গেল। এক মুঠা করিয়া অন্ন দিতে হইবে সবার মুখে, মাথার উপর একটু চালা; কোমরে একটু আবরণ...এত কাজ;—কর্মের বিরাট মূর্তি যেন দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছে; কোন্‌খানে আরম্ভ করিবে? নূতন গড়ার চেয়ে যা সব গেল সেগুলাকে অপসারিত করাই যেন বড় সমস্যা। ভাঙা ঘর ভাঙা ডালপালা, মূল থেকে ওপড়ানো বড় বড় গাছ—মাটিতে যেন একটু পা ফেলিবার উপায় নাই। এ ভিন্ন মানুষ মরিয়াছে, দাহ দরকার। পালিত পশু মরিয়াছে অসংখ্য, ব্যবস্থা দরকার—ত্বরায়, নয়তো মৃত্যুকে আবার আর এক রূপে ডাকিয়া আনিবে।

একটা ক্ষণিক বিমূঢ়তা আসিল, তাহার পরই কিন্তু কাজে নামিয়া গেল সবাই। নূতন রূপ জাগিল নরোত্তমের; নীরব, অতন্দ্রকর্মী, ওর যাদুস্পর্শে যেন ধীরে ধীরে শৃঙ্খলা জাগিয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমে আশ্রমটা ঠিক করিয়া ফেলা হইল। টানা চালার মধ্যে নিরাশ্রয় অনেকেরই জায়গা হইল, টুলু আর অন্যান্য আশ্রমকর্মীদের বাসাগুলাও তাড়াতাড়ি তুলিয়া আরও অনেকের জায়গার সঙ্কুলান করা হইল। ওদিকে গ্রামের কাজও হইতে লাগিল, বিশেষ করিয়া আশ্রমের এলাকায় যেগুলা যেগুলা পড়ে। টুলু একটা জিনিস দেখিয়া বিস্মিত হইল—এদের একজোট হইয়া কাজ করার ক্ষমতা। চেঁচামেচি নাই, দৌড়ধাপ নাই, এতদিন যারা নীরবে চরখা ঘুরাইয়া আসিয়াছে, তাঁত বুনিয়াছে, লোহা কাঠের উপর হাতুড়ি বাটালি চালাইয়াছে, তাহারা তেমনি নীরবে মৃতের সংকার করিল, মৃত পশুগুলির ব্যবস্থা করিল—জায়গা পরিষ্কার করিয়া সরঞ্জাম গুছাইয়া ঘর তুলিতে লাগিল।

টুলুও থাকে কাজের মধ্যেই, আর সবার মতই অতন্দ্র বিরামহীন, কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া যায়। যেন 'ভিজন্' দেখে—মনে হয়, যেন মাস্টার-মশাইয়েরই অমূর্ত রূপ সবার মধ্যে গেছে ছড়াইয়া—সেই ঋজুগতি, পেশীর মধ্যে সেই কর্মনিষ্ঠা, চোখে সেই শান্ত দীপ্তি, সেই শীর্ণ ব্রাহ্মণ, সেই বিদ্যুৎশিখা কি

করিয়া যেন সবার অণুতে অণুতে অনুবিষ্ট হইয়া গেছে। তাঁহার চিঠির কথা মনে পড়ে—শেষের চিঠিটার, এই নিরীহ আশ্রমের চতুঃসীমার মধ্যে, এই বিরাট শান্তির মধ্যে তিনি যে কী শক্তি নিহিত করিয়া গেছেন, কী মন্ত্রে, ভাবিয়া যেন কূল পায় না টুলু। আশায় উন্মাদনায় ওর মনটা যেন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

শুধু বর্তমানই নয়, সুদূরভবিষ্যৎ পর্যন্ত সে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া গেছেন মাস্টারমশাই, আগামী যুগের প্রতিনিধি শিশু হীরকের মধ্যে।

ওর মনটা প্রবল একটা নাড়া খাইয়াছে; আশ্চর্য হইবার কিছু নাই তাহাতে, কেন না, ও যাহা দেখিল, জীবনের প্রথম পদক্ষেপেই, অনেক শতায়ুরও সে করাল দৃশ্য দেখিবার দুর্ভাগ্য হয় না। প্রথমটা অভিভূত হইয়াছিল। আর সবার চেয়ে ঢের বেশি করিয়াই, তাহার পর শিশুর সহজ অনুকরণ-প্রবৃত্তিতেই পায়ে পায়ে আগাইয়া কাজে নামিয়া গেল। ওর দর বাড়িয়াছে, ছিন্নবস্ত্র নগ্ন সর্বহারাদের দল। অনেকেই একেবারেই সর্বহারা—হয়তো বাপ গেছে, হয়তো মা গেছে; দু-একজন এমন হয়তো একেবারেই সব মুছিয়া গেছে; হীরা সবাইকে লইয়া কাজে মাতিয়া ওঠে, সাধ্যের অতীত বড় বড় ডালগুলাকে ধরে সবাই দু-হাতে আঁকড়াইয়া, শক্তির প্রয়োগে সবাই পড়ে নুইয়া; ঘাম ঝরে; মুখগুলা রাঙা হইয়া ওঠে; ধীরে ধীরে আগাইয়া চলে; শিশুধর্মেই কাজের সঙ্গে খেলা যায় জড়াইয়া; হীরক সরিয়া দাঁড়াইয়া কোমরে হাত দিয়া কুলি-সর্দারের বুলি আওড়াইতে থাকে—ওদিকে তার প্রতিধ্বনি ওঠে—মারো জোয়ান, হেঁইও!··· বীর পালোয়ান হেঁইও! জোরসে চলো, হেঁইও!···

কেমন একটা ঝোঁক মনের, শক্তির মন্ত্র যেখানেই শুনিয়াছে, ওর কানে আটকাইয়া গিয়াছে—শ্লোগানই হোক বা কুলির ছড়াতেই হোক; এর ওপর মাস্টারমশাইয়ের শেখানো কত গান, কত কবিতা যে আছে তাহার তো ইয়ত্তাই নাই।

নজরে পড়িল নিজের কাজের মধ্যে টুলু অন্যমনস্ক হইয়া যায়;—ছন্দে ছন্দে চিতানো বুকে দোলা দিয়া দিয়া এক-একটা লাইন গাহিয়া যাইতেছে হীরক—ঝাঁপা ঝাঁপা কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো চুলগুলা লাফাইয়া উঠিতেছে, গৌর মুখে

আকাশের আলোর অতিরিক্ত কি একটা আলো—টুলুর মনে হয়, আকাশেরও ওদিকের···টুলু অন্যমনস্ক হইয়া যায়; স্বপ্নালু হইয়া পড়ে—কয়লাখনির হীরার এই টুকরাটুকু বড় রহস্যময় বোধ হয় ওর—কোথায় এর জন্ম, কোথায় এর পালন, কোন্ পুরুষোত্তমের কাছে এক দীক্ষা—বড় আশ্চর্য লাগে—কী ভাগ্যলিপি লইয়া আসিল এ সংসার ?

এক-এক সময় কাজ-কাজ খেলা হঠাৎ তরল লঘুতায় ভাঙিয়া চুরিয়া টুকরা টুকরা হইয়া পড়ে; কেহ হয়তো হাত পিছলাইয়া গেল ছিটকাইয়া পড়িয়া—অমন নিরেট গাম্ভীর্য এক কথাতেই ভাঙিয়া হাসির ফোয়ারা ছুটিল—এর পরে ইচ্ছা করিয়াই সবাই হাত ছাড়িয়া ছিটকাইয়া ছিটকাইয়া পড়িতে লাগিল—হাসির গায়ে হাসির ঢেউ—সেই উচ্ছ্বাসে পাথরের নুড়ির মত সবাই লুটাপুটি খাইয়া পড়িতেছে মাটিতে—যার বস্ত্র আছে, যে অর্ধনগ্ন, যার অন্ন গেছে, যার অন্নই আছে পড়িয়া, যে সব হারাইয়া একেবারে নিঃস্ব—সবাই উন্মত্ত আনন্দে একাকার হইয়া যায়।

একটা দৃশ্য টুলুর মনে হয় চিরদিনের জন্য তাহার মনে গাঁথা হইয়া রহিল। ঝড়ের তৃতীয় দিনের কথা। জ্যোৎস্নার আলোয় সমস্ত রাতই কাজ হয়, একটা চালা তুলিতে তুলিতে হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল, চালাটা হঠাৎ পিছলাইয়া যাওয়ায় ওপরের আড়ার কাঠে যে লোকটা বসিয়া ছিল সে বেকায়দায় পড়িয়া গিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল, নিচের আরও জনকতক কম-বেশি করিয়া বেশ ভালো ভাবেই জখম হইল।

কর্মের একটানা উত্তেজনার মধ্যে একটা বিরতি পড়িল। জন দুয়েক যাহারা খারাপভাবে জখম হইয়াছিল, নরোত্তম তাহাদের লইয়া জেলাবোর্ডের নিকটতম হাসপাতালে চলিয়া গেল। যে লোকটি মারা গেল, তাহাকে লইয়া বেশ একটা বড় দলের সঙ্গে টুলু গেল শ্মশানে।

ঝড়ের ধ্বংসলীলার চেয়ে আজকের এই ঘটনাটুকু ঢের ছোট হইলেও, কে জানে কেন, প্রাণে বড় লাগিয়াছে—সবারই। দাহ করিয়া অবসন্ন মনে ফিরিতেছিল, গ্রামের কতকগুলা বাড়ির আড়াল হইতে হঠাৎ কণ্ঠস্বর কানে আসিল—

"থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে…"

বোধ হয় শতাবধি শিশুর সমবেত কণ্ঠে আকাশটা ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া উঠিল—

"থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে…"

আবার একক কণ্ঠে—

"কেমন ক'রে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে…"

আবার সেই সমবেত মন্ত্র। টুলু আর তার পেছনের দলটা থমকিয়া দাঁড়াইল। আবার হীরক গাহিয়া উঠিল, স্বর আরও উদাত্ত হইয়া উঠিয়াছে—

"দেশ হ'তে সে দেশান্তরে—

ছুটছে ঝড়ে কেমন ক'রে…"

তাহার পর, ঐরকম প্রতিধ্বনির পরে পরে—

"কিসের নেশায় কেমন ক'রে মরতেছে বীর লাখে লাখে—

কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে…"

ঘরের কোণটা ঘুরিয়া সামনে আসিতে নজরে পড়িল, এই রাস্তারই ও প্রান্তে, আর একটা বাঁকের মুখে, উলঙ্গ অর্ধ-উলঙ্গ ধূলি-ধূসর একটা শিশু-ফৌজের আগে আগে হীরা, হাতে তার সেই কংগ্রেস-পতাকা; ছেলেরা বেশ সুবিন্যস্তভাবে ছুটির পিছনে ছুটি করিয়া অনুসরণ করিতেছে।

নিতান্তই খেলা; আশ্রমে কেহ নাই, তাই বেশ বড় করিয়া খেলা সাজাইয়া গ্রামের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে হীরা।…ঝড়, সেই মৃত্যুর মিছিল, তারপর কালিকার সেই ট্র্যাজেডি—এগুলার সঙ্গে হয়তো বা আছে সামান্য কিছু সম্বন্ধ এ খেলার, অবোধ শিশুর মন, কতটুকুই বা তার উপলব্ধি, তবুও টুলু অবসাদ থেকে ধীরে ধীরে জাগিয়া ওঠে, মনে মনে বলে—ভয় কি? অত্যাচারে দুর্বিপাকে সিদ্ধি যদি অনায়ত্ত থাকে আমাদের তো ওরা আছে, এগিয়ে যাবেই, ওদের পরেও চলমান জীবনের পতাকা তুলে ধরবার জন্য আসবে আরও সব, মুষ্টিতে আরও শক্তি; বক্ষে আরও উন্মাদনা নিয়ে—পথ কেটে চল, যতটুকু পার, যতক্ষণ পার—ওদের যাত্রা সুগম ক'রে দাও…

॥ আট ॥

সেই দিন সন্ধ্যার কথা। এ তিন দিন সারারাত মেহনতের পর টুলু ভোরের দিকে ছটাক খানেক ঘুমের ব্যবস্থা করিয়া লইতেছিল। কাল সেটুকুও হয় নাই, আজ সব জিনিসই বিলম্বিত; এই সবে আহার সারিয়া উঠিয়াছে। চোখের পাতা দুইটা পাহাড়ের মত ভারী হইয়া উঠিয়াছে। নিতান্ত অবশ হইয়াই একবার একটু গড়াইয়া লইবার জন্য ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, চম্পা বাহির হইতে ত্রস্তভাবে উঠানে প্রবেশ করিয়া বলিল—"দেখুন এসে, এ কি কাণ্ড!—কখনও দেখি নি!"

বিস্ময়ে চোখ দুইটা যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। টুলু প্রশ্ন করিল—"কি?"

"দেখুন না বেরিয়ে, বললে বিশ্বাস করতে পারবেন না।"

ক্লান্তি আর বিরক্তিতে টুলুর মুখটা একটু কুঞ্চিতই হইল, চম্পা ততক্ষণে আবার দরজার কাছে চলিয়া গেছে, বাহিরের দিকে চাহিয়া আরও শিহরিয়া বলিয়া উঠিল—"এ কি সর্বনাশ!"

ঘুরিয়া টুলুর দিকে চাহিল, সেও তখন পাশে আসিয়া গেছে, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সামনের দিকে চাহিয়া নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

হীরার মিছিলের মতই একটা মিছিল, তবে শুধু শিশুদের নয়,—বৃদ্ধ থেকে শিশু পর্যন্ত সব বয়সের লোক, মেয়ে পুরুষ দুইই; কাহারও কোলে শিশু, কাহারও হাতধরা; ক্লান্ত; মিছিলের সামনের অংশটা আশ্রম-প্রাঙ্গণের ওদিকটায় প্রবেশ করিয়াছে, একটা কলরব—কিন্তু চাপা, কণ্ঠে যেন কাহারও শক্তি নাই।

আশ্রমের মধ্যে থেকেও লোকেরা দরজার মুখে বাহির হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহারা এদিক ওদিক কাজ করিতেছিল, তাহারাও।

টুলু চম্পার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—ব্যাপার কি?"

চম্পা বলিল—"আমাদের যেখানে ফ্যান ঢালা হয়, একটা রোগা ডিগডিগে

পুরুষ আর একটা বছর দশেকের মেয়ে ফ্যান তুলে খাচ্ছিল, দূর থেকেই দেখে আপনাকে ডাকতে আসি, কিন্তু এ কি !"

ততক্ষণে মিছিলটা আরও আগাইয়া আসিয়া প্রাঙ্গণের ওদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কোলাহলটাও স্পষ্ট—"হ্যাঁগা, এখানে কারা খেতে দিচ্ছে ?···আমরা দুদিন খাই নি···আমি তিনদিন···কিছু নেই আমাদের···কারা দিচ্ছে, হ্যাঁগা ?···"

ফ্যানের নালার কাছ থেকে হঠাৎ একটা আহ্বান—"ওগো, ইদিকে ! ইদিকে !—ফ্যান—অনেক—গরম···ও পেসাদি !...হারাণ !···গুপির মা !···"

সব যেন স্থাণুর মত নিশ্চল হইয়া গেছে। নদীর ধারটায় মাটি খুঁড়িয়া টানা উনুন, সেইখানেই ঢালোয়া রান্না হয় আজকাল, ফ্যানের নালাটা নদীতে গিয়া মিশিয়াছে ; শব্দ লক্ষ্য করিয়া মিছিলের একটা অংশ ছুটিল সেদিকে—পড়িয়া, উঠিয়া।

টুলুর যেন চমক ভাঙিল।—"যেও না ওদিকে। যেও না। হাত দিয়ো না ফ্যানে।"—বলিতে বলিতে চম্পাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল, গলার স্বর কর্কশ হইয়া উঠিতেছে—"যাবে না বলছি—ফ্যানে হাত দিতে পারবে না—খবরদার···তোমরা রুখছ না কেন ?—হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ···ফ্যানে আমাদের কাজ আছে ..কেউ ছুঁতে পারবে না।···"

ওদের আবির্ভাবের চেয়ে টুলুর আচরণটা কম বিস্ময়কর নয়। আশ্রমের সবাই এদিকে চম্পা পর্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গেছে। টুলু গিয়া ফ্যানের নর্দমার সামনে রুখিয়া দাঁড়াইল, একটা পোড়া কাঠও হাতে তুলিয়া লইল। যাহারা ছুটিয়া গিয়াছিল তাহারা তো থমকিয়া দাঁড়াইলই, যাহারা নিমন্ত্রণ দিয়াছিল—একটি ন্যাকড়া-পরা মেয়ে আর একজন মাঝবয়সী পুরুষ—তাহারাও তাড়াতাড়ি উঠিয়া শঙ্কিতভাবে ভিড় ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। মিনিট খানেক একেবারে নিঃশব্দ, দুই পক্ষই বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া ; তাহার পর টুলু প্রশ্ন করিল—"কোথা থেকে আসছ তোমরা ? চাও কি ?"

নানা উত্তরে, নানা মিনতিতে আবার একটা মিশ্র কলনাদ উঠিতেছিল, টুলু হাত বাড়াইয়া একজন বয়স্থ লোককে সঙ্কেত করিয়া বলিল—"তুমি এগিয়ে এস।···কি ব্যাপার ? কোথা থেকে আসছ সব ?"

হাতজোড় করিয়া সমস্ত শরীরটা কুঁজো করিয়া লোকটা অসীম মিনতিতে মাথা দুলাইয়া বলিল—"আমরা আসছি দক্ষিণ থেকে বাবুমশাই, তিন দিন হেঁটে, তিন দিনই কিছু খাই নি এক রকম…বুঝছি, এতগুলোকে কে খেতে দেবে—বলি, আলাদা হয়ে পড়—যায় না…অবিশ্যি গেছেও ছড়িয়ে, আরও ছিল, কিন্তু তবুও…"

লোকটা একবার পেছন দিকে ফিরিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল—"তা, আমরা শুধ্ ফ্যান খাব বাবুমশাই। আর…"

আশ্রমের চালাটার দিকে একবার লুব্ধভাবে চাহিয়া দৃষ্টিটা তখনই ফিরাইয়া আনিয়া বলিল—"থাকব বাইরেই প'ড়ে…ঘরে ঢুকতে যাব নি…"

আশ্রমের সবাই আসিয়া টুলুকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, পাশে চম্পা, হীরক তাহার বাঁ হাতটা দুই হাতে জড়াইয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

টুলু প্রশ্ন করিল—"দক্ষিণ থেকে আসছ ?

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের থানা সুতোহাটা নন্দীগাঁ…"

"কি হয়েছে সেখানে ?—ঝড় ?—এই রকম ?…"

"এই রকম কি বাবুমশাই ?—ওসব জায়গা আর নেই। সরকারী বাঁধ ভেঙে সাগরের নোনা জল—বালি…গ্রাম বলতে কিছু নেই—গরুবাছুর, মানুষ…"

ভিড়ের এক প্রান্তে একটি মেয়ে হঠাৎ মুখ ঢাকিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল ; লোকটা ঘুরিয়া দেখিয়া চটিয়া উঠিল, বলিল—"আরে, বুলতে দে !…জ্বালা !…তোর একার গেছে ?…"

কাঁদা দেখিয়া চম্পার যেন সাড় হইল, আগাইয়া গিয়া মেয়েটির পিঠে হাত দিয়া বলিল—"এদিকে এস তুমি।"

তাহাকে লইয়া বাড়ির দিকে পা বাড়াইয়াছিল, টুলু বলিল—"চম্পা, একটু থেমে যাও।"

লোকটিকে বলিল—"আচ্ছা, যাক ওসব কথা। তোমরা আছ কতজন ?" সঙ্গে সঙ্গে নিজেও একটু গলা তুলিয়া দেখিয়া লইল, তাহার পর আবার প্রশ্ন করিল—"আরও আসছে কি পেছনে ?"

লোকটা একটু থতমত খাইয়া গেল, যেন একটা কিছু লুকাইতে চাহিতেছে, কিন্তু কোন ফল নাই, এখনই প্রকাশ হইয়া পড়িবে; পিছন দিকে একবার অনির্দিষ্টভাবে চাহিয়া বলিল—"ওরাও ইদিকেই আসবে?…হ্যাঁগা, তোদের কি বললে?—বনগাঁ-বারুলির ওরা?"

কি একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় কেহই উত্তর দিল না।

টুলু প্রশ্ন করিল—"কজন আছ?"

লোকটা আবার সেইরকমভাবে থতমত খাইয়া গেল। টুলু প্রশ্ন করিল—"আর এই এত কটি?"

দারুণ বিপদের মধ্যে লোকটার হঠাৎ যেন মাথা ঘুলাইয়া গেল, প্রশ্নটার সোজা উত্তর না দিয়া হাত নাড়িয়া বলিল—"তা এসে যায়ই তো তাদের খেদিয়ে দিও আপনারা বাবু। আমরাও ঢুকতে দোব নি।…কত লোককে বাবুরা ফ্যান দেবে? গরুবাছুর নাই তাদের?…অ—রে!"

শেষের কথাগুলা নিজের দলের দিকে চাহিয়া অনাগত দলকে লক্ষ্য করিয়া কতকটা রাগের টোনে বলিল, বাবুদের হইয়া একটা যেন ঘোরতর অন্যায়ের বিরুদ্ধে ওকালতি করিতেছে।

একটু দূরে নদীর ঢালু থেকে উঠিয়া আসিয়া একটি গরু আর একটি বাছুর নালাটায় মুখ দিয়াছে, সেটা দেখিয়াই বোধ হয় লোকটার গরুবাছুরের কথা মনে পড়িয়াছে। একটি স্ত্রীলোক কতকটা শঙ্কিতভাবেই সেদিকে চাহিয়া বলিল—"আর উরা তো ভাতই পাবে ব'লে গেচে রাজার কুটিতে। আমরা কিছু বলেচি?"

একটি মেয়েই একটু টানিয়া বলিল—"হুঁ, দিলে!—দেখেচি…"

স্ত্রীলোকটি তাহার উপরেই মুখ-ঝামটা দিয়া উঠিল—"না দেয় আমরা ঢুকতে দোব নি এখানে।…গেল কেন?"

টুলু অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছিল। ভিড়ের পিছন থেকে একটা ঢিল গিয়া গরু দুইটার মুখের কাছে পড়িল, একবার দেখিয়া লইল, কিন্তু কিছু বলিল না। স্ত্রীলোক দুটিকে বলিল—"তোমরা ঝগড়া করছ কেন অযথা? আমার কথাটার তো উত্তর দিলে না, কতজন হবে তারা?"

পিছন থেকে একজন বলিল—"আর এত কটিই হবে বাবুমশাই!…বলচে না কেন সোজা কথাটা?"

টুলু চম্পার দিকে চাহিয়া বলিল—"প্রায় ষাটজন, মনে হচ্ছে এসেই পড়বে ওরাও। পারবে? না, আমরা বেটাছেলেরাই হাত লাগিয়ে দোব?"

চম্পা একটু রাগ আর অভিমানের স্বরে বলিল—"হ্যাঁ, সেই ঠিক, আমরা বরং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখি, তামাশা দেখবার অভাব প'ড়ে গেছে তো বড্ড কদিন থেকে?"

"তা হ'লে ত্রিশ জনের ব্যবস্থা করো—এই যা রয়েছে।"

"সে আমি বুঝে-সুঝে ঠিক করছি, ওরাও এসে পড়বে, আরও না আসে! ব্যাপারটা বুঝছেন? থাকবার কি হবে? অনেক কচি-কাচা।"

টুলু বেটাছেলে যাহারা জড়ো হইয়াছিল তাহাদের বলিল—"আশ্রমের বাকিটাও এখুনি তুলে ফেলতে হবে গো, অন্তত খুঁটির ওপর চালাটা।"

একটু কুণ্ঠিতভাবেই বলিল—"ভেবেছিলাম বড্ড ক্লান্ত রয়েছ—আজ রাত্তিরটা আর কাজ হবে না, তা কি করি?"

কয়েকটা কণ্ঠেই উৎসাহের সঙ্গে উত্তর হইল—"তা উঠবে না কেন?… মা-মণি না হয় ছেড়ে দিক না, রান্নাটাও সেরে নিচ্ছি আমরা—কি আর এমন… হ্যাঁ, কজন না হয় উদিকেই যাই।"

চম্পা কিছু বলিবার পূর্বেই টুলু বলিল—"ওকে বলতে যাওয়া বৃথা, শুনলে না উত্তরটা? চল, হাত লাগিয়ে দিগে।…তোমরাও চল ওদিকে, আগুনের হাঙ্গামা এখানে, অনেকগুলি কাচ্চা-কাচ্চা রয়েছে।…আমরা কিন্তু আর ডাকলেও আসব না চম্পা, সামলাও।"

চম্পা উত্তর করিল—"আপনারা ওদিকে সামলাতে না পারলে বরং আমাদের ডেকে নেবেন।"

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই রকম ঠেস দিয়া কথা-কাটাকাটিতে মিষ্ট হাসিই আসে, সবার মুখে তাহার আভাসই একটু একটু ফুটিতেছিল, হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন প্রৌঢ় বাহির হইয়া টুলুর একেবারে সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল—"ভাত খেতে দেবেন নাকি—রেঁধে?"

কি একটা আছে চেহারার মধ্যে, টুলুর উত্তর জোগাইল না।

লোকটা বলিল—"আমি এদের পুরুত ছিলুম...ব্রাহ্মণ···চার মরাই ধান থাকত—স্ত্রী, দুটি ছেলে···ফ্যান কখনও খেতে হয় নি, তাই বলছিলাম···"

কথাগুলা বলিবার কোনই দরকার ছিল না, কিন্তু একেবারে ভিখারীর মত বর্তাইয়া গিয়া আনন্দ যেন ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। অথচ মর্যাদাজ্ঞান থাকার জন্য নিজেকে সংযত করিবারও চেষ্টা আছে; অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছে।

টুলু তাহার ডান হাতটা ধরিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল—"না, ফ্যান খাবেন কেন—আমাদের যখন একমুঠো জুটছে?"

"খেয়েছি, সে কথা নয়; এতর পরেও তো প্রাণধারণ করতে হয়; তবে, সব মনে প'ড়ে যায়, গলা দিয়ে কেমন যেন নামতে চায় না···সেই কথাই বলছিলাম—ভাতের জন্যেই যে তা নয়।"

অগ্রসর হইতে হইতে কোঁচার খুঁট দিয়া উদ্গত অশ্রু মুছিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"উঃ, এ কি সর্বনাশ! কাকে বলি? কে বুঝবে?"

॥ নয় ॥

চম্পার আন্দাজটা ঠিক ছিল—আরও না আসে!

সেই রাত্রেই প্রায় আশিজন আসিয়া পড়িল, ছোটবড় কয়েকটা দলে। এক দল রান্নার প্রায় শেষাশেষি আসিল, জন পনেরো; এক দল এদের খাওয়ার মাঝামাঝি—ভাতের গন্ধে বুভুক্ষু রব করিতে করিতে বিশৃঙ্খল ভাবে ছুটিতে ছুটিতে—কাতার দিয়া বসিয়া গেল, ঠেলিয়া বসিবারও চেষ্টা করিল। ওদিকে আবার ফ্যানের নর্দমার ওপর অভিযান—শক্ত হইয়া উঠিল শৃঙ্খলা বজায় রাখা। সুবিধার মধ্যে ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত। টুলু—পরিবেশনের দল, এদের সামলাইয়া রাখিবার দল, ওদিকে ঘর তুলিবার জন্য আলাদা দল ভাগ করিয়া দিল। আবার রান্না চড়িল সঙ্গে সঙ্গেই।...সব ঠিকঠাক করিয়া যখন এইবার আরাম করিতে যাইবে, একটা ছোট দল আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার গায়ে আর একটা—দুইটা মিশিয়া জন দশ-বারো হইবে। টুলু ভীতভাবে চম্পাকে প্রশ্ন করিল—"মাটি ফুঁড়ে বেরুচ্ছে নাকি? সমস্ত রাত চলবে?"

চম্পা সে কথার উত্তর না দিয়া শুধু বলিল—"ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেছে দেখছি ওদিকে! শুনছিলাম অনেক দিন থেকেই দুর্ভিক্ষের মতন আরম্ভ হয়ে গেছে—তার ওপর এই ঝড়, বাঁধ ভেঙে সমুদ্র ঢুকে পড়া!..."

"চাল ডাল মেপে দিচ্ছি, রেঁধে নিক নিজেরাই, তোমরা অসুখে প'ড়ে যাবে।"

কথাটা এত যুক্তিযুক্ত যে কাটান্ দিতে চম্পাকে একটু ভাবিতে হইল, বলিল—"তাই ভাল হ'ত, কিন্তু এদের বিশ্বাস আছে?—চালডাল চুরি করবে। রান্না ক'রেও নিজের দিকে টানবে; মানুষের মধ্যে তো আর নেই, দেখছেন না?"

"সে আমি জেগে থেকে সামলাচ্ছি।"

চম্পা আবার সেবারের মত ব্যঙ্গের সহিত বলিল—"হ্যাঁ, সে বরং দিব্যি হয়। আমরাও একটু নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে পারি।"

তাহার পর ভঙ্গি বদলাইয়া বলিল—"আপনি দয়া ক'রে ওদিকে যান তো, সত্যিই ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে। তেমন হুঁশ নেই, একটা কড়া কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লে বলবেন—দেখছ, চম্পা বললে!"

শেষরাত্রের দিকে আরও একটা দল আসে। আসিয়াই বোধ হয় ফ্যানের রজতধারার উপর দৃষ্টি পড়িয়া গিয়াছিল, কাহাকেও আর উঠায় নাই। অন্য যে গোলমাল হইয়া থাকিবে তাহাতে কাহারও ঘুম ভাঙিবার মত অবস্থা ছিল না।

সকালে উঠিয়া দেখা গেল ধারাটার পাশে দুটি মৃতদেহ—একটি বৃদ্ধার—শেষরাত্রের দলে আসিয়াছিল; আর একটা দশ-বারো বছরের ছেলের—প্রথম দলেই আসিয়া পরিতৃপ্তভাবেই আহার করিয়াছিল, আবার বোধ হয় শেষরাত্রের গোলমালে উঠিয়া পড়ে, তাহার পর লোভ সামলাইতে পারে নাই।

একটা মস্তবড় সমস্যার সামনে পড়িয়া টুলু যেন দিশেহারা হইয়া পড়িল। পরের দিন আরও লোক বাড়িল, বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম, নোংরামি—এও একটা যেন ঝড়, মৃত্যুকে অন্য পথ দিয়া লইয়া আসিবে। কাছে পিঠে ডাক্তারও নাই, ভরসা মাস্টারমশাইয়ের হোমিওপ্যাথির বাক্সটুকু; টুলুর অভ্যাসও নাই আর। ডাক্তার বলিতে চম্পা, তাহার হেঁসেল ছাড়া চলে না,—যমকে বুভুক্ষার দিকে আটকায়, কি রোগের দিকে?

আশ্রমের প্রাঙ্গণটা বেশ বড়, টুলু যোগাড়যন্ত্র করিয়া আরও একটা লম্বা চালা তুলিয়া ফেলিল, আরও গোটা-তিন টানা উনান খোঁড়াইয়া আলাদা আলাদা রাঁধুনিদের ব্যাচ করাইয়া দিল। চম্পাকে রাঁধার কাজ থেকে জোর করিয়া সরাইয়া হেঁসেলগুলার তদারকে আর ঔষধের দিকে লাগাইয়া দিল। ফল ভাল হইতেছে দেখিয়া চম্পা আর আপত্তি করিল না; তবে হেঁসেলের সামান্য একটু রাখিল নিজের হাতে,—নিজেদের চারজনের রান্নাটা, যে মেয়েছেলেটি বাড়িতে শোয় তাহাকে ধরিয়া।

গড়িয়া তুলিয়াছে খানিকটা শৃঙ্খলা, তবুও মাঝে মাঝে যায় ভাঙিয়া,—নিত্যই নূতন দল আসিতেছে, দুজন, পাঁচজন, আরও বেশি। তৃতীয় দিন পর্যন্ত আড়াই শত লোক হইয়া পড়িল।...তবু চলিতেছে কাজ, শুধু টুলুর মুখে মাঝে মাঝে বাহির হইয়া পড়ে—"নরোত্তম এখনও এল না ফিরে...নরোত্তম থাকলে বাঁচতাম —আসে না কেন?"

চতুর্থ দিন প্রাতে নরোত্তম আসিল। বলিল, যাহাদের হাসপাতালে লইয়া গিয়াছিল তাহারা জায়গা পাইয়াছে, সারিয়া উঠিলেই চলিয়া আসিবে, একটু দেরি হইবে।

টুলু বলিল—"তোমার বড় দেরি হ'ল নরোত্তম; অবস্থা দেখছ? ভর্তি ক'রেই বেরিয়ে পড়তে পারতে! আমার সব নতুন এখানে..."

নরোত্তম উত্তর করিল—"পড়েছিলাম বেরিয়ে, তবে একটু অন্যত্র গেছলাম।"

"কোথায়?"

নরোত্তম একটু ভাবিল, কতকটা যেন দোমনা থাকিয়া বলিল—"সে অনেক কথা, অন্য এক সময় বলব, এখন একটু দেখে নিই এদিকটা আগে। বড্ড একলা প'ড়ে গেছলেন...একটু ভুল হয়ে গেল আমার।"

সমস্ত দিনের মধ্যে অনেকটা সামলাইয়া ফেলিল। সব চেয়ে বড় কাজ—সংখ্যাটা বাড়িতে দিল না, বরং কিছু কমাইয়াই ফেলিল। খোঁজ লইতে লইতে আসিয়াছে—কোথায় কোথায় অন্নসত্র খোলা হইয়াছে, লোক লইতে পারে; নূতন যাহারা আসিতে লাগিল, একটা আহার দিয়া আপনার লোক দিয়া তাহাদের সরাইয়া দিতে লাগিল। দিন চারেকের মধ্যে আশ্রমের সংখ্যাটাও আড়াই শত

হইতে দুই শতে আনিয়া ফেলিল। বেশ একটি শৃঙ্খলা আসিল, গ্রাম-সংস্কারের কাজ আবার চালু হইল ভাল করিয়া; দুঃখের বাদলের গায়ে রুপালি রেখাও দিল দেখা—যাহারা আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে সক্ষম মাত্রেই এই সংস্কারের কাজে নিতান্ত যেন একটি সহজ কর্তব্যবোধে ধীরে ধীরে আত্মনিয়োগ করিল, ওদের দলের স্ত্রীলোকেরাও প্রথম ধকোলটা সামলাইয়া লইয়াই নিজেদের মধ্যে বেশ গোছগাছ করিয়া লইয়া হেঁসেলে নামিয়া গেল; এমন কি চরখার রবও উঠিল আবার আশ্রমের প্রাঙ্গণে।

টুলু একটা জিনিস লক্ষ্য করিল—আশ্রমসংলগ্ন গ্রামবাসীদের সঙ্গে ওদের চমৎকার একটি মিল আছে, নিঃশব্দে, সংযত উৎসাহের সঙ্গে কাজ করিয়া যাওয়া, কাজ খুঁজিয়া লইয়া। সবচেয়ে বড় কথা, এদেরই মত দারুণ বিপর্যয়ে ক্ষণিকের জন্য মনুষ্যত্ব হারাইয়া আবার আরও যেন ভালো করিয়া মানুষের মর্যাদায় ফিরিয়া আসার ক্ষমতা। টুলু নরোত্তমকে বলিল, নরোত্তম একটু হাসিয়া বলিল —"ওরা আবার তমলুক-কাঁথি অঞ্চলের লোক্ যে!…"

একটু বেশি ব্যস্ত ছিল, এইটুকু বলিয়াই চলিয়া গেল।

চম্পাকেও বলিল টুলু। চম্পা একটু যেন নিগূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল— "হ্যাঁ, লক্ষ্য করেছি; শুধু এইটুকুই নয়, যা কথা শুনলাম একটা মেয়ের মুখে…"

টুলু প্রশ্ন করিতে বলিল—"আমার পাশে দাঁড়িয়ে রাঁধছিল, বয়স তিরিশ বত্রিশ হবে, বিধবা; এই সব কথাই হচ্ছিল, হঠাৎ ঘুরে আমার দিকে চেয়ে বললে— 'আমরাও চুপ ক'রে থাকব না, টলিয়ে ছেড়ে দোব।…' জিগ্যেস করলাম— 'কি টলিয়ে ছাড়বে?'…ততক্ষণে মনে হ'ল কে যেন এদিক থেকে চোখ টিপে দিলে, চেপে গেল দেখে আমিও আর কিছু জিগ্যেস করলাম না।"

একটু হাসিয়া কপট গাম্ভীর্যের সহিত বলিল—"সর্বনেশে জায়গা বাপু এ, কেমন যেন গা-ছমছম করে…মাস্টারমশাইও ওইভাবে গেলেন…"

হীরকের কী যে হইয়াছে, আর সে রকম দল গুছাইয়া পতাকা হাতে শ্লোগান আওড়াইয়া বেড়ায় না। মা বাবা কেহই ওকে আর সময় দিতে পারে না; তবে দুজনেই বুঝিয়াছে, ঝড় ওকে যে ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল, এই দুর্ভিক্ষের দৃশ্য সেভাবে পারে নাই; দেখে ঘোরে, ওরা যখন খায়—শুধু খিচুড়ি আর একটু

করিয়া মুন—ফ্যালফ্যাল করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া খাওয়া দেখে একটা রোগা ডিগডিগে ছোট মেয়ের। মা বাপ কেহই নাই মেয়েটার, কি করিয়া দলের সঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে, রোগা বলিয়া একটু কম দেওয়া হয় তাহাকে, খাইবার সময় তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া চারিদিকে চায় আর হাতটা খুব চাটে।...মাঝে মাঝে হীরা এক-আধটা প্রশ্ন করে বাবাকে মাকে, উত্তর যা পায় তাই লইয়া নদীর ধারটিতে বসিয়া মনে মনে নাড়াচাড়া করিতে থাকে—শিশুমনে যেন অর্থ উপলব্ধি হয় না.. অবশ্য ওর প্রশ্নের সঙ্গে খুঁট মিলাইয়া মিলাইয়া সবিস্তারে উত্তর দিবার অবসরও নাই ওদের, টুলু এক-আধবার বিরক্ত হইয়া সরাইয়া দিয়াছে।

একটা নূতন দোষ দেখা দিয়াছে—আবদার। অন্যান্য সময় ছন্নছাড়ার মত ঘুরিয়াই বেড়ায়, মুখটা চুন করিয়া; কিন্তু যখনই মা একটু মনোযোগ দিবার অবসর পায় ওর দিকে—সাধারণত নাওয়ানো-খাওয়ানোর সময়—কোন কিছু একটা আবদার ধরিয়া কান্নাকাটি করিয়া হুলুস্থুল কাণ্ড বাধাইয়া তোলে—দাদুকে চাই তখনই, কিংবা ভাত হইল তো খিচুড়ি চাই সন্তসন্ত, কিংবা নিতান্তই অর্থ-হীন একটা কিছু; টুলু চম্পা দুজনে মিলিয়া হিমসিম খাইয়া যায়; এক-একদিন চম্পা টুলুর হাতে ছাড়িয়া সরিয়া পড়ে, বলে—"সামলান ছেলে, আমি আর রুখতে পারছি না, এইবার ওর অদৃষ্টে কোন্‌দিন মার আছে, যেটা বাকি।"

আজ সকালে নরোত্তম আসা অবধি ও একটু চনমনে হইয়াছে, সর্বদাই তাহার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে সব কাজেই; তাহার মধ্যেই গল্পও হইতেছে—মুক্ত নিঃসঙ্কোচ প্রশ্ন, আর ওদিকে কার্পণ্যহীন উত্তর, গল্প করিতে করিতেই প্রবল উৎসাহে কাজের সরঞ্জাম এটা ওটা জোগাইয়া দিতেছে নরোত্তমের হাতে।

মুক্ত প্রশ্ন-উত্তরে কি সব ঠাহর করিয়াছে—দুপুরে খাইবার সময় ডাল আর তরকারি ঠেলিয়া রাখিয়া বলিল—"আমি ওদের মতন খাব।" একটি তরকারি রাঁধে চম্পা, চম্পা সেটা কোন মতেই মুখে দেওয়াতে পারিল না। তবে কান্না-কাটি করিল না আজ, ওদের খিচুড়িতেও যে ডাল আছে সেই যুক্তি দেখাইয়া

চম্পা ঐ পর্যন্ত কোন মতে রাজী করিল। তরকারি না খাইয়া উৎসাহটা বাড়িল, বিকালে দল গুছাইয়া একবার গ্রাম প্রদক্ষিণও করিয়া আসিল, চারদিনের মধ্যে এই প্রথম।

সন্ধ্যার সময় নিশ্চিন্ত হইয়া আবার দুই ভাইয়ে কি জোর আলোচনা হইতেছিল, টুলু সেই দিক দিয়া যাইতে যাইতে দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল—"আজ তোমার দাদা-ভাই তরকারি খায় নি নরোত্তম।"

নরোত্তম হাসিয়া বলিল—"শুনলাম, ও-ই বাহাদুরি ক'রে শোনালে। আমারই দোষ, সকালে কখন কি জিজ্ঞেস করেছে, অন্যমনস্ক হয়ে বলেছি, তাই থেকে ওইটে মাথায় ঢুকে গেছল। তা এবার থেকে খাবে আমায় কথা দেছে,—মা-মণি যেন রাঁধে।" হীরা আসিয়া টুলুর ডান হাতটা বুকে জড়াইয়া ধরিল, বলিল—"তরকারি না খাওয়ার চেয়ে মার কথা না শোনা যে বড্ড খারাপ, বুঝলে না বাবা? তাই খাব।"

ওরই গুরুগিরি এসব, নরোত্তম একটু অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া বলিল—"ঐ আবার শাস্ত্রবচন শুনুন।" একটু থামিয়া প্রশ্ন করিল—"আপনার এখন ফুরসৎ আছে?"

টুলু হাসিয়া বলিল—"অভাবটা কবে ছিল? তুমি এসে অবধি আবার সবটাই তো ফুরসুৎ।"

নরোত্তম বলিল—"সে কথা একশ' বার, দেখচি তো।"

হীরার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল—"তরকারির কথাটা আমার হয়ে তুমিই বলো গে দাদাভাই। আর বলবে, আমিও খাব।"

টুলু আসিয়া বলিল—"সে কথা আর ব'লো কেন? আজ সমস্ত দিন আপশেছে চম্পা, তোমার জন্যে রান্না করতে ভুলে গেছে ব'লে; যখন মনে পড়ল তখন তোমার ওদিকে খাওয়া হয়ে গেছে। বলে—মুখ দেখাব কি ক'রে নরুর কাছে?"

হীরাকে সরাইয়া দিবার সুযোগটা হাতছাড়া করিল না নরোত্তম, বলিল—"ঐ শোন, দাদাভাই, হঠাৎ অনেক নতুন ছেলেমেয়ে পেয়ে মা-মণির আর বুড়ো ছেলের কথা মনে থাকবে না, তুমি ব'সে থেকে আমার দুটো তরকারির জোগাড় করোগে।"

॥ দশ ॥

হীরা নাচিতে নাচিতে বাসার দিকে চলিয়া গেল, যতক্ষণ দেখা গেল হাসির সঙ্গে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল নরোত্তম, তাহার পর ঘুরিয়া বলিল—"আপনাকে খুঁজছিলাম, বসুন ঐ গুঁড়িটার ওপর।···চাল নেই আর।"

গ্রামগুলায় চাল-ডালের অবস্থা ভালই বরাবর, ঝড়ে ওদিক দিয়া খুব বেশি ক্ষতি হয় নাই, টুলু বিমূঢ়ভাবে বলিল—"সে কি!...আমায় তো বলে নি কেউ; অভাব দেখছি না তো!"

"এরা বলবার পাত্র নয়, শেষ পর্যন্ত জুগিয়ে জুগিয়ে যাবে, পণ্ডিতমশাই সেই ভাবে তোয়েরই ক'রে গেছেন এদের। কিন্তু আমি এসেই হিসেব ক'রে দেখছি, গ্রামে আর মাত্র পাঁচদিনের চাল আছে।"

"তারপর?"

"তারপর এদের সুদ্দু উপোস।···এদের ঐ রকমই অব্যেস, কিছু না ব'লে কাজ ক'রে যায়; সামলাবার মালিক ছিলেন পণ্ডিতমশাই, কিছু কিছু আমি; এখন হয়েছেন আপনিই তাঁর জায়গায়।"

অসহায়তায় টুলুর চোখ দুইটা আয়ত হইয়া উঠিল, মুখ দিয়া আপনিই আপনিই যেন বাহির হইয়া পড়িল—"সর্বনাশ!"

নরোত্তম বলিল—"এর চেয়ে বড় সর্বনাশ সামনে রয়েছে···"

চিন্তাবশেই টুলুর মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়াছিল, চকিতে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—"আবার কি?"

"এখানে বাইরের লোক আরও বাড়বে—শীগগিরই, অবিশ্যি যদি খেদিয়ে না দেন,—তাও সহজ হবে না···"

"কেন?"

"চারিদিকেই চাল ক'মে যাচ্ছে, যেখানে যেখানে অন্নসত্র খুলেছে।"

"কেন? রিলিফ আসছে তো বাইরে থেকে, কলকাতা থেকে···"

"কলকাতায় এখনও খবরও পৌছায় নি—গবর্মেণ্ট পৌছুতে দেয় নি···"

"সে কি!"

"তাই।...কাছাকাছি—মানে, আওয়াজটা আপনি আপনি যতটুকু গেছে—সেখান থেকে যে সাহায্য আসছিল, গবর্মেণ্ট তাদের রুখে দিচ্ছে, কেড়ে নিচ্ছে—মারপিটও করছে অনেক জায়গায়..."

"তার মানে?"

নরোত্তম যেন অন্তরের পৈশাচিক উল্লাসে টুলুর দৃষ্টির মধ্যেকার বর্ধিত বিস্ময় আর উদ্গত ক্রোধটা লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিল, বলিল—"তার মানে, মেদিনীপুরের সাজা হওয়া দরকার—বড্ড বেড়েছে এরা। জেলার কর্তারা চারিদিকে ঐ রকম হুকুম তো দিয়েছেই, ওপরেও নাকি ও-রকম লিখেচে—ঝড়টা ওদের মতে ভগবানেরই একটা সাজা—গবর্মেণ্টের ওতে হাত দেবার দরকারও নেই, উচিতও নয়..."

টুলুর মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—"শয়তানের দল! উঃ, পণ্ডিতমশাই-ই এদের ঠিক চিনেছিলেন...তায় আবার দুই শয়তানে মিতালি হয়েছে তো..." পরমুহূর্তেই ওর মনটা কিন্তু দৃষ্টির নিচেই কঠিন বাস্তবে ফিরিয়া আসিল, আবার রাগের জায়গায় আসিয়া পড়িল আশঙ্কা, বলিল—"উপায় কি হবে নরোত্তম? দুর্ভিক্ষ বাঁচাতে গিয়ে আরও বড় দুর্ভিক্ষ ঘাড়ে এসে পড়ল যে! ওদের উপর আক্রোশ ক'রে কি হবে?...উপায় কি এখন?—পাঁচ দিন মোটে..."

নরোত্তমের দৃষ্টি একটু দূরে গিয়া পড়িয়াছিল, আক্রোশের কথাটার ওপর যেন একটা টিকা করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"হ্যাঁ, এখন ঠিক আক্রোশ মেটাবার সময় নয় বটে..."

"এখন" শব্দটার উপর একটু জোর দিয়াই বলিল কথাটা। তাহার পর টুলুর মুখের পানে একবার চকিতে চাহিয়া লইয়া বলিল—"উপায় নতুন কিছু আমার মাথায় তো আসছে না, শুধু...শুধু পণ্ডিতমশাই এ অবস্থায় কি করতেন সেইটে বলতে পারি।"

টুলুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। অদ্ভুত দৃষ্টি, শান্ত অথচ ভিতরে আগুন। টুলু প্রশ্ন করিল—"কি করতেন?"

ভিতরের আগুন আরও একটু ঠেলিয়া বাহিরে আসিল, একটু চুপ করিয়াই রহিল নরোত্তম, তাহার পর বলিল—"জেলায় চাল আছে প্রচুর—বড় বড় আড়তদারদের গোলায় আটকে রেখেচে চাল, মোটা লাভ মারবে, এখানেই বা বাইরে চালান দিয়ে যেমন সুবিধে হয়…"

"বেশ তো, কিছু কিনে ফেলা যাক।"

"ওরা বেচবে না আমাদের কাছে, জানে সে দর দেবার সাধ্যি আমাদের নেই। এই হ'ল এক। দ্বিতীয় কথা, ওরা বেচতে চাইলেও গবর্মেণ্ট আটকাবে। শুনলেন তো তাদের কথা সব—'সাজা দেওয়া দরকার মেদিনীপুরের লোককে।'

"তা হ'লে ?"

নরোত্তম একটু যেন ভিতরে ভিতরে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে, যেন আর কত স্পষ্ট করিয়া বলিবে ?…তাহার পর সে ভাবটা সামলাইয়া লইয়া বলিল—"ইয়ে, আপনি মেদিনীপুরের ব্যাপারটার কথা শুনেছেন ?"

একটা আলোক দেখিতে পাইল যেন টুলু, একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"কিছু কিছু। লোকেরা চালের কলের ওপর চড়াই করে, গভর্মেণ্ট কলওয়ালাদের পক্ষ নেয়—কিছু লোক খুন হয়।"

"সবটা শোনেন নি তা হ'লে। তারপর কলওয়ালারা চালের চালান বন্ধ করতে বাধ্য হয়, লোকেদের কাছে জরিমানাও দেয়।"

"তাই করতে বল আমাদের ?"

"ওতে কি আর এখন কাজ হয় ? আমাদের লোকেরা ঐ ভাবে মাতলে, এদিক সামলাবে কে বলুন ? তবে স্পষ্টই বলতে হ'ল আপনাকে—চাল যেমন যেমন শহরে মজুত ক'রে রেখেছে তেমনি দূরের পাড়াগাঁয়ের অনেক জায়গাতেও রেখেছে লুকিয়ে—গবর্মেণ্টের চোখেও ধূলো দিতে চায় ওরা ; সেই সব চাল নিয়ে আসতে হবে।"

"লুটে ?"

নরোত্তম একটু হাসিল, বলিল—"তারা আদর ক'রে তো গাড়িতে চাপিয়ে দেবে না বাবাঠাকুর…পণ্ডিতমশাই থাকলে যা করতেন তাই বললাম

আপনাকে, অবিশ্যি আন্দাজে, তিনি তো বেঁচে নেই যে, পাকাপাকি বলব! তবে জন কতক লোকে জমা করচে, জোঁকের মতন দিন দিন ফুলচে, আর তার পাশেই হাজার হাজার লোক মরচে—এটা তিনি বুঝতে পারতেন না, সহ্য করতে তো পারতেনই না। আর সব কাজেই যে বুক চিতিয়ে মরতে হবে—এটাও তিনি জানতেন না। বলতে শুনেচি মরার কাজটা সব চেয়ে সহজ, সেট একেবারে শেষের জন্যে রেখে দেওয়া উচিত—যখন বাঁচিয়ে চলবার আর কোন উপায় থাকবে না।”

টুলু গুঁড়ি ছাড়িয়া চঞ্চল ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, হাত দুইটা বুকের উপর জড়ো করিয়া পায়চারী করিতে আরম্ভ করিল। জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, হেঁট করা মুখের উপর জ্যোৎস্না পড়িয়া বিচিত্র আলোছায়ার রেখা সৃষ্টি করিয়াছে; মাঝে মাঝে ভ্রূ নাসিকা ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হইয়া রেখাগুলাকে চপল করিয়া তুলিতেছে। নরোত্তম কয়েকবারই আড়চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, টুলুর চঞ্চলতা যখন বেশ চরমে আসিয়া ঠেকিয়াছে মনে হইল, সেই রকম ধীরে ধীরে বলিল—“বলতাম না আপনাকে এসব কথা। সেদিন পণ্ডিতমশাইয়ের চিঠিটা আপনাকে দেবার আগে যে সব কথা শুনলাম আপনার মুখে—আমার ওপরই রাগ ক'রে বললেন—তাই থেকে মনে হ'ল, পণ্ডিতমশাই যা করতেন ব'লে আমার আন্দাজ সেটা আপনাকে বলা চলে। সেই শুনেই তাঁর অমন চিঠিটাও আপনাকে দিলাম আর কি।···এর মধ্যে যদি আপনার মত বদলে থাকে—যদি পণ্ডিতমশাইয়ের···”

টুলু দাঁড়াইয়া পড়িয়া নরোত্তমের মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া একটু যেন অন্যমনস্কভাবেই শুনিতেছিল কথাগুলা,—অন্যমনস্ক এইজন্য যে নরোত্তমের কলা-কৌশল দেখিয়াও বিস্মিত হইয়া উঠিতেছিল—ঠিক সময়টিতে ফু দিয়া বিধূমিত অগ্নিকে শিখায়িত করিবার কি চমৎকার কৌশল! পণ্ডিতমশাইয়ের নামটাই কতবার উচ্চারণ করিল!...মনের অন্য দিকে সঙ্গে সঙ্গে অন্য চিন্তার স্রোত চলিতেছে—সত্যই তো, কোথায় গেল মাস্টারমশাইয়ের সেই দ্বিতীয় চিঠির উন্মাদনা—পঞ্চকোটের সেই অগ্নিসঙ্কেত, তাহার পরে অগ্নিদীক্ষা—মাস্টারমশাইয়ের নিজের হাতের পিস্তল চাহিয়া লইয়া।···

আগাইয়া গিয়া কাঁধে হাত দিয়া বলিল—"নরোত্তম, মত বদলাই নি, তোমার শুধু আন্দাজ—তিনি এই করতেন, আমি নিশ্চয় জানি, তিনি এই করতেন! তবে তার আগে ভেবে দেখতেন, অন্য কোন উপায় আছে কি না! সেইটুকু সময় আমায় দাও। বড় হঠাৎ দিলে না খবরটা?...আমি তোমায় কথা দিচ্ছি—যে চাল এরাই এই মাটি থেকে তুলেছে, এই জেলার মধ্যেই, সে চাল মজুত থাকতে আমি ওদের মরতে দোব না, অন্তত আমি বেঁচে থেকে ওদের মৃত্যু দেখব না।"

কথাটা রাত্রে চম্পাকেও বলিল।

বলিল—"চম্পা, সেদিনকার কথাগুলো বোধ হয় তোমার মনে আছে, সেই রক্ত দেওয়া-নেওয়ার কথা, যার জন্যে তোমার এখান থেকে সরে যাওয়ার কথা ওঠে,—এই সব নতুন ব্যাপারে কথাটা চাপা প'ড়ে গেছল, কিন্তু আজ নরোত্তমের কথায় বুঝলাম, তার দরকারটা যায় নি, বরং তলে তলে একেবারে সামনে এসে পড়েছে।"

"তাতে আমায় সরিয়ে দেবার কথা নিশ্চয় আবার নতুন ক'রে উঠবে না?"

"না, তোমায় সরাবার কথা একেবারে তোমার ওপরই ছেড়ে দিয়েছি, যার মানে এই হয় যে, নিশ্চিন্ত আছি, তুমি ছেড়ে যাবে না। সেই জন্যেই তোমার কাছে কথাটা তুললাম তোমার পরামর্শের জন্যে, তুমি জীবনে মরণে নিতান্ত অচ্ছেদ্যভাবেই এখন আশ্রমের মানুষ ব'লে।"

নরোত্তমের সঙ্গে আজ সন্ধ্যার সমস্ত কথাবার্তা একটি একটি করিয়া বলিয়া গেল, নিজের মন্তব্য দিয়া আরও বাড়াইয়া গবর্মেণ্টের অন্যায়ের কথায়, জেলার কর্তাদের ধৃষ্টতার কথায় ক্রমে ক্রমে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে—যতবারই মাস্টারমশাইয়ের নামটা মুখে আসিতেছে উত্তেজনাটা যেন শিখায় জ্বলিয়া উঠিতেছে। চম্পা পিছনে যেমন হাত দিয়া দাঁড়ায়, দেয়ালে ঠেস দিয়া সেই ভাবে দাঁড়াইয়া স্থির অচল দৃষ্টিতে সবটা শুনিয়া গেল, অন্তরে কি হইতেছে বাহিরে এক বিন্দু প্রকাশ হইতে দিল না।

শেষ হইলে খানিকটা স্থির ভাবেই চুপ করিয়া থাকার পর কিন্তু একটু চঞ্চল

হইয়া উঠিল, দৃষ্টিটা ধীরে ধীরে এদিক ওদিক ঘুরাইয়া বার দুয়েক টুলুর মুখের উপর রাখিল, যেন একটা কথা বলিতে চায় অথচ মনস্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাহার পর এক সময় বলিল—"আমার মুশকিল যে কিছু বলতে গেলেই মনে করবেন, বারণ করছি; তা না মনে ক'রে যদি একটু বিশ্বাস করেন যে, আপনাদের পথে বাধা আমি জীবনে দোব না, যে পথই ধরুন তাতে একটুকুও কাঁটা দেখলে তুলে ফেলবার জন্যেই থেকে গেছি এখানে, তবেই আমার যেটুকু মনে হচ্ছে বলি।"

"আমার সে বিশ্বাস অনেকদিন থেকেই আছে চম্পা, হতে পারে মনের বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে কথা অনেক সময় হয়তো বলতে পারি নি। তুমি বল।"

"আপনারা দুজনেই বড্ড উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন, আপনাদের পুরুষের মন—অন্যায়টাও ওদিকে বড্ড বেশি; কিন্তু রাগের জন্যেই একটা ছোট্ট কথা আপনাদের নজর এড়িয়ে গেছে বলে মনে হয়।"

"কি সেটা?"

"লুটের চাল ঘরে তোলবার সঙ্গে সঙ্গে ধরা প'ড়ে যেতে হবে···"

"সমস্ত দেশে দুর্ভিক্ষ, কারা নিয়ে গেল, কোথায় নিয়ে গেল, কি ক'রে টের পাবে?"

"যারা মরছে দুর্ভিক্ষে, তাদের বিশ-ত্রিশ বোরা চাল সরিয়ে ফেলার ক্ষমতাও নেই, ক্ষমতা থাকলেও জায়গা নেই। গবর্মেণ্টের নজর সহজেই গিয়ে পড়বে যেখানে যেখানে অন্নসত্র খোলা হয়েছে সেইখানে, একটা মস্ত বড় সন্দেহ হবে, চাল চারিদিক দিয়ে বন্ধ করছি অথচ পাচ্ছে কোথা থেকে···"

"বেশ, তাই যদি হয় তো শান্ত নিরুপদ্রব আশ্রম ব'লে আমাদের আশ্রমের বরাবরই সুনাম আছে, এদিকে নজর না পড়বারই কথা।"

"কিন্তু পড়তেও পারে, আর অন্য জায়গা থেকে আমাদের বিপদ সেইখানেই বেশি।"

"কেন?"

"আপনি মাস্টারমশাইয়ের শেষ চিঠির কথাটা ভুলে যাচ্ছেন বোধ হয়; অন্য অন্য যে সব জায়গা সে সব শুধু দুর্ভিক্ষের জন্যে, দুর্ভিক্ষ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

গুটিয়ে যাবে। আমাদের আশ্রমের আসল কাজ অনেক দূরে—দুর্ভিক্ষ হঠাৎ একটা বোঝা হয়ে এসে পড়েছে মাত্র। শান্ত নিরুপদ্রব ব'লে আমাদের শান্তি আশ্রমের যে যশ আছে, সেই বড় কাজের জন্যে সেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সরকারের চোখে ধুলো দেওয়া আর কি। এটা গেলে তো আশ্রমের সব গেল।"

টুলুর উত্তেজিত দৃষ্টিটা শুধু নরম হইয়াই আসে নাই, অন্তরে প্রসন্নতায় স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়াছে। চুপ করিয়া অনেকক্ষণ ভাবিল, তাহার পর নিরুপায় করুণ কণ্ঠে বলিল—"কি করা যায় চম্পা? মনে হচ্ছে, বলছ যেন ঠিক।...কি করি? গায়ে বড্ড জ্বালা ধরে। মনে হয়, তাড়াতাড়ি একটু কিছু ক'রে সেই জ্বালার খানিকটা ওদিকেও ঢেলে দিই।

চম্পা চিন্তিতই ছিল, বলিল—"আমার কি মনে হয় জানেন? শান্ত নিরুপদ্রব ব'লে যে সুনামটা আছে, সেইটে ভাঙিয়েই একটু চেষ্টা করা ভাল আগে। সরকারকেই ধরুন—আমাদের চাল দাও। সবাই যখন হুমকি দিয়ে চাইছে, সেই সময় ভিক্ষে ক'রে চাইলে চাই কি যশটাও আমাদের বেড়ে যেতে পারে সরকারের কাছে। এক সঙ্গে দুটো কাজ হয়।"

কথাগুলা বড় গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে। টুলুর দৃষ্টির সঙ্কীর্যমান প্রশংসাতে চম্পা ভিতরে ভিতরে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিল—শেষের কথাটিতে একটু হাসিয়া বলিল—"কি জানি হয়তো ভাবছেন, চম্পাও দিব্যি বোড়ের চাল দিতে শিখেছে। তা নয়, মনে এই রকম হচ্ছে আমার। সার কতটুকু কি জানি?"

টুলু অন্যমনস্ক ভাবেই একটু হাসিল, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল—"যদি তাতেও না দেয় চাল?"

চম্পা সেই হাসিটুকুই একটু অন্যরকম করিয়া বলিল—"চিরদিনই যে নিজেদের আসল রূপ লুকিয়ে রাখতে হবে বা সেটা সম্ভব, এমন কথা তো বলেননি মাস্টারমশাই।"

॥ এগার ॥

তিন দিন পরের কথা। টুলু আশ্রমের ছই-ওলা বলদ-গাড়িতে মহকুমা হইতে ফিরিতেছিল।

জ্যোৎস্না রাত্রি, বোধহয় ত্রয়োদশী কি চতুর্দশী তিথি হইবে, নির্মেঘ আকাশে প্রায় পরিপূর্ণ চাঁদ, উচু নিচু কাঁকুরে পথ দিয়া গাড়িটা মন্থর গতিতে চলিয়াছে, বলদ দুইটা এক-একবার গাড়োয়ানের হাতে ল্যাজ-মলা খাইয়া দশ-বিশ পা ছুটিয়া যাইতে খানিকটা দোলানি লাগিতেছে। টুলু একবার বলিল—"গিরিধারি, আস্তেই যেতে দাও—যেমন যাচ্ছে; কতক্ষণ লাগবে পৌছুতে?"

"ওদের ধম্মের ওপর ছেড়ে দিলে রাত কাবার ক'রে ছাড়বে না?—তেমন বাপের সুপুত্তুর বলদ মনে করেচেন?"

"তা হোক, রাস্তা খারাপ তায় চড়াই-ওৎরাই রয়েছে। এ বরং একটু ঘুমুতে পাব।"

অসলে তা নয়, এই মন্থরতাটুকু চমৎকার লাগিতেছে, আরও একটা কি লাগিতেছে চমৎকার—কাল থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাগুলার মধ্যে সেটাকে বেশ স্পষ্টভাবে ধরা যাইতেছে না। ঠিক ধরা যাইতেছে না বলাও ভুল—সেটা আসিয়া পড়িতেছে মাঝে মাঝে একেবারে মন ঘেঁষিয়া, টুলুই যেন তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছে। এ ধরনের লুকাচুরি জীবনে তাহার এই নূতন, কিংবা হয়তো কোন বসন্তপ্রভাবে আসিয়া থাকিবে কখনও, কোনও দূর অতীতে, আজ আর পড়ে না মনে।

পরশু রাত্রেই টুলু সাগরদহের আশ্রম থেকে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, মোটে পাঁচ দিনের চাল হাতে, নষ্ট করিবার মত সময় কোথায়? নরোত্তমকে না পাঠাইয়া নিজেই বাহির হইল, হয়তো চালের পারমিটের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত পৌছিতে হইবে, নরোত্তম সুবিধা করিতে পারিবে না। তাহার বরং এখানেই বেশি দরকার।···সবার ওপরের কথা, টুলুর ইচ্ছা করিতেছে নিজেই শক্ত কাজটা বাছিয়া লইতে।

কিন্তু থাকা হইবে কোথায় ?

নরোত্তমের সারা জেলাটারই সব যেন নখদর্পণে, বলিল—"হোটেল আছে ওখানে অনেক—কোর্ট-কাছারির জায়গা তো ?···আপনি কিন্তু থাকবেন গিয়ে মুরলীধরের হোটেলে। বাবাঠাকুর উড়ে-বামুন, ভাল লোক ; বরং আমার নাম করবেন।"

চম্পা বলিল—"কেন, তটিনীদিদি তো রয়েছেন, মনে ছিল না আপনার ?"

টুলু উত্তর করিল—"মনে থাকা···হ্যাঁ, সেখানই তো রয়েছে···। তবে না-বলাকওয়া···ছুট ক'রে গিয়ে ওঠা···মেয়েছেলে...হয়তো একাই রয়েছে···

চম্পা দাঁতে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে শুনিতেছিল, বলিল—"কি হয়েছে তাতে ? আর আপনি তো দিনে দিনে কাজ সেরে দিনে দিনেই বেরিয়ে পড়বেন।···না, সেইখানেই উঠবেন, একটু ভদ্রভাবে থাকতেও তো হবে। আর খুব আনন্দ হবে তাঁর।"

তাহাই শেষ পর্যন্ত ঠিক করিয়া বাহির হইলেও, রাস্তায় নানারকম ভাবিয়া চিন্তিয়া হোটেলে ওঠাই স্থির করিল টুলু। বরং ফিরিবার সময় খোঁজ লইয়া দেখা করিয়া আসিবে যদি তেমন মনে হয়—কেন না, আশ্রমে আসিলে দুঃখও করিতে পারে তটিনী। মোটের উপর অনিশ্চিতই রহিল ওটুকু।

আশ্রম ছাড়িয়া বাহির হইতে অনেক রাত হইয়া গিয়াছিল, বেলা যখন প্রায় দশটা, তখনও উহারা শহর থেকে মাইল দুয়েকের পথে।

সামনে খানিকটা দূরে একটি ছেলে সাইকেলে করিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ নামিয়া পড়িয়া পিছনের চাকাটার পানে চাহিয়া হতাশভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল, তাহার পর নিরুপায়ভাবে একবার সামনে-পিছনে চাহিয়া সাইকেল হাতে করিয়া চলিতে লাগিল।

মাথার উপরে চনচনে রোদ, কাঁকুরে জমি তাতিয়া উঠিয়াছে, গিরিধারীকে একটু জোরে চালাইতে আদেশ করিতে গাড়িটা পাশে আসিয়া পড়িল। টুলু প্রশ্ন করিল—"সাইকেলের টিউবটা বুঝি পাংচার হয়ে গেল ?"

ছেলেটি অপ্রতিভভাবে একটু হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ···দেখুন না, মাঝরাস্তায় ··"

"শহরেই যাবেন ?"

"হ্যাঁ।"

"বলদ-গাড়িতে আপত্তি না থাকে তো আসুন না, ওদিকেই যাচ্ছি।"

"আর এই বোঝা ?"—প্রশ্নটা করিয়া ছেলেটি আবার লজ্জিতভাবে একটু হাসিল।

টুলু গিরিধারীকে প্রশ্ন করিল—"ছইয়ের ওপর বেঁধে-ছেঁদে নিতে পারবে না তুমি সাইকেলটা ?"

সেই ব্যবস্থাই হইল। ছেলেটি আসিয়া গাড়িতে বসিল।

পনেরো-ষোলো বছর বয়স হইবে। রোদে মুখটা রাঙিয়া উঠিয়াছে, একটু বোধ হয় লাজুকপ্রকৃতির, মুখটা বাহিরের দিকে ঘুরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

খানিকটা গিয়া টুলু আবার প্রশ্ন করিল—"এখানেই বাড়ি ?"

ছেলেটি মুখ ঘুরাইয়া উত্তর করিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ···ঠিক বাড়ি বলা যায় না..."

এই পর্যন্ত বলিয়া স্থিরভাবে মুখের পানে সেকেণ্ড কয়েক চাহিয়া রহিল। দৃষ্টিতে কৌতুহল লক্ষ্য করিয়া টুলু একটু হাসিয়া বলিল—"কি দেখছ যেন মুখের পানে চেয়ে ; কোথাও..."

সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজের দৃষ্টিতেই কৌতুহল ফুটিয়া উঠিল, পাল্টাইয়া প্রশ্ন করিল—"তোমার বোন এখানে মেয়ে-স্কুলের মিস্ট্রেস্, না ?"

ছেলেটি খুশী হইয়া উঠিল, একটু হাসিয়া বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ ; আপনি গঞ্জডিহিতে ছিলেন—হেডমাস্টারমশাইয়ের বাসায়..."

"হ্যাঁ।"—বলিয়া টুলু এমনভাবে মুখটা ঘুরাইয়া লইল যেন খুশী হওয়া দূরে থাকুক, একটু বিব্রত হইয়াই পড়িয়াছে। ছেলেটি লাজুকই, এই ভাবান্তরে যেন একটু হতবুদ্ধি হইয়াই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আর কোন কথাই হইল না, দুজনে দুজনের চিন্তা লইয়া দুই দিকে মুখ ফিরাইয়া বাকি পথটা কাটাইল।

শহরের মধ্যে খানিকটা আসিয়া ছেলেটি বলিল—"এইবার নামব, ঐ আমাদের বাসা, ঐটে স্কুল।...আপনি কোথায় নামবেন ?"

খুব অস্বস্তিকর একটা অবস্থা, টুলু শেষের প্রশ্নটা এড়াইয়া বলিল—"ও, এইটে স্কুল ?···বেশ ছোটখাট বাড়িটি···এইখানেই নামবে ?"

"হ্যাঁ, আপনি কোথায় নামবেন ?"

"একটু এগিয়েই···কাছারিতে কাজ আছে একটু।"

"কোথায় থাকবেন ?···আমাদের এখানেই চলুন না।"

"আমি কাজ সেরেই তাড়াতাড়ি ফিরে যাব।"

"নাইতে খেতে তো হবে।...নামুন এখানেই।"

ছেলেমানুষি জিদে মুখে একটু হাসি লাগিয়া আছে। উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিল—"চলুন···দিদি বড্ড খুশী হবেন, না হ'লে এমন রাগ করবেন আমার ওপর !"

"ব'লো, ফেরবার সময় করবই দেখা।"

"সে হয় না।···ততক্ষণ কে তাঁর বকুনি সামলাবে ?"

নিজে নামিয়া গিয়াছে, একটু স্পষ্টভাবেই কথাটা বলিয়া, আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া গাড়োয়ানকে বলিল—"গেটের মধ্যে দিয়ে ভেতরে চলো।"

ব্যবস্থাটা পাকা করিয়া নিজে একরকম ছুটিয়াই বাসার দিকে চলিয়া গেল।

পরিপূর্ণ জোৎস্নার মধ্য দিয়া জনহীন পথে গাড়িটা মন্থরগতিতে আগাইয়া চলিয়াছে। পরশু থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার মনে মনে পুনরাবৃত্তি করিতে করিতে টুলু এইখানে আসিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। মনটাকে অন্য চিন্তার দিকে ঘুরাইল—আশ্রমে হঠাৎ সেই মূর্ত দুর্ভিক্ষের বন্যা···ফ্যানের নালার ধারে দুইটা মৃতদেহ···টানা উনানের সামনে চম্পা রাঁধিতেছে—গাছ-কোমর করিয়া শাড়িটা জড়ানো—চম্পা, তাহার শিষ্যা···মাস্টারমশাইয়ের সেই চিঠি—একটা মেয়ে যদি সুধরে যায় তো একটা জাতি সুধরে যেতে পারে...আরও উঠুক চম্পা—ঊর্ধ্বে অনন্তে, মাস্টারমশাই ওপর থেকে আশীর্বাদ করুন টুলুর প্রিয় শিষ্যাকে···

এত করিয়াও মনটা কখন্ আবার তটিনীর বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছে। ভাই গিয়া আগেভাগে খবর দেওয়ায় তটিনী ভিতর থেকে বারান্দায় আসিয়া

দাঁড়াইয়াছে। কোন কাজে ব্যস্ত ছিল—মনে হইল যেন রান্নাই, কপালের চুলগুলা ভিজা ভিজা, মুখটা একটু রাঙা। একমুখ হাসিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—"আপনি!···হঠাৎ কানন বলতে বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না।··· তার ওপর আবার বললে আপনি নামতে চাইছিলেন না···"

বরান্দায় উঠিতে উঠিতে টুলু হাসিয়া বলিল—"খবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নালিশও হয়েছে?"

"নালিশের কি দোষ বলুন? এখানে এসে···"

"দোষ নয়, রাগিয়ে দিলে অভ্যর্থনাটা কি রকম হবে তাই বলছি।"

তটিনীর পিছনে পিছনে ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবে, গিরিধারী বারান্দার নিচে আসিয়া প্রশ্ন করিল—"হোটেলে তা হ'লে উঠবেন না দাদাঠাকুর এখানেই···?"

তটিনী ঘুরিয়া চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বলিল—"অবাক করলেন! রাগের আর কি দোষ বলুন? হোটেলে উঠতে যাচ্ছিলেন! আমি বলি, কেউ বুঝি আত্মীয়কুটুম্ব আছে।"

গাড়োয়ানটাকে বলিল—"না, তুমি বলদ খুলে জল-টল খাওয়াও!"

ঘরের মধ্যে আসিয়া তিনজনে বসিল; বাসাটা ছোট, কিন্তু বেশ তরতরে ঝরঝরে। ঘরগুলির জানালা-দোরে পরদা, বসিবার ঘরের আসবাব সামান্য হইলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সাদা লংক্লথ দিয়ে ঢাকা, বারান্দায় গুটিকতক ফুলগাছের আর পাতাবাহারের টব, বেশ একটি স্নিগ্ধ পরিবেশ।

টুলু আসিবার কারণটা বলিল, সাগরদহের অবস্থাটা বর্ণনা করিল—ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, তাহার পর দক্ষিণ থেকে আর্ত বুভুক্ষুদের দল···

তটিনী গম্ভীরভাবে এক নিশ্বাসেই সবটা শুনিয়া গেল, তাহার পর বলিল—"চাল কিন্তু পাবেন না তো!"

"খুব যে আশা ক'রে এসেছি তা নয়, তবু একবার চেষ্টা করতে তো হবে, ভাবছি, খোদ সাব-ডিভিশনাল অফিসারের সঙ্গেই দেখা করব একবার।"

"সেটা চাল পাওয়ার চেয়েও অসম্ভব।"

কি একটু ভাবিল, তাহার পর সমস্ত ব্যাপারটাই মন থেকে যেন নামাইয়া

দিয়া বলিল—"আচ্ছা, সে হবে 'খন। আগে উঠুন, স্নান-টান সেরে নিন, সমস্ত রাত্রি নিশ্চয় ঘুম হয় নি।"

ও প্রসঙ্গটাই চাপা দিয়া দিল। স্নানাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য কাননকে রাখিয়া চলিয়া গেল। টুলু প্রস্তুত হইলে রেকাবিতে জলখাবার সাজাইয়া আনিয়া গল্প জুড়িয়া দিল—চম্পা কেমন আছে—আর হীরা—প্রায় মনে পড়ে হীরার কথা—মাত্র একবার, তাও ঐটুকুর জন্য দেখিয়াছে তো?—কিন্তু কি ক্ষমতা আছে, যেন মায়ায় জড়াইয়া ফেলিয়াছে তটিনীকে। টুলু হয়তো বলিবে, কোথায় আর গেলেন হীরাকে দেখিতে! ছুটিতে কানন আসিয়া পড়িল যে, তবুও ভাবিয়াছিল যে কাননকে লইয়াই একবার যাইবে। এমন সময় আসিয়া পড়িল ঝড়···

ঝড়ের কথাটা আনিয়া ফেলিয়া তটিনী সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গটা বদলাইয়া ফেলিল—বেশ সহজ কৌশলের সঙ্গেই করিল এটুকু—এই প্রলয় ঝঞ্ঝার গায়েই আনিয়া ফেলিল গঞ্জডিহির সেই ঝড়ের বিকালটি, যাহার সমস্ত বিক্ষোভটুকু মুছিয়া গেছে, আছে শুধু একটা মিষ্ট স্মৃতি মনের কোণে লাগিয়া···টুলু আবার সেই রকম একটি স্কুল গঠন করুক না সাগরদহে—এবার সাগরদহ দেখিয়া আসা অবধি তটিনীর ভয়ানক ইচ্ছা হইয়াছে—খুব বড় প্ল্যান তটিনীর, সবাই মিলিয়া স্কুল চালাইবে—রতনকে রাজি করিয়াছে চিঠি লিখিয়া, সে বি, এ, পাশ করিয়া সাগরদহে গিয়া উঠিবে একেবারে—কাননও রাজি···

"নয় কানন?—আমাদের হয় না এই সব কথা ব'সে ব'সে?"

কানন টুলুর পানে চাহিয়া বলিল—"ফুরসৎ পেলেই দিদির ঐ কথা—কী যে দেখে এসেছেন সাগরদহে···"

টুলু তটিনীর মুখের উপর কৃতজ্ঞ দৃষ্টি তুলিয়া বলিল—"আপনি আমার চেয়ে এত বেশি ভাবেন সাগরদহের কথা!···"

তটিনী উত্তর দিল কাননের দিকে চাহিয়া—"না ভেবে যেন উপায় আছে!—একবার চল না কানন এই ছুটিতেই—ঝড়ের ব্যাপারটা একটু জুড়িয়ে আসুক—কী চমৎকার সে জায়গা, কি বলব তোমায়! নদীর ধার, যে দিকে চাও—সবুজ আর সবুজ; আমাদের সাঁকরেলের ওদিকের মতন নয়···এই! কানন এবার আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে···জানেন? সাঁকরেলের নিন্দে কাননের সামনে

করবার জো নেই—আমি বলি, যেটা ভাল সেটাকে ভাল বলব না?…ওকে কি ব'লে এর ওপর চটিয়ে তুলি বলুন তো?"

তটিনী হঠাৎ একটু লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া গেল, কানন টুলুর দিকে চাহিয়া বলিল—"বলে, তোমার সাঁকরেলের দিদির চেয়ে তোমার সাগরদহের বউদিদিটি পর্যন্ত ঢের ভাল, গিয়ে বরং মিলিয়ে দেখো…"

তটিনী টুলুর দিকে চাহিয়াই হাসিয়া বলিল—"চটলে ওর মনের কথাটা বেরিয়ে পড়ে, বলে—আমার সাঁকরেলের দিদিকে কবে বলেছি আমি ভাল?…

কথাগুলি একটি একটি করিয়া মনে পড়িতেছে টুলুর, অন্যমনস্ক হইবার করিতেছে চেষ্টা, যেন উল্টা পথে তটিনীর ভঙ্গিটুকু হাসিটুকু পর্যন্ত আসিয়া পড়িতেছে।

এই নির্জনতা তটিনী দিয়া যেন কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া যাইতেছে, এই জ্যোৎস্নাপ্লুত রজনীতে মেয়েটিকে বড় রহস্যময়ী বলিয়া মনে হইতেছে—যখন গম্ভীর থাকে, যেন থমথম করিতে থাকে, তাহার পর এ কথা সে কথার মধ্যেই ওর গাম্ভীর্য কখন যায় কাটিয়া, মুখরতায় যেন ছলছল করিয়া ওঠে—তিনবার দেখিল তিনবারই এইরকম—অথচ ওর তরলতার নিচেও থাকে চিন্তা, গাম্ভীর্য —মনটা কর্তব্যের দিকে থাকে সজাগ। টুলু বুঝিয়াছিল, এই যে ঝড়ের কথা, টুলুর আসিবার উদ্দেশ্যের কথা চাপা দিয়া নিতান্তই অবান্তর কথা সব আনিয়া ফেলিতেছিল তটিনী, তাহার একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল—অতিথির মনটাকে বেদনা থেকে একটু মুক্ত করিয়া রাখা—যেন মনে মনে বলা—এখানে যতটুকু আছেন একটু ভুলে থাকুন তো…

আহারের সময়েও এই সব গল্পই—নায়ক হইল বেশি করিয়া হীরা—তাহার রূপ, তাহার ভঙ্গি, তাহার কথা। টুলু একটু লজ্জিতভাবে তাহার কীর্তি-কলাপেরও কতক কতক বর্ণনা করিল। ভাই-বোন দুজনেই অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিল,—কী ভাবে গড়িয়া তুলিবে টুলু তাহার ছেলেকে?—এসব নূতন জগৎ গড়িবার ছেলে—আর এই স্কুল-কলেজের ধরা-বাঁধা পথে নয়…

আহারের পর তটিনী জোর করিয়াই একটু নিদ্রা যাওয়াইল টুলুকে। কিশোরীর মত ওর সমস্ত আনন্দ-কাকলির মধ্যে যে চিন্তার স্রোত বহিতেছিল

টুলু সোজা হৈয়ে পাইল জাগিয়া উঠিয়া। তটিনী বলল—"ভেবে-চিন্তে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা হবার একটা উপায় ঠাউরেছি। চলুন, দেখি যদি হয়।"

॥ বারো ॥

টুলুকে লইয়া তটিনী গেল তাহার স্কুলের সেক্রেটারির কাছে।

সৌম্যকান্তি বৃদ্ধ, এখানকার একজন বড় ব্যবহারজীবী, শহরে যথেষ্ট প্রতিপত্তি।···তটিনী পরিচয় করাইয়া দিল টুলুর—তাহার নিজের সঙ্গে কি করিয়া জানাশোনা, গঞ্জডিহিতে কি লইয়া ছিল, এখন কি লইয়া আছে। একটা জিনিস বড় ভাল লাগিল টুলুর—একজন অনাত্মীয় পুরুষকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে; কোন মিথ্যা আত্মীয়তা আরোপ করিল না, একটি কথা সামলাইয়া বলিল না; স্বচ্ছ সত্যটি বৃদ্ধের কাছে ধরিয়া দিল।

পরে যাহা বলিবার টুলুই বলিল, বৃদ্ধ সব শুনিয়া গেলেন, প্রশ্নাদি খুব বেশি করিলেন না, মুখের দিকে যেন একটু বেশি চাহিয়া থাকিয়া শুনিলেন সবটা, মুখে প্রশংসার একটি শান্ত মৃদু হাস্য ফুটিয়া রহিল। শেষ হইলে তটিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"দেখা করতে চায় না মা, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যে কত গলদ তুমি তো জানো; তবু আমি দেখাটা করিয়ে দোব, চিঠি না দিয়ে নিজেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব, কিন্তু কাজ কতদূর হবে বলতে পারি না তো।"

টুলু বলিল—"আমাদের আশ্রমের একটা সুনাম আছে গবর্মেণ্টে, সেই ভরসায়..."

বৃদ্ধের মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিলেন—"কিন্তু সুনাম আর রাখতে পারছেন কোথায়? দুশো লোককে খাওয়াচ্ছেন—ভগবান পর্যন্ত যাদের অপরাধের জন্যে গবর্মেণ্টের হয়ে সাজা দিচ্ছেন। চালের বদলে লোকগুলোকে ঠেঙিয়ে মারবার জন্যে লাঠি চাইতে আসতেন, সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যেতেন, কাজের সুবিধের জন্যে লাঠির বদলে বোধ হয় বন্দুক জুগিয়ে দিত।···উঃ, কি অত্যাচার! কলকাতার কাগজে এখনও খবরগুলো ছাপতে পর্যন্ত দেয় নি···"

মুখটা একটু ঘুরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

দেরি হইল আবার প্রকৃতিস্থ হইতে, তাহার পর আবার আগেকার মত শান্ত

উঠে বলিলেন—"বেশ, আজ তো রইছ লোগায় এন্‌কোয়ারিতে, কাল সকালে আমি একটু ব্যস্ত থাকব, বিকেলে আপনি আসবেন।"

তটিনীর পানে চাহিয়া বলিলেন—"চেষ্টা আমি করব যথাসাধ্য মা, কিন্তু কী যে অবস্থা হয়েছে, কী যে হবে!..."

গাড়ি অলস গতিতে চলিয়াছে। বলদ দুটাকে তাড়না করিতে না পারায় গিরিধারী বোধ হয় একটু অপ্রসন্ন।

কাল এতক্ষণ কী করিতেছে টুলু?...প্রশ্নটা মনে উঠিতেই টুলু মনটাকে আবার অন্য প্রসঙ্গে টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল—চম্পার কথা, হীরকের কথা, দুর্গতদের কথা, এখন দুইটা আহারের ব্যবস্থা হইতেছে—না পাওয়া যায় চাল, একটা আহার বরাদ্দ করিতে হইবে—বিকালে—যতদিন যায় টানিয়া-বুনিয়া, উপায় কি?...কখন যেন নিঃসাড়ে মনটা আবার তটিনীর বাসায় আসিয়া গেছে... কাল এতক্ষণ বাসার সামনে খোলা জায়গাটুকুতে তিনটি চেয়ারে তাহারা তিনজনে বসিয়া। এই রকম জ্যোৎস্না, বারান্দার টবে কয়েকটি রজনীগন্ধার স্তবক—মৃদুগন্ধ জ্যোৎস্নার সঙ্গে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, প্রথমে শুধু কাননই ছিল, তাহার পর তটিনী আসিল রান্না শেষ করিয়া।...কী যে একটা অপরূপ আস্বাদ এই সময়ের রাত্রিটিতে, টুলুর মনটা ক্রমাগতই তন্দ্রালস গতিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঐখানটি ত আসিয়া পড়িতে লাগিল। এ যেন এক অনাবিষ্কৃত জগতের একটি ক্ষীণ তটরেখা, সামনে এতটুকু আভাস—বাকিটা শুধুই স্বপ্ন আর স্বপ্ন।

সকালে কাননের সঙ্গে ছোট শহরটুকু ঘুরিয়া আসিল। এদিকেও ঝড় বেশই হইয়াছে, গাছ উপড়াইয়া পড়িয়াছে, কয়েকটা চালা-বাড়িও পড়িয়াছে কিছু কিছু, তবে লোক কিংবা গরু-বাছুর নষ্ট হয় নাই। দুর্গতরাও আসিয়াছিল দলে দলে, ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমেই তাহাদের ধরিয়া ধরিয়া লরিতে করিয়া দূরে দূরে ছাড়িয়া আসা হইয়াছে—শহরের হাওয়া ঠিক রাখিবার জন্য। অন্নসত্র খোলা মানা, তবে কিছু দুর্গত লুকাইয়া থাকিয়াই গেছে শহরের মধ্যে, প্রায় সব গৃহস্থই অবস্থানুযায়ী দুজন, পাঁচজন, দশজন বা তাহারও অধিক লোকের ভার লইয়াছে। টুলুর মুখে প্রশ্নটা বাহির হইয়া গেল—"তোমার দিদিও রেখেছেন নাকি কিছু?"

কানন লজ্জিতভাবে শুধু একটু হাসিল প্রথমটা, তাহার পর টুলু উত্তরের প্রত্যাশায় চাহিয়া আছে দেখিয়া বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল তাই চালের সন্ধানে বেরিয়েছিলাম!"

কৌতূহলটা ঠিক শোভন হইতেছে কি না ভাবিয়া না দেখিয়াই টুলু ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল—"কজন আছে? কোথায় আছে তারা? দেখলাম না যে?"

"আছে স্কুলে, স্কুল পুজোয় তো বন্ধ এখন…"

"কজন?"

এবার অন্য প্রশ্ন না থাকায় কানন উত্তরটা আর এড়াইতে পারিল না, একটু অনিচ্ছার হাসি হাসিয়া বলিল—"জন দশেক হবে বোধ হয়।…দিদি কিন্তু চান না কেউ জানে…"

"কেন? ম্যাজিস্ট্রেটের…?"

"না, সে নয়; গেরস্ত যদি নিজের বাড়িতে রাখে—রাস্তায় ঘোরাঘুরি না করে, ম্যাজিস্ট্রেটের আপত্তি কি থাকতে পারে? দিদি চান না, তার কারণ…"

একটু হাসিয়া মুখ তুলিয়া বলিল—"জানেনই তো দিদিকে।"

বিকালে সেক্রেটারির সঙ্গে গিয়া টুলু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত দেখা করিল।

সাহেব পদগৌরবে, এ দেশী লোকই। সেক্রেটারি পরিচয় দিয়া দিলে টুলুর কাছে সব শুনিয়া একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"তা এসব বাই কেন? আজকাল নিজেরই জুটছে না লোকের…দেশসেবা?"

চাহনিতেই একটা তীক্ষ্ণ কিছু ছিল, যাহার জন্য টুলু সাবধান হইয়া গেল, বলিল—"দেশসেবা যে নয়, এ কথা বললে মিথ্যে বলা হবে; তবে আজকাল দেশসেবার নামে যা হচ্ছে চারিদিকে তা যে নয়, একটু জোর ক'রে বলতে পারি আপনাকে। ইন্সট্যুশনটা কাছাকাছি কয়েকখানা গ্রামের সহানুভূতির ওপর নির্ভর করে; লোকগুলোকে ফিরিয়ে দিলে সেটা হারাতে হয়, তা নইলে সত্যিই আমাদের না আছে সময়, না আছে সামর্থ্য এসব উপদ্রব ঘাড়ে করবার।"

স্থিরভাবে শুনিতেছিলেন, প্রশ্ন করিলেন—আগস্টের রেকর্ড কি?—রাস্তা কাটা, টেলিগ্রাফ ছেঁড়া…"

টুলু বলিল—"সেটা আমার মুখে শুনবেন কি, তখনকার থানায় এন্‌কোয়ারি ক'রে জানবেন।...আগস্টে লোকদের কাছে আমাদের বদনাম হয়েছে ব'লেই আমাদের এই হ্যাপাটা ঘাড়ে করতে হ'ল।"

"নামটা কি বললেন?"

"শান্তি-আশ্রম।"

ম্যাজিস্ট্রেট সেক্রেটারির পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"বরং অশান্তি আশ্রম নাম হ'লে তার স্বরূপটা স্পষ্ট বোঝা যায়, এ যে···"

টুলুও হাসিল, বলিল—"অশান্তি-আশ্রম নাম দিয়ে আগস্ট আন্দোলনে যদি এই রকম কুটোটিও না নেড়ে ব'সে থাকতাম তো ওদের হাতে আমাদের দশাটা কি হ'ত সেটাও একবার ভেবে দেখতে অনুরোধ করি স্যার।"

সেক্রেটারি হাসিলেন, ম্যাস্ট্রেটও অল্প অল্প যোগ দিলেন, বলিলেন—"খাঁটি হয় তবে তো, সেই কথাই বলছি। শান্তি খাঁটি হ'লে আমরাও তো বাঁচি।"

একটি ডি, ও, চিঠির কাগজ টানিয়া লইয়া খস্‌খস্‌ করিয়া কি লিখিয়া খামে ভরিয়া ঠিকানাটা লিখিয়া দিলেন, কলিং বেল টিপিতে আরদালি আসিয়া দাঁড়াইল, বলিলেন—"সীল ক'রে দাও।"

চিঠিটা টুলুদের ওদিককার থানার দারোগার নামে।

বারান্দা থেকে নামিয়া খানিকটা আগাইয়া আসিয়া সেক্রেটারি টুলুর পিঠে দুইটা সাবাসির মৃদু আঘাত দিয়া বলিলেন—"বাঃ, দিব্যি!···কিন্তু খামের মধ্যে যে চাল আছেই এটা ধ'রে নেবেন না।"

টুলু প্রশ্ন করিল—"কেন?"

"অবশ্য থাকতেও পারে, তবে ফাঁকিও থাকে, এদের আর মনুষ্যত্ব নেই।"

টুলু হঠাৎ মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া কি একটু ভাবিল, তাহার পর সেক্রেটারিকে একটু অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া আবার উঠিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল, বলিল—"একটু মাফ করবেন স্যার, একটা কথা বলতে এলাম, লোকগুলোকে সরিয়ে দেবারই চেষ্টা করব, তা হ'লে আর আপনার দয়ার সুযোগ নেবার দরকার হবে না। গবর্মেণ্টের নিজের কত দরকার চালের দেখছি তো—এই যুদ্ধের বাজারে।"

ম্যাজিস্ট্রেট একটু লঘুভাবে হাসিয়া বলিলেন—"and government would be grateful (গবর্মমেণ্ট এর জন্যে কৃতজ্ঞ থাকবেন)।"

চিঠিটা পকেটে রহিয়াছে টুলুর। হাতটা গিয়া আবার খামটার উপর পড়িল, অনেকবারই পড়িয়াছে, কড়া খাম, গালার উপর সীলমোহরের কড়া পাহারা। কি রহস্য আগাইয়া চলিয়াছে? টুলুর মুখটা কঠিন হইয়া ওঠে, তবে সেও প্রস্তুত, তাহার জন্যই শেষে এটুকু গাহিয়া আসিল।

কিন্তু মনের কাঠিন্য আজ টিকিতেছে না যেন। কাল থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাগুলির মধ্যে কোথাও এমন কিছু যেন লুকাইয়া আছে যাহা নিজের উত্তাপে জীবনের সব কঠিনতাই গলাইয়া জীবনকে সহজ সরল স্বচ্ছন্দ করিবার ক্ষমতা রাখে···

কী যে সেটা টুলুর মন যেন বুঝিতে পারে না।

আসলে তাহাও নয়; সন্ন্যাসী টুলুর মন স্বীকার করিতে চায় না বুঝিতে পারাটাকে, তাই প্রতিপদেই তটিনীর চিন্তাটাকে প্রাণপণে ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।

চারিদিক নিঃশব্দ। কাঁকরের রাস্তার গায়ে শ্লথ-গতি চাকার ঘর্ষণে ভরা জ্যোৎস্নার গায়ে একটা অতি ক্ষীণ শব্দ-তরঙ্গ তুলিতেছে। রাত্রি হইয়া উঠিয়াছে। গভীর চিন্তার মোহেই হোক, কিংবা চিন্তাটাকে রুখিয়া রাখিবার পরিশ্রমেই হোক, চোখে তন্দ্রা আসিতেছে নামিয়া, টুলুর আচ্ছন্ন চেতনায় মনে হইতেছে, জীবন শুধু এই জটিল সমস্যা আর বিরোধ-বিক্ষোভের আগুনের মাঝখানে বসিয়া বৈরাগীর তপস্যাই নয়, আরও যেন কিছু কোথায় লুকাইয়া আছে; তন্দ্রার মধ্যে তাহারই সন্ধানে মনটা এক সময় গেল তলাইয়া।

॥ তেরো ॥

আশ্রমে না গিয়া টুলু কয়েক মাইল ঘুরিয়া আগে থানায়ই গিয়া উঠিল, নষ্ট করিবার সময় একেবারেই নাই যে। দারোগা চিঠিটা পড়িয়া বলিল—"বেশ, পাবেন, হবে ব্যবস্থা।"

টুলুর মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিল—"একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করতে হবে—এইটুকু অনুরোধ স্যার, আমাদের স্টক একেবারে নেই।"

"এতে লেখাই রয়েছে—আর্জেণ্ট।"

কি মনে হওয়ায়—হয়তো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অনুগ্রহভাজন মনে করিয়াই—চিঠিটা টুলুর চোখের সামনে তুলিয়া ধরিল। টুলুর দীপ্ত মুখখানা একেবারে যেন ছাইয়ের মত হইয়া গেল।—লেখা আছে, তদন্ত করার পর সাত দিনের জন্য পঁচিশ জন লোকের চালের ব্যবস্থা করা হোক।

এতবড় ভাবান্তর দারোগার দৃষ্টি এড়ায় না, একটু কৌতূহলী হইয়াই প্রশ্ন করিল—"মুষড়ে গেলেন যে! কম হয়েছে? চাল যে একেবারেই কাউকে দেওয়া হচ্ছে না। কতজন লোক আপনাদের?"

বিপদের মুখে এমন তড়িৎগতিতে জীবনে আর কখনও টুলুর এমন চমৎকার বুদ্ধি জোগাইয়া যায় নাই, একটু আবদারের হাসি হাসিয়া বলিল—"না স্যার, লোকের সংখ্যা ঠিকই আছে, জন তিরিশের জায়গায় না হয় পঁচিশ জন করেছেন—পাঁচজন কারটেল্ ক'রে; ও আমরা চালিয়ে নোব। একটু দ'মে গেলাম সময়টা দেখে—মোটে সাতদিন!"

একটু দুঃখের ভান করিয়া মুখটা নিচু করিল, তাহার পর একটু খোসামোদের ভান করিল; মুখটা তুলিয়া অল্প হাসিয়া বলিল—"বেশ, আপনারা রয়েছেন, আমাদের মালিক তো আপনারাই।"

টুলু নিজের এই নবতম শক্তির মধ্যে যেন মাস্টারমশাইয়ের আশীর্বাদ অনুভব করিতেছে।

দারোগা হাসিয়া বলিল—"বেশ, সে হবে 'খন···দেখা যাবে।"

ভদ্র মুখের খোসামোদ নিশ্চয় বেশি সুড়সুড়ি দেয় মনে, মুখে একটু অমায়িক হাসিও ফুটিল।

"কখন আসছেন তদন্ত করতে স্যার?"—একটু উদ্বিগ্ন ভাবেই মুখের পানে চাহিয়া রহিল টুলু—উদ্বেগটাকে চাপা দিবার জন্য বলিল—"আজ বিকেলে? তা হ'লে ওদের খাওয়ার ব্যবস্থাটা বিকেলেই করি আর কি, দেখেন আপনি, ওরা একটু বল পায় মনে।"

"তাই আসা যাবে।"

আর একটা দরকারী কথা বাকি, টুলু ভিতরে ভিতরে মস্তিষ্কচালনা করিতেছিল, খোসামুদী আবদারের স্বরে বলিল—"আর একটি অনুরোধ স্যার, যদি রাখেন…"

খোসামোদের রসান্ তো আছেই, তাহা ভিন্ন যে উপরে খাতির পাইয়াছে নিচের খাতিরও তাহার সুলভ, দারোগা হাসিয়াই বলিল—"আবার কি?"

"চেয়েছিলাম তিরিশ জনের, স্যাঙ্কশন্ করেছেন পঁচিশের। ওঁর মন জুগিয়ে চলাই ভাল মনে করছি—যখন দয়ার ভাব আছে…আপনি অনুগ্রহ ক'রে লিখে দেবেন—বাকিদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, শুধু, the rest have been removed."

"দেবেন তো সরিয়ে?"—ঠোঁটে মৃদু হাসি লইয়া একটু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

টুলুও পরাজয়ের অভিনয় করিয়া মাথাটা নিচু করিয়া অল্প হাসিল। দারোগা প্রশ্রয়ের হাসি হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা, যান। সে সব হবে 'খন।"

টুলু উঠিয়া নমস্কার করিয়াও আরও একবার বলিল—"শুধু, the rest have been removed, স্যার।"

আর একবার নমস্কার করিয়া গাড়িতে উঠিল। মোড় ঘুরিয়া থানাটা দৃষ্টির অন্তরালে হইয়া যাওয়া মাত্রই বলিল—"যত জোরে পার চালাও গিরিধারী।"

"সমস্ত রাত চলেছে, হাক্লান্ত রয়েছে দাদাঠাকুর।"…কতকটা সত্যই বলিল, কতকটা বোধ হয় কাল তাড়না করিতে পায় নাই সেই আক্রোশে।

টুলু বলিল—"তা হোক্, ন্যাজ-মলা দাও…একটু ক'ষে দাও, ও-রকমে হবে না!"

ঘুর-পথে প্রায় দশটার সময় আশ্রমে নামিল, অন্য কোনদিকে না গিয়া একেবারে বাসায় গিয়া উঠিল। চম্পা সামনেই ছিল, প্রশ্ন করিল—"পেলেন চাল?"

"না, নরোত্তমকে একবার ডেকে পাঠাও, আছে তো এখানে?"

হীরা বাপ আসিয়াছে দেখিয়া খেলা ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিতেছিল, চম্পা তাহাকে বলিল—"তোমার দাদাভাইকে ডেকে নিয়ে এসো···শোন, আস্তে আস্তে ডেকে নিয়ে এসো, হৈ-চৈ ক'রো না।"

টুলুর মুখের পানে চাহিয়া কোন প্রশ্ন করিতে যেন সাহস হইল না, এত বিচলিত দেখে নাই কখনও ওকে, অত্যন্ত অন্যমনস্ক, কপালের শিরগুলা ঠেলিয়া উঠিয়াছে, চোখ দুইটা লাল, রাত্রিজাগরণের জন্যই নয়, যেন জ্বলিতেছে। চম্পা চুপ করিয়া দরজায় ঠেস দিয়া বার কয়েক শুধু চোখ তুলিয়া দেখিল, একবার চোখাচোখি হইতে টুলু বুকে খানিকটা বাতাস ভরিয়া লইয়া বলিল—"আবার 'আর্জেণ্ট!' ঠাট্টা হয়েছে—ঠাট্টা!"

মাঝখান থেকে হঠাৎ একটা কথায় চম্পা চুপ করিয়াই রহিল।...নরোত্তম আসিতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, টুলু বলিল—"না, থাকো তুমি।" হীরক কপাটের বাহিরে থেকেই বাপের চেহারা দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, চম্পা তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিল—"যাও, খেলোগে এখন।"

টুলু নরোত্তমের পানে চাহিয়া বলিল—"না, চাল পেলাম না—দেখা করে না—অনেক কষ্টে হ'ল তো একটা সীল-করা খাম দিলে থানার দারোগার নামে —সেইখান থেকেই আসছি—মাত্র পঁচিশ জনের চাল—সাতদিনের যুগ্যি, তার সঙ্গে ঠাট্টাও আছে একটু—রসিকতা!"

যেন ছেলেমানুষের সঙ্গে কথা কহিতেছে, নরোত্তম এইভাবে একটু হাসিয়া শান্ত কণ্ঠেই বলিল—"চাল যোগাড়ের পথ নয় ওটা, তা···। এখন ফল এই হ'ল যে···"

চম্পার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"মা-মণি, একটু ওদিকে যাও তো।"

টুলু বলিল—"চম্পা সব জানে, কি বলছিলে বল।"

নরোত্তম খুব বিস্মিত হইল না, চম্পার মুখের উপর দিয়া দৃষ্টিটা একবার ঘুরাইয়া আনিয়া বলিল—"বলছিলাম ফল এই হ'ল যে, এখন সে-সব করতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়ে যাবে কাদের কাণ্ড, তারপর সঙ্গে সঙ্গেই···"

টুলু বলিল—"সে দিক আমি বাঁচিয়ে এসেছি, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গেয়ে এসেছি—নজরখানাটা ভেঙে দেবারই চেষ্টা করব—গবর্মেণ্টের চাল অপচয়

করতে চাই না; দারোগাকে জপিয়ে এসেছি—মাত্র পঁচিশজনই আছে ব'লে রিপোর্ট দেবে।"

চম্পার পানে চাহিয়া একটু অদ্ভুতভাবে হাসিয়া বলিল—"আমি এতদিনে পুরোপুরি মাস্টারমশায়ের মন্ত্রশিষ্য হয়ে উঠেছি।"

দুজনকেই বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল—"না, দু'শ লোক দেখে লিখবে—পঁচিশ, এতবড় আত্মীয়তা করতে পারি নি, সেটা মুখের খোসামোদে হয়ও না। ব্যবস্থা করতে হবে, সেই জন্যেই ডেকেছি তোমায়। এদের মধ্যে কিছু সর্দার-গোছের আছে, না?—যাদের কথা চলে?"

নরোত্তম বলিল—"আছে, দলে দলেই এসেছে তো?...হ্যাঁ, এখন তো দু'শ নয়, আবার প্রায় আড়াইশয় এসে ঠেকেছে।"

"তা আসুক, তুমি তাদের ডেকে নিয়ে এসো, গোলমাল না হয়।"

নরোত্তম চলিয়া গেলে চম্পা বলিল—"সমস্ত রাত জেগে আছেন, নেয়ে খেয়ে নেবেন না আগে?"

টুলু একটু ব্যঙ্গের স্বরেই প্রশ্ন করিল—"আগে ঐটেই দরকার?"

চম্পা একটু অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া গেল। টুলু বুকে হাত দুইটা জড়াইয়া মাথা হেঁট করিয়া পায়চারি করিতে লাগিল। একটু পরে নরোত্তম জন দশেক লোককে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল—তাহার মধ্যে দুইজন স্ত্রীলোক, টুলু দরজার কাছে আসিয়া বলিল—"একটা কাজ করতে হবে তোমাদের, রান্না তাড়াতাড়ি করিয়ে দিচ্ছি, সবাইকে খাইয়ে-দাইয়ে ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়িতে জন ত্রিশেককে এখানে রেখে বাকি সবাইকে কখানা গ্রামের মধ্যে লুকিয়ে ফেলতে হবে আজকের রাত্তিরটার জন্যে—নরোত্তম ব্যবস্থা ক'রে দেবে। কথাটা নিয়ে চেঁচামেচি হবে না, বাইরে প্রকাশ পাবে না।" নরোত্তম আরম্ভই করিয়া দিল ব্যবস্থাটা, ওদের দিকেই চাহিয়া—"বলোগে, দারোগা আসছে টের পেলেই লরিতে ক'রে চালান দেবে।"

টুলু বলিল—"যারা থাকবে তাদের ছেলে বুড়ো যে কাউকে জিগ্যেস করলে যেন বলে—আমরা বরাবর এত কটিই আছি। আর এক কথা, যারা থাকবে—জন তিরিশ, তাদের জন্যে ঠিক তিনটের সময় আর একবার রান্না চড়বে।"

নরোত্তম টুলুর পানে চাহিয়াই বলিল—"তাদের রান্না বরং এখন চড়িয়ে কাজ নেই।"

"এতক্ষণ উপোসী থাকবে ?"

"নইলে হাভাতের মতন জলুস বেরুবে কি ক'রে চেহারায় বাবাঠাকুর ? দারোগার দিষ্টিতে সেটুকু তো পড়া দরকার ! একে তো খেয়ে-দেয়ে পুরন্ত হয়ে এসেছে সবাই।"

দুঃখের মধ্যেও টুলু আর চম্পার ঠোঁট একটু হাসিতে কুঞ্চিত হইয়া উঠিলই।

উহারা চলিয়া গেলে টুলু বলিল—"এখন সে ব্যাপারের কি করবে বলো নরোত্তম ? দেরি তো একদণ্ড করা চলে না।"

"হবেও না দেরি, সবাই তোয়ের আছে, আজ রাত্তিরেই।"

টুলু একটু বিস্মিতভাবে চাহিয়া বলিল—"তোয়ের আছে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তোয়ের আছে বইকি। আপনার এ উপায় তো খাটবে না, জানতুম···"

অভিযানের ব্যাপারটা যতক্ষণ কল্পনার মধ্যে ছিল, একরকম ছিল, প্রায় বাস্তবরূপে দেখিয়া টুলু একটু বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া রহিল—রীতিমত একটা ডাকাতি ···তাহারাই করিতে যাইতেছে···আজ রাত্রেই···

প্রশ্ন করিল—"কজন থাকবে ?"

এর গায়ে-গায়েই আবার প্রশ্ন করিল—"কিন্তু নিয়ে আসবে কি ক'রে ? এক-আধ থলে নয়তো···"

নরোত্তম একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল—"দাঁড়ান, আপনাকে সব ব্যবস্থাই দেখিয়ে দিই।

আবার চুপচাপ। টুলু সেইভাবে ঘাড় হেঁট করিয়া পায়চারি করিতে লাগিল, চম্পা ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আওয়াজের মধ্যে এক সময়ে সজোরে তাহার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল ; টুলু মুখ তুলিয়া চাহিল না ; কানে যায় নাই।

মিনিট তিন-চার পরে নরোত্তম ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে নয়জন লোক, তিনজনকে টুলু চেনে, দুইজন এই আশ্রমেরই, বাহির থেকে আসিয়া কাজ

করে, আর একজন ভুখা-মিছিলের লোক, আশ্রমের অন্নজীবী বাকি ছয়জনকে টুলু কখনও দেখে নাই; তাহাদের মধ্যে একজন বিশেষ করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—লোকটা ছ-ফুটের ওপর লম্বা, একমুখ দাড়ি-গোঁফ, কেশবহুল দক্ষিণ হাতে একটা লোহার বালা ; শিখ একজন।

নরোত্তম বলিল—"এরাই থাকবে।"

শিখটিকে দেখাইয়া বলিল—"এর একটি গাড়ি আছে, তাইতেই মাল আসবে।"

সবাইকে যাইতে বলিল, চলিয়া গেলে একটু পরিচয় দিল,—বাইরের ছজনের মধ্যে পাঁচজন মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে শেষের দিকে ছিল, এখন দক্ষিণে গিয়া তমলুক অঞ্চলে কাজ করিতেছে। শিখ লোকটির একটু ইতিহাস আছে, তমলুক অঞ্চলে খান তিনেক লরি চালাইয়া রোজগার করিতেছিল, বঞ্চন-নীতির ফলে দুইখানি লরি গবর্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়া বাকি একটি লইয়া তাহাকে নির্দিষ্ট রেখার বাহিরে চলিয়া আসিতে বাধ্য করে। পরশু রাতে সে নরোত্তমের সহিত নিভৃতে দেখা করিয়া বলে—যদি দরকার হয় তো সে দু বোরা চাল দিতে পারে।···নিবিড়তর পরিচয় হয়, বলিতেছে—সে চাটগাঁ আর্মারি ব্যাপারে ছিটকাইয়া বাহির হইয়া পড়ে ; ঠিক করিয়াছিল, শান্তভাবেই জীবন যাপন করিবে, গবর্মেণ্টের নূতন অত্যাচারে আবার ভেতরে ভেতরে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। চাল কোথা থেকে কি ভাবে যোগাড় করিল বলিল না, তবে দিয়াছে অত্যন্ত সস্তায়। বলিতেছে, একটা পেট আর একটা লরি চলিলেই হইল তাহার।

অদ্ভুত সময়ে অদ্ভুত সমাবেশ হয়, অদ্ভুত রকম খবর সব আসিয়া পৌঁছায়। টুলু একবার চম্পার পানে চাহিল, সে তাহার দিকেই স্থির ভাবে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

নরোত্তম প্ল্যানের বাকিটাও বলিল—এখান থেকে প্রায় পনেরো মাইল ঘুরে, বড় রাস্তা থেকে নামিয়া মাইল পাঁচেকের মধ্যে প্রসাদ মাইতির বড় আড়ৎ, গ্রাম থেকে একটু তফাতে নদীর পাড়ে ঘাট ঘেঁষিয়া, অভিযানটা সেইখানে ; লোকটার বর্ধমান অঞ্চলে দুইটা কল, কলিকাতায় নাকি খান তিনেক বাড়ি কিনিয়াছে।

নরোত্তম বলিল—"এক সুবিধে, নরিতে ক'রে ওর চাল মাঝে মাঝে আসেই, কারুর চোখে পড়বে না।"

টুলু বলিল—"বেশ মোটামুটি বুঝলাম, নেয়ে খেয়ে তোমায় আবার ডেকে নেবো, এখন যাও, ওদিকটা তাড়াতাড়ি সামলে নাওগে; শিখটিকে আগে সরিয়ে ফেল এ-তল্লাট থেকে।...তা হ'লে আমরা এগারো জন হলাম..."

নরোত্তম বিস্মিতভাবে চাহিয়া বলিল—"আপনিও নিজে যাবেন?...এসব ব্যাপারের কিছু বোঝেন না..."

টুলু একটু হাসিয়া বলিল—"তোমরাও যে পেশাদারী লুটেরা এটা তো আজ প্রথম শুনলাম।"

নরোত্তম চলিয়া গেল, চলার ভাব দেখিয়া মনে হইল, মুখে যাহাই বলুক, টুলুর এই যাবার কথাটায় ওর মনে যেন হঠাৎ উৎসাহের জোয়ার আসিয়া গেছে।

টুলু চম্পাকে প্রশ্ন করিল—"কি বলো চম্পা?"

বেশ সহজ চম্পার মুখের ভাবটা, সঙ্কল্পে কঠিনও, বলিল—"বলব আর কি? ঠিকই করেছেন, আশ্রয় দিয়ে তো আর লোকগুলোকে মেরে ফেলা যায় না।"

উত্তরে, উত্তরের ভঙ্গিতে টুলু বেশ একটু বিস্মিতই হইল।

স্নানাহারটা সারিতে একটু বিলম্ব হইল। শেষ হইলে একবার বাহিরে আসিয়া দেখিল, প্রাঙ্গণ একেবারে খালি, দুর্গতদের জন ত্রিশেক লোক চোখে পড়ে—ছেলেমেয়ে আর বুড়োরা ঘোরাঘুরি করিতেছে, যাহারা একটু সক্ষম, কয়েকজন লোকের সঙ্গে ওদিককার উনান ও ফ্যানের নর্দমাগুলা বুজাইতে ব্যস্ত। নরোত্তম কাছে আসিয়া বলিল—"সব এখুনি সরিয়ে দিলুম বাবাঠাকুর, দারোগা পুলিসকে বিশ্বাস করতে আছে? বলবে চারটেয় আসছি, এসে পড়বে বোধ হয় একটায়। আর ঐ একটা রেখে বাকি উনুনগুলোও বুজিয়ে দিচ্ছি এখনকার মতন, ওপরে খড়-কাঠ ছাইপাঁশ দিয়ে ভরিয়ে দোব, টের পেতে হবে না সুমুন্দিকে..."

সত্যই খুব উৎসাহ আসিয়াছে নরোত্তমের। ক্লান্তিতে, ঘুমে শরীর ভাঙিয়া আসিয়াছিল, একটু এদিক ওদিক দেখিয়া লইয়া টুলু নিদ্রা দিতে গেল।

॥ চৌদ্দ ॥

যতক্ষণ টুলু জাগিয়াছিল চম্পা মুখের সহজ ভাবটা ধরিয়া রাখিল। টুলুর বরং মনে হইল, নরোত্তমের মতই চম্পার মুখটাও যেন নূতন উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। টুলু মুগ্ধ হইল, খনির গহ্বরের সেই মেয়ে চম্পা, এত উঁচুতে উঠিবার ক্ষমতা ছিল না তাহার।

টুলু ঘুমাইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চম্পা একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিল, এত গাঢ় আতঙ্কের ছায়া গঞ্জডিহির পরে আর পড়ে নাই তাহার মুখে, যেন সব গেল, কী করিবে, কোথায় যাইবে, ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না। খানিকটা ছটফট করিয়া বেড়াইল, তাহার পর এক সময় টুলুর ঘর থেকে দোয়াত কলম ও একটু কাগজ লইয়া নিজের ঘরে গিয়া লিখিতে বসিয়া গেল। নরোত্তম বাহিরের কাজের তদারকে ব্যস্ত ছিল, চিঠিটা শেষ হইলে চম্পা তাহাকে ডাকিয়া লইয়া অফিস-ঘরে চলিয়া গেল এবং একটু ভিতরের দিকে গিয়া সামনাসামনি হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"একটা কাজ তোমায় করতে হবে নরু।"

ভাব দেখিয়া নরোত্তম বিস্মিত হইল, চম্পা একটু একটু কাঁপিতেছে, ঠোঁট দুইটা একবার থরথর করিয়া উঠিল, সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা, চম্পা বলিল কথাটা আদেশের স্বরে, যা কখনও ও করে না—ও পণ্ডিতমশাইয়ের কন্যা, এই আশ্রমের কর্ত্রী এইরকম একটা দাবির সহিত।

প্রশ্ন করিল—"কি কাজ মা-মণি?"

চম্পা ঠোঁটের একটা কোণ একটু কামড়াইয়া ধরিয়া মুখটা ঘুরাইয়া লইল একটু, যেন নিজের সঙ্গে লড়াইয়ে আর পারিতেছে না, তাহার পর মুঠার চিঠিটা নরোত্তমের সামনে বাড়াইয়া বলিল—"এই চিঠিটা—একটুও দেরি না ক'রে সবচেয়ে তোমার যে বিশ্বাসী আর যে সবচেয়ে আগে পৌঁছুতে পারবে তাকে দিয়ে মহকুমা শহরে পাঠিয়ে দাও—মেয়ে-স্কুলের মাস্টারনী—নাম তটিনী হাজরা—তার

হাতে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে কি সবার মেয়ে নিয়ে চ'লে আসবে—এই কুড়ি-বাইশ মাইল পথ যে না ফিরিয়ে চ'লে আসতে পারবে—আর..."

কেহ আসিতেছে কি না একবার ফিরিয়া দেখিয়া লইল, তাহার পর আদেশের ভঙ্গি একেবারে ভুলিয়া, একপা অগ্রসর হইয়া নরোত্তমের ডান হাতটা ধরিয়া দীন মিনতির স্বরে বলিল—"আর আজকের রাতটা তোমরা থেমে যাও নরোত্তম—মাত্র একটা রাত—আমি তোমাদের পণ্ডিতমশাইয়ের মেয়ে—ভিক্ষে চাইছি তোমার কাছে—শুধু একটা রাত থেমে যাও। কোনও রকমে ওঁকে বুঝিয়ে বল, শুধু আমি যে বলেছি—এইটুকু প্রকাশ করবে না, আর কখনও তোমার কাছে কিছু চাই নি..."

নরোত্তম বাঁ হাতটা চম্পার কাঁধের ওপর একটু টানিয়া দিয়া বলিল—"একটু থির হও মা-মণি, কি এমন ব্যাপার যে অত ক'রে বলছ তুমি?...যাব না আজ, তার হয়েছে কি?...দ্যাও তোমার চিঠি...কাক-কোকিলে জানবেনা এ কথা..."

একটু যেন আশ্বস্ত হইয়া ভিতরে ভিতরে আরও অসংযত হইয়া উঠিল চম্পা, চিঠিটা মুঠার মধ্যে চাপিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আত্মদ্বন্দ্বের মর্মান্তিক যাতনায় মুখটা এক-একবার কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে, সেই যাতনার মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে যেন কঠিন হইয়াও উঠিতেছে, বার দুয়েক এদিক ওদিক চাহিয়া চিঠিটা দুই হাতে কুঁচি কুঁচি করিয়া ছিঁড়িয়া কোণের দিকে ফেলিয়া দিল, ঠোঁট দুইটা আবার কামড়াইয়া ধরিয়াছে, নরোত্তমের দিকে চাহিয়া বলিল—"থাক্ নরু, বড্ড ভুল হয়ে যাচ্ছিল, নিজের কথাই ভাবছি শুধু...ওদের কি হবে?...যাও।"

নরোত্তম একটু বিমূঢ়ভাবে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, প্রাঙ্গণে খানিকটা গিয়া নিজের মনেই বিড় বিড় করিয়া বলিল—"হুঁঃ, মেয়েছেলে এনে থোবেন ইর মধ্যে—হবে না?"

চম্পা একটু স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সবার দৃষ্টি থেকে নিজের মুখটা যেন কোন রকমে বাঁচাইয়া হনহন করিয়া বাসায় চলিয়া গেল, তাহার পর একেবারে নিজের ঘরে গিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; রুদ্ধকণ্ঠে একটা চাপা কাতরানি—"আমি আর পারছি না—আর ওপরে ওঠবার ক্ষমতা নেই

আমার—কি হবে ?···আমি তোমার পায়ের নাগাল আর পাচ্ছি না—আর সাধ্যি নেই আমার—প'ড়ে রইলাম—আমায় ক্ষমা ক'রো—ক্ষমা ক'রো আমায়···"

তদন্তের আর তেমন গুরুত্ব ছিল না, দারোগা আর সাত-আট মাইল পথ ঠেলিয়া নিজে আসিল না, হেড কনস্টেব্‌ল্‌-গোছের একজন আসিয়া, দারোগার চেয়েও ঢের বেশি তম্বিসহকারে চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া, যথারীতি বিদায় দক্ষিণা পকেটে করিয়া চলিয়া গেল।

তাহার পর রাত্রি যখন নিষুপ্ত, আহারাদি সারিয়া আশ্রমের লোকেরা আর দুর্গতেরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন, আশেপাশের গ্রামের মধ্যেও এক শেয়াল-কুকুরের রব ছাড়া অন্য কোন শব্দ নাই, দশজনে অফিস-ঘরে জমা হইল। চম্পাও ছিল, কি মনে করিয়া টুলু ওকে বাসা থেকে সঙ্গে করিয়াই ডাকিয়া আনিয়াছিল। নাই শুধু শিখ লোকটি, সে মাইল চারেক তফাতে বড় রাস্তায় লরি লইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

নরোত্তম একবার সব মিলাইয়া লইল—সবার কাছেই একটা করিয়া অস্ত্র, তা ভিন্ন তালা ভাঙিবার এক সেট যন্ত্র, টর্চ, খানিকটা ক্লোরোফরম্। টুলু বলিল "সবাই তোয়ের, তা হ'লে বেরুতে পারা যায় ?"

তাহার পর হঠাৎ চকিত হইয়া বলিল—"এই দেখো, পরকে জিগ্যেস করছি, অথচ আমি নিজেই তোয়ের নেই।"

পকেট থেকে চাবিটা লইয়া চম্পার হাতে দিয়া বলিল—"খাটের শিয়রের বাক্সটার মধ্যে মাস্টারমশাইয়ের রাইফেলটা আছে, নিয়ে এস।"

এইটুকু যে সাজানো—ইচ্ছা করিয়াই তোলা—চম্পার বুঝিতে বাকি থাকে না, একটু পরে রাইফেলটা আনিয়া হাতে তুলিয়া দিতে দিতে হাসিয়াই বলিল—"আমার পরীক্ষা আর শেষ হবে না আপনার কাছে!"

টুলুও একটু হাসিয়াই বলিল—"হবে।···জানো নরোত্তম, আমি মাস্টার-মশাইয়ের হাত থেকে তাঁর অস্ত্র চেয়ে দীক্ষা নিয়েছিলাম। আজ যখন ফিরে আসব—যদি আসি, চম্পা আমার হাত থেকে এই রাইফেলটা নিজেই নেবে চেয়ে। জোর ক'রে তো আর দীক্ষা হয় না···"

আর বিলম্ব না করিয়া উঁহারা আশ্রম ছাড়িয়া ধীরে ধীরে অন্ধকারের সঙ্গে মিশাইয়া গেল। চম্পা আদেশমত কয়েকজনকে ডাকিয়া অফিস-ঘরে শয়ন করাইয়া বাসায় চলিয়া গেল।

সেইদিনকার মত ঝড়, সেদিন ছিল বাহিরে, আজ অন্তরে, তাহারই প্রলয়-আলোড়নে উৎক্ষিপ্ত মন লইয়া চম্পা চুপ করিয়া শুইয়া রহিল, আর পারে না, যেন শতছিন্ন হইয়া যাইতেছে।...চোখে বন্যা নামিল, শুকাইল, আবার নামিল, তাহার পরে এক সময় কি করিয়া মনটা গেল শান্ত হইয়া। মনে ধীরে ধীরে অন্যভাবের ঢল নামিল—পারিবে চম্পা, পারিতে হইবে, এই দেশেই—এই জেলাতেই তো সত্তর বছরের বৃদ্ধা প্রাণ দিল—এই সেদিন—বৃদ্ধা, জীবনের শক্তি যাহার সমস্তই ক্ষয়িত—চম্পা পারিবে না কেন?—আর না পারার অর্থ যে টুলুকে হারানো, এতদিনের তপস্যা নিজের হাতে মুছিয়া ফেলা..

হীরাকে লইয়া শুইয়া ছিল, বুকে চাপিয়া আপন মনেই বলিল—"পারব রে হীরা, নোব দীক্ষা, দেখিস—বাবা-মায়ে একসঙ্গে না তোয়ের হ'লে তুই তোয়ের হবি কোথা থেকে?—কত মা তোর মতন হীরের হার যে বুক থেকে নামিয়ে দিলে, তুই তোয়ের না হ'লে যে আবার এই রকম হবে...আমি পারব—দেখিস..."

হীরাকে তুলিল, ভাল করিয়া জাগাইয়া বলিল—"কি রকম ছেলে রে তুই?—মাকে একা রেখে বাবা চলে গেল, ছেলে কোথায় পাহারা দেবে, না, ফোঁস ফোঁস ক'রে ঘুমুচ্ছে!"

হীরা একটু বিমূঢ়ভাবেই বলিল—"কোথায় গেছেন মা বাবা?—ও-ঘরে নেই?"

ঝোঁকের মাথায়ই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছে, চম্পা বুঝিল ভুল হইয়া গেছে; একটু ভাবিয়া বলিল—"যাবেন আর কোথায়? আশ্রমেই রয়েছেন, বাইরে; নতুন আবার একদল এল এক্ষুনি কিনা। তা আশ্রমে গেলেও আমার ভয় করে না? তোর পাহারাতেই তো আমায় রেখে যান...তুই এদিকে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিস!"

বাহিরে শৃগালের দল বোধ হয় দ্বিতীয় যাম ঘোষণা করিল। হীরা একটু

ফোঁপিয়া আসিয়া মাকে আলগাভাবে জড়াইয়া বলিল—"না, কিছু ভয় নেই, আমি জেগে আছি, ঘুমুব না আর।"

"ওঁকে আমিও তাই বললাম—তুমি যাও, আমার হীরে রয়েছে, কাকে ভয়?…হ্যাঁ রে হীরে, তুইও বড় হয়ে তোর বাবার মতন এই সব গরিব-দুঃখীদের দেখবি তো?—যাদের ঘর প'ড়ে যাচ্ছে, মরাই ভেসে যাচ্ছে, ছেলেমেয়ে বুক থেকে খ'সে পড়ছে, যারা ফ্যানের ওপর মুখ থুবড়ে মরছে…"

হীরার বীরত্ব সাড়া দিয়া উঠিতেছে, বলিল—"জানো মা, এই সব করেছে ইংরেজে—দাদাভাই বলেছে, আমি আগে তাদের দেশছাড়া ক'রে তারপর এদের ঘর বেঁধে দোব, মরাই তুলে দোব, ফ্যান খেতে দোব না…দাদাভাই আমায় সব বলেছে মা, আমি রামের মতন রাজ্যসুখ চাইব না, লক্ষ্মণের মতন চোখে ঘুমের বুড়ি নামলে তাকে তীর দিয়ে মেরে ফেলব—খালি দেখে বেড়াব, কোথায় কার দুঃখু আছে…কোথায় কে খেতে পাচ্ছে না…কে কার ধানের মরাই ভেঙেছে…"

ছল করিয়া শোনে মা, বুকে এ এক নূতন ধরনের আলোড়ন জাগে, সন্তানকে চাপিয়া চাপিয়া ধরে। ওর বাপ এখন বোধ হয় এই কাজই করিতেছে—কে গরিবের মরাই ভাঙিয়া, একমুঠি অন্নের সংস্থান হরণ করিয়া, অন্নের পাহাড় করিতেছে জমা,—ভগবানের উদ্যত কোপের মতই হীরার বাপ তাহার মস্তকে আসিয়াছে নামিয়া—এতক্ষণ—এই নিশীথ রজনীতে—রামচন্দ্রের মতই সর্বত্যাগী বাপ ওর, লক্ষ্মণের মতই তপস্যায় অতন্দ্র।

প্রতিজ্ঞায় মায়ের মনও দৃঢ় হইয়া উঠে, তাহার পর আবার আশীর্বাদে হইয়া আসে শিথিল, সন্তানের পিঠে ধীরে ধীরে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে চম্পা বলে—"না, তোকে ওসব করতে হবে না হীরে, আমি আশীর্বাদ করছি। এ দুঃখের বোঝা ভগবান দিয়েছিলেন তোর দাদুর ঘাড়ে, তোর বাবার ঘাড়ে, তাঁরাই যত দুঃখের কাঁটা পরিষ্কার ক'রে দেশকে তোদের হাতে দিয়ে যাবেন, তোরা সেখানে সুখে ফসল ফলিয়ে যাবি…"

বুকে চাপিয়া ধরে, বলে—"বুঝতে পারিস আমার আশীর্বাদ হীরা?—তোদের কাজ হবে আরও বড়, তোরা বড় বড় শহর বসাবি, দেবতাদের জন্যে

বড় বড় দেউল তুলবি, বিশ্বের জন্যে বড় বড় বাড়ি তুলবি; তোরাও রাতকে রাত জেগে কাটাবি—তবে তোদের রাতজাগা এ রকম দুঃখের জাগা হবে না; তোরা নতুন নতুন রাস্তা গড়বি, নিজের দেশকে গ'ড়ে নিয়ে তোরা সেই রাস্তায় দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়বি—তোদের দেশের লোকেরা এক সময় করেছিলেন তাই, জানিস হীরা?—তোরাও আবার করবি—এ দেশের লোক ব'লে তোদের পূজো করবার জন্যে দেশ-বিদেশের লোক···"

হীরা বাধা দেয়—"মা!"

আবেগের মুখে ডাকটা বোধ হয় বেশি মিষ্ট লাগে, চম্পা বুকের একটা চাপ দেয়, প্রশ্ন করে—"কি রে হীরে?"

"সেই যে—'থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে···না মা?"

"হ্যাঁ, বল্ তো হীরে, শুনি।"

ছড়া আওড়াইবার পালাই চলে এর পর, এই পথেই মা-ছেলের যুগ্ম আবেগটা মুক্তি পায়, একটা নয়, যত সব জানা আছে হীরার—হেম, রবীন্দ্র, সত্যেন্দ্র, নজরুল···যাঁরা সবাই আশার গান গাহিয়া গেছেন, মহত্ত্বকে বন্দনা করিয়া গেছেন, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মানবাত্মার বিজয় অভিযানের পুণ্যগাথা রচিয়া গেছেন।

হীরার বাপ গেছে সেই পথই পরিষ্কার করিতে, দুঃখের যাত্রা—দিনের আগে রাত্রির মত···চম্পা পারিবে, শুধু টুলুই নয়তো, তাহার সন্তানও যে চম্পাকে করিতেছে দীক্ষিত, ছেলেও যে মাকে গড়ে।

॥ পনেরো ॥

কাঁচা পথ, কিন্তু মুরাম কাঁকরের বলিয়া মোটামুটি বেশ মসৃণ, অন্ধকার ভেদ করিয়া লরিটা ছুটিয়া চলিল। প্রায় মাইল পাঁচেক আসার পর সামনে একটা তেমাথা পড়িল, এইখান থেকে ডান দিকের পথটা উত্তর-পূর্বে মহকুমা শহরের দিকে চলিয়া গেছে, টুলুদের যাইতে হইবে বাঁ দিকে।

নিতান্ত আকস্মিক একটা ঘটনা—একটু ভুল—তাহাতেই চাল-অভিযানের সবটা ওলট-পালট হইয়া গেল; ড্রাইভারের ভুলে লরিটা ডান দিকের রাস্তায়

ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, শ'খানেক গজ যাওয়ার পরই নরোত্তম বলিল—"শহরের রাস্তা ধরেছেন শিখজি, ব্যাক করুন।"

ব্যাক করিতে যে সময়টা লাগিল তাহাতে আর একটা ব্যাপার হইল; রাস্তাটা শ' তিনেক গজ দূরে কতকগুলা গাছপালার আড়ালে ঘুরিয়া গেছে, যতক্ষণ লরিটা পিছু চলিয়া তেমাথায় আসিয়া পড়িয়াছে, দেখা গেল, সেই গাছপালার আড়াল থেকে একটা ছইওলা বলদ-গাড়ি বাহির হইল, তাহার পর আর একটা। ফুটফুটে জ্যোৎস্না, বেশ স্পষ্টই পড়িল নজরে।···লরিটা মুখ ঘুরাইয়া বাঁ দিকের রাস্তায় ঢুকিল। নরোত্তম হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল, খানিকটা যাওয়ার পরই ড্রাইভারের বাঁ হাতের ওপরটা চাপিয়া বলিল—"শিখজি, একটু থামান তো।"

গাড়িটা ব্রেকের শব্দ শুনিয়া থামিয়া পড়িল।

নরোত্তম টুলুর পানে চাহিয়া বলিল—"আমি বলছিলাম দু-দুটো গাড়ি হঠাৎ একের পিঠে এক ক'রে আসে কেন?"

"কি হয়েছে তাতে?"

"অনেক সময় এই সব চাল আসে আড়ৎদারদের, চোরাগুদামে সরাবার এ-ই সময় কিনা।"

একটু নিস্তব্ধতা গেল, নরোত্তমের ভিতরে অন্য কে একজন যেন জাগিয়া উঠিতেছে। টুলু বলিল—"গেরস্তরও তো হতে পারে।"

নরোত্তম নিজের চিন্তাতেই অন্যমনস্ক ছিল, কথাটা যেন কানে গেল না; লরি থেকে লাফাইয়া পড়িয়া বলিল—"দেখতে হচ্ছে, মা-অন্নপূর্ণা যদি মাঝপথেই হাতে তুলে দেন তো সিঁদকাঠি ধ'রে কি হবে?···কোশ খানেকের মধ্যে গাঁ-ও নেই এখানে। আমি একাই যাই, একটা গলা-খাঁকারি দিলেই এসে পড়বেন সব।"

একটা অদ্ভুত অনুভূতি টুলুকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল। মনে পড়িল, এই পথ দিয়াই কাল রাত্রে কি সব রঙিন স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে আসিয়াছিল—এই জ্যোৎস্না ছিল কালও। গলা-খাঁকারি শোনা গেল না, খানিক পরে নরোত্তমই আসিয়া উপস্থিত হইল, একটু দূরে দাঁড়াইয়াই বলিল—"বাবাঠাকুর, আপনাকে নামতে হচ্ছে একবার।"

রহস্যটা আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে, টুলু উৎসুক ভাবে লাফাইয়া কাছে গিয়া দাঁড়াইতে নরোত্তম হঠাৎ ঝুঁকিয়া তাহার পদস্পর্শ করিয়া বলিল—"বাকসিদ্ধ হয়ে গেছি, পায়ের ধুলো ছ্যান—মা-অন্নপূর্ণা নিজের হাতে নিয়ে এসেছেন অন্ন, একেবারে কৈলেস থেকে, দেখবেন কি রূপ মায়ের!"

টুলু বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করিল—"কি ব্যাপার নরোত্তম?"

"ব্যাপার একখানি মহাভারত, আসুন না।"

আর কিছু না বলিয়া ঘুরিয়া পা বাড়াইল।

ও-রাস্তায় উঠিয়া একটু যাইতেই টুলু দেখিল, সত্যিই একটি স্ত্রীলোকই নামিয়া রাস্তায় দাঁড়াইল, তাহার পরেই একজন পুরুষ; আর কয়েক পা গিয়াই টুলু চিনিল—তটিনী আর কানন।

তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া বলিল—"আপনারা—এদিকে—এত রাত্রে? —ও-গাড়িটাতে কি?"

"চাল নিয়ে যাচ্ছি।"

"কোথায়?"

"আপনার ওখানেই।"

টুলুর গুছাইয়া প্রশ্ন করিবার অবস্থা নাই দেখিয়া বলিয়া চলিল—"আপনি চ'লে আসবার পরই সেক্রেটারির ওখানে যাই; আপনাকে যা বলেছিলেন আমাকেও তাই বললেন—চাল দিলে চিঠিতে সীলমোহর করত না; শুধু তাই নয়, দারোগার হাতে এন্‌কোয়ারির ভার দেওয়াটাও তাঁর তেমন ভাল বোধ হ'ল না; চিঠি সাধারণত কাছাকাছি কোন আড়ৎদারের নামে দিয়ে দেয়।...সব শুনে আমি তাঁকেই ধ'রে বসলাম—চাল কোন রকমে জোগাড় ক'রে দিতেই হবে। আজ প্রায় সমস্ত দিন ওঁর বাড়িতেই ধরনা দিয়ে বসেছিলাম। বড্ড স্নেহ করেন, সমস্ত দিন প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন—কতজনকে ডেকে—বুড়ো মানুষ—নিজেও কত জায়গায় গিয়ে। আজকাল প্রায় সমস্ত আড়তের ওপর গবর্মেণ্টের কড়া নজর, কেউ স্বীকার করলে না। নিরাশ হয়ে সন্ধ্যের সময় বাসায় ফিরে এসে চুপ ক'রে বারান্দায় ব'সে আছি, এমন সময় তাঁর লোক এসে হাজির, ডেকে পাঠিয়েছেন। যেতে বললেন, চাল পেয়েছেন। একটি বড় মাড়োয়ারী

আড়ৎদারের মোকদ্দমা হাতে এসেছে, তিনি ফী না নিয়ে চাল দেওয়ার শর্তে রাজি হয়েছেন।"

টুলুকে দুটা প্রশংসার কথা বলিবার সুযোগ দিবার জন্য তটিনী তাহার মুখের দিকে একটু স্মিত হাস্যের সহিত চাহিয়া চুপ করিল। টুলু বলিল—"অদ্ভুত রকম ভাল লোক তো?"

তটিনী কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলিল—"কী যে স্নেহ করেন ব'লে ওঠা যায় না।··· আড়ৎদার কিন্তু একটা শর্ত চাপিয়ে বসল—"

কথাটা অর্ধেক বলিয়াই চুপ করিয়া গেল। টুলু প্রশ্ন করিল—"কি শর্ত?"

তটিনী লজ্জিতভাবে বলিল—"এই যা দেখছেন, গভীর রাতে তার আড়ৎ থেকে চাল গিয়ে নিয়ে আসতে হবে; তা ভিন্ন···"

তটিনী চুপ করিয়া গেল;—ও-কথাটাই ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"সে শুনবেন 'খন এখন চলুন, চাল নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয় আজকাল।"

টুলু বলিল—"কি একটা লুকুচ্ছেন।" একটু হাসিয়া বলিল—"এত শর্তের চাল আমিও শর্তের ওপরই নোব। ব্যাপারটা কি খুলে বলতে হবে।"

তটিনীকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া কাননের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"কি ব্যাপার কানন?"

কানন একবার দিদির পানে চাহিয়া বলিল—"আর বলেছে, যদি রাস্তায় ধরে তো কোন্ আড়ৎ থেকে নেওয়া হয়েছে নামটা প্রকাশ করতে পারা যাবে না।"

টুলু ভীতভাবেই তটিনীর পানে চাহিয়া বলিল—"এতটা বিপদ আপনি ঘাড়ে ক'রে নিয়েছেন! সেক্রেটারিই বা···"

তটিনী তাড়াতাড়ি বলিল—"তিনি জানেন না আমার আসার কথা···নিজের লোক দিয়েছেন, ঐ গাড়িতে আছে।···কিন্তু আপনিই যে বিপদ বাড়াচ্ছেন রাস্তার মাঝখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে।···চলুন।···হ্যাঁ, আপনিই বা চলেছেন কোথা এত রাত্তিরে? একটা লরির মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে না?"

নরোত্তম প্রশ্নটার জন্য যেন ওৎ পাতিয়া ছিল, টুলু মুখ খুলিবার আগেই একপা আগাইয়া আসিয়া বলিল—"সেই যে আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম না, আপনি বললেন—আগে বাবাঠাকুরকে ডেকে আনতে। আমরা চালের জন্যেই যাচ্ছিলাম,

ইদিকে এক জায়গায় লুকিয়ে খয়রাৎ করছে এক মাড়োয়ারী। তিনজন আছি, একটা লরি ভাড়া ক'রে নিয়ে যাচ্ছি, যা পাই।"

টুলুর পানে চাহিয়া একটা চোখের কোণ একটু টিপিয়া বলিল—"তা হ'লে আমি লরিটাকে ডেকে আনিগে বাবাঠাকুর, আপনারা দাঁড়ান।"

একটু পরেই লরিটা আসিয়া দাঁড়াইল, আরোহী শুধু শিখ ড্রাইভার।

দুইটা গাড়ি খালাস করিয়া বোরাগুলা লরিতে চাপানো হইল, শেষ হইলে নরোত্তম একবার তটিনীর দিকে একবার টুলুর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"এবার?"

টুলু তটিনীর পানে চাহিয়া বলিল—"তাই তো ভাবছি, লরিতে যদি যাই সবাই, আধ ঘণ্টায় পৌঁছে যাওয়া যায়; কিন্তু…"

তটিনী হাসিয়া বলিল—"নেহাৎ বলেন তো যাব, তবে আমার তো লরিতে চেপে যেতে…

কানন যেন একটু শিহরিয়া উঠিয়াই বলিল—"না দিদি, তুমি লরিতে লাফাতে লাফাতে যাচ্ছ—এ পিক্‌চার আমি প্রাণ ধ'রে…"

তিনজনেই হাসিয়া উঠিল। কানন টুলুর দিকে চাহিয়া বলিল—"তা ছাড়া এমন চাঁদনি রাতটা আধ ঘণ্টায় কাবার করতে মায়া হয়, মনের কথাটাই বললাম আপনাকে।"

টুলুর মনের কথাও তাহাই, তটিনীর কি কে জানে; কাননকে এতটা উচ্ছ্বসিত হইতে দেখিয়া তাহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, তাহার পর নরোত্তমকে বলিল—"শুনলে তো? তোমরা এগিয়ে যাও তা হ'লে, আমরা ভোরের দিকে পৌছব।"

অন্য গাড়িটাকে ভাড়া দিয়া ফিরাইয়া দেওয়া হইল।

চারিদিকে খোলা মাঠ, জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটিতেছে, ছইয়ের তরল অন্ধকারে তিনজনে মুখামুখি হইয়া গল্প করিতে করিতে চলিল। তটিনী চাল সংগ্রহের বাকি ইতিহাসটা শেষ করিল, কতকটা নিজে কতকটা কাননের মুখ দিয়া।… আগে কাননকে দিয়াই সেক্রেটারির লোকটিকে সঙ্গে দিয়া চিঠিটা পাঠাইয়া দেয়, নিজে থাকে গাড়ির ছইয়ের মধ্যে। আড়ৎদার টালমাটাল করায় তটিনীকে

ভিতরে যাইতে হয়। কানন হাসিয়া বলিল—"দেখলে যখন নেহাৎই নাছোড়বান্দা, নিজেই সব ব্যবস্থা ক'রে দিলে। শুধু কি তাই?—বরং বেশ খাতির ক'রেই বললে—আপনাকে নিজে আসতে হবে না, উকিল সাহেবের আত্মীয়া আপনি—একটা চিঠি লিখে দিলেই হবে এর পর দরকার পড়লে।"

কানন সহজ কৌতুকবোধেই হাসিয়া বলিল কথাগুলা, তটিনী কিন্তু এইখানে মুখটা লইল ফিরাইয়া।

অদ্ভুত লাগে টুলুর, লোকটাকে ক্ষমা করা উচিত নয়, তবু এই জ্যোৎস্না-তরল রাত্রিটার মধ্যে, এই অন্তরঙ্গ গল্পের মধ্যে, এই যেন নিঃশব্দে ভাসিয়া যাওয়ার মধ্যে কি একটা আছে, যাহার জন্য অতি সহজেই ক্ষমা করিতে পারিল ও।—নারী জিতিবে পুরুষ হারিবে, নারীর সৌন্দর্যের কাছে পুরুষের বর্বর স্বার্থবোধ শিথিল হইয়া গিয়া শিভ্যাল্‌রির নামে সেই বর্বরতা অন্যরূপে জাগিয়া উঠিবে—এর চেয়ে সহজ, সরল, সার্বভৌম সত্য টুলুর কাছে আজ যেন আর কিছুই নাই। মনে একটি প্রশ্ন, এতটুকু দ্বিধা জাগিল না। এই ইতিহাসেরই নিজের দিকের অধ্যায়টাও বলিল টুলু—দারোগার সহিত বোঝাপাড়ার কাহিনীটা—হাসির মধ্যে সুমিষ্ট টিপ্পনী দিয়া।…গঞ্জডিহিতে কাঞ্চনতলায় মাস্টারমহাশয়কে প্রথম দেখা থেকে আজ পর্যন্ত এতগুলা রাত্রিদিনের মধ্যে আজকের রাত্রিটি বড় যেন আলাদা, বড় যেন উদার, মুক্ত, নিঃসঙ্কোচ…

অন্য গল্পও হইল; কাল টুলু এই পথ দিয়াই এই সময় একলা আসিতেছিল—একই পথ, কাল একলা আসা আর আজ তিনজনে গল্প করিতে করিতে যাওয়া যে তাহার অদ্ভুত লাগিতেছে—এই অতি সামান্য কথাটাও কেন যেন কি উদ্দেশ্যে বলিয়া ফেলিল,—আজ কথা কওয়াতেই যেন একটা মাধুর্য পাওয়া যাইতেছে, যতই তুচ্ছ ততই যেন আরও মধুর!

মাঝে মাঝে নামিয়া তিনজনে হাঁটিয়াও আসিতে লাগিল, রাত্রিটিকে যেন সর্বাঙ্গ দিয়া মাখিয়া লইতে ইচ্ছা হইতেছে।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমে আসিয়া পড়িল, দরজায় করাঘাত করিয়া বলিল—"হীরাবাবু কপাট খোল, দেখ কারা এসেছেন।"

॥ ষোলো ॥

ধীরে ধীরে চারিদিকে একটা শুভ পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাইতে লাগিল। ঘটনার বিবরণ ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—জেলার কোণে কোণে, ক্রমে জেলার বাহিরে ; আর চাপিতে না পারার জন্যই হোক বা যে জন্যেই হোক গবর্নমেণ্ট খবরটা প্রকাশের অনুমতি দিয়াছে, [illegible] রুদ্ধকণ্ঠ দৈনিকগুলা মুখর হইয়া উঠিয়াছে, কাউন্সিলের সদস্যরা অনুসন্ধানে আসিতেছেন, দেশময় সাড়া পড়িয়া গেছে, রিলিফ পার্টির ছাড়পত্র পাইয়াছে। গবর্নমেণ্টের গূঢ় সঙ্কেত আছেই, বৃটিশের সঙ্গে তাহার চরম দোস্তি এখন, তবু কাজ হইতেছে !

আশ্রমের সমস্যাও হালকা হইয়া উঠিতেছে। চাল-ডালের দুর্ভাবনা তো নাই-ই, বরং আশ্রমের সুনামের জন্য অনেক কেন্দ্র হইতে উপযাচক হইয়া পাঠাইয়া দিতেছে ; অধিকন্তু টাকা আসিতেছে দুর্গতদের অন্য প্রকারেও। সাহায্য দেওয়া সম্ভব হইতেছে, সেবায় আসিয়াছে একটা আনন্দ।···অবস্থার আরও উন্নতি হইল, বন্যাপীড়িত অঞ্চলে পুনর্বসতির ব্যবস্থা আরম্ভ হইল, বাহিরের রিলিফ পার্টিরা করিতেছে, জনমত প্রবল হইয়া ওঠায় গবর্নমেণ্টকেও অন্তত লোক-দেখানি কিছু কিছু করিতে হইতেছে। আশ্রমের দুর্গত সংখ্যা অনেক কমিল, নরোত্তমের আন্দাজ অনুযায়ী এক সময় দুই শতের ওপরে গিয়াছিল, ক্রমে পঞ্চাশ-ষাটে আসিয়া দাঁড়াইল। থাকিয়া গেল তাহারই, যাহাদের শুধু ঘর-বাড়ি খেত-খামারই যায় নাই, আত্মীয়-স্বজনের দিক দিয়াও সব মুছিয়া মিটিয়া গেছে—জন্মভিটা হইয়া পড়িয়াছে বিষ। ইহাদের জমিজমা দিয়া ধীরে ধীরে এইখানেই বসবাস করাইবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। অনেকে আশ্রমের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াও এখানে থাকিয়া গেল।

প্রায় মাসাবধি একটা নিদারুণ উদ্বেগ আর অমানুষিক পরিশ্রমের পর আশ্রমের জীবনটি আবার থিতাইয়া আসিল ধীরে ধীরে। স্কুল চলিল, চরখা ঘুরিল, তাঁতের

ঘরে মাকুর খটখটানি জাগিয়া উঠিল, বোধ হয় একটা দুরতিক্রম্য বাধাবিঘ্নের পর বলিয়া ভালই লাগিল টুলুর এবার।

কংগ্রেস-পতাকার নিচে হীরার দলও আবার নব উদ্যমে যুদ্ধ-বিগ্রহে উঠিল মাতিয়া। দাদুর মত এক সঙ্গী পাইয়াছে, বয়সে নয়—উৎসাহে; কানন। ঝঞ্ঝা, প্লাবন, দুর্ভিক্ষ লইয়াই যে কী চমৎকার খেলা সব রচনা করিয়া দিয়াছে, কত নূতন ছড়াই যে দিয়াছে শিখাইয়া, আর কত ভালই যে বাসে হীরাকে আর হীরার দলকে! হীরা তো কাননকাকার নিত্য সঙ্গী হইয়া পড়িয়াছে, কাছে না থাকিলে কেমন যেন জোড়-ভাঙা বোধ হয়, চম্পা প্রশ্ন করে—"ও কানন, তোমার ছায়াকে কোথায় ফেলে এলে ভাই?"

একটা জিনিস কিন্তু চোখে পড়ে মাঝে মাঝে,—থাকিয়া থাকিয়া হীরা যেন একটু বিষণ্ণ হইয়া পড়ে, বিশেষ করিয়া কোন কারণে যখন একা পড়িয়া যায়। এক-একবার মনে হয় খেলার মধ্যে অন্যমনস্ক হইয়া গিয়া যেন নিঃসঙ্গতা খুঁজিতেছে।

সবচেয়ে পরিবর্তন হইয়াছে চম্পার। তটিনী আর কানন দুজনেরই স্কুল আর কলেজ এখন পূজার জন্য বন্ধ, কাজ করিবার জন্য আশ্রমে আসিয়াছিল, থাকিয়া গেছে।...হীরার রাগ-অভিমান ভাঙানোর প্রসঙ্গে চম্পা টুলুকে একদিন বলিয়াছিল—"হীরাবাবুকে কি ব'লে ঠাণ্ডা করলাম জানেন?—শোনা দরকার আপনার। বললাম—আর একজন ভাল মায়ের ব্যবস্থা ক'রে দোব।"...তটিনীকে লক্ষ্য করিয়াই বলা। আসলে এ ঘটকালির জন্য চম্পার মন প্রকৃতই কতটা প্রস্তুত ছিল বলা শক্ত, তবে তটিনী আসিয়াই একটি সহজ সম্বন্ধের স্থান বাছিয়া লইল। হয়তো তটিনীর স্বভাবই ঐ রকম, কিংবা চম্পার সীমন্তের সিন্দুরই বোধ হয় ওর মনের গতি নির্দিষ্ট করিয়া থাকিবে, নিতান্তই সহজভাবে চম্পার সঙ্গে ওর ননদ-ভাজের সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গেল।...চম্পার এখন ভরা সংসার—ছেলে, ননদ, দেওর, স্বামী—অন্তত পাঁচজনের চোখে তা তাই; কী নাই ওর?

চম্পার আরও পরিবর্তন এই জন্য যে, তটিনী আর কানন আসিয়া টুলুর যেন আমূল পরিবর্তন ঘটাইয়া দিয়াছে। এই মাসখানেকের উদ্বেগ দুশ্চিন্তা তো আপনি গেছেই অবস্থার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, এর আগেও মাস্টারমশাইয়ের

চিঠি পাওয়া অবধি ওর দৃষ্টিতে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে একটা হিংস্র চক্রান্তের জ্বালা ফুটিয়া উঠিতেছিল সেটা পর্যন্ত নাই আর। চম্পার জীবনে একটিই ছিল সব চেয়ে বড় বিভীষিকা।...শুধু তাহাই নয়, মাস্টারমশাইয়ের চিঠি পাওয়ার আগেও ছিল জীবনের ক্লান্তি তথা গ্লানির জের কিংবা আশ্রমের ছোটখাট দিনগত সমস্যার জন্যও যে একটা ছায়া পড়িয়া থাকিত মুখের উপর—প্রায় সর্বক্ষণেই, সেটুকু পর্যন্ত যেন কাটিয়া গিয়া টুলুর দৃষ্টিটা হইয়া উঠিয়াছে স্বচ্ছ প্রসন্ন। কোন সময়েই ওর দিকে আর ভয়ে ভয়ে চাহিতে হয় না। এক এইটুকুর জন্যই কতগুণ স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিয়াছে চম্পার জীবন।

কাজে টুলুর যেন উৎসাহ বাড়িয়াছে। সেটা বিশৃঙ্খলার পর যে এই শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিয়াছে, কতকটা এই জন্য নিশ্চয়, তবে সমস্তটা নয়, আরও কিছু আছে কোথাও। কাজে ডুবিয়া থাকে; চম্পা, তটিনী, কাননকে ডাকিয়া কতরকম প্ল্যান করে। নরোত্তমকে ডাকিয়া নয়—ঝড়-ঝঞ্ঝার হিড়িকে আরও গোটা তিনেক টানা চালা তুলিতে হইয়াছিল, এখন তাহার দুইটাও আশ্রমে আসিয়া গেছে—আরও তাঁত বসিয়াছে, চরখার সংখ্যা বাড়িয়াছে, লোকের অভাবে আর সময়ের অভাবে ছেলে-মেয়েদের পুরা স্কুল করা যাইত না, এখন একটা চালা ওদের জন্য আলাদা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তটিনী আর কাননে মিলিয়ে পড়ায়!

যত পরামর্শ যত প্ল্যান সব এই ধরনের কাজ লইয়া, এই শান্তি-আশ্রমকেই শান্তিতে, শ্রীতে, সৌষ্ঠভে পূর্ণতর করিয়া তোলা—কলিটিকে রস দিয়া, উত্তাপ দিয়া ভাল করিয়া ফোটানো—একটি পূর্ণবিকশিত পুষ্পে।

মাস্টারমশাইয়ের চিঠি চাপা পড়িয়া যাইতেছে, ক্রমেই নিচে—আরও নিচে। চম্পা হয় খুশি।

কিন্তু চম্পা যে পরিমাণে হয় খুশি, আর একজন ঠিক সেই পরিমাণে হয় নিরাশ—সে নরোত্তম।

টুলুর মনের কপাটে টোকা মারে, যে অমন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল, সে শুধু নিদ্রিতই রহিয়াছে, না, একেবারে মৃত?

সুযোগ পায় কম, তবু দক্ষিণের গল্প করে মাঝে মাঝে—ও হাসপাতাল হইতে

সোজা সেই দিকেই গিয়াছিল সেবারে, তাই ফিরিতে দেরি হয়,—এদিকের সর্বনাশে সেদিকের সর্বনাশ, এদিকের অত্যাচারে সেদিকের অত্যাচারে তুলনাই হয় না।

টুলু শোনে, বিচলিত হয়, তবে আবার জুড়াইয়া যাইতে দেরি হয় না। নরোত্তম যখন একলা থাকে, ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে,—অনেক দেখিল বলিয়া—মনে ঘাটা পড়িয়া গেল নাকি টুলুর? না, আরও কিছু?

একদিন টুলুকে বলিল—"এখন বাইরের মা-মণি আর কানন-ভাই রয়েছেন, হাঙ্গামাও কমেছে এদিকে, একবার দক্ষিণের দিকে ঘুরে আসবেন চলুন না।"

বর্ণনা শোনায় হইতেছে না, নিজের চোখে দেখায় যদি-হয় একটু ফল। টুলু একটু হাসিয়া উত্তর করিল—"তুমি ঠিক উল্‌টো বললে হে নরোত্তম, ও বেচারা এসেছে দুদিনের জন্য। দরদ দিয়ে খাটছে ব'লে ওদের ঘাড়ে চাপিয়ে চ'লে যাওয়াই কি উচিত হবে এ সময়?"

বহুদর্শী নরোত্তম আবার একান্তে গিয়া ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়িল—না, কিছু বুঝিতে পারা যাইতেছে না!

কিন্তু নরোত্তম যাই ভাবুক, চম্পা বাঁচিয়াছে।

চম্পার জীবন-তরী ভরা পালে তর-তর করিয়া ভাসিয়া চলিল। ও-ও যেন আরও মাতিয়া উঠিল কাজে, আশ্রমের কাজ বাড়িয়া গেছে, তাহার উপর আগের চেয়েও আরও বেশি করিয়া নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিল সেবার কাজে—ঘরে ঘরে যেন খুঁজিয়া বেড়ায় কোথায় কি একটু ত্রুটি আছে, ব্যথা আছে। ওর পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে থেকে কিসে ওকে যেন ঠেলিয়া চারিদিকে উৎসারিত করিয়া দিতেছে—কোথাও কোন বেদনা থাকিতে দেবে না চম্পা, সব মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া না দিতে পারিলে যেন বাঁচিতেছে না।

আনন্দের ক্লান্তির মধ্যেই হয়তো কখন আসে অবসাদ, মন অন্তর্মুখী হইয়া পড়ে।...এই কি ওর স্বপ্ন ছিল জীবনে?...এর চেয়ে কি আরও বড় কথা ভাবিত না কখনও? এর চেয়ে কি বড় আশীর্বাদ ছিল না তাহার?...প্রশ্নগুলা মনে স্পষ্ট হইয়া উঠিবার আগেই চম্পা জোর করিয়াই মিলাইয়া দেয়। চম্পা

আনন্দের মধ্যে আর খাদ আসিতে দিবে না; বাঁচা চলে কি পদে পদে অত প্রশ্ন করিয়া?

কিন্তু, সত্যই কি ওর আনন্দ নিখাদ?

একদিন একটি সামান্য ঘটনা চম্পার দৃষ্টিতে অসামান্য হইয়া ফুটিয়া উঠিয়া এই প্রশ্নের যেন উত্তর খুঁজিতে লাগিল।

টুলুর পরিবর্তনের আর একটা দিক—ও যেন জীবনকে আজকাল একটু পরিপূর্ণ ভাবে পাইতে চায়। কাননের সাহচর্যেই বোধ হয় এটা হইয়াছে, ওর সঙ্গে কাব্য, সাহিত্য লইয়া আজকাল প্রায়ই ওর আলাপ হয়, কলেজে শিক্ষার অনুপাতে এদিকে বেশ একটু গভীরতা আছে কাননের, কতকগুলি নিত্যসঙ্গী বই সঙ্গেও আনিয়াছিল—ইংরাজি-বাংলা দু রকমই। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর এটা আরও জমে—তটিনী থাকে, চম্পা থাকে। চম্পার জানা কম, তবে সূক্ষ্ম অনুভূতির জন্য আর রসবোধের জন্য আটকায় না, আলোচনায় রাত গভীর হইয়া ওঠে। এর ওপর টুলুর একটু বেড়ানোর শখ হইয়াছে। বিকেলের দিকে কাননকে লইয়া বাহির হইয়া পড়ে, সঙ্গে থাকে হীরা। মাঠ, পথ, নদীর ধার—সবখান থেকেই পায় পায় কি যেন একটি আনন্দ সঞ্চারিত হইয়া উঠে আজকাল।

নদীতে আজকাল জল বেশ। একটা নৌকাও যোগাড় হইয়াছে কাননের আগ্রহে এবং নরোত্তমের চেষ্টায়, ইদানিং জলবিহারই হয় বেশি, দাঁড়ের সাহায্যে উজান বেয়ে বহুদূর চলিয়া যায়, তাহার পর শুধু হালটুকু ধরিয়া স্রোতের বেগে নামিয়া আসে। কোনদিন স্রোতের মুখেই ছাড়িয়া বাহির হইয়া আরও দূর; কাহাকেও সঙ্গে লয়, সে নৌকাটা দাঁড় বেয়ে আনে। নিজেরা ডাঙার পথে হাঁটিয়া চলিয়া আসে। একটা নেশার মত হইয়া গেছে। রাত্রের মজলিস এই আলোচনাতেই হইয়া উঠে মুখর।

একদিন চম্পা একবার তটিনীর দিকে আড়ে চাহিয়া লইয়া টুলুকে বলিল—"তোমরা নৌকোর গল্প ক'রো না; দিদি বলছিলেন—গল্প শুনেই তো পেট ভরে না।"

তটিনী মিথ্যা করিয়াই একটু হাসিয়া বলিল—"বাঃ রে! কবে বললাম, কোথায়?"

টুলু আগ্রহের সহিত বলিল—"বেশ তো, চল না তোমরাও একদিন—রোজই যেতে পার, দোষ দেখি নে তো···"

চম্পা ভয়ে যেন শিহরিয়া শরীরটা একটু গুটাইয়া লইয়া বলিল—"ওমা, 'তোমরাও' মানে! আমি যেতে পারব না; দিদি একলা যাবেন।"

"উনি তো যাবেনই, তোমার আপত্তিটা কিসের? নৌকাটা ভালই···"···

"আপত্তি···বাড়ির ঝিউড়ি মেয়ের সব মানায়—ভাইয়ের বাড়ি এসে ঘোরা-ঘুরি, লাফালাফি···কিন্তু···"

একটু হাসিল তটিনীর দিকে ঘুরিয়া।

তটিনীও হাসিয়া বলিল—"ও! আর যারা বাড়ির বউভাজ, তারা বড্ড নিরীহ!"

চম্পার মুখের আলোটা যেন দপ করিয়া নিবিয়া গেল। সেকেণ্ড কয়েক যেন একটা কি রকম অপ্রতিভ ভাব ছাইয়া রহিল, সেটুকু সামলাইয়া লইবার জন্যই টুলু হাসিয়া বলিল—"অন্তত এটা তো ঠিক যে বোনেরা এলে ভাজেরা হয়ই একটু সাবধান। আপনিই চলুন না হয় একলা।"

চম্পা একটু রাঙিয়া উঠিল, একবার চেষ্টা সত্ত্বেও দৃষ্টিটা টুলুর মুখের উপর গিয়া পড়িল, তাহার পর তটিনীর দিকে চাহিয়া বলিল—"বেশ, আপনি একবার ঘুরে আসুন, আপনার ওপর দিয়েই ভয় ভাঙাটা হয়ে যাক। তারপর যাব।"

গেল না চম্পা। কানন আর হীরাকে লইয়া চারজন হইল। আর দুইজন লোক লইল টুলু দাঁড় ঠেলিবার জন্য। উজানের দিকটাই নদীটা বেশি আঁকিয়া বাঁকিয়া আসিয়াছে, দৃশ্যটি ভাল, সেই দিকেই যাত্রা করিল।

গেলও অনেক দূর আজ। ফিরিতে দেরি হইতে লাগিল। সন্ধ্যা উৎরাইয়া গিয়া নূতন শুক্লপক্ষের চাঁদটা যখন আকাশে স্পষ্ট হইয়া উঠিল, চম্পা একটু উদ্বিগ্ন হইয়াই নদীর ধারে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল নৌকাটি আসিতেছে।

চারজনে মুখামুখি হইয়া বসিয়া আছে, কাননের কোলের কাছে হীরা। তটিনী বোধ হয় গল্প করিতেই জলের দিকে ঝুঁকিয়া নিজের ডান হাতটা খেলাচ্ছলে জলে একটু ডুবাইয়া দিতে টুলু বোধ হয় কিছু বলিল, তটিনী হাসিয়া

একটু মুখটা তুলিতে তাহার খানিকটা জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট হইয়া উঠিল, তটিনী কিন্তু যেন অবাধ্য ভাবেই হাতটা ডুবাইয়া রহিল জলে।

চম্পার মনটা হঠাৎ মোচড় দিয়া উঠিল।···ঘরে একটা হাতের কাজ ফেলিয়া আসিয়াছিল, এরা যখন আসিয়া গেছে, চলিয়া যাওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু পা যেন উঠিতে চাহিল না।···নিজের মনকে চম্পা দাবের মধ্যেই রাখে, অনুভূতিটা চেষ্টা করিয়া চাপা দিয়া দিল···অন্যায় এমন ভাব···

নৌকাটা আসিয়া পড়িল। একেবারে ধারে লাগাইল। একটা গাছের গুঁড়ি আছে জলের মধ্যে, শুকনো ডাঙা থেকে হাত দুয়েক তফাতে, সেইটার উপর পা দিয়া টুলু আর কানন লাফাইয়া আসিল। দাঁড়ীদের মধ্যে একজন হীরাকে কোলে করিয়া আনিয়া দিল।

বাকি রহিল তটিনী। গুঁড়িটার উপর উঠিয়া সে যেন থতমত খাইয়া গেল। একেবারেই কাছে ছিল টুলু, একটু হাতটা বাড়াইয়া দিলেই তটিনী বোধ হয় ওটুকু ডিঙাইয়া লয়, কিন্তু সেও যেন স্ট্যাচুর মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সামান্য কয়েকটি মুহূর্ত, বাতাসটা যেন কি রকম হইয়া গেছে। চম্পার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—একদিন পথের মাঝে তাহার আঁচলটা নিঃসঙ্কোচে তুলিয়া হাতে ধরিয়া দিয়াছিল—এই টুলুই না?···তবে আজ কেন এ সঙ্কোচ?···

একটা মোক্ষম ঠাট্টা করিয়া বলিল—"এ কি! বোনের হাত ধ'রে ভাই নামাবে—সামনেই রয়েছ, ভাই বোন দুজনেই কাঠ হয়ে গেলে?···"

তাড়াতাড়ি নিজেই নামিয়া গিয়া তটিনীকে হাতটা বাড়াইয়া দিল এবং তাহার পরই প্রশ্নে প্রশ্নে, হাসিতে গল্পে ঠাট্টায় লজ্জাটা একেবারে চাপা দিয়া দিল।

॥ সতের ॥

এই ব্যাপারটুকুর পর থেকেই চম্পার দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল।

একটা জিনিস লক্ষ্য করিল চম্পা, ঠাট্টা টুকুতে টুলুর কিছুক্ষণ পর্যন্ত একটু জড়িমা লাগিয়া থাকিলেও, তটিনীর কথাবার্তা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার সহজ আর মুক্ত হইয়া উঠিল, যেন ভাজের সুবাদ যাহার সঙ্গে, সে সুযোগ পাইলেই ভাই-বোন লইয়া ঠাট্টা করিবে, এর আর হইয়াছে কি?...আরও যেন ভাল লাগিল তটিনীকে, আর সেটা শুধু এই জন্যেই নয় যে ওর দিক দিয়া তটিনী নিশ্চিন্ত রাখিল চম্পাকে, ওর চরিত্রের স্বচ্ছতা ওকে মুগ্ধ করিল।

তবু মেয়েছেলেরই মন তো—চিন্তার কারণ না থাকিলেও একেবারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে কই? চোখ দুইটা খুলিয়া রাখিতে হইল, তবে না-জানিতে দেবার ক্ষমতাটা খুব আয়ত্ত বলিয়া টের পাইল না কেহই—না টুলু, না তটিনী।

ছুটি ফুরাইয়া আসিল। কাননের দিন সাতেক আগেই খুলিবে, সে এই হিসাবে আগে যাইবে—এই রকম মোটামুটি সবার জানা। যাইবার আগের দিন রাত্রে এই প্রসঙ্গেই তটিনী জানাইল, সেও যাইবে। আহারের পরে চারজনের যে মজলিসটা বসে তাহাতেই কথাটা পাড়িল তটিনী।

বিস্মিত হইল চম্পা টুলু দুজনেই, কিন্তু চম্পার এ-ধরনের কথায় বিস্মিত হওয়ারও অতিরিক্ত কাজ আছে, চকিতে একবার টুলুর মুখের পানে চাহিল; দেখিল, বিস্ময়ের সঙ্গে হঠাৎ নৈরাশ্যে মুখটা যেন অন্ধকার হইয়া গেছে।

বলিল—"সে কি! আপনার তো এখনও সাত দিন বাকি, এর মধ্যেই..." চম্পার দিকেই ঘুরিয়া বলিল—"শুনছ চম্পা, কালই যাবেন বললেন উনি।"

"তার জন্যে তো গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বের করা যায় না ওর নামে।"

কথাটা কতকটা নির্বিকার ভাবে বলিয়া চম্পা একবার তটিনীর মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিল। চম্পার উপরই ভরসা ছিল টুলুর, একটু যেন নিরুপায়

হইয়া চুপ করিয়া গেল, তাহার পর দুর্বল কণ্ঠে বলিল—"সে কথা নয়, তবে করবেন কি গিয়ে এখন ?···তাই বলছি···"

কণ্ঠের এই স্খলন, দৃষ্টির এই সঙ্কোচ, এইটুকুরই দরকার ছিল চম্পার, এর পরই কথাবার্তা বেশ সহজ খাতে নামাইয়া আনিল, নয়তো ওদিকে তটিনীও আবার অন্যরকম ভাবিবে। তাহার দিকেই চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"কথাটার উত্তর দাও দিদি, করবে কি এখুনি গিয়ে ?···এটুকু না হয় বুঝলাম যে এখানে কষ্ট হচ্ছে।"

তটিনীও হাসিয়া টুলুর দিকে চাহিয়া বলিল—"সোজা কথাটা বলতে জানে না বউ। ওটুকু জুড়ে দেওয়া চাই—কষ্ট হচ্ছে।···আপনিও বোধ হয় তাই বিশ্বাস করলেন ?"

কানন বলিল—"অথচ দিদি বলেন, এখান থেকে যেতে মন চাইছে না কানন। কতবার আমায় বলেছেন।"

তটিনী সমর্থন পাইয়া বলিল—"বল্ ওঁদের সেই কথা।...কী যে ভাল লাগে আমার জায়গাটা !"

এ সুযোগটাও ছাড়িল না চম্পা, তটিনীর মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল—"এ জায়গায় এমন কি মধু আছে বুঝি না তো ; অজ পাঁড়াগাঁ···"

এত বড় প্রত্যক্ষ আঘাতেও তটিনীর মুখের ভাব এতটুকুও বদলাইল না, বেশ সহজ দৃষ্টিতেই চাহিয়া বলিল—"পাড়াগাঁ নাকি মন্দ ? আমার তো শহরের চেয়ে ভালই লাগে বরং···"

কানন অজ্ঞাতসারেই চম্পার কথাটাই আরও স্পষ্ট করিয়া দিল, বলিল—"তার চেয়েও বড় কথা—দিদির অনেক দিন থেকেই ইচ্ছে টুলুদা, এই রকম একটি আশ্রম গড়েন আর উনিও এসে কাজ করেন সেখানে।"

তটিনী চম্পার দিকেই চাহিয়া বলিল—"সে কথা বউ-ই কি জানে না ? কতবার তো ওকে বলেছি, গঞ্জডিহিতে যেদিন প্রথম গিয়ে পড়ি ওঁর কুঠুরে, সেদিনকার কথা।···তার ওপর কত ভাল জায়গাটা গঞ্জডিহির চেয়ে।···আমার তারও ওপর আছে—গঞ্জডিহিতে কি টের পেয়েছিলাম—এর মধ্যেই তুমি রয়েছ ঢাকা রয়েছে ?"

চম্পা যেন নিজের কাছেই অপরাধী হইয়া একটু চুপ করিয়া রহিল, যাহার মনে এতটুকু গ্লানির চিহ্নমাত্রও কোথাও নাই তাহার সম্বন্ধে এ কলুষিত সন্দেহটুকু ওর মিটিতেছে না কেন? নিজের মনের এ পাপকে চম্পা কোথায় রাখে?... আপাততঃ যেন সে পাপের যতটুকু ক্ষালন হয় ততটুকুর জন্যই জিদ ধরিয়া বসিল—থাকিয়া যাইতে হইবে একটা দিন। বলিল—"কিন্তু তোমার কাজে আর কথায় তো মিলছে না দিদি, এত ভাল লাগে বলছ এই সাগরদহ, আমাদের সবাইকেও, অথচ হাতে ছুটি থাকতেও যাচ্ছ তো চ'লে..."

টুলুর পানে চাহিয়া বলিল—"বাঃ, তুমি যে চুপ ক'রে গেলে, আমার দিকে হয়ে বল একটু।"

টুলু বলিল—"আমি হার মেনেই তো ধরলাম তোমায়।"

চম্পা তটিনীর দিকে একটু আড়ে চাহিয়া বলিল—"বেশ আমি কিন্তু হার মানবার পাত্রী নই দিদি, আমার হাতে যা অস্ত্র আছে সকালবেলা উঠেই দেখতে পাবে...হীরাকে দোব লেলিয়ে, যেও ভাল ক'রে তখন।"

তটিনী হাসিয়া বলিল—"কিন্তু বীরমাতা হওয়ার বিপদের কথা তো জানো না,—ওকে বললেই হবে, ওদের দলের জন্যে তাড়াতাড়ি বন্দুক কিনে পাঠাতে যাচ্ছি, ইংরেজদের আসতে আর দেরি নেই।"

এর পরেও অনেকক্ষণ গল্পগুজব হইল; তটিনীর যাওয়াটা স্থগিতই রহিল এবং এ প্রসঙ্গের পর অন্য প্রসঙ্গ আসিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্তই জাগিয়া রহিল সবাই, কাল থেকে তো কাননকে পাওয়া যাইবে না। চম্পা কিন্তু ক্রমেই যেন স্বল্পবাক হইয়া আসিল। মনের অন্য প্রান্তে গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট হইয়া কি যেন ভাবিতেছে। টুলু লক্ষ্য করিল, মাঝে মাঝে মুখটা ওর যেন অতিরিক্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। এই ভাবান্তরটা টুলুর চেনা—মনে মনে কিছু একটা বড় সঙ্কল্প করিলে ওর মুখটা কখনও কখনও এই রকম হইয়া উঠে, ওর ভিতরে যেন আগুন জ্বলিয়া ওর ভিতরের যত খাদ সেগুলাকে দগ্ধ করে, সেই আগুনেরই হল্কা উঠে মাঝে মাঝে ঐ রকম করিয়া।

অবশ্য কিছু বলিল না টুলু।

মজলিস ভাঙার পরও গল্পের জের চলে খানিকক্ষণ, ও-ঘরে কাননে টুলুতে

এ ঘরে চম্পায় তটিনীতে। আজ কয়েকবারই গল্পের মধ্যে মাত্রার স্খলন লক্ষ্য করিয়া তটিনী বলিল—"বউ, তুমি আজ বড় অন্যমনস্ক রয়েছ; থেকে তো গেলাম, আবার কি?"

চম্পা আরও একটু চুপ করিয়া শুইয়াই রহিল, ঘুমন্ত হীরাকে যে বুকে একটু চাপিয়া ধরিল তটিনী সেটা ক্ষীণ আলোয় টের পাইল না, তাহার পর একটু কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—"দিদি, একটা কথা অনেক দিন থেকে জিগ্যেস করব ভাবছি—অপরাধ হয় তাই করি নি—এবার তো চ'লেই যাচ্ছ, কাল, না হয় দুদিন পরে..."

তটিনী বলিল—"এত গৌরচন্দ্রিকার ঘটা কেন?"

চম্পা আর একটু চুপ থাকিয়া প্রশ্ন করিল—"বলছিলাম এই ভাবেই জীবনটা কাটাবে?...কেন?"

"বেশ তো কেটে যাচ্ছে।"

"একে তো বেশ কাটা বলে না...মেয়েছেলের পক্ষে। আর একটু অপরাধ করি তা হ'লে, দোষ নিও না, মেয়েয় মেয়েই তো কথা হচ্ছে,—এ রকম কাটানোর মধ্যে অনেক সময় একটা ইতিহাস থাকে...সেই রকম বাধা আছে কি কিছু?...অবিশ্যি যদি বলতে বাধা না থাকে, তা হ'লে..."

তটিনী চুপ করিয়া রহিল।

চম্পা সময় দিল উত্তর দিবার, কেননা যতক্ষণ চুপ করিয়া থাকে তটিনী, ততই বেশি করিয়া অকথিত কথাটা চম্পার কাছে স্পষ্ট হয়। মেয়েরা মেয়ের অনুচ্চারিত ভাষা বুঝিতে পারে, বোধ হয় যত বেশি অনুচ্চারিত ততই বেশি পারে বুঝিতে। এক সময় বলিল—"বললে আমি কাজে লাগতে পারি, তাই জিজ্ঞেস করলাম, দোষ হ'ল কি না জানি না।"

একটু নীরব থাকার পর তটিনী বলিল—"এমন কিছু বলবার নেই বউ... ভাই দুটোকে মানুষ করতে হচ্ছে। বাবা মা উপরোউপরি গেলেন, নিজের কথা ভাবলে ভেসে যেত ওরা।"

"এবার তো ওরা মানুষ হয়েছে দিদি, আর নিজের কথা ভাবতে দোষ কি?"

তটিনী এবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর যেন মন থেকে অনেকগুলা ব্যাপার চেষ্টা করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল—"আমার নিজের কথা

আমার চিরজন্মই দোষ থাকবে বউ—তাতে পরের সর্বনাশ।...ঘুমোও, রাত হয়ে গেছে।"

এর পর চম্পাও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, শেষের কথাগুলার মত বেদনা যেন নিঙড়াইয়া নিঙাড়াইয়া পান করিতেছে, যতই করিতেছে ততই যে-সঙ্কল্পটা করিয়াছিল নেশার মত ওর মনটাকে সেটা যেন অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। এক সময় মনস্থির করিয়া ফেলিয়া, হীরাকে যেন শেষবারের মত বুকে চাপিয়া ধরিয়া হাত দুইটা আলগা করিয়া দিল, যেন বিদায় দিল নিজের এই সমস্ত জীবনটারই সঙ্গে ; তটিনীকে বলিল—"বললে না?...আমার জীবনেও —একটা ইতিহাস আছে দিদি, হুকুম কর তো বলি।"

"কি, বল না।"

"আমি ভেসে বেড়াচ্ছিলাম ; ভাসতে ভাসতে তোমার দাদার পায়ে এসে ঠেকি...অনেক দুঃখের কথা, রাত কাবার হয়ে যাবে শুনতে শুনতে..."

গলাটা হঠাৎ ধরিয়া গেল; তটিনী বাধা দিয়া বলিল—"পায়ে জায়গা তো পেয়েছ বউ, ঐ পর্যন্তই থাক। সিদ্ধির কথাই তো আসল কথা, ফল কি তপস্যার কথা শুনে?"

চম্পা চুপ করিয়া গেল। তটিনীর চিত্তের নির্মলতায় মুগ্ধ হইয়া স্থির করিয়াছিল নারী-জীবনের চরম স্বার্থত্যাগ করিবে আজ ; নিজের জীবনের সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইবে, ও সীমন্তের সিঁদুরের জন্যই যে তটিনীর কঠোর আত্মনিয়ন্ত্রণ—আর সত্যই তাহা যে কত কঠোর এটা বুঝিতে চম্পার দেরি হয় নাই, তাহার পর নিঃশব্দতার মাঝে যখন তটিনীর অন্তস্থল পর্যন্ত দেখিতে পাইল, তখন ওর সঙ্কল্প হইয়া উঠিল আরও দৃঢ়।

আরম্ভ করিল নিজের জীবনী।

ঈর্ষার কুটিল সন্দেহ থেকে আরম্ভ করিয়া চম্পা নারী-জীবনের চরম মহত্ত্বের একেবারে কাছাকাছি আসিয়া পড়িল ;...কিন্তু শেষরক্ষা হইল না। আত্মহত্যার শক্তি অর্জন হয় নাই ওর এখনও ; ডুবিয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে তটিনীর শেষের কথাগুলা যেন প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আবার উঠিয়া পড়িল। ঐ পর্যন্তই থাকিয়া গেল কথাটা।

॥ আঠারো ॥

দিন পাঁচেক পরে তটিনী চলিয়া গেল।

নরোত্তম সপ্তাহখানেক আশ্রমে ছিল না। কাল আসিয়াছে, আসিয়া অবধি ভাবটা অত্যন্ত চনমনে, চুপ করিয়াই থাকে, বেশি কথা কয় না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বড়ই অধৈর্য। ভাবটা টুলুর নজরে পড়িল না, যদিও সাধারণত এর চেয়ে ঢের সূক্ষ্ম বৈলক্ষণ ওর দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। তবে চম্পার নজরে পড়িল, বেশ বুঝিল—গুরুতর কিছু একটা রহস্য বহন করিয়া ফিরিতেছে নরোত্তম, সেটা যে টুলুর জন্যই, এটাও আন্দাজ করিয়া লইল, নরোত্তম সুযোগ খুঁজিতেছে। নিজে হইতেই চম্পাকে বলিল না বলিয়া চম্পাও প্রশ্ন করিল না।

তটিনী গেল সকালে, আহারাদি করিয়া, দিনে দিনে পৌছিয়া যাইবে। আশ্রমের কাজকর্ম সারিয়া বিকালে টুলু নৌকায় করিয়া একটু বেড়াইতে গেল; চম্পাকে ডাকিল, কাজ আছে বলিয়া সে কাটাইয়া দিল, সত্য হোক বা মিথ্যাই হোক। সঙ্গী হইল শুধু হীরা। দাঁড় ধরিবার জন্য একটা লোক লইল। ফিরিল সন্ধ্যা হইবার ঢের আগেই। হীরা একটু অনুযোগও করিল, একে আলাপে তেমন সুবিধা হয় নাই আজ, কত প্রশ্নের জবাবই পায় নাই, কত প্রশ্নের জবাব পাইয়াছে ওলট-পালট করিয়া; বলিল—"বাবা, তুমি আজ যেন কি হয়েছ, এমন জানলে আমি আসতুম তোমার সঙ্গে—ভালো করে!"

টুলু হাসিয়া বলিল—"কি হয়েছে রে?"

"অদ্ধেকও বেড়ালে না তো···কিছু দেখা হ'ল না।"

"সেই একই জিনিস রোজ রোজ কি অত দেখবি শুনি?"

"না যাও, তুমি ভারি দুষ্ট, কাননকাকা থাকলে কাশবনীর বনে কেমন দেশ আবিষ্কার করতে নিয়ে যেত সেদিনকার মতন। বেশ তো, আবার আমায় ডেকো কখনও, আসব ভাল ক'রে!"

একটা বড়গোছের খেলা জমাইয়া ক্ষতিটুকু পোষাইয়া লইবার জন্য নৌকা থেকে লাফাইয়া চলিয়া গেল, তাহার পর জমাইতে না পারিয়া একটা বাজে আবদার ধরিয়া কাজের মধ্যে মায়ের পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। চম্পা একবার কতকটা বিদ্রূপ কতকটা দুঃখে নিজের মনেই বলিল—"কেনই যে আসা, ভাই-বোনে বাপ-বেটার অভ্যাস খারাপ ক'রে দিয়ে গেলেন শুধু।··· চম্পা ভুগুক এখন।"

নিজের মনটাও তাহার বড় ভার।

হীরা চলিয়া গেলে টুলু উঠিয়া আসিয়া নদীর ধারেই দূর্বাঘাসে ঢাকা একটা জায়গায় বসিল। কিছু যেন ভাল লাগিতেছে না, অথচ কিছু করিতেও ইচ্ছা হইতেছে না, এমন কিছু পাইতেছে না যাহাতে একটু আগ্রহ পায়, একটু নূতনত্ব আছে। তাহার পর হঠাৎ মনে পড়িল—কয়েকদিন বাহিরে কাটাইয়া নরোত্তম ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার সঙ্গে তো এখন পর্যন্ত ভাল করিয়া কথা হয় নাই। ফিরিয়া কাহাকেও ওকে ডাকিয়া আনিতে বলিবে, দেখে—বাসার দোরের কাছে হীরাকে কাঁধ থেকে নামাইয়া দিয়া সে নিজেই এই দিকে আসিতেছে। টুলুর হঠাৎ কেমন একটা বিরক্তি ধরিয়া গেল, মুখটা ঘুরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল!

নরোত্তম বলিল—"আপনি এখানে? আমি ওদিক থেকে এসে বাড়িতে খুঁজতে গেছলাম।

টুলু বলিল—"নৌকো ক'রে ঘুরতে গেছলাম, ভাল লাগল না, একটু এসেছি এখানে।"

"বাইরের মা-মণি আর তাঁর ভাই চ'লে গেলেন কিনা···"

"বোধ হয় সেই জন্যেই, দুজনে হৈ-হৈ ক'রে ছিল তো।···বিশেষ ক'রে কানন। আমি তোমাকে ডাকতে পাঠাচ্ছিলাম। কোথা থেকে ঘুরে এলে? নতুন খবর কিছু আছে নাকি?"

নরোত্তম উত্তর দেবার মুখ খুলিবার আগেই আবার বলিল—"হ্যাঁ, তার আগে একটা কথা নরোত্তম, তটিনী আর কানন কায়েমীভাবেই এখানে থেকে কাজ করতে চায়। তোমায় বলেছিলাম এ কথা, যাওয়ার সময় আরও আগ্রহ প্রকাশ ক'রে গেল। তোমার মতটা কি?"

নরোত্তম একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল—"আপনি নিজেই ঠিক করুন সেটা, একটা নতুন খবর আছে সেটা শুনে নিয়ে।"

"খবরটা কি ?"

"তমলুক-কাঁথীর দিকে ওরা আবার খুব তোড়জোড় করছে, শীগ্‌গিরই কিছু একটা হবে, বলছে—এবার হয় এস্‌পার, নয় ওস্‌পার।"

টুলু মুঠায় চিবুকটা চাপিয়া চুপ করিয়া রহিল, নরোত্তম আড়চোখে দেখিল মুখের নির্বিকার ভাবটা প্রায় বিরক্তির কাছাকাছি। নরোত্তমের মুখটা কঠিন হইয়া উঠিল, তবে বেশ সহজ কণ্ঠেই বলিল—"কাজে কাজেই আবার যা হবে তার কাছে আগস্টের ব্যাপারটা পানসে হয়ে যাবে। জানেন তো পণ্ডিত-মশাইয়ের সঙ্গের কয়েক জনাই উদিকে কাজ করছে, তাদের ইচ্ছেটা আশ্রমও লাগে এই সঙ্গে। তাই বলছিলাম একেবারে নতুন লোক আর আশ্রমে নেওয়া ঠিক হবে কি ?—আপনি ঐ যে বললেন বাইরের মা-মণি আর কানন-ভাইয়ের কথা…।"

মুখে বিরক্তির ভাবটা আরও একটু স্পষ্ট হইল বলিয়া টুলু মুখটা একটু ঘুরাইয়া লইল, একটু হাসিয়া বলিল—"আশ্রম আর ও-অঞ্চলের মাঝখানে অনেকটা ফাঁক প'ড়ে যাচ্ছে না, নরোত্তম ? আমার বলার উদ্দেশ্য—দক্ষিণ যতটা করেছে বা করবার জন্যে তোয়ের, এদিককার অঞ্চলগুলো ততটা নয়; এ অবস্থায় দক্ষিণের সঙ্গে যোগ রেখে কাজ করতে গেলে আমরা নেহাৎ একা প'ড়ে যাব না ? বাইরের লোক—তুমি যেমন বলছ—না-ই নিলাম—এতই যখন অবিশ্বাস।"

শেষের কথাটিতে ব্যঙ্গ বেশ একটু রূঢ়ভাবেই ফুটিয়া উঠিল।

নরোত্তম বেশ সূক্ষ্ম ব্যঙ্গেই উত্তর দিল—"অবিশ্বাস নয়—বাবাঠাকুর, তবে কাঁচা লোকের মতিস্থির থাকে না তো, আজ বলছে এক রকম, কাল বলবে অন্য রকম। তা ভিন্ন কথা হচ্ছে আমাদের আশ্রমের সুনাম রয়েছে, কথাগুলো চাপাচুপি রেখে যেতে পারলে কাজ আমরা খুব বেশি করতে পারব। নতুন লোক কি পারবে তা ?"

একটু ক্ষান্তি দিয়াই অনেক দিনের পোষা মন্তব্যটা প্রকাশ করিয়া ফেলিল—"একজন আবার মেয়েছেলে কিনা তার মধ্যে।"

টুলু একটু অসহিষ্ণুভাবেই বলিল…"ও-অপবাদ কেন নরোত্তম? আগস্টের ব্যাপারে দক্ষিণে মেয়েছেলেও তো ছিল—বুকে গুলি নিয়ে মরেছে…"

একটুও দেরি হইল না নরোত্তমের উত্তরটা দিতে, বলিল—"তারা সব অন্য জেতেরই মেয়েছেলে বাবাঠাকুর…"

সঙ্গে সঙ্গেই একটু নরম করিয়া দিয়া বলিল—"তাদের ট্রেনিং কতদিনের ট্রেনিং…সেই কথা বলছি।"

খানিকক্ষণ একেবারে নিঃশব্দে কাটিল। তাহার পর নরোত্তমই বলিল—"কাকথেনের জায়গাগুলোর কথা যা বলছিলেন, আমি কয়েকটা কেন্দ্র ঘুরে এসেছি, তারা তোয়ের আছে, অবিশ্যি দক্ষিণের ওদের মতন নয়, খাটতে হবে একটু। তাদের নিজের ওপর সরকারের নজর বড্ড বেশি ব'লে আমাদের ওপরই বেশি ভরসা।…"

আবার একটু চুপচাপ গেল। তাহার পর টুলু বলিল—"তবে তোমায় আসল কথাটাই বলি নরোত্তম, আমার মত নয় আর এ সব ব্যাপারে থাকা! তুমি বোধ হয় বলবে, আমি কাঁচা লোক, মতিস্থির নেই, কাল যা বলেছি আজ তা উলটে দিচ্ছি, কিন্তু ওলটাবার কারণ হয়েছে এর মধ্যে।

প্রশ্নের অপেক্ষায় একবার অপাঙ্গে দেখিয়া লইয়া বলিল—"এই যে একটা দুর্বিপাক গেল—ঝড়, বন্যে, দুর্ভিক্ষ, মহামারি,—এতে শেষ পর্যন্ত তাদের হাত পাততে হ'ল কাদের কাছে ভেবে দেখ। ঝড় বন্যেটা দৈব, এরকম ভাবে আর নাও হতে পারে, কিন্তু একটা ভীষণ দুর্ভিক্ষ যে আসছেই—এটা দেশের অবস্থা দেখে একটা শিশুও ব'লে দিতে পারে, আর দুর্ভিক্ষ এলেই মহামারী কেউ রুখতে পারবে না। তা হ'লে ফের তো আমাদের ঐ গভর্মেণ্টের কাছেই হাত পেতে দাঁড়াতে হবে? লোকগুলোকে আগে বাঁচাতে হবে, তার পরে তো স্বাধীনতা নরোত্তম? তুমি বলবে—কি ফল হ'ল হাত পেতে? দিলে কি গভর্মেণ্ট?…ঠিক কথা, তবে একেবারে খালি হাতেও তো বিদায় করেনি, খেদিয়ে দেয়নি তো। ভবিষ্যতের পথটুকু তো খোলা আছে? কেন, ঐ সুনামের জন্যে নয় কি?"

নরোত্তম যেন একটু নরম হইয়া একটা কাঠি দিয়া মাটি আঁচড়াইতে

আঁচড়াইতে বলিল—"বাবাঠাকুর, আমরা অজ্ঞ গেঁয়ো লোক, মানায় না আপনাদের সঙ্গে তর্ক করা, তবে একটা কথা বিচার ক'রে দেখুন—উদ্দেশ্য কি ওদের এই নয় যে, ওরা চিরকালই আকাল-মহামারী লাগিয়ে রাখুক, আর আমরা চিরকালই হাত পেতে রাখি ওদের সামনে? এদের রাজত্বের কাহিনীটা গোড়া থেকে মিলিয়ে যান না—সেই কোম্পানীর আমল থেকে—ছোট-বড় কত দুর্ভিক্ষই গেল হিসেব ক'রে দেখুন না—রোজকার দুর্ভিক্ষ রোগ মহামারী, যেটা গা-সওয়া হয়ে গেছে সেটার কথা ধরলাম না আর।"

একটু বিস্মিত হইয়াই টুলুকে নরোত্তমের মুখের পানে চাহিতে হইল। কিন্তু এক সময় যাহাতে হয়তো প্রশংসার ভাবই আসিত, মেজাজের অবস্থায় তাহাতে ভিতরে ভিতরে আরও বিরক্তি আসিল; বলিল—"বেশ, এর প্রতিকার করছ কি তোমরা?"

"আমি তো এখানেই।"

"ওদের কথাই জিজ্ঞেস করছি।"

"বললাম তো—এবারে খুব বড় তোড়জোড় হচ্ছে।"

"যেমন?"

"এবার ওরা গোড়া থেকে শুরু করেছে, নিজেদের আইন, আদালত, পুলিস ট্যাক্স..."

টুলু বাধা দিয়া একটু ঠোঁটের কোণে হাসিয়া বলিল—"প্যারালাল গভর্মেন্ট—এবার খেলাঘর পাতা হচ্ছে।...রাজ্য রক্ষার জন্যে ফৌজ চাই নরোত্তম, আবেদন-নিবেদনে রক্ষা হবে না তো?"

"তার ব্যবস্থাও হচ্ছে। আবেদন-নিবেদনে যে আর বিশ্বাস করে না সেটা তো দেখালে ওরা। প্রাণ দিয়েছে, দরকার পড়লে এবার নেবে। পণ্ডিতমশাই আগে নেবার মন্তরই দিয়ে গেছেন ব'লে তাঁর সাকরেদের কাছে অনেক আশা ক'রে ব'লে পাঠিয়েছে তারা।"

কথাটা যেন নরোত্তমের শেষ কথা,—শ্লেষও আছে, রূঢ়তাও আছে, আবার মিনতি-আবেদনও আছে। একসঙ্গে সবগুলা লাগিল টুলুর অন্তরে, বিশেষ করিয়া—'তাঁর সাকরেদের' কথা দুইটি। একবার অন্যভাবেই মুখ তুলিয়া চাহিল;

পরক্ষণেই কিন্তু যেন নিজের মতের দৃঢ়তাটুকু বজায় রাখিবার জন্য বলিল—"আচ্ছা, পাতুক খেলাঘর, একটু দেখি নরোত্তম।"

বুঝিয়াও বিরক্তিটাকে কোনমতেই যেন মন থেকে সরাইতে পারিতেছে না; মুখটা ভাল ভাবেই ঘুরাইয়া বসিয়া রহিল। একটু পরে হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল—চম্পাকে টানিলে হয় এর মধ্যে, ওর সমর্থন পাইবেই; দেখিতেও একটু ভাল হইবে। ঘুরিয়া তাহাকেই ডাকিয়া আনিতে বলিবে—দেখে, নরোত্তম কখন নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গেছে।

ধক্ করিয়া একটা ভয়ানক চোট লাগিল টুলুর বুকে।—সেই ধরনের একটা প্রচণ্ড আঘাত, যাহাতে অনেক সময় হঠাৎ মনের কতদিনের পুঞ্জীভূত অন্ধকারে আলোকের সংঘর্ষ জাগিয়া উঠিয়া দৃষ্টিকে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করিয়া দেয়।...টুলুর ভ্রূ দুইটা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—সে এতক্ষণ নরোত্তমের সঙ্গে কি সব যেন তর্ক করিতেছিল না? চঞ্চলভাবে কতকটা অকারণে উঠিয়া পড়িল টুলু, তাহার পর আবার কি ভাবিয়া বসিয়া পড়িয়া তর্কটা আগাগোড়া মনে করিবার চেষ্টা করিল।...নরোত্তম বাহিরে অর্থাৎ দক্ষিণ অঞ্চলে ঘুরিয়া খবর সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে—আরও বড় বিদ্রোহের সরঞ্জাম চলিতেছে ওদিকে—জলোচ্ছ্বাস-দুর্ভিক্ষ-মহামারীর পটভূমিতে অনাত্মীয় বিদেশী সরকারের নৃশংস রূপটা নিজের বীভৎসতায় আরও প্রকট হইয়া পড়িয়াছে—জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে—এবারে একেবারেই একটা চরম নিষ্পত্তি,—হয় ভাল করিয়া বাঁচিবে, নয়তো ভাল করিয়া মরিবে।...টুলু এই বিরাট জাগরণ-প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করিয়া গেল—আগাগোড়া...কেন?

সে-ই না সেদিন আশ্রমের শান্তভাব লইয়া নরোত্তমকে অমন চোখা চোখা কথা দিয়াছিল শোনাইয়া, যাহার ফলে নরোত্তমের এই স্বরূপে প্রকাশ? এ কয়টা দিনের মধ্যে কী এমন হইয়াছে যাহার জন্য তাহার এই অদ্ভুত রূপান্তর? নূতন কি এমন হইল?

টুলু চুপ করিয়া বসিয়া নিজের মনের মধ্যে যেন তলাইয়া যাইতে লাগিল,

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল, আকাশে শুকতারা ফুটিল এবং সমস্তটুকু কারুণ্যের সঙ্গে যেন এক হইয়া একটি মুখ ধীরে ধীরে তাহার মনে স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

—তটিনীর মুখ! টুলু যেন হঠাৎ একটা নূতন আবিষ্কারের বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। এ ধরনের অনুভূতি একেবারেই নূতন তাহার জীবনে। মনটা তাহার বহুদূর পর্যন্ত চলিয়া গেল, সেই সন্ধ্যাটিতে ঝটিকা-বিক্ষিপ্ত পক্ষীটির মতই তটিনী সেই যে দুর্যোগের সন্ধ্যায় তাহার আশ্রয়ে—নিতান্তই তাহার পাশটিতে আসিয়া পড়িয়াছিল। টুলু আজ বুঝিল, সেদিন তাহার জীবনেও একটা বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। মিলাইয়া দেখিল সেই থেকে তটিনীর চিন্তায় বরাবরই একটা মাদকতা ছিল। কিন্তু এমনই অদ্ভুত এই মাদকতা যে, যখন ছিল, বেশ সচেতনভাবে তা বুঝিতে দেয় নাই!···কতকটা মাস্টারমশাইয়ের প্রভাবে, কতকটা এই বয়সে জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতালাভের জন্য টুলুর আত্মবিশ্লেষণের ক্ষমতাটা বেশ আয়ত্ত, যেন নিজের থেকে আলাদা হইয়া নিজের গতিবিধি, নিজের মনের খুঁটিনাটি লক্ষ্য করিবার বেশ ক্ষমতা আছে, অভ্যাসও আছে। কিন্তু আশ্চর্য, এই একটি ব্যাপার যেন তাহার সতর্কতাকে ফাঁকি দিয়া ঘটিয়া গেল তাহার জীবনে; তটিনী তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে দেখার সেই মুহূর্ত থেকেই, কিন্তু আজ পর্যন্ত তো জানিতে দেয় নাই, সে আকর্ষণের মধ্যে এ রকম একটা ঘুমপাড়ানো যাদুশক্তি ছিল।

টুলু নিজের মনটা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল। নারীর সঙ্গে একটা অদ্ভুত সম্বন্ধের আস্বাদ, টুলুর জীবনে এই প্রথম—কত নিবিড়, কত অশ্রুজলে গলা, কত মধুর, কিন্তু কত সর্বনাশাভাবে মধুর। আজ সে তটিনী থেকে দূরে বলিয়াই সমস্তটা স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছে। বুঝিতেছে, তটিনী নাই বলিয়াই তাহার সন্ধ্যা আজ এত মলিন—জীবনে কিছু যেন আর তার নাই। এই তো এত নারীর সান্নিধ্য সে পাইয়াছে, অস্বীকার করিতে পারিতেছে না সেই একদিনের কলুষ-কামনার উন্মাদনা—সাঁকরেল থেকে ফিরিয়া যেদিন চম্পার রূপবহ্নিতে নিজেকে আহুতি দিবার জন্য ছুটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ নূতন এক জিনিস—এত কামনাময় হইয়াও এত নিষ্কলুষ!

কিন্তু তবুও সত্যই কি সর্বনাশ !...এখন তো বুঝিতেছে—আর তো অস্বীকার করিতে পারে না যে, শত নিষ্কলুষ হইলেও তটিনীর সংশ্রবই তাহাকে তাহার ব্রত থেকে স্খলিত করিতে বসিয়াছে। নিজের কাছে বিশ্বাস না করা শক্ত যে, এত বড় একটা গুরুগম্ভীর ব্যাপার লইয়া সে নিঃশব্দে, আর নিশ্চয়ই তীব্র ঘৃণাভরেই তাহার সঙ্গ পরিহার করিয়া উঠিয়া গেল।

॥ উনিশ ॥

টুলুকে যখন আহারের জন্য ডাকিতে আসিল হীরা, তখন সে একভাবেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। চম্পা এ লইয়া একটি কথা বলিল না, খুব সম্ভব হীরাকেও আজ টুকিয়া দিয়াছিল, সেও বাচালতা করিল না, হাত পা গুটাইয়া, অতিরিক্ত ভদ্রভাব অবলম্বন করিয়া রহিল, এক রকম নিঃশব্দেই আহারটা সমাধা হইল।

সকালে টুলুর দৃষ্টি এড়াইয়া কয়েকবার আড়চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার মুখটা বিশীর্ণ হইয়া গেছে, দৃষ্টিতে একটা জ্বালা। সমস্ত রাত সে ঘুমায় নাই—এটা জানে চম্পা, কেন না তাহার নিজেরও ঘুম হয় নাই, কয়েকবারই শুনিল টুলু দোর খুলিয়া বাহিরে আসিল, বুঝিল দাওয়ায় পাইচারি করিতেছে।

সমস্ত দিন এ সব লইয়া কিছু উচ্চবাচ্য করিল না। দারুণ অন্যমনস্কতার জন্য আজ সব কাজেই বিলম্ব হইয়া যাইতেছে বলিয়া টুলুর আশ্রম থেকে ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। মুখ হাত পা ধুইয়া জলযোগ করিতেছে। চম্পা বলিল—"কাল আমার ফুরসৎ ছিল না, নৌকা ক'রে বেড়াতে যাও তো চল না আজ।"

হীরাও ছিল, বাঁ হাতটা জড়াইয়া বলিল—"হ্যাঁ বাবা, চল।"

টুলু চম্পার পানে চাহিয়া অল্প একটু বিরক্তির সহিত বলিল—"মোটেই ভাল লাগছে না চম্পা, কেন ওকে নাচালে ?"

চম্পা হীরাকে বলিল—"যাবেন না হীরা, তুমি খেলোগে।"

কাল থেকে মায়ের দৃষ্টিতে কি একটা রহস্য আছে, হীরা মুখটা একটু চুন করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

চম্পা দরজায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"যাবে না জেনেই বলা। কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে ?"

টুলু একটু বিস্মিতভাবে বলিল—"কি ভাবে ?"

"এই যে কাল থেকে যে ভাবে চলছে—দিদি গিয়ে পর্যন্ত। তুমি সমস্ত রাত ঘুমোও নি, আর সব কথা না হয় বাদই দিলাম।"

টুলু নির্বাকভাবে চম্পার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ব্যাপারটাকে হালকা করিয়া ফেলিবার জন্য একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"গঞ্জডিহিতে সমস্ত রাত জেগে পাহারা দিতে, এখনও অভ্যেসটা যায় নি দেখছি।"

চম্পা ও-কথার উত্তর দিল না, বলিল—"আমি যা বলি শোন, দিদিকে আনিয়ে নাও, আমিই দিচ্ছি লিখে..."

"সে কি ? সর্বনাশ !"

এমন আতঙ্কিতভাবে আপনিই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল কথা দুইটা যে, এত গাম্ভীর্যের মধ্যেও চম্পা একটু না হাসিয়া পারিল না, বলিল—'দেখো ! দিদি বাঘ, না ভাল্লুক ?"

টুলুর গাম্ভীর্য কিন্তু এতটুকুও নষ্ট হইল না, একটু মাথা নিচু করিয়া ভাবিল, তাহার পর বলিল—"চম্পা, গঞ্জডিহিতে—কি উপলক্ষ্যটা ঠিক মনে পড়ছে না আমার—আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তোমার আর আমার মাঝে গোপন কিছু থাকবে না, অন্তত আমি কিছু লুকুব না তোমার কাছ থেকে—যে ভাবে তুমি নিজেকে আমার কর্মজীবনের সঙ্গে জুড়ে ফেলেছ..."

আবেশে চম্পার চোখ দুইটি নরম হইয়া আসিল। টুলু একটু বিরতি দিয়া বলিল—"তাই তোমার কাছে আর অস্বীকার করব না যে, তটিনী সত্যিই আমার জীবনে মস্তবড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে...এটা হঠাৎ টের পেলাম আমি..."

চম্পা প্রশ্ন করিল—"বাধা কেন ? বাধা কিসের ?"

"সবটা শুনে যাও। মাস্টারমশাই তোমায় আমার শিষ্যা ব'লে গেছেন, আমি তোমায় তারও ওপরে জায়গা দিয়েছি আমার জীবনে—শিষ্যা বলতে, বন্ধু বলতে

এক তুমিই আছ, তোমার পরামর্শ আমার দরকার। সবটা শুনে, আমার জীবনের যা কাজ তার সঙ্গে মিলিয়ে বল, বাধা নয়তো কি তটিনী? ওকে প্রথম যেদিন দেখি—হয়তো যে-অবস্থায় আচমকা দেখা সেইজন্যই—ও সেইদিন থেকেই আমার মনের খানিকটা জুড়ে বসেছে। আট বছরের জেল-জীবনের ব্যবধানে হয়তো সেটা তলায় প'ড়ে গিয়েছিল, কিন্তু ছিল। মনে পড়ে—তুমি একদিন কি কথার মাথায় বলেছিলে, হীরার নতুন মা এনে দেবে?—সেই থেকে তটিনী আবার নতুন ক'রে জেগে ওঠে আমার মনে, তারপর এল আশ্রমে, তারপর চালের ব্যাপার নিয়ে আমি রইলাম ওর ওখানে। এখন মিলিয়ে দেখছি ব'লে মনে পড়ছে চম্পা—ফিরে আসবার সময় তটিনীর চিন্তাটাকে মন থেকে ঠেলে রাখার জন্যে সমস্ত রাত পথে আমায় কি অমানুষিক চেষ্টা করতে হয়েছে, অথচ আমি পারি নি।...তারপর এখানে এই মাসখানেকের ওপর একসঙ্গে থাকা...আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যতদিন তটিনী ছিল, বুঝি নি এতটা, ও চ'লে যেতে সব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—আমি সত্যি ভয় পেয়েছি..."

চম্পা যেন নিজের মৃত্যুর রায় শুনিতেছে, অনুভূতিগুলা সব শিথিল হইয়া আসিতেছে, তবু নির্বিকারভাবেই বলিল—"সবটাই তো স্বাভাবিক। দিদির মতন মেয়ে একটা...

"কিন্তু আমার জীবন তো স্বাভাবিক নয়।"

"খানিকটা স্বাভাবিক নয় ব'লে সবটাই অস্বাভাবিক ক'রে তুলতে হবে তার মানে কি? শোন আমার কথাটা, দিদিকে আনিয়ে নাও, তার মানে যা হয়—দিদিকে বিয়ে কর।"

টুলুর ঠোঁটে একটু শ্লেষের হাসি ফুটিল, বলিল—"এই জন্যে তোমায় বললাম সব কথা?—এরই নাম পরামর্শ দেওয়া?"

"হ্যাঁ, এরই নাম পরামর্শ দেওয়া; কেন না তুমি যেটা ঠিক ব'লে মনে করেছ, আমাকেও যদি তাই ঠিক ব'লে ধ'রে নিতে হয় তো তা হ'লে আর পরামর্শের কি রইল? কথাটা ভুল বলছি?"

"না, কথাটা ভুল বল নি, তবে পরামর্শটায় যে ভুল আছে সেটা তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথম, তটিনীর রাজি হওয়া চাই তো?"

"দিদির মন আগেই জেনে নিয়েছি আমি।"

"তাই নাকি ?" টুলু ক্ষণমাত্রের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া গেল, তাহার পর বলিল —"বেশ। তোমার কথা ? তুমি কি করবে ?"

"সব কথা দিদিকে খুলে বলব। তিনি বুঝবেন—এ বিশ্বাস আমার আছে।"

"সিঁথির সিঁদুর তোমার ?"

"মুছে ফেললেই হবে ; ওর তো দাম নেই।"

"আমার কথা ?"

"কি তোমার কথা ?"

"তোমার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে এতদিন আমার কাছে রেখেছি—সবার চোখে ধুলো দিয়ে।...এই আশ্রমে আজ আমি কী আছি, তোমার কপালের ঐটুকু সিঁদুর লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কী হয়ে যাব ভেবে দেখো। কেন সিঁদুর দেওয়া সেইটুকুই মনে ক'রে দেখো না। গঞ্জডিহি ভুলে গেলে ?"

চম্পা চুপ করিয়া স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল টুলুর মুখের পানে। টুলু প্রশ্ন করিল—"তারপর হীরার কথা ? কত ক'রে গড়েছি ওকে ভেবে দেখ—তুমি, আমি, নরোত্তম ; দীক্ষা দিয়ে গেছেন মাস্টারমশাইয়ের মতন লোক। তোমার সিঁদুরের প্রবঞ্চনা ধরা পড়লে ও যে কয়লার খনির চেয়েও নিচে তলিয়ে যাবে।"

চম্পার চক্ষু দুইটা বিস্ফারিত হইয়া আসিল ধীরে ধীরে—সেই পরিণামটা যেন চোখের সামনে দেখিতে পাইতেছে। তাহার পর হঠাৎ যেন বুদ্ধির উদয় হইল একটু, বলিল—"আমি ওকে নিয়ে চ'লে যাব। একদিন তো বলেছিলে।"

"তা হতে পারে ; এমন কি যাবার কারণটা চেষ্টা-চরিত্র ক'রে আপাতত লুকিয়েও রাখতে পার ওর কাছ থেকে। কিন্তু বয়েস আটকে রাখতে পার না তো ? একদিন বড় হয়ে টের পাবে ও এমন বাপের সন্তান যে এক স্ত্রীর লোভে এক স্ত্রীকে বাড়িছাড়া করেছিল। শুধু হয়তো মনে থাকবে—সেই বাপ খুব বড় বড় কথা বলত, অনেক উঁচু কথার ছড়া শিখিয়েছিল।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"আরও কিছু বলবার আছে নাকি ?"

নিরুত্তর দেখিয়া বলিল—"এই গেল ছেলের দিকের কথা, ওর ওপর সে অবিচারটা হতে পারে। আমার ওপর যা অবিচার তা ক'রেই ফেলেছ চম্পা।"

চম্পা মুখ তুলিয়া বলিল—"কি ? অবিচার কি ?"

"তটিনীকে পাবার জন্তে আমি তোমায় ইচ্ছে ক'রে হারাব ?"

উত্তর দিবে কি, চম্পার যেন দাঁড়াইয়া থাকা অসহ্য হইয়া উঠিল, কোন রকমে বলিল—"ভুল হয়েছে সত্যিই ; আমায় মাপ ক'রো ; আমি যাই।"

"দাঁড়াও, আসল কথা তো তোমায় বলা হয় নি, এ শুধু তোমার পরামর্শের ভুলটুকু দেখা গেল..."

দাঁড়াইতে পারিতেছিল না বলিয়াই চম্পা ভুলটুকু স্বীকার করিয়াছিল, মুখটা একটু ঘুরাইয়া, নিজের অধরটাকে কামড়াইয়া অশ্রুটা দমন করিয়া লইল, তাহার পর আবার ঘুরিয়া সহজকণ্ঠে বলিল—"ভুল হয়েছে, তাই ব'লে সমস্তটাই যে ভুল এ কথা মানব না, একটা বড় কাজের জন্তে—আশ্রমের জন্তে—আমার মতন একটা মেয়েছেলেকে ত্যাগ করা চলে—উচিত ; বলি চাই..."

আবার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

অভিমান হইয়াছে, না হইলে হঠাৎ 'বলি'র কথা বাহির হইত না চম্পার মুখ দিয়া। কেন অভিমান টুলু তাহাও জানে, কিন্তু উপায় কি ? বলিল—"তাও দিতাম চম্পা, যদি না তাতে আশ্রমটাই বলি পড়ত। তোমার দরকার আরও বেশি হয়ে পড়েছে আশ্রমে।"

"কেন ? ঝঞ্চাট তো ক'মে এসেছে, এটুকু শীগ্‌গিরই যাবে ; এখন যা কাজ তার জন্তে দিদির মতন মেয়েরই তো দরকার বরং।"

"এটা তো বাইরের ঝঞ্চাট ছিল। এ থেকে নিশ্চিন্দি হবার পরই তো আসল ঝঞ্চাট আরম্ভ হবে, যার জন্তে আশ্রম। তুমি ভুলে গেলে আশ্রমের উদ্দেশ্য ?"

চম্পা আবার স্থির দৃষ্টিতে টুলুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ ; তাহার পর ভীতভাবে বলিল—"আবার সেই সব ?—সেই মাস্টারমশাইয়ের চিঠি ?"

টুলু কতকটা নিষ্ঠুরভাবে বলিল—"হ্যাঁ চম্পা। আবার সেই সব আরম্ভ করতে হবে ব'লেই তো তটিনী আমার সমস্যা, সেই জন্তেই তো তোমার পরামর্শ চাওয়া। শুধু তাঁতবোনার আশ্রম হ'লে আসতই বা তটিনী, তুমি যে ভাবে বিধান দিলে। ..ক্ষতি কি ছিল এমন ?"

আজ রাত্রেও টুলুর চোখে ঘুম নাই। তবে নিঃশব্দেই পড়িয়া রহিল, জানে, চম্পাও জাগিয়া আছে।...আজ একটিমাত্র চিন্তা, চম্পাকে হারাইল টুলু। তটিনী যাওয়া অবধি ওর নব নব আবিষ্কারের যেন মরশুম পড়িয়া গেছে, কাল ছিল নিজের ভালবাসা সম্বন্ধে, আজ সেই ভালবাসা দিয়াই চম্পার অন্তরকে চিনিল। জানিল চম্পার মনের কথা আগেও, তবে ভালবাসা যে কী শক্তি, নারী হইয়া চম্পা যে সে-শক্তির কাছে আরও কত অসহায়, সেটা নিজের ভালবাসার নিরিখে আজ এই প্রথম বুঝিল টুলু। সেইজন্য এও বুঝিল যে, চম্পাকে হারাইতে হইল ; সাথী হিসাবে চম্পার গতি ফুরাইয়া গেছে।

একেবারে শেষ রাত্রে নিঃশব্দে উঠিয়া খুব সন্তর্পণে দুয়ার খুলিয়া বাহিরে গেল। আপিসের দুয়ারে ধীরে ধীরে কয়েকটা টোকা দিল। সবচেয়ে সজাগ ঘুম নরোত্তমেরই, দরজা খুলিয়া বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল—"আপনি ?"

"হ্যাঁ, চল নদীর ধারে।"

বাকি রাত্রিটা দুইজনে মিলিয়া পরামর্শ হইল...কি ভাবে কাজ করিতে হইবে, কে কে থাকিবে, এই সব। ওদিককার প্ল্যানটাও সবিস্তারে তখন শোনা হয় নাই, প্রশ্ন করিয়া শুনিল।

উঠিবার সময় বলিল—"চম্পা এসবের কিছু ঘুণাক্ষরেও জানবে না নরোত্তম।"

নরোত্তম যে বিস্মিত হইল সেটা নিশ্চয় আহ্লাদের বিস্ময়,—মেয়েছেলে যত দূরে থাকে ততই মঙ্গল ; তবু সহজভাবেই প্রশ্ন করিল—"কেন ? মা-মণি তো সবই জানেন।"

টুলু শুধু বলিল—"থাক্, পারবে না।...যতটুকু জেনেছে তার তো চারা নেই !"

॥ কুড়ি ॥

কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। দিন দাঁড়াইয়া থাকিবার নয় বলিয়াই কাটিয়া গেল, কিন্তু চম্পার মনে হয়, আর কাটিতে চায় না।

টুলুর গতিবিধি অনেকখানিই বদলাইয়া গেছে। আশ্রমে থাকে কম ; একবার তিন দিন বাহিরে কাটাইয়া আসিল, একবার পাঁচ দিন ; চেহারাটা যেন ঝোড়ো কাকের মত হইয়া গেছে, দৃষ্টির সেই জ্বালাটা গেছে বাড়িয়া, ভ্রূকুটির মধ্যেই যেন কোন রকম প্রশ্নে আপত্তির ইঙ্গিত রহিয়াছে ; চম্পা আর করেই না কিছু জিজ্ঞাসা, এত কৌতূহলের মধ্যেও করিল না।...নিশ্চয় রাত্রেও প্রায় বাহির হইয়া যায়। তটিনী থাকিতে কানন আর টুলু বাসার মধ্যেই একটা ঘরে শয়ন করিত, যে রাত্রে চম্পার সহিত কথা হইল, তাহার পর-রাত্রি হইতেই বাহিরে আপিস-ঘরে শুইতেছে ; দুই দিন দেখিল, টুলু ভোরবেলায় গ্রামের দিক থেকে আসিতেছে। চম্পা জিজ্ঞাসা না করিলেও কিন্তু প্রশ্নটা একদিন টুলুর কানে পৌঁছিয়া গেলই,...হীরাও আজকাল বড় একটা আমল পায় না, একদিন আদর করিয়া ডাকিয়া একটু গল্প-স্বল্প করিতেছে, হীরা হঠাৎ বলিল...“বাবা, একটা কথা বলব, মাকে বলবে না ?”

টুলু তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—“যদি দরকার মনে করি তো বলব না ? তুই-ই বল্ না রে হীরা, বড় হয়েছিস তো ?”

হীরা একটু ভাবিয়া বলিল—“বেশ ব'লো ; কিন্তু মাকে বকতে বারণ ক'রে দিও আমায়, রাজি তো ?”

“হ্যাঁ, সে বরং কথা দিচ্ছি তোকে, বকবে না ; বল্।”

“তুমি কোথায় যাও মাকে আর বল না তো।”

কথাটা ছেলের মুখ দিয়া ঘুরিয়া আসিবার জন্যই আজও বেশি করিয়া বাজিল টুলুর বুকে, একটু চুপ করিয়া হাত বুলাইতে লাগিল হীরার মাথাতে, তাহার পর বলিল—“তোর মাও তো যায় হীরা ; সেবারে সেই দুটো রাত কাটিয়ে এল

মাঝের পাড়ার কার ছেলের অসুখে, আমায় বলেছিল?···মনে নেই?—তুইও কান্নাকাটি করলি।"

হীরা মুখ টিপিয়া হাসিয়া উপর নিচে মাথা নাড়িল। বাবা-মায়ের আড়া-আড়ি-টুকু বেশ রুচিকর হইয়াছে। বলিল—"তুমিও যেমন আমায় বল না, আমারও তেমনি তোমায় বলতে ব'য়ে গেছে, কি বল বাবা?"

"হ্যাঁ, এই তো তুই সব বুঝতে শিখেছিস হীরা। যা খেল্‌গে যা; কই আজকাল সে রকম কংগ্রেস-পতাকা নিয়ে খেলিস না তো?"

"আমি দাঁড় ঠেলতে শিখছি বাবা, কলম্বাস-কলম্বাস খেলি আজকাল—আমেরিকা আবিষ্কার করতে যাই। কাননকাকা গল্প করত না সেই? জাহাজ চালাবার গানও আছে, শোন না—

"খর বায়ু বয় বেগে,
চারিদিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।
তুমি ক'ষে ধরো হাল,
আমি তুলে বাঁধি পাল—
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইও॥
শৃঙ্খলে বার বার
ঝন্‌ঝন্ ঝংকার,
নয় এ তো তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার···"

টুলু মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া থাকে, অনেক দিনই দেখে নাই হীরার এই ছন্দ-রূপ, কিন্তু বড় অন্যমনস্ক হইয়া গেছে একটা কথায়, মাঝখানেই থামাইয়া বলিল—"থাক্, আর একদিন শুনব হীরা—ভাল ক'রে।···খেল্‌গে যা এখন, তোর মাকে একবার ডেকে দিয়ে।"

দুই পা গিয়া হীরার মনে পড়িয়া গেল, আবার ঘুরিয়া বলিল—"আবার বিদ্রোহও হয় বাবা, সত্যিকার।"

টুলু হাসিয়া বলিল—"সেটা ডাঙায় সেরে জাহাজে উঠো; নদীতে নতুন জল নেমেছে।···যাও ডেকে দাওগে।"

চম্পা আসিলে প্রশ্ন করিল—"কোথায় যাই, কি করি, তোমায় বলি না ব'লে হীরার কাছে দুঃখ করেছ চম্পা ?"

একটু বিস্মিত হইয়াই চম্পা বলিল—"বারণ করলাম তবু বলতে গেল তোমায় ?—ওই আমায় জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাও তুমি, সে-পাঁচদিন কোথায় গিয়েছিলে ? বললাম—আমায় আর বলেন না।"

সুযোগটা আপনিই আসিয়াছে দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"মিছেও তো বলি নি, কই, আর বল ?"

"কি করবে সব কথা শুনে চম্পা ?"

"তা হ'লে আর একটু বলি, তুমিই সেদিন বললে—কবে গঙ্গাডিহিতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলে কিছু লুকুবে না আমার কাছ থেকে।"

"সে কিন্তু আমার সমস্ত কর্মজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলে বলে, এখন তো ওদিক থেকে তুমি আলাদা হয়েছ।"

"আমি কি নিজে হতে আলাদা হয়েছি ?"

"না, তবে যদি মনে কর আমিই ক'রে দিয়েছি, সেটা আরও ভুল, ওটা হয়ে পড়ল অবস্থা গতিকে। তুমি বুদ্ধিমতী, যদি কখনও স্থিরভাবে ভেবে দেখ, নিজেই বুঝতে পারবে। দেখই ভেবে, তাতে অন্তত আমার ওপর থেকে রাগ বা অভিমানটা কেটে যাবে। এই সঙ্গে একটা কথা তোমায় বিশ্বাস করতে বলি চম্পা, আমি এসব বলি না ব'লে স্বপ্নেও ভেবো না যে, তোমার ওপর আমার কোন রাগ বা অভিমান আছে। বলি না—অযথা তোমার দুশ্চিন্তা বাড়াতে চাই না ব'লে।"

টুলুর কণ্ঠস্বরটা স্নেহে করুণায় ছলছল করিতেছে।

সত্যই রাগ-অভিমান তো নাই-ই চম্পার উপর, বরং আরও গভীর স্নেহ আর মায়ায় মনটা সর্বদা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। ও যে আর হাতে হাত রাখিয়া আগাইয়া আসিতে পারিল না, দাঁড়াইবার উপায় নাই বলিয়া ওকে যে পথের ধারে ফেলিয়া আসিতে হইল, এইটিই হইয়া রহিল মর্মন্তুদ। আরও একদিন এই রকম কথাচ্ছলে টুলু জিনিসটা আরও স্পষ্ট করিয়া দিল, বলিল—"মনে খেদ রেখো না চম্পা, এই রকমই হবার ছিল। আমরা দুজনে এলাম অনেকদূর,

একসঙ্গে, কিন্তু উদ্দেশ্য আমাদের এক ছিল না। তোমার যা উদ্দেশ্য, অবস্থা অনুকূল হয়ে তার অনেকখানি তোমায় দিয়েছে; সেইটুকুর মোহই যে কী ভীষণ তোমায় ভেবে দেখতে বলি। তুমি আরও যদি এগুতে যাও তো আমার জীবন করবে বিফল, চাও কি তাই?"

এই করিয়া বুঝাইতে হয় না চম্পাকে আজকাল, ওর পথ যে শেষ হইয়া আসিয়াছে, ভাল করিয়াই বোঝে সেটা।...আজকাল একা পড়িয়া গেছে, ভাবে বড় বেশি। এক এক সময় আরশির সামনে গিয়া প্রতিচ্ছায়াটির পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মনে হয় খুবই অন্তরঙ্গ দুই সঙ্গীতে মুখামুখি হইয়া আছে, দুই বুকে একই বেদনা লইয়া, এর চোখ ঝাপসা হইয়া আসিলে ওর চোখেও জল টলটল করে।...হ্যাঁ, পাইয়াছে বইকি—সিঁথির ঐ সিঁদুর, অবস্থাগতিকে অগ্নিসাক্ষী রাখিয়া পাওয়া সিঁদুরের মতই অনপনেয়; সন্তান স্ত্রীর মর্যাদা—সবাই পাইয়াছে—কত মিষ্টই যে লাগে নিষ্পাপ প্রবঞ্চনার অন্তরাল থেকে আশ্রমের সবাই যখন 'মা-মণি' বলিয়া ডাকে, তটিনী আসিয়া বলে—'বউ', কানন ডাকে 'বউদিদি'। অবস্থা আরও অন্তরঙ্গ করিয়া আনিয়া দিয়াছে টুলুকে, কথাবার্তার মধ্যে একটা ব্যবধান থাকিয়া গিয়াছিল, তটিনী আসায় 'আপনি' থেকে স্বামী-স্ত্রীর যে অন্তরঙ্গ 'তুমি'তে আসিয়া গেছে এটাও অবস্থার একটা কম আনুকূল্য নয়। বাইরের সবটুকুই পাওয়া গেছে—পূর্ণমূর্তিতে, কিন্তু প্রাণ কই?

চম্পার মনটা ব্যাকুল আবেগে উথলাইয়া উথলাইয়া ওঠে; কাহাকেও পায় না বলিয়া অবস্থাকেই যেন দেবতা করিয়া লইয়া মনে মনে বলে—"আমি চাই না আর কিছু, আমার এইটুকুই বজায় রেখে দাও; এর সবটুকুই মিথ্যে, তবু এই মিথ্যে বুকে ক'রেই আমি নির্বিবাদে, আর কিছুই না পেয়ে কাটিয়ে দোব আমার জীবন! আমি চাই না এতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা—আমার প্রাণ যে ঢেলে দিতে পারছি এই আমার যথেষ্ট।"

কিন্তু কই আর থাকিতেছে এটুকুও? চম্পা চোখের সামনে দেখিতেছে ঐ অবস্থা—দেবতা বিরূপ হইয়া উঠিতেছে, টুলু যে ওকে তাহার জীবন থেকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া আগাইয়া গেল এর বেদনাই অসহ্য, আগাইয়া চম্পার কোন সর্বনাশের পথে যে চলিয়াছে ভাবিতেও আতঙ্কে ভরিয়া ওঠে সারা মন।

তবু, যত দিন যাইতেছে নিজের অদৃষ্টের সঙ্গে আপোস করিয়া লইতেছে চম্পা। এক এক সময় মনটাকে দৃঢ় করিয়াও লয়, মনে মনে নিজের অতীত জীবন থেকে ঘুরিয়া আসে—আরও কিছু অবলম্বন করিয়া কি এই জীবনে পা দেয় নাই? কেন, হীরা আছে তো, কোথা থেকে আসিয়া পড়িয়াছে তাহারই কোলে, তাহাকে মানুষ করিতে হইবে।…ছেলে লইয়াই পড়ে চম্পা—তাহাকে শেখায় পড়ায়, কানন কতকগুলা বই রাখিয়া গিয়াছিল, নিজে পড়িয়া গল্প বলে—বিবেকানন্দের বাণী, রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ; ওর গৌর আননে দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়া যে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয় তাহার কথা ভাবিয়া বর্তমানকে ভোলে চম্পা। ওর সেই খেলাধূলাকে আবার জমাইয়া তুলিতেছে—নকলগড়, সীতা-উদ্ধার, তোরণদুর্গ অবরোধ। চম্পা যেন নিজের সঙ্গে জেদাজেদি করিয়াই করে এসব; নিজের কুণ্ঠা-দুর্বলতা থেকে সরিয়া আসিয়া যেন মুক্ত ভূমিতে দাঁড়ায়—কই, চম্পা তো ভীরু নয়, এই তো সে নিজের সন্তানকে বীরধর্মে গড়িয়া তুলিতেছে; তাহার দীক্ষাগুরু—মাস্টারমশাই, বুকের রক্তে যিনি শিষ্যকে নির্দেশ দিয়া যান, পিতা যাহার আদর্শের জন্য অমন করিয়া আত্মবলি দেয়, তাহাকে চম্পা মেরুদণ্ডহীন একটা কীটের মত বুকের ভরে মাটি বহিয়া চলিতে দিবে নাকি?

কি রকম জোয়ার আসে মনে, চম্পা আরও বড় করিয়া অনুভব করে নিজেকে। পারিবে, পারিবে—আদর্শের জন্য টুলু যত বড় বিপদকেই বরণ করুক না কেন, যাহাই কেন পরিণাম হোক না তাহার, চম্পা হাসিমুখেই সহ্য করিবে। টুলুকে নিবারণ করিবার জন্য পাশের জায়গাটি বাছিয়া লয় নাই, তাহাকে তাহার সিদ্ধির পথে আগাইয়া দিবে—চম্পার সিদ্ধিও যে তাহাই। টুলু না দিতে চায় স্থান সে জোর করিয়া নিজের স্থান অধিকার করিবে।

নদীর সহজ গতি নিবদ্ধ করিয়া জোয়ারের জল কিন্তু টেঁকে না বেশিক্ষণ, আবার নামিয়া যায়।

॥ একুশ ॥

দিনগুলা বড় এলোমেলো ভাবে কাটিতেছে। পৌষ মাস পড়িয়া গেল, বেশ শীত পড়িয়াছে। শীতে একে এমনি মন অন্তর্মুখী হইয়া পড়ে, তাহার উপর আজ দশদিন যাবৎ টুলু বাড়ি নাই। নির্জলা দুশ্চিন্তার দিনটা কিন্তু আজ ভালই কাটিল কিছুক্ষণ; দুপুরবেলা হঠাৎ কানন আসিয়া উপস্থিত, একটা কাজে দিন চারেকের জন্য দিদির কাছে আসিয়াছিল। একটা দিন এখানেও কাটাইয়া যাইবে।

আসিয়াই প্রথম প্রশ্ন চম্পার চেহারা লইয়া, বলিল—"চেনা যায় না যে বউদি—কটা দিনই বা আমরা গেছি বলুন না?"

চম্পা হাসিয়াই উড়াইয়া দিল কথাটা, বলিল—"থাক্, এই কটা দিনেই ভুলে গেছ, সে কথা আর তুলতে হবে না বাহাদুরি দেখিয়ে; ওদিককার খবর বল আগে।"

পরকে আপন করিয়াই জীবন। দেবরকে পাইয়া যেন বর্তাইয়া গেল। একটু কাছছাড়া হইতে দিল না, ওরই খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থার মধ্যে ঘর থেকে, দাওয়া থেকে, উঠান থেকে মুখ ঘুরাইয়া অনর্গল গল্প করিল,—মুখে কখনও হাসি, কখনও গাম্ভীর্য, কখনও বিস্ময়, রান্নার সময় রান্নাঘরের মধ্যেই মোড়ায় বসাইয়া রাখিল হীরার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করিয়া, দুপুরে আশ্রমের কাজে কামাই করিল—যাহা ও কখনও করে না। গল্পের মাঝে মাঝে অবান্তর ভাবেই ক্রমাগত অনুযোগ করিল—"এলেই যদি, বউদিকে মনে ক'রে তো মাত্র একটা দিনের জন্যে—তারও আদ্দেকটা তো পথেই কেটে গেল। এ আসা তোমার মঞ্জুর হ'ল না ভাই, তা ব'লে রাখলাম,—এবার বউদির কাছে একদিন কাটাবে। তবে শোধবোধ হবে।"

বিকাল গড়াইয়া গেলে আর ধরিয়া রাখা গেল না; নৌকাযোগে কাশবনীতে দেশ আবিষ্কার করিতে যাইবার জন্য হীরক একেবারে ধরিয়া পড়িল। কানন

বলিল—"একবার হয়ে আসি বউদি, আমার নিজেরও টান রয়েছে, বেশ লাগে জায়গাটা, সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসব।"

নিজেই দাঁড় ঠেলিয়া লইয়া গেল, বনের ধারে নৌকাটা রাখিয়া তীরে উঠিল।

জায়গাটা যথার্থই একটু বন্যপ্রকৃতির। এইখানেই লম্বাচওড়া বেশ অনেকখানি জমির ওপর নদীটা কয়েকবারই স্রোত পরিবর্তন করিয়া সমস্ত তল্লাটটাকে ভাঙিয়া চুরিয়া বসতি বা চাষবাসের একেবারে অনুপযোগী করিয়া দিয়াছে। উঁচু-নিচু জমির উপর কাশ, বনঝাউ, আরও কতকগুলা বেলে জমির আগাছা, তারই মাঝে আবার এই সবে ঘেরা ফাঁকা জমিও আছে এখানে সেখানে। কাছেপিঠে গ্রাম না থাকায় বন্যরূপটা যেন আরও ভাল করিয়া ফুটিয়াছে।

কাননের মনটাই একটু অরণ্য-বিলাসী, তাহার ওপর সঙ্গীর অদম্য উৎসাহ, কতকগুলা চেনা জায়গা আছে, সেগুলা খুঁজিতে খুঁজিতে অনেকটা ভিতরে চলিয়া গেল, যে সময় নদীর ধারে ফিরিয়া আসিল তাহার অনেক আগেই সূর্যাস্ত হইয়া গেছে।

ভাঙা পাড় দিয়া নামিতে যাইবে, হঠাৎ একটা দৃশ্যে থমকিয়া দাঁড়াইল। শ চারেক হাত দূরে নদীর ওপারে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন লোক জমা হইয়াছে। ধারে একটা নৌকা আছে, দশ-বারো জন করিয়া নদীর মাঝামাঝি চড়াটায় নামিল, নৌকাটা ফিরিয়া গেল, আরোহীরা চড়ার এপাশের নদীর ফালিটুকু পায়ে হাঁটিয়াই পার হইয়া ধীরে ধীরে কাশবনীর ও-প্রান্তে প্রবেশ করিল। আরও বাকি সবাই নৌকায় উঠিয়া মাঝের চড়ায় আসিল, এবং তাহারা এদিককার জলটুকু পার হইতে না হইতে নদীর ধারে আরও একটা দল আসিয়া উপস্থিত হইল। কানন বিস্মিত হইয়া একটা কাশের ঝাড়ের পাশে সরিয়া আসিয়াছে, হীরাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া। হীরা প্রথমে ব্যাপারটার মধ্যে যে অস্বাভাবিক কিছু আছে এমন বুঝিতে পারে নাই। কাননের ভাবগতিক দেখিয়া একটু বোধ হয় রোমান্সের গন্ধ পাইয়া প্রশ্ন করিল —"কারা কাননকাকা?"

কানন বলিল—"চুপ ক'রে দেখো এখন, পরে বলব।"

খানিকক্ষণ চুপ থাকিয়া হীরা ফিসফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দেশ অধিকার করতে এসেছে?"

অবশ্য অনেকখানি দূরে, তবু কানন তাহার মুখে হাত চাপিয়া বলিল—"হ্যাঁ, চুপ কর।"

আরও লোক আসিল ওপারে, সেইভাবেই নদী পার হইয়া নিঃশব্দে বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক এইভাবে চলিয়াছে, কাননের আন্দাজ মত প্রায় শ দুয়েক লোক বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, হীরা হঠাৎ জোরে ফিসফিস করিয়া বলিয়া উঠিল—"ও কাননকাকা, কলম্বাস!"

সত্যই দলপতি কলম্বাস। এইটেই শেষ দল, তাহাদের পুরোভাগে কানন দেখিল নরোত্তম। গা-ঢাকা অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, তবু ভুল হয় না, সেই দীর্ঘ ঋজু শরীর, ছায়াকারে হইলেও বলদৃপ্ত ভঙ্গী; মাথার বড় বড় চুল; হীরা চেনে নাই, মাথায় কলম্বাসের রোমান্স গাদা রহিয়াছে বলিয়া।

কি ভাবিয়া কানন তাহাকে কাশ-ঝাড়ের আড়ালে টানিয়া লইল, আর দেখিতে দিল না।

অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল। তীব্র কৌতূহল লইয়া কানন অনিশ্চিতভাবে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, একবার মনে হইল আগাইয়া গিয়া দেখে ব্যাপারখানা কি, কিন্তু হীরা সঙ্গে রহিয়াছে। বনে প্রবেশ করিতে সাহস হইল না। মানুষের কণ্ঠের আওয়াজও যদি শুনিতে পায়—এই আশায় আর একটু অপেক্ষা করিল। কোনরকম আওয়াজ নাই। ওরা নিশ্চয় বনের ও-প্রান্তে গিয়া উঠিয়াছে; কানন নামিয়া আসিয়া নৌকায় বসিল।

বাড়িতে আসিতেই চম্পা বেশ একটু অনুযোগ করিল—শহুরে লোক, একেই পাড়াগাঁয়ের কিছু জানে না, তাহার উপর এত রাত পর্যন্ত নদীতে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ানো…

হীরার পেট ফুলিতেছিল, প্রথম সুযোগেই বলিল—"দেশ আবিষ্কার দেখছিলুম মা—কলম্বাস নিজে এসেছিলেন।"

চম্পা বলিল—"মনের মত কাকা পেয়েছ, দেখো; কোন্‌দিন এসে আবিষ্কার করবে—মা ম'রে প'ড়ে আছে।"

কানন একটা ছুতা করিয়া হীরাকে বাহিরে সরাইয়া দিয়া আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা বলিয়া গেল।

সব শুনিয়া চম্পা বেশ সহজভাবেই বলিল—"অবিশ্যি ঠিক বুঝতে পারছি না নরু ফিরে না আসা পর্যন্ত..."

তাহার পর ব্যাপারটাকে আরও হালকা করিয়া দিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"তবে ও যখন রয়েছে বলছ, তখন তোমার ভাইপোর দেশ আবিষ্কারও নয়, কিংবা তুমি বোধ হয় যা ভয় করছ, কোথাও ডাকাত পড়বে না ; দেখছই তো আশ্রমের এরা অহিংসায় এক-একটি পরমহংস।...আসুক নরু, জিগ্যেস করছি।"

তাহার পর যেন হঠাৎ মনে পড়িয়া গেছে এইভাবে বলিল—"যদি না ফেরে আজ তো বুঝব লোকজন নিয়ে ধান কাটতে গেছে, আশ্রমের একটা বড় জমি আছে কিনা ওদিকে—মাইল পাঁচেক দূরে।"

কথাটা একেবারে বানানো। একটু পরে কানন আর হীরাকে ঘরে রাখিয়া একটা ছুতা করিয়া আপিস-ঘরে চলিয়া গেল। লাটু কুইতি নামের একজন লোক এই সময় পাহারায় থাকে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"নরু কোথায় জান?"

লাটু জানাইল—না, তাহার জানা নাই।

চম্পা বলিল—"এলেই আমার নাম ক'রে বলবে, সে যেন তক্ষুনি চ'লে যায়, আর আমার বাসাতেও না যায়, বলবে—মা-মণি নিজে এসে ব'লে গেছে। আমি নিজেই ডাকলে তবে যেন দেখা করে আমার সঙ্গে।"

কানন ভোরেই চলিয়া গেল। আসিয়াই যা প্রথম কথা ছিল যাওয়ার সময় তাহাই শেষ কথা—"আপনার চেহারা কিন্তু বড্ডই খারাপ হয়ে গেছে বউদি... টুলুদাদা দশ দিন হ'ল বাইরে গেছেন বললেন না?"

চম্পা এবারেও হাসিয়া বলিল—"ভয় নেই, বিরহ আমার অত বেশি ক'রে লাগে না।"

তাহার পর সহজভাবেই বলিল—"বড্ড খাটুনি পড়েছে ভাই; দেখছই তো।"

কানন [illegible] বলিল—"আমিও সেই কথাই বলছিলাম—একার ওপর

ঝোঁক পড়েছে। দাদা এলে আপনি না হয় দিদির কাছেই চ'লে আসুন না কেন ?···না হয় দিদিকেই পাঠিয়ে দোব দিন কতকের জন্যে ?"

চম্পা যেন হঠাৎ একটু ভীত হইয়াই বলিয়া উঠিল—"না ভাই···এখন নয়।"

তখনই আবার সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"বলছিলাম—মোগা হওয়ার ভাগীদার করতে যাব কেন তাঁকে ?···তবে আসতে হবে ব'লে রেখো—আমি চিঠি লিখলেই।"

সমস্ত পথটা মনমরা হইয়া কাটিল কাননের—আশ্রমের যেন ছন্নছাড়া ভাব—টুলু দশ দিন অনুপস্থিত···কাশবনীর ও ব্যাপারটা আদতে কি ?···চম্পা নিজের মুখে একবারও তটিনীর যাওয়ার কথা তোলে নাই, কানন তুলিলেও ওটা যেন হঠাৎ ভয়ের ভাব ছিল না কি ?...বেশ যেন যুৎসই বোধ হইতেছে না...

সমস্ত দিনটা ছটফট করিয়া কাটিল চম্পার। কানন চলিয়া যাওয়ার দিনটা এমনি বড় ফাঁকা ঠেকিতেছে, তাহার ওপর কাননের কাছে না হয় গোপন করিল, কিন্তু কাশবনীর ও ব্যাপারটা কি ?...আরও একটু ব্যাপার হইল, বিকালে নরোত্তম আশ্রমে আসিলে চম্পা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া কাশবনীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে নরোত্তম একটু ভাবিয়া বলিল—"থাক্ সে কথা মা-মণি। মানা আছে বলতে।"

তাহার পর নিজেই প্রশ্ন করিল—"জানলে কোত্থেকে ও-কথা ?"

চম্পা জানাইলে বোধ হয় একটা কড়া মন্তব্যই করিতে যাইতেছিল—কাননের ওখানে যাওয়া অন্যায় হইয়াছে, কিংবা বাইরের লোক আজকাল আসাই বন্ধ রাখিতে হইবে ; চোখ তুলিয়া দেখিল, চম্পার ঠোঁটের একটা কোণ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে এবং চোখের কোণ একটু সিক্ত—রাগে কিংবা অভিমানেই ; আর কিছু না বলিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে চলিয়া গেল।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় টুলু আসিল। এবার চম্পার প্রথম প্রশ্ন হইল—"এ কি চেহারা তোমার ! কোন অসুখে প'ড়ে গিয়েছিলে নাকি ?"

একমুখ দাড়িগোঁফ, চক্ষু দুইটা কোটরগত, গালের হাড়গুলা ঠেলিয়া উঠিয়াছে ; তেলের সঙ্গে যেন কতদিন সাক্ষাৎ নাই। টুলু কিন্তু চম্পার কথার উত্তর না দিয়া বলিল—"পাছে তোমাকেই ঐ কথা জিগ্যেস করি এই জন্যে আগেভাগে তুমিই

জিগ্যেস ক'রে রাখলে চম্পা? এত রোগা হতে তোমায় তো দেখি নি কখনও—আর এই কটা দিনে!"

এবারেও ঠোঁটের কোণ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল চম্পার—দুর্বলতার জন্য একটা স্নায়ুদোষ দাঁড়াইয়া গেছে; চোখ দুইটাও অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল, কিছু বলিতে না পারিয়া মুখটা ঘুরাইয়া লইল।

টুলু একটু আগাইয়া আসিয়া বলিল—"কাঁদছ তুমি? সে কি?"

তখনও কাঁদে নাই; কিন্তু আর সামলাইতে পারিল না নিজেকে চম্পা। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দুলিয়া দুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। টুলুর সামনে এই দ্বিতীয়বার।

টুলু কাঁধে ডান হাত তুলিয়া দিয়া স্নেহদ্রব কণ্ঠে বলিল—"চম্পা, আজ আমার কত বড় দিন! কত বড় খবর নিয়ে তাড়াতাড়ি তোমায় বলতে এলাম। এমন কি শুভদিন ব'লে আজ ভাল ক'রে খেতে হবে তোমার হাতে। আর তুমি?—"

চম্পা সামলাইয়া লইয়াছে, চোখ দুইটা আঁচলে মুছিয়া ধরা গলায় প্রশ্ন করল—"কি খবর?"

"আজ দক্ষিণে জাতীয় সরকার স্থাপন করা হ'ল।"

চম্পার অশ্রুসিক্ত মুখে বিশেষ ভাবান্তর দেখা গেল না, টুলু তবুও আবেগভরে ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া চলিল—"অবশ্য আমার ওর মধ্যে বিশেষ হাত নেই। আমি এই এক মাস ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, বুঝছিলাম, ট্রেনিং নিচ্ছিলাম, তাইতেই যা একটু করা হয়েছে; কিন্তু নাইবা পুরোপুরি আমার হাতের কাজ হ'ল,—যা আসল, কাজটাই যে মস্তবড়···কী যে উৎসাহ চম্পা! সমস্ত তল্লাটটায় প্রত্যেকটি লোক স্বাধীন হলাম ব'লে কী ক'রে বুক ফুলে দাঁড়িয়েছে দেখলেও আনন্দ। সবচেয়ে বড় কথা, ওরা পারবেই—ওদের মধ্যে গিয়ে ওদের ইতিহাস শুনলে, ওদের বুকের পাটা দেখলে এতটুকু সন্দেহ থাকে না ওরা পারবেই—ওদের দাবাতে তখনই পারবে গভর্মেণ্ট যদি আশি বছরের বুড়োবুড়ি থেকে কোলের শিশুটিকে পর্যন্ত নিঃশেষ ক'রে দেয়।···এরা নিশ্চয় পারবে—কিছু একটা দেখেছিলেন এখানকার হাওয়ায়, যার জন্যে মাস্টারমশাই এটা তাঁর

চরম কর্মক্ষেত্র ক'রে নিয়েছিলেন।...আমার কি একটা কথা প্রায় মনে হয় জান চম্পা?—এই জায়গায়ই থানা ডোবায় ভরা বাংলা দেশকে বিদ্যাসাগর দিয়েছিল; সব লোকগুলোর মধ্যে কেমন যে একটা বিদ্যাসাগরী গোঁ আছে!"

কতকটা সেই রকম নির্বিকারভাবেই চাহিয়া চম্পা দাঁড়াইয়া রহিল। নিজের আবেগ সঞ্চারিত করিতে পারিতেছে না বলিয়া টুলু একটু অসহিষ্ণুভাবে বলিল···"কই, কিছু বলছ না কেন চম্পা? এত বড় একটা খবর···মাস্টারমশাই এর জন্যেই প্রাণ দিয়ে গেলেন—আগস্ট আন্দোলনের পরের ধাপ এই—দেশের একটা অংশ পা তুলে দিলে সাহস করে, আর সবাই এবার এগুবে—"

চম্পা প্রশ্ন করিল—"আমাদের আশ্রমও এসে গেল এর মধ্যে?"

"না, তবে আর দিন কতকের মধ্যেই যাবে এসে, সেই চেষ্টাই হচ্ছে—সারা জেলাটা নিয়ে—ভেতরে ভেতরে···এসব জায়গা তো এত তোয়ের ছিল না··· এইবার হচ্ছে তোয়ের। শুধু স্বাধীন হলাম বললেই তো হয় না চম্পা, তার পেছনে শক্তি চাই, আর সেটা শুধু দাঁড়িয়ে মরবার শক্তি নয়। এই লড়াইয়ের সময়,—চারিদিক দিয়েই গবর্মেণ্টকে উদ্‌ব্যস্ত ক'রে তোলবার ক্ষমতা বাগিয়ে নিয়ে তবে ওদিকে করতে পেরেছে—জাতীয় সরকারের ঘোষণা।"

একটু বিরতি দিয়াই বলিল—"কিন্তু কই, তুমি আমায় একটু থিতুতে-জিরুতে বললে না তো আগে চম্পা—একটানা চ'লে আসছি···"

"হেঁটে?"

"না, সেই শিখ-লোকটির লরিতে।"

এর পর খাওয়া-দাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর কোন কথাই হইল না এ লইয়া, টুলু তুলিতে গেলেও চম্পাই—"এখন থাক্, এখন থাক্"—বলিয়া প্রতিবারেই বাধা দিয়া গেল। খাওয়া শেষ হইলে সে-ই আবার তুলিল প্রসঙ্গটা, বলিল—"কাল সন্ধ্যের পর কাশবনীতে নরোত্তম প্রায় শ দুয়েক লোক জমা করেছিল—আমায় বললে কানন, কাল দুপুরে এসেছিস, সন্ধ্যায় হীরাকে নিয়ে সেখানে বেড়াতে যায়।"

টুলু একটু যেন অন্যমনস্ক হইয়া গেল, সেটা বোধ হয় কাননের উল্লেখে, তাহার

পর বলিল—"রোজই হয় আজকাল, লোকগুলোকে শেখাচ্ছে পড়াচ্ছে, কয়েকটা ব্যাচ আছে, পালা ক'রে এক-একটাকে নিয়ে যায়। এর পর আরও কিছু ব্যাপার হবে ওখানে।"

কাননের কথা একেবারেই তুলিল না।

চম্পা স্থিরভাবে চাহিয়া শুনিয়া যাইতেছিল, বলিল—"একটা কথা জিগ্যেস করছি, সেদিন আমায় এসব কথা শুনতে বারণ করেছিল, আজ যেন নিজে থেকেই বলছ।"

"লুকুবার দরকার নেই ; চলবেও না লুকুলে।"

"কেন ?"

"বিপদটা যে কত বড়—জানা দরকার তোমার। তুমি একটা কথা জেন, দক্ষিণে এই জাতীয় সরকার নিয়ে গবর্মেণ্ট বেশি ঘাঁটাঘাটি করবে না, কিন্তু আর যাতে একটুও না ছড়াতে পারে তার জন্যে কোনরকম অত্যাচারই বাকি রাখবে না। ওদের পলিসি হবে—একটুখানি জায়গায় আবদ্ধ হয়ে জিনিসটা যাতে আপনিই চুঁইয়ে ম'রে যায়।...তা হ'লেই বুঝছ বিপদটা কত, আর সে বিপদের মধ্যে তোমাদের থাকা চলবে না।"

চম্পা হঠাৎ মুখটা কঠিন করিয়া বলিয়া উঠিল—"কোথায় যাব আমি ! বাঃ !"

টুলু ওর ভঙ্গী দেখিয়া বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল ; চম্পা বলিল—"তোমরা গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে যে উপায় করেছ, তোমাদের বিরুদ্ধেও আমি তাই করব ; জ্যান্ত আমায় সরাতে পারবে না এখান থেকে।"

টুলু একটু সেই ভাবে চাহিয়া থাকিয়াই বলিল—"বেশ, হীরাকে পাঠিয়ে দাও অটলীর কাছে।"

চম্পা বলিল—"হীরাও যাবে না ; মরতে হয় এইখানে মরবে। জন্মাবার আগেই বাপ খেয়েছে, যাঁকে পেলে কপালজোরে, বিপদের মুখে তাঁর পাশ থেকে স'রে যাওয়ার চেয়ে মরাই ভাল ওর।"

॥ বাইশ ॥

কথাটা বলিল বটে চম্পা, কিন্তু হীরাকে সরাইয়া দিবার জন্য ওই বেশি ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তাহার কারণ আশ্রমটি দিন দিনই ওর কাছে আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিতে লাগিল।

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে এখন প্রায়ই বন্দুকের আওয়াজ হয়; বেশি জোর নয়,—ফট্ ফট্ ফট্ করিয়া আওয়াজ, দূরে ছাত-পেটার মত, কাশবনীর দিক থেকে আসে আট মিনিট দশ মিনিট অন্তর। কখনও একটু বেশি বিরতি, কিন্তু থাকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত। চম্পা বড় মুখ করিয়া হীরার কথা বলিয়াছিল বলিয়া অনুরোধটা গলায় যেন আটকাইয়া যাইতে লাগিল, তাহার পর একদিন সঙ্কোচের হাত এড়াইয়া বলিয়া ফেলিল—"ওকে পাঠিয়ে দাও এখান থেকে।"

টুলু বলিল—"হ্যাঁ, তাই ভাবছি; তুমিও যাও চ'লে, বুঝতেই তো পাচ্ছ সব।"

চম্পা আজকাল একটু খিটখিটে হইয়া পড়িয়াছে, একটু রাগের সহিতই বলিল—"দায়-পড়া ভেবে দর কষছ! হীরার সম্বন্ধে হারলাম ব'লে, নিজের সম্বন্ধেও হার মানব ভেবেছ বোধ হয়? পরের ছেলে ঘাড়ে তুলে তুমিই নিয়েছিলে, ভাল করবার ছুতোয় যদি প্রাণটা যায় ঐ বাপ-মা-মরা অনাথের..."

একেবারে নূতন ধরনের ভঙ্গীতে টুলু হকচকিয়া গিয়াছিল, বাধা দিয়া হাসিয়া বলিল—"তুমি যে রীতিমত রাগ করলে দেখছি চম্পা; তা নয়, আর চাই না তটিনীকে এ সবের মধ্যে টানতে।...বেশ ভেবে দেখি কি করা যায়।"

চাপা রহিল কথাটা। ইতিমধ্যে চম্পার দেহে-মনে আরও ভাল করিয়া ঘুণ ধরিতে লাগিল।

আশ্রমের ব্যাপার আরও ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। নূতন নূতন লোকের আমদানি বাড়িয়াছে, তবে থাকে না বড় একটা কেহ; কেমন যেন একটা চাপা নিঃশব্দ চঞ্চল ভাব। চম্পা কিছু জিজ্ঞাসা করে না, তবে টুলুই বলে মাঝে মাঝে, আশ্রমের নিজের পাঁচটা গ্রাম থেকে এখন বারোখানা গ্রামের মধ্যে কাজ

হইতেছে, ক্রমেই বাড়িতেছে—প্রায় তৈয়ার সব।...ওদিকে দক্ষিণের জাতীয়-সরকার প্রবলবেগে কাজ করিয়া যাইতেছে, ও এলাকার গবর্মেণ্ট একরকম নিষ্ক্রিয়—আইন, আদালত, রাজস্ব, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বার্তাবহন—সব বিভাগেই আশ্রমের সঙ্গে ওদিককার প্রতিনিয়তই সংবাদ আদান-প্রদান চলিতেছে, সব-চেয়ে নূতন—বিদ্যুৎ-বাহিনী নাম দিয়া একটা সামরিক বিভাগও উঠিয়াছে গড়িয়া; ভিতরে ভিতরে আয়োজন ছিল, এখন কতকটা খোলাখুলিই আত্মপ্রসার করিতেছে।...সমস্ত জেলাটাতেই এই আদর্শে কাজ হইতেছে ভিতরে ভিতরে।

চম্পা চুপ করিয়া শোনে। এর আগে বিদ্রোহ সম্বন্ধে কথা হইলে, মনে মনে যাই থাকুক বাহিরে বিরুদ্ধে মত দিত না, এখন আর ভিতরে বাহিরে অমিল রাখে না, পারৎপক্ষে চুপ করিয়াই থাকে, কখনও কখনও প্রশ্ন করে—পুলিস টের পাইলে কি হইবে; এক-এক বার বিরুদ্ধ মন্তব্যই করিয়া বসে। একদিন, শরীর আরও ভীষণভাবে খারাপ হইয়া যাইতেছে বলায় ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিয়া বলিল—"হোক না গো, স্বাধীন ভারতের মহারাণী হ'লেই ঠিক হয়ে যাবে আবার।"

কেমন যেন হইয়া যাইতেছে চম্পা—টুলু ভাবে; কিন্তু সময় পায় না স্থিরভাবে ভাবিবার।

তাহার পর হঠাৎ ব্যাপারটা গুরুতর আকার ধারণ করিল। একদিন সন্ধ্যায় টুলু আসিয়া খবর দিল—গোপন সংবাদ পাইয়াছে, আশ্রমে পরদিন সন্ধ্যায় পুলিস আসিয়া হানা দিবে।

চম্পার মুখটা ফ্যাকাশে হইয়া গেল, প্রশ্ন করিল—"কি ক'রে টের পেলে?"

"আমরাও ব'সে নেই চম্পা, পুলিসের ঘরে আমাদের গোয়েন্দা এখন, কোশ তিনেকের মধ্যে ওদের লোক এসে পড়লে আমাদের বিশ-পঁচিশ মিনিটও লাগে না সে খবর পেতে, নইলে দিনদুপুরে বন্দুকের নিশানা অভ্যেস করা চলে? আমাদের চর প্রত্যেকটি ঘাঁটি আগলে আছে সর্বক্ষণ।"

চম্পা আবার একটু ব্যঙ্গের স্বরেই কহিল—"আগলাবার তো এই নমুনা।"

"হয়তো তা নয়; জেলার যেখানে যেখানে আশ্রম বা কর্মকেন্দ্র আছে সেখানে

সেখানেই খানাতল্লাসি করবে শুনছি ভালমন্দ বিচার না ক'রে ; এও বোধ হয় তাই।…যাই হোক, এবার তো এই সবের জন্যে তোয়ের থাকতেই হবে।"

টুলুর আহারের সময় এই কথাটা আবার তুলিল চম্পা, বলিল—"আজ তোমায় একটা কথা জিগ্যেস করব ; সব তো করছ, কিন্তু আমার ব্যবস্থা করছ ?"

"এ ব্যাপারটার পরই তুমি চ'লে যাও চম্পা।"

চম্পা বিরক্তির সহিতই উত্তর দিল—"বাজে ব'কো কেন ? যা হবার নয় তাই। বলছিলাম—পুলিসে আজকাল নানা রকমই অত্যাচার করছে—মেয়েদের মান-ইজ্জত থাকছে না…"

টুলু অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া আহার করিল, তাহার পর বলিল—"আহ্লাদীর মাকে জান ?"

এ দুর্গতদের মধ্যে সেই বিধবা মেয়েটি, যে একদিন রাঁধিতে রাঁধিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিয়াছিল—'আমরাও চুপ ক'রে থাকব না, টলিয়ে ছেড়ে দেব', সে এখানেই থাকিয়া গেছে এবং কাজ করিতেছে। চম্পা বলিল—"জানি বইকি।"

"তাকে জিগ্যেস ক'রো এ কথা।"

চম্পা একটু থামিয়া বলিল—"আর একটা অনুরোধ—আজ রাত্তিরটার জন্যে শুধু—হীরাকে পাঠিয়ে দিলে না, আজ রাত্তিরে তুমি আমার ঘরেই শুয়ো…আরও দু-একজন লোক নিয়ে না হয়।"

"বুড়ি তো শোয়ই।"

"আমার কেমন ভয় করছে হীরাটার জন্যে। কি জানি, পুলিস যে কোনও সময় হয়তো এসে পড়বে।"

"ও না হয় আমার ঘরেই শোবে।"

"ওকে কাছ-ছাড়া করতে পারব না। পুলিসের হাঙ্গামাটা চুকে গেলেই ঠিক হয়ে যাবে আবার।"

টুলু আবার চুপ করিয়া আহার করিল একটু, তাহার পর বলিল—"বেশ, আর লোকের দরকার কি ?—একলাই শোব।"

অথচ এই চম্পাই এক সময় সারারাত জাগিয়া টুলুকে দিত পাহারা। টুলু বিস্মিত হয়,—সে শক্তি যদি ভালবাসারই হয় তো আজ এ পরিণতি কেন?

পুলিস আসিল দুপুরের একটু পরেই। জানে, ওদের ওপরও চর আছে—যতটা পারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাল্টাইয়া লয়। টুলু খবর পাওয়ার পর থেকেই প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল, খানাতল্লাসি করিয়া কিছুই পাওয়া গেল না। তবে চলিল অনেকক্ষণ, আশ্রম ভালরকম করিয়া ঘিরিয়া। চম্পা আশ্রমের দিকের জানালাগুলা আধ-ভেজানো করিয়া হীরাকে কোলের কাছে চাপিয়া চুপ করিয়া দেখিতে লাগিল। আশ্রমের অন্য বাসাগুলাও তল্লাস হইল, যতই না পাইল কিছু ততই জিনিসপত্র ফেলিয়া ছড়াইয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল। টুলুর বাসাও বাদ গেল না।

সেই দারোগা; শেষ হইলে টুলু একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল—"আমাদের আশ্রমটাও বাদ দেওয়া হ'ল না?"

দারোগা একটু চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"আপনাদের এদিকে বন্দুকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে মশাই।"

"সে তো আমরাও শুনি। নদীর চরে ওধারে পাখি বসে আজকাল…"

"সে তো চিরকালই বসে; বন্দুকের আওয়াজ ছিল না।"

"আজকাল মিলিটারি থেকে শুনছি স্মাগ্‌ল্ হচ্ছে। শোনা কথা, আপনারাই জানেন ভাল।"

প্রায় ঘণ্টা চারেক কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় পুলিস বিদায় হইল।

চম্পা এ ঘটনার চাপটা আর সহ্য করিতে পারিল না, অসুখে পড়িয়া শয্যা গ্রহণ করিল।

টুলু চিন্তিত হইয়া পড়িল, কিন্তু এমনই অবস্থা আজকাল যে জেলাবোর্ডের ডাক্তারকে ডাকিয়া আনাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেও তিনটা দিন লাগিয়া গেল। ডাক্তার আশঙ্কার কিছু বলিল না, তবে জানাইল যে, ভালরকম বিশ্রামের দরকার, স্নায়ুদৌর্বল্যের জন্য এ রকমটা হইয়াছে। সেবনের জন্য ঔষধের সঙ্গে একটা সালসার ব্যবস্থা করিয়া গেল। সেটা আসিতেও দুই দিন লাগিল, অর্থাৎ টুলু যখন টের পাইল চম্পা কাহাকেও দিয়া আনাইয়া লয় নাই।…দুঃখ করিয়া

বলিল—"আমার ওপর এখনও ভরসা কর চম্পা? লক্ষ্মীটি, এমনভাবে নিজেকে নষ্ট ক'রো না, সংসারী হিসেবে আর আমার পদার্থ নেই।"

শয্যা লইয়া অবধি চম্পা যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া গেছে, নিরুপায়ের নিশ্চিন্ততা, তাহার যেন আর কিছুই করিবার নাই। তাহার ঘরের আশ্রমের দিকের জানালাটা একটু উঁচুতে ছিল, টুলুকে বলিয়া নামাইয়া লইয়াছে। বিছানায় শুইয়া বাহিরের পানে চাহিয়া থাকে। প্রশস্ত প্রাঙ্গণটা, সামনে আশ্রমের কয়েক-জন কর্মীর বাসা, বাঁ দিকে আশ্রমের টানা চালাটা। শীতের প্রায় সমস্ত দিনই ঘর ছাড়িয়া বেশির ভাগ লোকই বাহিরে আসিয়া কাজ করে—চরখা কাটা, কাঠের কাজ। স্কুলটা হয় রৌদ্রের মধ্যেই। স্তব্ধ চপলতার সঙ্গে একটা মিশ্র গুঞ্জন মিলিয়া চমৎকার একটি শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ডান দিকে নদীটায় নীল জলের রেখার পাশে সাদা বালির চর জাগিয়া উঠিয়া সূর্যকিরণে চিকচিক করিতেছে, ওপারে ঘাটের আর গ্রামের চঞ্চলতা দূরত্বের জন্য আরও মৃদু। চম্পা চাহিয়া চাহিয়া দেখে; আশ্চর্য লাগে—এই স্নিগ্ধ পরিবেশের অন্তরালে অমন সব সর্বনাশা কাণ্ড চলিতেছে—ঐ মৌন গ্রামগুলাও তা থেকে বাদ যায় না।

ঘরে ওর নিত্যসঙ্গী বাউরী বুড়িটি আর হীরক। রুটিনগত যেটুকু কাজ—স্কুলে যাওয়া, আশ্রমের পিছনে অন্য ছেলেদের সঙ্গে বাগান করা—সেটুকু সারিয়া হীরা যে মায়ের কাছে আসিয়া বসে আর নাওয়া-খাওয়ার সময় ভিন্ন বড় একটা ওঠে না। মায়ের কাছে গল্প শোনে, চম্পা ফরমাস করিলে বই পড়িয়া শোনায়। যদি কখনও নিতান্তই খেলার দিকে টান হয়, কিংবা চম্পাই জোর করিয়া দেয় পাঠাইয়া, একটুখানির মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া আরও আকুলভাবে মায়ের কাছে লুটাইয়া পড়ে, গলা জড়াইয়া আদর করে, হাতটা টানিয়া নিজের গলায় জড়াইয়া আদর কাড়ায়, শীঘ্র ভাল হইয়া উঠিবার জন্য আবদার ধরে। এক এক সময় চম্পা ওকে ঘাঁটায়—বেশ তো, যদি না-ই আর ভাল হয় চম্পা—মরিয়াই যায়, নূতন মা আসিবে হীরার, নূতন নূতন আদর খাইবে হীরা। নাকে কাঁদিয়া, হাত পা আছড়াইয়া সে অনর্থ লাগায়। চম্পা তাহা হইতেই জীবনের নূতন রস সঞ্চয় করে।

দিন দশেক ভুগিবার পর আবার উঠিয়া বসিল চম্পা। টুলু দুই দিন থেকে নাই, কিন্তু এ সব গা-সওয়া হইয়া গেছে। পথ্য লইয়া আশ্রমের সীমানার মধ্যে হীরাকে লইয়া একটু ঘুরাফিরা করিয়া বেড়াইল, বেশ ভালই লাগিল। রাত্রে একটু বেশি শীত বোধ হওয়ায় ঘুমটা হঠাৎ ভাঙিয়া গেল। দেখে, আশ্রমের দিকের জানালাটা খুলিয়া গেছে কখন; উঠিয়া বন্ধ করিতে যাইবে, বাহিরে নজর পড়ায় থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী কি ত্রয়োদশী হইবে, সবে মাত্র পূর্বাকাশে এক ফালি চাঁদ উঠিয়াছে, তাহার জ্যোৎস্নায় দেখিল আশ্রমের ছইওলা গাড়িটা আসিয়া আপিসের সামনে দাঁড়াইল, তাহার মধ্যে থেকে টুলু আর নরোত্তম নামিল, দুইজনের হাতেই দুইটা রাইফেল, আর নামিয়া নরোত্তম চট দিয়া জড়ানো যে একটা বাণ্ডিল আপিস-ঘরের দিকে লইয়া গেল তাহার মধ্যেও যে ঐ বস্তুই রহিয়াছে বাণ্ডিলের আকার দেখিয়া চম্পার আর তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না;

নরোত্তম রহিল, টুলু আবার সেই গাড়িতেই বাহির হইয়া গেল।

আসিল পরদিন বেলা আন্দাজ দশটার সময়।

দুপুরে চম্পা নিজের ঘরে শুইয়া আছে, হীরা গেছে স্কুলে, টুলু আসিয়া একটা মোড়া টানিয়া লইয়া চম্পার সামনে বসিল, হাতে একটা লম্বা খাম। বলিল—"একটা বিশেষ দরকারী কথা আছে চম্পা তোমার সঙ্গে, হীরার বিষয়ে।"

চম্পা বলিল—"পাঠিয়ে দেবে?—দাও তাই, আর দেরি ক'রো না।"

"কেন, নতুন কি হ'ল?"—বলিয়া টুলু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

চম্পা উত্তর করিল—"এর ওপরও আরও নতুনের দরকার?···তবে, তাও হয়েছে: কালকের রাত্তিরের ব্যাপারটা আমি দেখেছি,—দেখে ফেলেছি বলাই ঠিক।"

"ভালই হয়েছে। না, আমি সে কথা বলছি না।···আমি রাজসাহী গিয়েছিলাম চম্পা, একবার যে পাঁচদিন ছিলাম না, সেই সময়। সে একদিন সবিস্তারে বলব'খন। বাবা মা দুজনেই গেছেন—অনেকদিন। বিষয়সম্পত্তি

তাড়াতাড়ি যতটা সম্ভব ঠিকঠাক ক'রে এলাম ; আর এই আমার উইল—তোমার আর হীরার নামে…"

চম্পা হঠাৎ আতঙ্কে সিঁটকাইয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল—"উইল !…উইল কেন ?"

"সব তো দেখছই ; যা আসন্ন তা থেকে চোখ সরিয়ে ফল আছে চম্পা ? ওরা আর কোন কেন্দ্রকেই মাথা তুলতে দেবে না, আমরাও দিতে হয় তোলা মাথাই দোব।"

চম্পা অস্থির হইয়া পড়িল, অবুঝের মতই বলিতে লাগিল—"না, উইল কি ! —অলুক্ষুণে কথা !—রেখে দাও গে—ছিঁড়ে ফেলো গে, ও আমি ছুঁতে পারব না—বাঃ, উইল করবার কি হয়েছে ?—অলুক্ষণ !…না, তুমি যাও আমার কাছ থেকে এখন—আমার মাথার ঠিক নেই—নিয়ে যাও ওটা—ছেলের আমার অকল্যাণ ক'রো না—উইল পাবার বয়স হয় নি এখনও ওর…"

॥ তেইশ ॥

ধীরে ধীরে চম্পার মন কিন্তু কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। উইলের ব্যাপারই তো হইয়া আসিয়াছে, চোখ বুজিয়া কি এ সত্যকে ঠেলিয়া রাখা যাইবে ?

চম্পা সারাদিন ধরিয়া ভাবিল, এই সত্যের রূপটা যেন প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিল নিজের দৃষ্টির সামনে। রাত্রে টুলুর আহার না হওয়া পর্যন্ত অন্যমনস্ক রহিল খুব। তাহার পর নিজের ঘরে গিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া কাগজ কলম লইয়া একটা চিঠি লিখিতে বসিয়া গেল।

চিঠিটা তটিনীকে। চম্পা নিজের ইতি-কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছে ; এ-সব কাণ্ড হইতে দিবে না। তটিনী আসুক—এমন করিয়া লিখিল নিজের একেবারে মৃত্যুশয্যার কথা ইনাইয়া-বিনাইয়া যে, তটিনীর না আসিয়াই উপায় থাকিবে না—পাঁচ সাত দিন, যাই হোক। তাহার পর কি করিতে হইবে চম্পা জানে ; তটিনীর মোহে জড়াইবে টুলুকে, দুজনেরই মন জানা, নিজের মন

দিয়াও জানে কি সর্বনাশা রোগ এই ভালবাসা—দুজনেই দুজনকে এড়াইয়া চলিতেছে বলিয়া বাঁচিয়া আছে; ও একত্র করিয়া দিবে, যাদু বিস্তার করিবে; ওর সিদ্ধি একেবারে করায়ত্ত। এতদিনে চেষ্টা করে নাই, নিজের স্বার্থ ছিল—কে আর ঘরের শত্রুকে আমন্ত্রণ করিয়া আনে? আজও স্বার্থ, এই স্বার্থের কাছে সে-স্বার্থকে বলি দিবে চম্পা।

চিঠি লিখিতে লিখিতে মনটা উদাস হইয়া যাইতেছে, যেন নিজের মৃত্যুর রায় লেখা, হাত কাঁপে, চোখ সজল হইয়া আসে। আর কোন উপায় নাই কি বাঁচাইবার—সব দিক রক্ষা করিয়া?…টুলুকে কি করিয়া ছাড়িবে চম্পা?…

কোন উপায় নাই, মনকে কঠিন করিয়া চম্পা শেষ করিল চিঠিখানা, আর কোন কথাই নাই, একবার শেষ দেখা করিবার ইচ্ছা—আকূতিতে ভরা। তাহার পর মনে পড়িল নিজের সীমন্তের সিঁদুরের কথা। টুলুর সেদিনকার যুক্তি—সত্যই তো, এটুকু থাকিতে তটিনীকে ডাকিয়া ফল কি? আর মোছা তো কোন মতেই যাইবে না এটুকু।…চম্পা যেন পাগলের মত হইয়া উঠিল—ওটা যেন সিঁদুর নয়, অগ্নিশিখা হইয়া সমস্ত মাথাটায় আগুন ধরাইয়া দিতেছে!…হে ভগবান, এর মধ্যে কি সত্যই কোথাও প্রবঞ্চনা ছিল?—রক্ষাকবচ করিয়া সেটা মাথায় তুলিয়া লইয়াছিল, আজ সেটা এমন অভিশাপে দাঁড়াইল কেন?

রাত্রি গড়াইয়া চলিল।—আবার বোধ হয় ছইওলা গাড়িটা বাহির হইতে আশ্রমে প্রবেশ করিল। হীরা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে, ঘুমের মধ্যেই ডান হাতটা চঞ্চল হইয়া উঠিল—একটা অভ্যাস, মাকে খোঁজে; চম্পা হাতটা নিজের হাতে তুলিয়া লইল।

চিন্তা আবার পূর্বের খাতে ফিরিয়া আসিল,—হ্যাঁ, আরও একটা উপায় আছে—সিঁদুর না মুছিয়াও,—টুলুকে ভাল করিয়া ফিরাইয়া, যখন ওর ওদিকে ফিরিয়া যাইবার আর উপায় থাকিবে না, যখন ও মৃত্যু থেকে সুনিশ্চিত জীবনের পথে, সেই সময় হীরাকে লইয়া চম্পা চুপি-চুপি সরিয়া পড়িবে।…এ কথাটাও সেদিন হইয়া গেছে, হীরার জীবনে এ ঘটনার প্রভাব।…কিন্তু অত ভাবিয়া কাজ করা চলে না তো। সেটা ভবিষ্যৎ, ঢের উপায় আছে; এখন সব চেয়ে বড় বর্তমান—আর যে কোন উপায় নাই।

চম্পা মন স্থির করিয়া ফেলিল।

মনটি স্নিগ্ধতায় ভরিয়া গেছে—বাঁচাইবে টুলুকে চম্পা; নিজেকে বলি দিয়া এমন করিয়া বাঁচানোর যেন একটা নূতন ধরণের আনন্দ আছে।···অনাগত দিনের একটি চিত্র ধীরে ধীরে চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল—একটি পরিচ্ছন্ন সংসারের চিত্র—টুলু, তটিনী, আরও সব···হীরাকেও ফিরাইয়া দিবে চম্পা, অনেক উপায় আছে—টুলুকে কোন দিক দিয়া বঞ্চিত হইতে দিবে নাকি? —কবে, কোন বিষয়ে দিয়াছে বঞ্চিত হইতে?

কিন্তু যদি না থাকিতে পারে চম্পা? এই তো গঞ্জডিহিতে ছাড়িয়া গিয়াছিল, গৃহে চলিয়া গিয়াছিল হীরাকে লইয়া, পারিল কি থাকিতে? আবার যে ছায়ার মত আট বৎসর পাশে পাশে ঘুরিতে হইল...যদি তেমন করিয়া আবার অভিশাপ হইয়া ফিরিতে হয়—সর্বনাশ হইয়া যাইবে যে।

এই চিন্তাটাই স্থায়ী হইয়া রহিল অনেকক্ষণ—একই বিভীষিকার আকারে। তাহার পর চম্পার মনে পড়িল, মুখটা কঠিন হইয়া উঠিল, তখন আছে উপায় তাহারও—আছে বইকি।

মাথার বালিসের তলায় হাত দিয়া একটা ছোট লাল কাগজের ডিবা বাহির করিল চম্পা—পুলিশের জুলুমের প্রতিষেধ দিয়াছে আল্লাদীর মা—সেই বিধবাটি—একটা ছোরার সঙ্গে; উর্মিবিক্ষুব্ধ দুস্তর চিন্তাসাগরে একটা অবলম্বন পাইল চম্পা।···যদি কখনও আসে দুর্বলতা, আবার টুলুর জীবনে ফিরিয়া আসিবার লালসা জাগে তো এই তাহার মহৌষধ।

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। হাতের মুঠায় সেই কৌটাটা।···হঠাৎ এ কি?···তন্দ্রাঘোরে চাহিয়া চম্পার পূর্বরাত্রের চিন্তাগুলা একে একে মনে পড়িল।

কিন্তু কেন বলা যায় না, এই গভীর স্তব্ধ রাত্রে চিন্তা আবার হঠাৎ এক নূতন রূপ লইয়া দেখা দিল,—এই মৃত্যুকল্প রজনীর মধ্যে জীবনটাকে যেন নূতন অর্থে অর্থবান মনে হইল; চারিদিকের স্তব্ধ সমাহিত ভাবে মনে হইল জীবন

বড় পবিত্র, বড় বিরাট—ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র জন্ম-মৃত্যুর অতীত যেন একটা কিছু—অনন্তকাল ধরিয়া অখণ্ড অমরত্বের পথ দিয়া তাহার যাত্রা।

কেন সে টুলুর জীবনকে এভাবে নষ্ট করিবে? কী অধিকার তাহার অমন একটা জীবনকে ক্ষুদ্র ভালবাসার গ্লানির মধ্যে নামাইয়া আনিতে?—কী অধিকার তাহার এই মহাতপস্বীর তপস্যাভঙ্গে? এই জন্যই কি তাহার পাশে অভিশাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এতে ওর সীমান্তের সিঁদুরের চেয়েও বড় অভিশাপ হইয়া রহিল সে নিজেই।

না, চম্পা অত দুর্বল নয়, মিথ্যাচারিণী নয়—কতবারই বলিয়াছে—"কখনও তোমার পথের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াব না।"...এই শর্তেই তো ওর স্থান টুলুর পাশে, এই বিশ্বাসেই।

পূর্বরাত্রের সংকল্প মুছিয়া চম্পা নূতন সংকল্পের প্রতিষ্ঠা করিল। চিঠিটা এবারও টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া জানালাটা খুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল।

তাহার পর আবার আশঙ্কা,—ফের যদি কখনও এই দুর্বলতা আসে।—এই তটিনীকে দিয়া টুলুর ব্রতভঙ্গের অশুভ কল্পনা!...কত দুর্বল মানুষ—দেখিল তো এই ছাব্বিশ বছরের সামান্য জীবনেই...

কি মনে হইল, চম্পা ধীরে ধীরে উঠিল, জানালাটা দিল খুলিয়া; কালকের সেই চাঁদ, আজ আরও ক্ষীণ, গাঢ় অন্ধকারের বুকে একটি যেন আলোর ইঙ্গিত।...ও দুর্বলতাও তো যায় মেটানো—যায় না? একেবারেই ওর উৎস-মুখ যদি নিরুদ্ধ করিয়া দেয় চম্পা...

রাঙা কৌটাটি খুলিয়া চম্পা নিজের কণ্ঠে উবুড় করিয়া ধরিল, তাহার পর আবার বিছানায় আসিয়া, হীরার মাথায় হালকাভাবে হাতটা রাখিয়া ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল।

॥ চব্বিশ ॥

একটিমাত্র মানুষ নিঃশব্দে বিদায় লইয়া অন্তর্জগতে একটি নিঃশব্দ প্রলয় ঘটাইয়া গেল। এত যে কাজ—কাজ, কাজ এখন টুলুর কাছে যেন বিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, হীরার মুখের দিকে তাকাইতে পারে না, এমনই দু-একবার নজর পড়িয়া যাইতে দেখে ছল-ছল চোখে একদিকে চাহিয়া বসিয়া বা দাঁড়াইয়া আছে; নিজে অভিভূত হইয়া পড়িবার ভয়ে টুলু আর ডাকিয়া দুটা ভুলাইবার কথা বলিতে সাহস পায় নাই। সবচেয়ে অসহ্য হইয়াছে নিজের অন্তরের দিকে তাকানো, অথচ কাজ একমাত্র দাঁড়াইয়াছে নিজের অন্তরের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকা, নিজেকে প্রশ্ন করা আর নিজের কাছে উত্তর খোঁজা।…কেন গেল চম্পা? —ও কি নিতান্তই সামান্য রমণীর মত ক্ষুদ্র ঈর্ষার গণ্ডি অতিক্রম করিতে পারিল না? কিংবা একটু অসাধারণ হইয়া নিজের বঞ্চনার সিঁদুর লইয়া টুলুর সুখের পথ থেকে সরিয়া দাঁড়াইল তটিনীকে নীরব আহ্বান দিয়া? কিংবা সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে, সব সুখ-লালসার মধ্যে চম্পা স্থির নিষ্ঠায় নিজের অন্তরে অন্তরে মাস্টারমশাইয়ের সেই মহামন্ত্রটি ধরিয়া রাখিয়াছিল—একটা নারী যদি শুধ-রাইয়া যায় একটা জাতি শুধরাইয়া যাইতে পারে।…তাই, যখন বুঝিল নিজের ভালবাসার করাল ক্ষুধা লইয়া ও টুলুর এ জাতি-সাধনার অন্তরাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে—শুধুই শুধরানো নয়, ও কি এইভাবে নিজেকে একেবারে অগ্নিশুদ্ধ করিয়া লইল?

এক-একটি মুহূর্ত যে-সময় অমূল্য সে-সময় কয়েকটা দিনই এইভাবে কাটিয়া গেল। নরোত্তম একলা সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না, একলাই আশ্রম আর বাহির করিতেছে। এদিকে চারিধারেই ধরপাকড়ের ধুম পড়িয়া গেছে, কয়েকটা কেন্দ্রে অগ্নিসংযোগের খবর পাওয়া গেল; ওদিকে দক্ষিণের মূল কেন্দ্র থেকে তাগাদা আসিতেছে—এইবার সব কেন্দ্রকেই একজোটে একদিনে দাঁড়াইয়া উঠিতে হইবে, নয়তো একে একে ধ্বংস হওয়া ভিন্ন গতি নাই।

একবার তিন দিন বাহিরে কাটাইয়াও ফিরিয়া আসিয়া এই ভাব দেখিয়া বলিল—"আপনার মতন মানুষও যদি স্ত্রীর মৃত্যুতে এত অধীর হয়ে পড়েন…"

টুলু উদাসভাবে চাহিয়া বলিল—"স্ত্রীর মৃত্যু আর চম্পার মৃত্যু যে এক নয় নরোত্তম।"

কথাটা যেন আপনিই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, নরোত্তম কিছু না বুঝিয়াই বলিল—"সে বুঝি বইকি, মা-মণির মতন মেয়ে…সারা দেশটায় হায় হায় রব উঠে গেল।…তবে দাদুভাইয়েরও মুখ চাইতে হবে তো, এত উচাটন হ'লে চলবে?…আর ইদিকেও…"

নরোত্তম একবার কুণ্ঠিতভাবে মুখের পানে চাহিল, তারপর কুণ্ঠাটা যেন জোর করিয়া কাটাইয়া উঠিয়া বলিল—"আর ইদিকেও আর যে সময় নেই বাবাঠাকুর। খবর নিয়ে এলুম, পরশু নাকি সব থানাতেই জাতীয়-সরকার কায়েম করা ঠিক হয়ে গেছে—এই সময় একটা ভয়ানক জুলুম হবে, পুলিস টের পেয়েছে তাদের ঘরেই এদিককার চর মোতায়েন আছে, কবে যে কোন্‌খানে গিয়ে উঠে পড়বে আর জানতে পারা যাচ্ছে না। দক্ষিণের সঙ্গে একজোটে না দাঁড়িয়ে উঠতে পারলে পিষে ফেলবে। বলবার অবসর নয় এটা বাবাঠাকুর, বুঝি সব, মা-মণি কি আমারও বুকখান খালি ক'রে দে যায় নি? কিন্তু অধৈর্য হ'লে সব যে যায়। পণ্ডিতমশাই হাতে ক'রে চারাটা পুঁতেছিলেন বুকের শোণিত দিয়ে, নিজে আপনি বাড়ালেন, শেষে শোকে অধৈর্য হয়ে…"

নরোত্তম মিনতির দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর একটা যে চরম সান্ত্বনা পাইয়া গেছে এই ভাবে বলিল—"আর তিনি তো কপালের সিঁদুর বজায় রেখে গেছেন বাবাঠাকুর, হিঁদুর মেয়ের আর এর চেয়ে কড় কাম্য কি?

কথাটা এত অদ্ভুত লাগিল টুলুর যে, সে কেমন এক নূতনতর দৃষ্টিতে নরোত্তমের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ বড় অন্যমনস্ক হইয়া গেছে—একদিনের বিস্মৃত একটি ছবি হঠাৎ চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল, যেদিন দেখিয়াছিল অত অবহিত হয় নাই।—সন্ধ্যার একটু আগে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখে, ঘরের জানালার সামনে বাঁ হাতে আরশিটা ধরিয়া চম্পা মাথা নিচু করিয়া ডান হাতের আঙুলের ডগায় সীমন্তে সিঁদুর টানিয়া দিতেছে, মুখের পাশটায় একটু

দেখা যায়—বোধ হয় একটু হাসি লাগিয়া আছে, আর কী গভীর অভিনিবেশ! চম্পা যেন পূজায় নিরত।

যেন চলচ্চিত্রের দ্রুত টানে কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে কত বেদনা, কত অবহেলার ছবি জাগিয়া উঠিয়া টুলুর মনটা নূতন করিয়া উদ্বেল করিয়া দিল, খানিকক্ষণ কোন কথাই বলিতে পারিল না, তাহার পর গভীর মিনতির স্বরে বলিল—"নরোত্তম, তোমার কাছে ছুটো দিন ভিক্ষে চাইছি, মাত্র ছুটো দিন—পরশু এগারোটা দিন পুরো হচ্ছে, চম্পার কাজ; তটিনীর ওখানে গিয়ে আমি হীরাকে দিয়ে এইটুকু শেষ ক'রে আসি। ভেবেছিলাম, নিজে আর যাব না, কাউকে দিয়ে হীরাকে পাঠিয়ে দোব—এখন মনে হচ্ছে, নিজেই যাই একবার, এর শেষ কাজ…"

নরোত্তম, আর নরম হওয়া যেন চলে না এইভাবে একটু নিরাসক্ত কণ্ঠেই বলিল—"এইখানেও তো হ'তে পারে বাবাঠাকুর—ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি…এই জায়গায় ছিলেন তিনি—ভালবাসতেন তাঁর বাপের ভিটে একরকম…"

টুলুর মুখটা বিরক্তিতে দৃঢ় হইয়া উঠিল, বলিল—"না নরোত্তম, এখানে হঠাৎ বাধা এসে পৌঁছুতে পারে, চম্পার এই শেষ কাজে আমি ছোটবড় কোনরকমই উপদ্রব সহ্য করতে পারব না।"

ভাঙা গৃহস্থালী হইতে দরকারী জিনিসগুলা গুছাইয়া লইতে যা একটু দেরি হইল, তাহার পরই টুলু হীরাকে লইয়া আশ্রমের গাড়িতে বাহির হইয়া পড়িল। নানারকম চিন্তায় মনটা তোলপাড় করিয়া দিতেছে। হীরা আজকাল কমই কথা কয়, বাড়ির পাট উঠিয়াই গেছে, বাইরে টুলু-নরোত্তমকে পাওয়াও যায় না আর; তবু বোধ হয় যাত্রার শিশু-সুলভ উত্তেজনাতেই একটু আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল বাবার সঙ্গে, উত্তরের অসঙ্গতিতে এবং কোন কোন প্রশ্নের উত্তরের অভাবে শেষপর্যন্ত উৎসাহ না পাইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। টুলুর বোধহয় একসময় হুঁশ হইল, ছেলের সঙ্গে এই শেষ যাত্রা, নিজে হইতেই আবার আরম্ভ করিল গল্প।…হীরা পড়াশুনা করিতে যাইতেছে, আশ্রমে তো তেমন স্কুল নাই—হীরার যুগ্যি—তাই ব্যবস্থা হইল হীরা ঐখানে থাকিয়াই পড়িবে—চমৎকার

জায়গা ওটা, হীরার বড়-মা আছে, কানন কেমন আসিবে মাঝে মাঝে, রতন আসিবে…রতনকে হীরা দেখে নাই—বড় চমৎকার, একবার দেখিলে আর ছাড়িতে ইচ্ছা করিবে না হীরার…

হীরা প্রশ্ন করে—"আর তুমি থাকবে না বাবা ?"

উত্তরটা যেন কঠিন হইয়া গিয়া টুলুর গলাটাকে রুদ্ধ করিয়া ধরে, বলে "হ্যাঁ, আমি থাকব এসে মাঝে মাঝে তোর কাছে, থাকব বইকি। তারপর তোর পড়াশোনা শেষ হ'লে তুইও চলে আসবি। আর জানিস হীরা ? তোর বড়-মা, কাননকাকা, রতনকাকা সবাই আশ্রমেই আসবে চ'লে, তখন আবার বড় হ'য়ে তুই রতনকাকার মতন কলকাতায় যাবি চ'লে কলেজে পড়তে।…বড়-মার কাছে এখন লক্ষ্মীটি হয়ে থেকে মন দিয়ে পড়াশোনা করবি…"

"আর, খেলা বাবা ?… নকল-গড়, তোরণ দুর্গ—ইংরেজে-বাঙালীতে লড়াই—আমি বাবা পতাকা নিয়েছি সঙ্গে, তা মনে ক'রো না যে ভুলে গেছে হীরে !"

হীরা আবার মুখর হইয়া উঠিতেছে ধীরে ধীরে।

টুলু চুপ করিয়া যায়, মনটা আবার আলোড়িত হইয়া ওঠে, একটু পরে হীরার মাথায় হাতটা তুলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে সঞ্চারিত করিতে থাকে, টুলু আশীর্ময় হইয়া ওঠে, বলে—"সবসময় কি একই খেলা হীরা ? বড় হয়ে কি করতে হবে তাই জন্যেই তো খেলা শেখা, নয় কি ? তা ও-খেলা তো তোর রইলই শেখা হীরা, দরকার হয় কুম্ভর মতন নিজের দেশের মান বাঁচাবি, শিবাজীর মতন শত্রুর হাত থেকে দুর্গ কেড়ে নিবি, দেশ থেকে অত্যাচারী বিদেশীকে তাড়াবি…কিন্তু আমি আশীর্বাদ করছি, ও-সবের দরকার হবে না হীরা, আমরা—তোর দাদুর সঙ্গে যাঁরা কাজ করতেন, তাঁরা তোর জন্যে দেশের এসব জঞ্জাল মিটিয়ে যাব… তোদের হবে আরও বড় কাজ, তোরা দেশকে আরও নতুন ক'রে গড়বি—শুনেছিস তো রামায়ণ মহাভারতের গল্পে কি রকম ছিল আমাদের দেশ ?—সেই রকম ক'রে—তার চেয়েও ভাল ক'রে। তারপর নিজের দেশকে গ'ড়ে নিয়ে…"

হীরার উৎসাহ ফিরিয়া আসিতেছে, অনেকদিন পরে এত মন খুলিয়া কথা বাপের ; নিজের কথা কহিবার যে সব মুদ্রাদোষ সেগুলাও আসিতেছে ফিরিয়া,

তাড়াতাড়ি বাবার মুখটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"চুপ কর বাবা, শোন না বলছি—সেদিন মাও এইসব কথা বলেছিলেন—আমরা নতুন রাস্তা গড়ব, তারপর সেই রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে প'ড়ে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ব, এই দেশের লোক ব'লে কত পুজো করবে আমাদের সবাই...মাও বলেছিলেন বাবা···কবে জান বাবা?—সেই একদিন—যেদিন অনেক রাত ধ'রে আমার সঙ্গে গল্প করলেন না? আমায় তুলে বললেন—তুমি মাকে একলা ফেলে কোথায় চলে গেছ—আমায় পাহারা দিতে হবে..."

এর পরেই কথা যাইতে লাগিল বাধিয়া, পথের একঘেয়েমি ক্লান্তি মনকে আরও স্তিমিত করিয়া আনিতে লাগিল, আর এ-উৎসাহকে ফিরাইয়া আনা গেল না।

সন্ধ্যা নামিল, হীরা ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া অবশেষে বাপের হাঁটুতে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল, টুলু একেবারেই আত্মগত হইয়া রহিল বসিয়া।

শীতের অল্পায়ু সন্ধ্যা গিয়া রাত্রি নামিল। যেখানে টুলুর কাননের সঙ্গে দেখা হয় সেবার, সেই জায়গাটা ছাড়াইয়া গেছে একটু, এমন সময় পিছনে রাস্তার বাঁকে মোটরের দুইটা হেডলাইট দেখা গেল, বেশ জোরে চলিয়া আসিতেছে; কাছে আসিয়া গাড়িটার গতি শ্লথ হইল, তাহার পর বলদ-গাড়িটার পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। হেডলাইটে চোখে ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছিল, দাঁড়াইতেই টুলু দেখিল সেই শিখের লরিটা।

নামিয়া আসিল নরোত্তম, বলদ-গাড়ির পিছনে দাঁড়াইয়া টুলুকে বলিল—"একবার নেমে আসতে হবে আপনাকে।"

দুইজনে গিয়া গাড়ি থেকে একটু তফাতে দাঁড়াইয়া বলিল—"আজ রাত্তিরে যে কোন সময় পুলিসে হানা দেবে আশ্রমে, বোধহয় জন পনরো থাকবে বা তারও বেশি, এবার আর খানাতল্লাসী নয়, আশ্রম পোড়াবে, নেবার মতন জিনিস সব সরিয়ে নিয়ে, রুখতে গেলেই গুলি চালাবে।"

টুলু গাড়ির মধ্যে একবার ঘুমন্ত হীরার দিকে চাহিয়া লইয়া বলিল—"ঠিক কখন্, তা টের পাওয়া গেল না?"

"না, যেমন খবর তাতে বেরিয়ে প'ড়ে থাকতে পারে। জিনিসপত্র আপিস

থেকে সরিয়ে ফেলেছি, আশ্রমও একেবারে খালি ক'রে সবাইকে কাশবনীর এপারে আমবাগানে লুকিয়ে বসিয়ে রেখে এসেছি।"

"কেন, এরকম করলে কি ভেবে?"

"দু রকম পরামর্শ হতে পারে বাবাঠাকুর; এক, যখন ওরা আশ্রম তল্লাস করবে আগুন দেবার আগে, সেই সময় হঠাৎ আক্রমণ ক'রে ওদের শেষ করা; আর, একেবারে গা-ঢাকা দেওয়া; ওরা ধরাক আগুন, না হয় ঘরগুলোই গেল।"

দুই দিককার টানে টুলুর মনটা যেন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, শেষের কথাটায় আর একবার ঘুমন্ত হীরার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"হঠাৎ গা-ঢাকা দেওয়া, তাও তোমার মুখে শুনছি নরোত্তম!"

"কারণ আছে বাবাঠাকুর, পরশু আমাদের এদিককার জাতীয়-সরকারের ঘোষণার দিন, সেইটে ক'রে তারপর ওদের সঙ্গে একহাত খেলা যাবে, তখন আমরা না থাকলেও কাজ চলবে।"

টুলুর মনটা অনেকখানি শান্ত হইয়া আসিয়াছে। চুপ করিয়া ভাবিল খানিকক্ষণ, তাহার পর বলিল—তোমার মতটা কি?"

"আজ ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গেলে ও-কাজটা বোধহয় আর হবেও না বাবাঠাকুর—কতকগুলো কাজ ওদিকে বাকি আছে এখনও জানেনেই। বলছিলাম —যাক নাহয় খানকতক ঘর এখন।"

বুকের চাপা নিশ্বাসটা টুলু নিঃশব্দে মুক্ত করিয়া দিয়া বলিল—"বেশ, তাই করোগে তবে। আমি পরশু শেষরাত্রে কাশবনীর জোড়া বাবলার নিচে এসে পৌছুব, তুমি থেকো—একলাই।"

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আবার ছইয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। লরিটা স্টার্ট দিয়া আগাইয়া গেল, অপরিসর রাস্তা, যতক্ষণ না একটা তেমাথা গোছের পাইতেছে ঘুরাইতে পারিতেছে না।

॥ পঁচিশ ॥

আবার চিন্তার ঝড় উঠিল টুলুর বুকে, বুকটা এত জোরে ঢিপঢিপ করিতে লাগিল যেন শব্দটা পর্যন্ত শোনা যায়।...টুলু আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়াছে, সত্যই কি এই তাহার নিজের মত—গা-ঢাকা দেওয়া? অথচ এই একটা ছুতা পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেল, কেন এরকম?

টুলু গিরিধারীকে প্রশ্ন করিল—"কতটা গিয়ে লরিটা ঘোরবার জায়গা পাবে গিরিধারী, জানা আছে?"

গিরিধারী একবার দুইধারে দেখিয়া লইল ভাল করিয়া, তাহার পর বলিল—"আর পোটাক পরে রায়গঞ্জের রাস্তাটা বেরিয়ে গেছে ডাইনে, সেইখানে ঘুরতে পারবে।"

আরও বাড়িয়া গেল বুকের ধুকপুকুনিটা—যাইতে আসিতে এই এক মাইল রাস্তা, লরির পক্ষে মিনিট দু-তিন, ঘুরিতে আর একটু, অতটাই না হয়, এই মিনিট পাঁচেক; তাহার পরই লরিটা আবার সামনে দিয়া বাহির হইয়া যাইবে, আর কোন উপায়ই থাকিবে না।

টুলু যেন বুকে জোর পাইবার জন্যই বুকের কাছে জামাটা খামচাইয়া ধরিল; বিদ্যুৎগতিতে মনটা এই প্রায় নয় বৎসরের সমস্ত জীবনের উপর দিয়া ঘুরিয়া আসিল—কত দুঃখ, কত বেদনা-ভরা জীবন—তাহার তপস্যা—এর জন্য সে সবই ছাড়িয়াছে—একটার পর একটা কাটাইয়া আসিয়াছে—ধর্মের বিলাস—সত্যই তো এই রুক্ষ কঠোর তপস্যার সামনে সেটা বিলাসই বইকি; তারপর নারীর মোহ, তারপর নিছক দেহের মোহের চেয়েও যা শতগুণে কঠিন, নারীর ভালবাসা। আজ তবে এ আবার কি?

টুলুর হৃদয় মথিত করিয়া চম্পার স্মৃতি জাগিয়া উঠিল; আজ তাহার এ দুর্বলতা ঐ শোকেই, টুলু বুঝিল—একটির পর একটি করিয়া কে যেন তাহার

সন্ন্যাসের পথে সব প্রতিবন্ধকগুলিই সাজাইয়া গিয়াছে; এই শেষ, কাটাইয়া উঠা যায় না এটুকুকেও?

লরিটার আওয়াজটা থামিয়া গেছে, নিশ্চয়, রায়গঞ্জের রাস্তার মোড়ে আসিয়া গেল।

আর যে সময় নাই!

টুলু সোজা হইয়া বসিল, গিরিধারীকে বলিল—দাঁড় করাও গাড়িটা।"

আর একটুও আগাইয়া লরির সঙ্গে ব্যবধানটা কমাইতে চায় না, চিন্তার যতটুকু সময় পাওয়া যায়।

এই শোকও জয় করিতে হইবে, এও একটা বিলাস, এসব টুলুর জন্য নয়। আর যে গেলই চলিয়া তাহার জন্য এতটুকু শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াই বা কি হইবে? —একটা আত্মপ্রবঞ্চনাই নয় কি—ভদ্র আকারে?

সঙ্গে সঙ্গে টুলুর আরও একটা কথা মনে হইল, হঠাৎই—কে জানে এই শ্রদ্ধা নিবেদনের অন্তরালে তটিনীর আকর্ষণ আছে কি না···হয়তো সেইটাই আসল—মনের মগ্নচেতনার সন্ধান কে রাখিতে পারে? কর্মক্লান্তির মধ্যে শোকের অবসাদে টুলু বোধহয় আবার তটিনীর কাছেই ধরা দিতে যাইতেছে—ভালবাসাকেও জয় করিয়াছে বলিয়া যে-দম্ভ, তাহার অন্তরালেও বোধহয় পরাজয়েরই আয়োজন চলিয়াছে।

অন্ধকারের মধ্যে লরীর হেডলাইট দুইটা দিকচক্রের উপর দিয়া আবার এইদিকে ঘুরিল, লরিটা মুখ ফিরাইয়াছে।—টুলুর মনে হইতেছে, উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডটা এবার ফাটিয়া যাইবে।

টুলুর সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল।

ঘুরিয়া নামিতে যাইবে, ঘুমন্ত হীরার মুখের উপর দৃষ্টিটা পড়ায় আবার নিশ্চল হইয়া বসিল।—এই যে আরও প্রতিবন্ধক বাকি, এ যে সবচেয়ে শক্ত···হীরাকে কি করিয়া ছাড়া যায়? কোথায় যায় ফেলা?···কয়বার করিয়া মা-বাপ হারাইবে এই অবোধ শিশু?···

কাঁকরের উপর লরির শব্দ জাগিয়া উঠিয়াছে—উগ্র হইয়া উঠিতেছে—কি যেন,

ছেদন করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। গিরিধারী গাড়িটা যতটা সম্ভব পাশে করিয়া লইল।

টুলু নামিয়া একেবারে রাস্তার মাঝখানে গিয়া দুইহাত তুলিয়া দাঁড়াইল,—পাছে একটু ভুল হইয়া যায়, এতটুকুও সন্দেহ থাকে ড্রাইভারের মনে ···

প্রায় শেষ মুহূর্ত বলিয়া লরিটা সশব্দে ব্রেক করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। নরোত্তম উপর থেকেই একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"এ কি !"

অন্যরকম সন্দেহ করিয়া ছিল বোধ হয়; মনের যা অবস্থা !...টুলু ঠোঁটের কোণে একটু হাসিয়া বলিল—"না আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম না। নেমে এস।"

নরোত্তম নামিয়া আসিলে বলিল—"ভেবে দেখে মতটা বদলাতে হ'ল নরোত্তম, গা-ঢাকা দিলে চলবে না।"

নরোত্তম বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করিল—"তবে ?

আশ্রমে যারা আগুন দিতে আসবে তাদের ফিরে যেতে দোব না; তার মানে নিশ্চয় এই যে, নিজেদেরই শেষ হতে হবে। তাই হয়তো তারই ব্যবস্থা করতে হবে।"

নরোত্তম যে ক্ষুব্ধ তা নয় মোটেই, তবে বিস্মিত, নির্বাকভাবে মুখের পানে চাহিয়া রহিল। টুলু বলিল—"যেতে যেতে সবিস্তারে বলব পথে, প্ল্যানও ঠিক করতে হবে, তবে মোটামুটি খানিকটা বলি—ভেবে দেখলাম রক্ত দেওয়াই দরকার এখন, মানুষের মনের ফসলের জন্যে ওর মতন সার আর নেই। দক্ষিণে আগস্ট-সেপ্টেম্বরে রক্তস্রোত বয়েছিল ব'লেই আজ জাতীয় সরকার সম্ভব হয়েছে—সার দেওয়া জমিতে ফসল ফলেছে। আরও ফলবে। আমরা যাই—যাবই—ক্ষতি নেই—মানুষ তোয়ের হবে। এ দেশে লোকেরই অভাব নরোত্তম, লীডারের নয়। এ যা সময়, গা-ঢাকা দেবার সময় নয়।"

নরোত্তম একটু নীরব থাকিয়া বলিল—"বেশ, তা হ'লে আপনি হীরা-দাদুকে রেখে আসুন, লরি করেই, আমরা দাঁড়াই।"

টুলু মনে মনে যেন শিহরিয়া উঠিয়াই বলিল—"না, আর কি এক পা এগুই !—মানে, আর কি সময় আছে নষ্ট করবার ?...হীরাকেও আর ওঠানো

চোখ না··· ইয়ে—তোমাদের কাছে কাগজ পেন্সিল আছে?···সিংজী, আপনার কাছে আছে?"

সিংজী ইঞ্চি দুয়েকের একটা পেন্সিল আর নোটবুক থেকে একখানা পাতা ছিঁড়িয়া দিল। নোটবুকের উপরই সেটা রাখিয়া টুলু মোটরের আলোতে সেটা ধরিল; একটু ভাবিল, তাহার পর লিখিল—

স্নেহের তটিনী,

চম্পার মুখে সব শুনেছিলাম। যা বলেছিল যদি সত্যি হয় তো আমার সন্তানকে তোমার হাতে দেওয়া রইল; আমার আদর্শ জান, সেইরকম ক'রে ওকে মানুষ ক'রো। এই সঙ্গে আমার উইলটা পাঠাচ্ছি, সম্পত্তি কম নেই, হীরাকে যত ইচ্ছা বড় করা চলবে,—মনে তো হয়, ওর মধ্যে বড় হবার অশেষ প্রেরণা জমাও রয়েছে।

চম্পা নেই। এরা জানে অসুখে মারা গেছে, আসলে কিন্তু আমার প্রতিবন্ধক হয়েছিল মনে ক'রে পথছেড়ে দাঁড়িয়েছে। তোমার সঙ্গে লুকুবার সম্বন্ধ নয় ব'লে তোমাকেই বললাম এ-কথাটা, হীরা পর্যন্ত কখনও জানবে না।

পরশু চম্পার শেষ কাজ, একটু নিষ্ঠার সঙ্গে করিয়ে দিও; এই আমার শেষ অনুরোধ।

ইতি—

টুলু

গিরিধারীকে ডাকিয়া উইলের খাম আর চিঠিটা হাতে দিয়া বলিল—"তোমাদের বাইরের মা-মণির হাতে দিয়ে দেবে, আর পৌঁছে হীরাকে আগে না উঠিয়ে তাঁকেই আগে ডেকে নিয়ে আসবে।"

তাহার পর আর গাড়িটার দিকে ফিরিয়া না চাহিয়া, একেবারে লরির উপর উঠিয়া বলিল—"এবার চালাও সিংজী একটু জোরে।"

কড়া আলোয় শুধু সামনের গতিপথটুকু উজ্জ্বল করিল, বাকি আর সবই গভীরতর অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করিয়া লরিটা ছুটিয়া চলিল।

শেষ